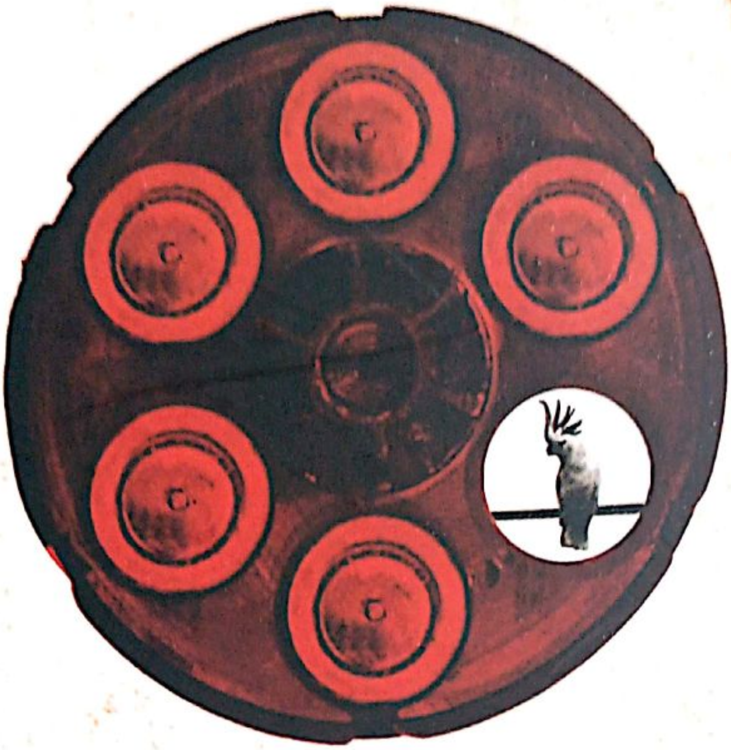


দীনেশ গুপ্তের রিভলভার

সন্মাত্রানন্দ

দীনেশ গুপ্তের রিভলভার

সন্মাত্রানন্দ

১

এইসব পাহাড়ি জায়গায় মৃত্যুর নিকষ অন্ধকারের মতো অতর্কিতে সন্ধ্যা নামে। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লে বিকেলের রোদ ঝপ করে নিভে যায়। পথের দুপাশে সবুজ পাতাগুলো সন্ধ্যার অন্ধকারে বিলীয়মান। সর্পিল পথ বেয়ে কটেজের দিকে উঠে আসে সে। তার ঢোলা পাঞ্জাবির ওপর চাপানো বাদামি রঙের সোয়েটার ভেদ করে ঠান্ডা বাতাস কামড় বসাতে শুরু করে। এই ঠান্ডা তার কাছে অবশ্য কিছুই না। এর থেকে অনেক বেশি ঠান্ডার প্রকোপ পুইয়েছে বিরূঢ়ক। তবে এটাও ঠিক, তখন সে ছিল যুবক। তখন তার দুর্বার প্রাণশক্তি ছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, স্বপ্ন ছিল। আর এখন এই দুহাজার পনেরোতে তার শরীরে এসে পৌঁছেছে মধ্যবয়সের বিষণ্ণতা। রক্ত শীতল হচ্ছে দিনে দিনে।

পাহাড়ি পথের দুপাশে আকাশছোঁয়া দেওদার গাছেদের অচল মিছিলের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিরূঢ়কের মনে প্রশ্ন আসতে থাকে। রক্ত শীতল হয় যেন কাদের? নিজেই নিজেকে উত্তর দেয়, সাপের রক্ত শীতল হয়। অন্তত এরকমই শুনেছে সে। কোন সাপের রক্তের তাপমান কত—সে বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান কখনও তার চোখে পড়েনি। এরকম কোনো স্টাডি হয়েছে কি? যদিও জুলজি তার বিষয় নয়, তবু এমন কোনো সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা হয়ে থাকলে কি তার চোখে পড়ত না? নাও পড়তে পারে। আচ্ছা, এমন কোনো সাপ কি থাকতে পারে কোথাও, যার রক্ত ঠান্ডা নয়, যার রক্ত গরম? থাকতেই তো পারে এমন একটা ফ্লাকচুয়েশন!

সাপের ভেতর একটা প্রচণ্ড শয়তানি আর ধূর্ততা আছে বলে মনে হয় তার। মানুষের থেকেও কি বেশি? সাপের এই শয়তানি আর সাপের রক্তের শীতলতা—এ দুয়ের ভেতর কোনো সম্পর্ক নেই তো? রক্ত যত ঠান্ডা হয়, শয়তানি তত বাড়ে, নাকি? আসলে সাপের শয়তানি তো দেখছে মানুষ তার নিজের চোখ দিয়ে। আদতে সাপ জীবটি নিতান্ত নিরীহ একটি জীব। তার গায়ে কেউ পা না দিলে আত্মরক্ষার জৈব তাগিদ ছাড়া সাপ কখনও কামড়ায় না। কিন্তু 'সভ্য' মানুষ? আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়াও অন্যের ওপর ঈর্ষা আর প্রতিহিংসার বিষ ঢেলে উজাড় করে দিতে অণুমাত্র দ্বিধা করে না সে। মানুষের বিষ এত সাংঘাতিক যে, তার তুলনায় কেউটে সাপকেও নির্বিষই বলা

যেতে পারে। ভাবতে ভাবতে ঠান্ডা বাতাস আরেকবার তার হাড়ের ভেতরে দাঁত ফুটিয়ে গেল। সমতলে এখন গ্রীষ্ম আসব আসব করছে, তবু এখানে এই পাহাড়ি উপত্যকায় বাতাস এখনও বেশ শীতল। বাতাস, নাকি তার নিজেরই রক্ত? নিজের রক্তই কি আরও আরও দিনের পর দিন শীতল হয়ে যাচ্ছে বিরূঢ়কের? কিন্তু কেন?

আপাতত প্রশ্নটা মুলতুবি থাক। কটেজের নীচে কাঠকুটো শুকনো লতাপাতা জড়ো করে আগুন দিয়েছে অবিরাম ছেত্রি প্রতিদিনের মতো। চা বানাবে। অবিরাম, নাকি অভিরাম—কী নাম ওর? ইদানীং এই লোকটিই বিরূঢ়কের কাজকর্ম করে দেয়। সরল, বিশ্বাসী লোক। যতদিন বিশ্বাসী থাকে বিরূঢ়কের ততদিনই সুবিধে। মোটের ওপর কৌতূহলী না হলেই হল। এর আগে পর পর দুজন পরিচারক একটু অধিক কৌতূহলী হয়ে পড়ায় বিরূঢ়ককে গা-হাত-পা সামান্য ঘামাতে হয়েছিল। তবে সে তেমন কিছু না। আর তেমন কিছু বিরূঢ়ককে করতেও হয়নি। দুবারই কয়েকদিনের মধ্যেই পাহাড়ি ঝরনার আশেপাশে লোক দুটির বাঘে খাওয়া মৃতদেহ পাওয়া যায়। বাঘ শরীরের অর্ধেক খেয়ে গেছে। এ অঞ্চলে বাঘের হাতে মরা নতুন কিছু তো নয়। ডেডবডি দুটো পাহাড়ি গ্রামের লোকেরা প্রশ্নহীন নিশ্চিন্ততায় নিয়ে গিয়ে শ্মশানে জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেখানে হিংস্র বাঘ জল খেতে আসে, সেই জায়গায় বোকার মতো লোক দুটি উদগ্র কৌতূহল দেখাতে গিয়েছিল কেন যে!

ব্যাপারটা ভাবলেই বিরূঢ়কের ঠোঁটের কোণে একটা পিচ্ছিল হাসি খেলে যায়।

কাটা গাছের একটা শুকিয়ে যাওয়া গুঁড়ির ওপর এসে বসল বিরূঢ়ক। অবিরাম চা দিল। আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে বিরূঢ়ক বাঁকা চোখে দেখল, অবিরাম নিজের চা নিয়ে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় বসেছে। একটা কলাই করা বাটিতে চা ঢেলে ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে জুড়িয়ে খাচ্ছে। তার রং-জ্বলে-যাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া সোয়েটার আর মাথার তেকোনো কাপড়ের টুপিতে শুকনো পাতা, ধুলো, জংলা ঘাস লেগে আছে। মুখের চামড়ার রুক্ষ ফাটলে আর কপালের বলিরেখায় টিলা-পাহাড়ের অনেক গল্প লেগে আছে যেন। একটু আগেই কিচেনে নিশ্চয়ই বিরূঢ়কের জন্য রাতের খানা পাকিয়েছে সে। সাতটা বাজার আগেই অবিরাম নীচের পাহাড়ি গ্রামে নেমে যাবে। সাতটাও এখানে বেশ অন্ধকার। অবশ্য যদি চাঁদ না থাকে। অন্ধকারে হনহন করে চলে যায় রোজ অবিরাম ছেত্রি। একটা টর্চও নেই হাতে। রাস্তাঘাট তার মুখস্থ—সে না হয় হল, তবু...

'তোমার ভয় করে না, অবিরাম? এখানে বাঘের এত উৎপাত...'

'নেহি, বাবুজি। শেরোয়ালি মাতা হৈ না... মাতাজিকি কিরপা সে...' কী যেন আরও কথা বিড়বিড় করে বলেছিল অবিরাম।

সম্ভবত, মানুষ সরল হলে নির্ভয় হয়। কিন্তু নির্ভয় হতে কি ভালো লাগে? জীবনে

ভয় না থাকলে উত্তেজনা কোথায়? আর উত্তেজনা না থাকলে এ জীবন নিয়ে কীই বা করবে তখন বিরূঢ়ক?

অবিরামকে বিদায় দিয়ে বিরূঢ়ক উঠে দাঁড়াল। একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল সে। আঁধার পাতায় ছাওয়া অরণ্যের ছাদ পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে আজকের রাতের আকাশ। এখানে তারাগুলো যেন অনেকটা নেমে এসে জ্বলছে। একটা বিশালকায় ময়াল সাপের বুটিদার মসৃণ পেটের মতন রাতের আকাশটা বনের ওপর তার যাবতীয় দংশন নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ঘরের ভিতর এসে ঢুকল বিরূঢ়ক। নিজের মতো করে সে সব গুছিয়ে নিয়েছে এই ক-বছরে। এসব পাহাড়ি অঞ্চলের বাড়িঘর তৈরিতে সিমেন্ট যত না ব্যবহৃত হয়, কাঠের বহর তারও চেয়ে বেশি। হাঁটলে মেঝেতে কাঠল শব্দ হওয়ার কথা। বিরূঢ়কের চলাফেরায় অবশ্য শব্দ হয় না। বহুদিনের ট্রেনিং।

কী জানি কোন মতলবে এই বিজন পার্বত্য প্রদেশে একজন রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার বাড়িটা বানিয়েছিল! কতরকম ধান্দা থাকে মানুষের। লোকটা মরে যাওয়ার পর কয়েক হাতফেরতা হয়ে বাড়িটা বিরূঢ়কের হাতে এসেছে। তার কাজকর্মের পক্ষে এর থেকে উপযুক্ত পরিবেশ হতেই পারে না আর।

দুটো ঘর—একটা শোয়ার, আরেকটা পড়ার। একটা টয়লেট। কিচেন একটা। মাঝখানে অনেকটা প্রশস্ত জায়গায় ডাইনিং স্পেস। টেবিলে হটপটে খাবার রেখে গেছে অবিরাম। ফ্লাস্কে কফি। রাতে বেশি কিছু খায় না বিরূঢ়ক। দুটো স্যান্ডউইচ আর এক কাপ ব্ল্যাক কফি। জুড়িয়ে যাওয়ার আগেই খেয়ে নেওয়া ভালো। ভেতরে ভেতরে বড্ড উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছে সে আজ সারাদিন। ইব্রাহিমের কোনো মেসেজ এল না। অথচ আজই আসার কথা। দ্রুত ছন্দে রাতের খাওয়া সেরে স্টাডিতে এসে ল্যাপটপটা খুলল বিরূঢ়ক। না, কোনো মেসেজ ঢোকেনি।

ঘড়িতে সময় দেখল—সাড়ে সাতটা। অথচ মনে হচ্ছে, যেন কত রাত যে হয়ে গেছে! ঘরের বাইরে নিঃশব্দ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা পাইন বনের দিক থেকে একটানা ক্লান্তিকরভাবে ঝিঁঝি ডাকছে। জানালার কাচের সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালে অনেক দূরের অনুচ্চ পাহাড়টার গায়ে দু-একটা আলোর বিন্দু দেখা যায়। ওখানে হয়তো গ্রাম আছে কোনো। স্বাভাবিক মানুষ আছে। স্বাভাবিক জীবন তাদের। ঘর আছে, ঘরনি আছে, হাসি-কান্না আছে, ভালোবাসা আছে, ঘৃণাও আছে। এককথায় একটা জ্যান্ত জীবন আছে। জীবন তো জ্যান্ত হয় না সব সময়, মরা জীবন বিরূঢ়ক দেখেছে। দেখছে। আজ বহু বছর।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে বইয়ের র‍্যাকগুলোর দিকে তাকালো বিরূঢ়ক। নানারকম বই। জার্নাল। তার নিজের বিষয় ছিল এইসব একদিন। এখন এসব তার

কাছে নিষ্প্রাণ। বইয়ের পাতার ভাঁজে বইপোকার মতো বহুদিন সে মরে শুকিয়ে গিয়েছে। মরা জীবন তার—সে-কথা সে জানে। তবু যতদিন না শরীরের রক্ত একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, ততদিন উত্তেজনা চাই। ভয় চাই। রোমাঞ্চ চাই।

পড়ার টেবিলে এসে বসল। একটা জার্নাল ওলটাচ্ছে। অপারেশনস রিসার্চের মূল্যবান গবেষণা। লিখেছেন অ্যালেক্স আর্চার। স্বনামধন্য অধ্যাপক। কী নিখুঁত কাজ! কী গভীর গবেষণা তাঁর। বিরূঢ়কের গাইড। অথচ এ পেপারগুলো তৈরি করতে বিরূঢ়ককেই রাতের পর রাত জাগতে হয়েছিল। খাটতে হয়েছিল বছরের পর বছর। প্রকাশিত হয়েছে অ্যালেক্সের নামে। নাহ্, সহকারী হিসেবেও বিরূঢ়কের নাম কোথাও উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি অ্যালেক্স। অন্যদিকে বিরূঢ়কের পেটমোটা ডক্টোরাল থিসিস অ্যালেক্সের ভল্টে শুয়ে শুয়ে বছরের পর বছর ধুলো খেয়েছে।

সশব্দে বাঁধানো জার্নালটা বন্ধ করল বিরূঢ়ক। ঘরের নৈঃশব্দ্য দুলে উঠল একটু। হাইব্যাকড চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসল। তাকিয়ে দেখল, ঘরের কোনায় ছাদের কাছে একটা মাকড়সা নিস্তব্ধ অপেক্ষায় বসে আছে। জালে শিকার নেই। কখন পড়বে শিকার? কতক্ষণ বসে থাকবে আর মাকড়সাটা স্থিরচিত্র হয়ে ওইভাবে?

ঝিঁঝির ডাক ঘন হয়ে এল। চোখ আধবুজে আছে বিরূঢ়ক। কতগুলো ছবি রোজকার মতোই চোখের সামনে বেকার ঘুরে মরছে। ওগুলোতে আর সে মন দেয় না। স্মৃতি আর অবচেতনের ছবি সব। মফস্‌সল শহরে ফেলে আসা শৈশব, কৈশোর। ছোটোবেলার মাতৃপিতৃহীন অনাদৃত নিরাপত্তাহীন জীবন। তারপর আড়ষ্ট যৌবন। দেবলীনা... প্রাইভেট টিউশন পড়াতো সে দেবলীনাকে। নিজেও তখন বারো ক্লাসের ছাত্র। স্কুলের পাঠ সেরে কলকাতায় পড়তে আসা। প্রেসিডেন্সি। হিন্দু হোস্টেল। স্ট্যাটিস্টিকসের জটিল ধাঁধা। সেই ধাঁধা ভাঙতে তাকে অবশ্য বেশি আয়াস করতে হয়নি। মাথাটা চিরকালই পরিষ্কার তার। ভালো ফল হয়েছিল অনার্সে, মাস্টার্সে বেশ ওপরের দিকে।

তবু তার ছিল ভয়ংকর সর্বগ্রাসী একাকিত্ব। বন্ধু হত না তার কিছুতেই। কোনো সম্পর্ক কোনোদিন প্রলম্বিত হয়নি জীবনে। শুধু ব্যতিক্রম ছিল দেবলীনা।

দেবলীনা তার জন্যেই চলে এসেছিল কলকাতায় কলেজে পড়তে। দুজনের ঘোরাঘুরি... দেবলীনাকে পড়ানো... আউট্রামঘাটে আঙুল ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা...আরও অনেক কিছু। হ্যাঁ, অনেক কিছু। দমদমের কাছে একটা বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকত দেবলীনা। তারপর কী যেন হয়ে গেল!

কী আবার হবে? যা হয়। দেবলীনার জীবনে অন্য পুরুষ এল। সমর্থ, সফল পুরুষ। সম্পর্কটা এতদিন কেন দেবলীনা লুকিয়ে রাখল বিরূঢ়কের কাছ থেকে, কে জানে!

তার উত্তর আর খোঁজেওনি বিরূঢ়ক। অথচ এই ব্যাপারটা সে মেনেও নিতে

পারেনি। একটা আলোহীন রাস্তায় ফট করে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠে চিরতরে নিভে যাওয়ার মতো জীবনের একেকটা ক্লান্তিকর অধ্যায়। তার সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে আবাল্য একাকী জীবনের মধ্যে আবার ফিরে গেছে সে। দিল্লি আইএসআই-তে চলে গেছে। সেখান থেকে বছর তিনেক পরে অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি। ডাব্লু পি কেরি স্কুল অব বিজনেস। অপারেশনস রিসার্চ। অধ্যাপক অ্যালেক্স আর্চার। বিরূঢ়কের নিয়তি! যার সুভদ্র মুখোশের নীচে একটা বীভৎস দাম্ভিক মুখ। নিষ্ফল পরিশ্রম ও ক্ষয়ে আসা তামাদি হয়ে যাওয়া বিরূঢ়কের জীবন।

সায়েন্টিফিক জার্নালের কাগজকাটা সিলভারফিশ পোকা যেমন একদিন বইয়ের চাপে পাতার ভাঁজে মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে, নিজেকে তেমনই তখন প্রতিদিন মনে হচ্ছিল তার। মরেই গেছে সে, শুধু শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়নি, এই যা। সৎ মানুষ সারা জীবন সৎ থেকে কী পায়? কিচ্ছু না। অন্যকে ভালোবেসে মানুষ কী পায়? কিচ্ছু না। শ্রমসাধ্য পড়াশোনা করে, আন্তরিকভাবে ভালো কাজ করে কী পায়? বিরূঢ়ক কী পেয়েছে? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।

জীবনে একটা মারাত্মক উত্তেজনা চাই। ভয় চাই। ভয় পাওয়া চাই, ভয় দেখানো চাই। যে জীবনে ভয় নেই, সে জীবনে কিছু আছে? মানুষ সরল হলে ভয় চলে যায়। ভয়কে পেতে চাইলে মানুষকে জটিল হতে হবে। অপারেশনস রিসার্চের ব্রেইনস্টর্মিং জটিল ধাঁধার থেকেও জটিলতর। তখন বেঁচে থাকাটার একটা মানে পাওয়া যাবে। সারা দিনের শেষে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে রোজ এই কথা মনে হত বিরূঢ়কের।

এই ভয়, এই উত্তেজনা, এই রোমাঞ্চ, এই জটিলতা খুঁজতে খুঁজতে নিজের ভেতর আরেকটা মানুষকে দেখতে পেল একদিন বিরূঢ়ক। অ্যালেক্সের মুখোশের নীচে যে ভয়াবহ মুখটা আছে, তার চেয়েও ভয়ংকর একটা মুখ। এতদিন তার নিজের মধ্যে সেই ভয়ানক লোকটা ঘাপটি মেরে ছিল, বিরূঢ়ক স্বপ্নেও ভাবেনি।

উত্তেজনা কোথায়? বই পড়া, গবেষণা করা, কঠিন প্রবলেম সল্‌ভ করা, গান শোনা, সিনেমা দেখা, প্রেম করা, শরীর বানানো, শরীর খাওয়া—এসব ঢের করেছে, এসব বিস্বাদ হয়ে গেছে তার। নতুন উত্তেজনা চাই। এমন কোনো কাজ, যাতে বিপন্নতা আছে, ভয় আছে, ভয় দেখানো আছে, রক্তের চনমনে স্বাদ আছে...

কিছুটা মন ভালো করার জন্যে, কিছুটা নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে এই সময়েই বিরূঢ়ক অ্যাডভান্সড নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামিং নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। দারুণ লাগছিল সেই জগৎ, এতদিনের নির্জীব মন চাঙ্গা হয়ে উঠছিল। কিন্তু এই করতে গিয়েই হঠাৎ একদিন...

হঠাৎ একদিন একটা ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কীভাবে যেন ক্র্যাক করে ঢুকে

পড়ল বিরূঢ়ক। পা পিছলে ঢুকে পড়েই বুঝতে পারে সে একটা লুক্কায়িত নিষিদ্ধ পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছে... অদ্ভুত কতগুলো লোক... অদ্ভুত কতগুলো গোপন খবর... বুঝতে পারে, তাকে দেশে ফিরতে হবে। হবেই। এবং এখনই।

কিছুদিনের মধ্যেই একটা আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ নিউজ মিডিয়াগুলোতে পৃথিবীব্যাপী প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ অ্যালেক্স আর্চার তাঁর স্টাডিতে এক রাত্রে মারা গেছেন। ডাব্লু পি কেরি স্কুল অব বিজনেসের এই প্রতিভাবান বিপত্নীক অধ্যাপকের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন। সহসা ভয়ংকর কিছু দেখে হার্টফেল করায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ফরেন্সিক রিপোর্টে বলা হয়েছে।

এইসব খবর আর ছবি টুকরো টুকরো হয়ে হাইব্যাকড চেয়ারে এলিয়ে দেওয়া বিরূঢ়কের মাথার খুলির ভেতরে ঘুরতে থাকে। ছবিগুলোতে সে মন দেয় না। ঘুরতে দেয়। এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে নাগরদোলার ঘুরনচরকির মতো থেমে যায় ছবিগুলো; চিন্তাগুলো নিভে আসে। ঘুমের অতলে ডুবে যায় বিরূঢ়ক... রক্তস্রোত আরও ঠান্ডা, আরও হিম হয়ে আসে...

হঠাৎ একটা যান্ত্রিক সুরেলা শব্দে জ্যামুক্ত ধনুকের মতো সোজা হয়ে উঠে বসল বিরূঢ়ক। মেসেজ ঢোকার আওয়াজ। চকিতে সরে এল ল্যাপটপটার কাছে। চোখ কচলে ভিপিএনে ঢুকল। গোটা মনিটার কালো হয়ে গেছে। সেই নিকষ কালো পর্দায় সাদা অক্ষরগুলো ফুটে উঠতে শুরু করছে। ইব্রাহিম! এতক্ষণে!

'ট্রেজার প্রোটেকটার চিফ! শুভসন্ধ্যা! দিস ইজ ইব্রাহিম!'

এই তোর সন্ধে হল? মনে মনে একটা অশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে বিরূঢ়ক উত্তর দেয়, 'শুভসন্ধ্যা, ইব্রাহিম! আমার প্রস্তাব ভালো করে ভেবে দেখেছ?'

'সেকথা পরে বলছি, সুশীতলবাবু! আগে বলুন কেমন আছেন? সব ঠিকঠাক চলছে তো?'

ঠান্ডা চোখে মনিটারের দিকে তাকিয়ে বিরূঢ়ক টাইপ করে, 'সো সো।'

'আপনার প্রস্তাব ভেবে দেখেছি। কিন্তু তাতে রাজি হলে ট্রেজার প্রোটেকটারের একেবারে প্রাথমিক শর্ত লঙ্ঘিত হয়...'

'কীরকম?'

'আপনাকে নতুন করে কী বলব? আপনি সবই জানেন। আমাদের মন্ত্রগুপ্তির প্রথম শপথই হল, আমরা ট্রেজার প্রোটেক্ট করব। ট্রেজার হান্ট করব না।'

উত্তর দেওয়ার আগে একটু অন্যমনস্কভাবে বিরূঢ়ক মাউসপ্যাডের ওপর আঙুল নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর লিখল, 'এই নিয়ম কে ঠিক করে দিয়েছে?'

উলটোদিকে এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর ফুটে উঠল, 'আপনি সেটাও ভালোভাবেই জানেন, চিফ। রাগ করে এসব লিখবেন না। ট্রেজার প্রোটেকটার যিনি

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিই এই নিয়ম স্থির করে দেন... অরুণেশ গুপ্ত।'

ক্ষিপ্র বেগে ঝড় তুলল পর্দায় এবার বিরূঢ়ক। লিখল, 'অরুণেশ গুপ্ত... যোগেশ গুহ... বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একজন সদস্যও আজ বেঁচে আছেন নাকি? কত কত বছর আগে তাঁরা চলে গেছেন। কারও ফাঁসি হয়েছে তো কেউ আন্দামানে শেষ হয়েছেন... একদল লোক যুগের পর যুগ ধরে তাঁদের ট্রেজার পাহারা দেবে, অথচ ট্রেজারটা কী, কোথায় ট্রেজার আছে, তা জানবে না, সেগুলোকে কাজে লাগাবে না—এ কি হতে পারে?'

আবার উলটো দিকে সব চুপচাপ। ইব্রাহিম ভাবছে। ভাবুক। এটাই প্রলোভনের মুহূর্ত। এসময় সবাই ভাবে।

একটু পরেই দেখা গেল, উত্তর লিখছে ইব্রাহিম। উত্তর ঢুকল।

'মানুষ মরে যায়। কিন্তু তার আদর্শ মরে না। আপনি ট্রেজার খুঁজে বের করে তা দিয়ে কী করতে চাইছেন, সুশীতলবাবু?'

একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল বিরূঢ়ক, 'সেটা এখানে লেখা নিরাপদ নয়। সাক্ষাতে বলব। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

উত্তরটা লিখেই অসম্ভব টেনশন হতে লাগল বিরূঢ়কের। আহ্! একটা অসাধারণ ভয়ের স্রোত উঠে আসছে তার সারা শরীর বেয়ে, না? অপূর্ব! গলা শুকিয়ে আসছে। অ্যাড্রিনালিন! আহ্! এই অনন্যসাধারণ অনুভূতিটাই তো সে সব সময় চায়। ফাইট অর ফ্লাইট!

দারুণ উত্তেজনায় চোখ বড়ো বড়ো করে সে দেখল, ইব্রাহিমের মেসেজ ঢুকছে।

'কিন্তু... কিন্তু আমরা তো কেউ কাউকে কোনোদিন দেখিনি... দেখা হওয়াও সম্ভব নয়...'

চমৎকার! সারা শরীরে একটা স্বস্তির অনুভূতি আছড়ে পড়ল। আহ্, রিলিভড! আচ্ছা, চরম উত্তেজনার পর এই রিলিফ এত তৃপ্তিদায়ক কেন?

তার মানে যা দাঁড়াল, ইব্রাহিম সুশীতলবাবুকে কোনোদিন দেখেনি। এই ব্যাপারেই সে এতদিন সন্দিগ্ধ ছিল। যদি এর আগে ইব্রাহিম আর সুশীতলবাবুর দেখা হয়ে থাকত, তাহলে কাজটা খুব কঠিন হয়ে যেত বিরূঢ়কের পক্ষে।

সুশীতলবাবু ছাড়াও আরও একটা মানুষের লাশ জলের তলায় মাছেরা ঠুকরে খেলে জীবিত মানুষের জন্য ব্যাপারটা বড্ড রিস্কফুল হয়ে যায়। রিস্ক নেবার উত্তেজনা বিরূঢ়ক চায় ঠিকই, কিন্তু খেলাটা দ্রুত শেষ হয়ে যাক, সে কি চায়? চায় না। শেষে অবশ্য আড়াই ঘর চালে ঘোড়া বোড়েকে খাবেই। কিন্তু শুরুতেই নয়। সেটা খেলার শেষে।

আর একটুও দেরি না করে বিরূঢ়ক উত্তর টাইপ করল, 'এতদিন দেখা হয়নি,

ইব্রাহিম! কিন্তু এবার দেখা হওয়া জরুরি। বিশেষত, এই ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আজকাল আর তত নিরাপদ নয়।'

উত্তর দিল ইব্রাহিম, 'কোথায় দেখা করতে চান?'

'পরে জানাচ্ছি, ইব্রাহিম। দু-এক দিনের মধ্যেই।'

'বেশ। আপনি খুব সতর্ক থাকবেন, সুশীতলবাবু।'

মনিটারের মধ্যে ইব্রাহিমের উপস্থিতির কোনো চিহ্ন নেই। নিশ্চয়ই ইব্রাহিম বেরিয়ে গেছে।

মেসেজগুলো ডিলিট করল বিরূঢ়ক। তারপর বেরিয়ে এসে ল্যাপটপ বন্ধ করল। ঢকঢক করে জল খেল সে। তারপর ক্লান্ত মাথাটা হাই-ব্যাকড চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দিয়ে ওপরের দিকে তাকাতেই দেখল, ছাদের কোণে মাকড়সার জালে কী একটা পোকা পড়ে ছটপট করছে। জালের কেন্দ্র থেকে এতক্ষণের মৌন ভেঙে পাহাড়ি মাকড়সাটা পোকাটার দিকে ধীর পায়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে।

২

উদ্দালকের মামার বাড়িটা সত্যিই বড়ো বিচিত্র গড়নের। এ ধরনের পুরোনো বাড়ি কলকাতা হলে প্রোমোটারদের হাতে পড়ে ভেঙেচুরে শপিং মল উঠে যেত। কিন্তু জায়গাটা মেদিনীপুর শহরের সব থেকে প্রাচীন অঞ্চল মীরবাজার হওয়ায় বাড়িটা একইরকম থেকে গেছে। বাইরের দিকে ছড়ানো অনেকটা বাগান; নারকেল গাছ, সুপুরি গাছ, পেয়ারা গাছ, আরও নানারকম ঝোপঝাড়। বাগানের পেছনে মূল বসতবাড়িটি দোতলা; লম্বা টানা বারান্দা, মোটা মোটা থাম, মাথার ওপর ভারী কড়িকাঠ, মার্বেল পাথরের মেঝে, ঘোরানো সিঁড়ি, ভিতরমহল, বাহিরমহল, দুর্গাদালান—সব মিলে জমজমাট ব্যাপার। উদ্দালকের দাদু, তাঁর বাবা, বাবার বাবা—এক কথায় উদ্দালকের মায়ের দিকের সাত পুরুষ এ বাড়িতেই বাস করে এসেছেন। যদিও দাদু মারা যাবার পর দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গেছে, উদ্দালকের একমাত্র মামা স্যানফ্রান্সিস্কোতে থাকে, এ বাড়িতে দিদার দেখাশোনার জন্য দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয় বিশুমামা রয়েছে। এ ছাড়া এ বাড়ির বড়ো বড়ো ঘর দুয়ার দালান এমনিই পড়ে থাকে, বেশিরভাগ ঘরই তালাবন্ধ।

অন্যান্য বার উদ্দালক মা-বাবার সঙ্গেই মামার বাড়িতে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আসত, কিন্তু এবার সে ক্লাস এইটে উঠেছে আর এ বছর এসময়েই বাবার কলেজে প্রজেক্ট চলছে, তাই উদ্দালককে এবার হাওড়া স্টেশনে মেদিনীপুর লোকালে মা-বাবা তুলে দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ, এই প্রথম উদ্দালকের একা একা মামার বাড়ি আসা। মেদিনীপুর স্টেশনে অবশ্য বিশুমামা ছিল, কোনো অসুবিধে হয়নি। আর অসুবিধেই বা হবে কেন? উদ্দালক তো বড়ো হয়ে গেছে, তাই না?

সে যে বড়ো হয়ে গেছে—এ কথাটা যে একেবারেই মানতে চায় না, সে হচ্ছে দিদা। দিদা ভাবে, তার দালি সেই আগের মতো ছোটোটিই আছে। উদ্দালকের মায়ের নাম প্রতিমা, ডাকনাম বুলি। তাই মায়ের নামের সঙ্গে মিলিয়ে দিদাই উদ্দালকের নাম দিয়েছিল 'দালি'। সেই থেকেই স্কুলে সে উদ্দালক হলেও বাড়িতে দালি।

বাড়ির সামনে পিছনে দুটো পুকুর; বেনাপুকুর আর পিড়িপুকুর, পুকুর না বলে দিঘি বলাই ভালো, সকাল থেকে জাল ফেলে নাতির জন্য এত্তো মাছ ধরিয়েছে দিদা। সেই

সব মাছ থেকে ভাজা, ঝোল, ঝাল, অম্বল বানিয়েছিল শীলুমাসি, যে দিদার রান্না করে দেয়। সামনে বসিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে একতলার ঠান্ডা ঘরটাতে দিদা বড়ো খাটের ওপর নাতিকে পাশে নিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প বলতে লাগল সেই ছোট্টোবেলার মতো। ওসব গল্প শুনে শুনে পুরোনো হয়ে গেছে; সেকথা বলার সাহস আছে নাকি দালির? একটু আগে গল্প বলতে বলতে দিদা ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘরের মধ্যে শন শন করে পাখা ঘুরছে আর দিদার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাথার কাছে সবুজ রঙের পুরোনো দিনের খড়খড়ি দেওয়া জানালা। দালি খড়খড়ির কাঠটা ধরে টান দিল, চোখের পাতার মতন সব কটা ঘুলঘুলির ওপর থেকে ঢাকনা একটু উঠেছে, সেই ফাঁক দিয়ে পিড়িপুকুরের হলদেটে জলতল নিথর হয়ে আছে দেখা যায়। বেলা দুপুর।

চুপিসাড়ে দিদার পাশ থেকে নামল দালি। একবার ফিরে দেখল, দিদা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘরের কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে চাবির গোছাটা এমনভাবে নিল যেন শব্দ না হয়। চৌকাঠ পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। সে দোতলায় যাবে। এই দুপুরবেলা দোতলার মস্ত ঘরগুলোতে তার একা একা ঘুরে বেড়াতে দারুণ লাগে।

দোতলার বারান্দাটা শুনশান। মেঝের ওপর পঙ্খের কাজ। উঁচু ছাদ। লোহার বিম দিয়ে তৈরি কড়িবরগা। খুট করে চাবি ঘুরিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল সে। এটা লাইব্রেরি ঘর। দেওয়াল জোড়া উঁচু উঁচু বইভরা আলমারি। কত বই! সব পুরোনো। পুরোনো বইয়ের গন্ধ, ন্যাপথলিনের গন্ধ। দেব সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত পূজাবার্ষিকীগুলো—কী সুন্দর নাম সেসব বইয়ের। বেণু ও বীণা, অরুণাচল, আরাধনা—এমনি কত নাম! বাঁধানো শুকতারা, ভারতবর্ষ, দেশ, প্রবাসী। শার্লক হোমস অমনিবাস, ব্যোমকেশ সমগ্র, ফেলুদা, দস্যু মোহন... আরও এমনি সব বই... ইংরেজিতে, বাংলাতে। সব বই খুলে দালি বুঝতেও পারে না। পুরোনো দিনের ভাষা। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন' বইটার মলাটের ছবি দেখে তার মনে হল, বইটা পড়তে হবে। আলমারি থেকে বই নিয়ে লাইব্রেরি ঘরে বসে পড়তে লাগল কিছুক্ষণ। কোথায় যেন পায়রা ডাকছে মন্থরগতিতে দুপুরবেলায়...

এই ঘর থেকে পাশাপাশি ঘরগুলোতে যাওয়া যায়। দু-তিনটে ঘর পরপর যুক্ত। আবার বারান্দা দিয়েও হেঁটে যাওয়া যায় অনেক দূর। কিছুক্ষণ বই পড়ার পর বারান্দা দিয়ে একটু হেঁটে এল দালি। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। এমন একটা ছড়ানো বাড়ি, কেউ যদি হাঁটতে থাকে, অবাক হয়ে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে হয়তো এমন জায়গায় এল, যেখানে এর আগে কখনও আসেনি। কোথাও দেওয়ালের গায়ে মিনারের মতো স্তম্ভ উঠে গেছে, কোথাও ছাদটা চারকোণ থেকে যেন মাঝখানে নেমে এসেছে, কোথাও দরজাগুলো ওভাল, ডিমের মতো। কোথাও আয়তাকার। কোথাও ছাদের থেকে মৌচাক ঝুলছে, কোথাও ঘুঘু পাখি বাসা বেঁধেছে...অদ্ভুত!

'তোর মামার বাড়িটা ভালো করে ঘুরে দেখলে বাংলার গত দুশো বছরের ইতিহাসটা মোটামুটি পড়া হয়ে যায় রে! একেকটা সময় বাড়ির একেকটা অংশ বানানো হয়েছে,' কথাটা বলেছিল সবুজমামা।

দালি বলেছিল, 'তুমি দেখে কী করে বুঝতে পারো?'

'তুইও পারবি। একটু মন দিয়ে আরকিটেকচারের ধরন-ধারণ অবজার্ভ করলে আর বাংলার ইতিহাসটা মোটামুটি পড়া থাকলে ওটা কিছু কঠিন নয়,' গম্ভীর গলায় সবুজমামা বলেছিল।

সবুজমামা হচ্ছে দালির যে মামা স্যানফ্রান্সিস্কোতে থাকে, তার ছোটোবেলার বন্ধু। সবুজমামার ভালো নাম শৌনক মিত্র। থাকে মানিকপুরে, এখান থেকে মিনিট পনেরো লাগে হেঁটে যেতে। সবুজমামা মেদিনীপুর কলেজের ম্যাথসের লেকচারার। কিন্তু ম্যাথসের বাইরেও হাজারো বিষয়ে সবুজমামার ইন্টারেস্ট। লম্বা, ছিপছিপে সবুজমামা, চোখে একটা হাই-পাওয়ারের চশমা, বাইক চালায় দারুণ জোরে, আর ভীষণ সাহস সবুজমামার। এক কথায় সবুজমামা হচ্ছে দালির হিরো। আজ বিকেলেও সবুজমামাদের বাড়িতে যাবে দালি। এই ছুটিতে সবুজমামা দালিকে কম্পিউটার ইনটারনেট শেখাবে, কথা দিয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে বাড়িটার একদিকে চলে এসেছে সে। এদিকটা আরও চুপচাপ। বিশেষ কেউ আসে না বোধ হয়। মেঝেতে পায়রা নোংরা করে রেখেছে। বারান্দায় মেঝের ওপর লোহার রেলিং-এর ছায়া বাঁকাভাবে পড়েছে।

একটা কাঠের দরজা। বন্ধ। পাল্লার ওপর কীসব লতাপাতা জবরজং ছবি খোদাই করা। লোহার তালাটা দেখে মনে হচ্ছে বহুদিন খোলা হয়নি। কেন জানি, এই বন্ধ দরজাটা দালিকে হঠাৎ খুব টানতে লাগল।

'এখানে কী করছ?' আচমকা গলার আওয়াজে চমকে গেছিল দালি। ফিরে দেখল, বিশুমামা।

'এমনি বেড়াচ্ছি!'

'এটা তোমার বেড়ানোর জায়গা নয়। চারিদিকে নোংরা। নীচে নেমে দিদার পাশে গিয়ে শুয়ে থাকো,' বিশুমামা রাগ-রাগ গলায় বলল।

দালি বলল, 'যাবো তো! এখন একটুখানি এখানে থাকি।'

নিজের মনে গজগজ করতে করতে বিশুমামা চলে গেল।

বিশুমামা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেই পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল দালি। একটা চাবি তালাটার পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ঘোরালো। খুলল না।

আরও একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করল, হচ্ছে না। শেষে দেখল, গোছাটার ভেতর

একটা জং-ধরা লোহার চাবি আছে। এটাই কি তবে এই কাঠের দরজার চাবি?

লোহার তালাটার ভেতর চাবিটা দিয়ে এবার ডানদিকে ঘোরাতেই ঘটাস্ করে তালাটা খুলে গেল। দরজার বোল্ট খুলে পাল্লাটা ঠেলতেই পুরোনো দিনের ভ্যাপসা একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল।

ধুলিমলিন একটা অন্ধকার ঘর। বারান্দা থেকে একটু নীচে ঘরটার মেঝে। দুই তিন ধাপ সিঁড়ি আছে ঘরের মধ্যে নামার। আবছা আলোতে যা চোখে পড়ে, সারি সারি অনেকগুলো বাক্স, আলমারি, কাপড়ের পুঁটুলি, এলোমেলো অনেকগুলো জিনিস...

হঠাৎ দালির মনে পড়ল, মা একবার গল্প করেছিল, ছোটোবেলায় মা, মামা, বাড়ির অন্য সব ছেলেমেয়েরা 'চিলেকোঠার ঘর'-এ বাক্স, আলমারির আড়ালে লুকোচুরি খেলত। কিন্তু সেই ঘরটা যে বাড়ির কোন অংশে, মা তা বলেনি।

এই কি তাহলে সেই 'চিলেকোঠার ঘর'? ভেতরে যাবে নাকি? যাবে? দালি ভাবতে লাগল।

গেলে কী আর হবে? বিশুমামা এখন আসবে না। ঘরের মধ্যে নেমে একটু বাক্স-প্যাঁটরা-আলমারি ঘেঁটে, কী আছে ভেতরে দেখে চলে আসবে।

চারপাশে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে দুই তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে অন্ধকার ঘরটার ভেতর নামতে লাগল উদ্দালক।

৩

সাহিল আল ফরাজি প্রায় অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠল। ঘরের জানালার সমস্ত পর্দা টেনে ঘুমোতে গিয়েছিল দুপুরে খাওয়ার পর। জেগে উঠে ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগল তার। এখন ভোর না বিকেল—ঠাহর করতে বিভ্রান্ত হচ্ছিল বারবার। সেলফোনে অস্পষ্টভাবে দেখল সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি সময়। বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে তাকাতেই বুঝতে পারল দিনের আলো ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে।

এতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে? না-ঘুমোবেই বা সে কেন? পরপর কয়েক রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। যদি বা শেষরাতের দিকে ঘুম এসেছে আধঘণ্টা-একঘণ্টার জন্য, সেই ঘুমের মধ্যে মিশে থেকেছে দুঃস্বপ্নের বিষ। একটা অসহ্য উদ্‌বেগ তার মাথাটাকে কুটে কুটে খাচ্ছে ঘুণপোকার মতো। কী যে করবে, কী তার করা উচিত, কিছুই স্থির করতে পারছে না। তার এই পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে এমন মানসিক সঙ্কটে পড়েনি সে এর আগে কোনোদিন। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাথা টলমল করছিল আজ সকাল থেকেই। অথচ ঘুমোতে যেতেও সাহস হয়নি, পাছে শেষরাতের ভয়ানক স্বপ্নগুলো আবার দেখা দেয়। শেষে চোখ জড়িয়ে আসছে দেখে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বাঁচতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে বালিশে মাথা রেখেছে। দাদাজান বলতেন, আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ঘুমোতে গেলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাকি একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হয়, যার প্রভাবে নিদ্রাকালে সুপ্ত ব্যক্তির নিকটে শয়তান ঘেঁষতেও পারে না।

আয়াতুল কুরসীর প্রভাবেই হোক, অথবা তিন রাত ঘুম ছুটে যাওয়ার কারণেই হোক, দুঃস্বপ্নহীন সুগভীর নিদ্রা হয়েছে তার আজ দুপুরবেলায়। কিন্তু এখন আবার সেই একই উদ্‌বেগ কালো অশুভ মেঘের মতো মনের আকাশ ছেয়ে আসছে। আর বেশি তো সময় নেই। আজ সন্ধ্যাতেই এসপার ওসপার কিছু একটা হওয়ার কথা। কিন্তু কীভাবে হবে, কোথায় হবে, কিছুই সে জানে না। ট্রেজার প্রোটেকটার চিফ নিজেই নাকি তাকে খুঁজে নেবেন। তবু শেষমেশ সাহিল যে কী বলবে, কী তার বলা উচিত, জানে না।

আহ্, রুকসানা আজ যদি বেঁচে থাকত, তবে এই কঠিন সঙ্কট তার সঙ্গে ভাগ করে

নিতে পারত সাহিল। পাঁচ বছর হল, রুকসানা মারা গেছে ব্লাড ক্যান্সারে। ওদের শাদি হয়েছিল বছর কুড়ি আগে। সাহিল তখন পঁচিশ বছরের যুবক, রুকসানার বয়স ছাব্বিশ। ইউনিভার্সিটিতেই দুজনের দেখা, আলাপ, প্রলাপ, প্রেম। কিন্তু শাদির পর পর থেকেই রুকসানা খুব অসুস্থ থাকত। একটা-না-একটা উপসর্গ লেগেই আছে। মা-ও হতে পারেনি রুকসানা শারীরিক অসুস্থতায়। তারপর ক্যান্সার যখন ধরা পড়ল, তখন একেবারে লাস্ট স্টেজ।

রুকসানা চলে গেছে সাহিলকে একেবারে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে। আব্বার এন্তেকাল হয়েছে আগেই, ঘরে মাত্র দুজন প্রাণী—সাহিল আর তার আম্মা। আম্মা সব সময়ই কাজেকর্মে আর রোজা নামাজ নিয়ে থাকেন। বেশি কথা বলেন না আজকাল। আম্মার কাছেও এ ব্যাপারে মন খুলতে পারছে না সাহিল।

ক্ষিপ্রগতিতে হাতমুখ ধুয়ে কাচা পাজামা পরে পাজামার ওপর কুর্তাটা চাপিয়ে নিল। মাথায় নেটের টুপিটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁকুই দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। চোখ আরক্ত হয়ে আছে, চোখের নীচে অনিদ্রার কাজল। হঠাৎ অনেক বুড়ো হয়ে যাচ্ছে নাকি সাহিল? অনেকদিন একা থাকার ফলে তেলাপোকার পাখার মতো বাদামি আর শুকনো হয়ে যাচ্ছে তার চোখের পাতা? শরীরের বাঁধুনি কমে যাচ্ছে, জেল্লা ফুরিয়ে আসছে যৌবনের? ভালো করে আয়নায় তাকিয়ে দেখল, তার মুখচোখ কি তবে গদ্দারের মতো হয়ে যাচ্ছে? না, গদ্দার সে নয়। কোনোমতেই না। তবু কেন যে মনে হচ্ছে এসব! কার সঙ্গে গদ্দারি করতে যাচ্ছে সে? নিজের সঙ্গে?

আর বেশিক্ষণ আরশির সামনে দাঁড়াতে সাহস হল না সাহিলের। তাড়াতাড়ি আলনার কাছে সরে এসে দেওয়ালে টাঙানো রুকসানার ছবিটার দিকে তাকাল। শান্তি পেল না। মনে হল, ঘরে থাকবে না সে আর। মসজিদে যাবে। প্রার্থনা করে দিমাগ ঠান্ডা করা দরকার। এই নির্জন ঘরকে তার ভয় করছে খুব।

সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে আম্মার সঙ্গে দেখা হল। হাতে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে তিনি কোথায় যেন যাচ্ছেন। মোমের আলোয় একবার শান্ত চোখ তুলে ছেলের দিকে দেখলেন আয়েশা। নিজের বেওকুফিতে নিজেই অবাক হয়ে গেল সাহিল। এই মহল্লায় এতক্ষণ যে লোডশেডিং চলছে, সে একদম খেয়ালই করেনি!

তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় পড়ল। দ্রুতচ্ছন্দে হাঁটছে। এখানে সকলেই তাকে চেনে, দেখা হলেই কেউ হাসছে, কেউ সালাম দিচ্ছে। এইসব সুপরিচিত মানুষেরা কেউ কি জানে, কীসের দিকে সে হেঁটে যাচ্ছে আজ বিকেলে সাহিল? সাহিল নিজেও কি জানে?

তার দাদা, পরদাদা এখানকার পুরোনো বাসিন্দা। অটোমোবাইলের পুরুষানুক্রমিক

ব্যবসা। বহুদিনের দোকান। সাহিলের পূর্বপুরুষেরা সকলেই নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই দাদাজানের কাছে সাহিলের বড়ো হয়ে ওঠা। আব্বা আর কতটুকু সময় দিতে পারতেন? দাদাজান সাজ্জাদ হুসেন সাহিলকে কাছে কাছে নিয়ে ঘুরতেন। নামাজ আদায় করতে, নিয়মিত কোরান মজিদ পড়তে দাদাজানই শিখিয়েছিলেন তাকে।

বলতেন, 'গদ্দারি কখনও কোরো না, সাহিল। গদ্দারের ইহকাল তো গেছেই, তার উপর পরকালে গদ্দারের জন্যে জ্বলছে দোজখের আগুন।' হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরোলো যে বছর, সে বছরের শীতেই দাদাজান চলে গেলেন। তিনি এখন কোথায়? বেহেস্তে, নাকি মাটির অনেক নীচে ঘুমিয়ে রয়েছেন, কে জানে! অসহায় হয়ে পড়লেই দাদাজানের হাসি হাসি মুখ মনে পড়ে সাহিলের।

কিছু ভালো লাগে না তার। কয়েকদিন দোকানে যেতে পারেনি। ওসমানকে ফোনে বলে দিয়েছে তবিয়ত খারাপ। তবিয়তের আসল মালিক হল দিল, সেই দিলের ভেতরেই জাহান্নম জ্বলছে রাতদিন। এসব কথা সে কাউকে বলতে পারে না। মনখারাপের এমন মুহূর্তে বিকেলের নিভে আসা আলো বড়ো মারাত্মক। কেমন একটা জ্বরগ্রস্ত মানুষের ঘোরঘোর ভাব চারিদিকে!

দুপাশের বসতবাড়ি, স্কুলঘর, দোকানপাট, পুকুর ছাড়িয়ে রাস্তাটা একটা বটগাছের দিকে গিয়েছে। বটতলায় একটা রিকশা-স্ট্যান্ড। তার ওপাশে কয়েকটা এগরোল চাউমিনের দোকানের ধার ঘেঁষে স্থানীয় বাজার। রিকশা-স্ট্যান্ডে মুখচেনা রিকশাওয়ালারা সাহিলের দিকে চেয়ে হাসল কেউ কেউ। ভুসিমালের দোকানে কুপির আলোয় মোটা ঘর্মাক্ত মানুষটা হলদেটে গেঞ্জি ফোলা পেটের ওপর তুলে নিবিষ্ট মনে জিনিস ওজন করছে। দোকানের সামনে খদ্দেরের ভিড়। চায়ের দোকানের পাশে হাতেগড়া রুটি বিক্রি করে যে মেয়েটা, সে বেশ তরলতার ভঙ্গিতে পার্শ্ববর্তী ফুচকাওয়ালার সঙ্গে চড়া সুরে প্রেমালাপ করছে। এরা কী নিশ্চিন্ত, কী নিরুদ্‌বেগ, কী সুখী! এদের জীবনে ট্রেজারও নেই, তাকে প্রোটেক্ট করার গুরুভার দায়িত্বও নেই।

মৃত্যুর বছর পাঁচেক আগে আব্বাজান সাহিলকে এক রাত্রে সব কথা বলেছিলেন। সব শুনে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আশি বছরেরও বেশি সময় ধরে এমন একটা ব্যাপার টিকে থাকতে পারে!

টিকে আছে সদস্যদের একনিষ্ঠতায়। আব্বা, দাদা, পরদাদা প্রত্যেকেই নাকি এর মেম্বার ছিলেন। এমন পঞ্চাশেরও বেশি সদস্য ছড়িয়ে আছেন এ শহরের নানা স্থানে। কেউ কাউকে সাক্ষাৎ দেখেননি। দেখা না করাটাই এই গুপ্তসমিতির মেম্বার হওয়ার প্রথম শর্ত। নির্দেশ আসবে ঘুরপথে। হয়তো অজানা নিরীহ কোনো লোকের একটা মামুলি কথার মাধ্যমে। কথাটা কেউ তাকে শিখিয়ে দেবে। সেই লোকটিও জানবে না

তার আপাত নিরীহ কয়েকটা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কোন ভয়ংকর বার্তা সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক মেম্বারের থেকে অন্য পূর্বনির্দিষ্ট মেম্বারের কাছে। হয়তো সাধারণ কোনো পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। বা হয়তো শহরে সার্কাস এসেছে, তার খবর। কিন্তু সেই মামুলি খবরটার অর্থ অন্য। একমাত্র একজন মেম্বারই বুঝতে পারে এর মধ্য দিয়ে কী নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাকে সঙ্গোপনে।

শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সাহিল। বারবার জানতে চেয়েছিল, কারা এই সমিতি গড়েছিলেন অত বছর আগে? আব্বা দু-একজনের নাম বলেছিলেন। অরুণেশ গুপ্ত। যোগেশ গুহ। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন, এগুলো তাঁদের আসল নাম নয়। গুপ্তসমিতিতে কেউ কারও আসল নাম ব্যবহার করে না। যেমন আব্বার নাম এই গুপ্তসমিতিতে প্রীতম। সাহিলও এখানে সাহিল নয়, ইব্রাহিম!

অরুণেশ গুপ্ত নামের আড়ালে যে মানুষটি ছিলেন আশি বছরেরও আগে, তিনি কে তা না বুঝতে পারলেও, তিনি কী ছিলেন, সাহিল কিছুটা আঁচ করতে পারে বই-কি! অত বছর আগে এই মেদিনীপুর শহরের বারুদখানায় এমন একটা সিক্রেট সোসাইটি তৈরি করার দরকার পড়েছিল যাঁর বা যাঁদের, কিংবা এমন গুপ্তদল গঠনের হিম্মত ছিল যাঁদের, বোঝাই যায় তাঁরা কেউ সহজ মানুষ ছিলেন না। সম্ভবত আগুনঝরানো বিপ্লবী। সমিতিটি তৈরি করা হয়েছিল তাঁর বা তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। তাঁদেরই বিপজ্জনক জিনিসপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গোপনে দেওয়ানেওয়া করা, কিংবা কোনো ব্যক্তির ওপর আড়াল থেকে শ্যেনদৃষ্টি রাখা, প্রয়োজনে তাকে এ দুনিয়া থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে দেওয়া, এমন আরও অনেক কাজের দায়িত্ব বর্তে ছিল গুপ্তসমিতির সদস্যদের ওপর।

এসব কাজ কতটা বিপজ্জনক, সময়ে সময়ে কতটা নির্মম হতে পারে, সেকথা ভেবে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠেছিল সাহিল। ভেবেছিল আব্বার কাছে সে ব্যাপারে প্রশ্নও তুলবে। কিন্তু প্রৌঢ় মানুষটি কী এক গভীর চিন্তায় ডুবেছিলেন। চিরাগের আলোয় ঘরের দেওয়ালে দীর্ঘ ছায়া ফেলে দুলে দুলে গম্ভীর স্বরে বলছিলেন, 'এই যুদ্ধেই জান্নাত, এই যুদ্ধেই জান্নাত'। যেন কী একটা পবিত্র কাজের ফরমান পেয়েছেন তিনি! তাঁর এই গাম্ভীর্য দেখে প্রশ্নগুলো উচ্চারণ করতে পারেনি সাহিল। তবু বিচক্ষণ সামশের হুসেনের অসুবিধা হয়নি ছেলের চোখের ভাষা পড়ে নিতে। বলেছিলেন, 'বাজান! এখনই তুমি এই কথাগুলো বুঝবে না। এটুকু জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে আমাদের পরিবার পুরুষানুক্রমে এ কাজের দায়িত্ব পেয়েছে। শহীদ হওয়ার যোগ্যতা আমাদের ছিল না। তবু আমরা গর্বিত যে, আমরা সেই বীর শহীদদের কাজে সহায়তা করতে পেরেছি। আল্লাহ্‌পাক সূরা বাকারাহ-র একশো নব্বই সংখ্যক আয়াতে বলেছেন, যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কোরো। কিন্তু সীমালঙ্ঘন কোরো না, মহান আল্লাহ্‌

সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না।'

তারপরেই স্বাভাবিক হয়ে হেসে বলেছিলেন, 'তবে তুমি অত ভয় কোরো না, বাজান। দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর তেমন কঠিন বিপজ্জনক কাজের নির্দেশ আসে না আমাদের ওপর। এখন আমাদের কাজ শুধু ট্রেজার প্রোটেক্ট করে চলা। একটু নজরদারি করে চললেই হবে। তাতে তুমি বিপন্ন হবে না।'

সাহিল রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে প্রশ্ন করে ফেলেছিল, 'ট্রেজার। সেটা কী?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আব্বা যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছেন এমন নিরাসক্ত থমথমে গলায় বলেছিলেন, 'এই প্রশ্ন তুমি আর কখনও কোরো না, সাহিল। ট্রেজার কী, তা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করার বা কৌতূহল প্রকাশ করারও কোনো অধিকার নেই। সে আছে কিছু একটা। আমাদের কাজ এ শহরের কয়েকটি বিশেষ জায়গার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। ওইসব জায়গায় যেন কোনো কনস্ট্রাকশন, কোনোরকম খোঁড়াখুঁড়ি না হয়। কেউ যেন সেসব জায়গায় অযথা হাঁটাহাঁটি না করে।'

'কেন? ওইসব জায়গার বিশেষত্ব কী, আব্বাজান?'

কিছুটা বিরক্ত স্বরে সামশের হুসেন বলেছিলেন, 'হবে কোনো দেবস্থান বা কোনো পবিত্র ভূমি। কত পুরোনো এ শহর, কত কাণ্ড হয়েছে এখানে, আমরা নাদান ছোকরা ছিলাম তখন, আমাদের আর কে কতটুকু ভেঙে বলেছে?'

আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, তিনি এসব ব্যাপারে সত্যিই বিশেষ কিছু জানেন না আর।

আব্বার এন্তেকাল হওয়ার পর একদিন ঘুরপথে নির্দেশ এসেছিল, সাহিল যেন তার ল্যাপটপ অন করে ইন্টারনেট চালু করে। নির্দেশানুযায়ী কাজ করে সাহিল দেখেছিল, তাকে একটা বিশেষ সাইটে ঢুকতে বলা হচ্ছে। ঢুকবার পরেই ল্যাপটপের পুরো স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সাদা সাদা অক্ষর ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। বোঝা গেছিল, অপরিচিত লোক মারফত খবর চালাচালি করার বিপদ অনুভব করেই ট্রেজার প্রোটেকটারের কর্মকর্তারা এই ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কের আশ্রয় নিয়েছেন। এখন থেকে যাবতীয় নির্দেশ এখানেই পাবে ইব্রাহিম ওরফে সাহিল।

আস্তে আস্তে সে সব জানতে পারে। টিপি-র চিফের নাম সুশীতলবাবু। বলাই বাহুল্য, সুশীতলও নিশ্চয়ই তাঁর আসল নাম নয়। সরাসরি এই চিফের কাছ থেকেই নির্দেশ আসতে শুরু করে। তেমন কঠিন কাজ কিছু নয়। কর্নেলগোলার কালী মন্দিরের ঠিক পাশে একটা বাড়ি মেরামত হচ্ছে। সেখানে যতক্ষণ মিস্ত্রিরা কাজ করে তাদের ওপর নজর রাখা। দত্তগলিতে দুর্গাপূজার প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধা চলছে। প্যান্ডেল তৈরি হয়ে যাওয়া অবধি ওখানেই কাছে কাছে থাকা। কাকাতুয়া-বাড়িতে কে আসছে যাচ্ছে, তার খবর নিয়ে চিফকে জানানো... এইসব।

মাঝখানে কিছুদিন এই নেটওয়ার্ক চুপচাপ হয়ে যায়। সুশীতলবাবুর দিক থেকে কোনো খবর নেই। আবার দুমাস পর মেসেজ আসতে শুরু করে। ব্যাপারটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি সাহিলের। কিন্তু দিন পনেরো আগে যে নির্দেশ পেল, তার পর থেকেই মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল তার। এটা সে কীভাবে করবে?

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছে সে। মসজিদের সামনের নির্জন রাস্তাটা। নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকার দরুন কোথায় পা ফেলছে লক্ষ করেনি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরতেই ভীষণভাবে চমকে উঠে পিছু হঠে গেল সাহিল। চালতে গাছের পেছনের জঙ্গলটা থেকে একটা সাপ হিলহিল করে বেরিয়ে এসে একেবারে প্রায় তার পায়ের কাছ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে।

ইয়া মাবুদ! একদম জাত পদ্মগোখরোর বাচ্চা! আরেকটু হলেই হয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে গায়ের ওপর পা ফেললেই ছোবল দিয়ে বিষ ঢেলে দিত, একেবারে অনিবার্য মৃত্যু!

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ধক ধক করে উঠছে পড়ছে। এমন ভর সন্ধেবেলা সাপ এলো কোত্থেকে এ তল্লাটে?

সাপটা রাস্তা পার হয়ে ওদিকের ড্রেনের ভেতর সেঁধিয়ে গেল।

বড্ড বিপজ্জনক ব্যাপারস্যাপার ঘটছে আজ। মালিকের কী ইচ্ছা, কে জানে!

দূরের আকাশটার গায়ে মেঘরাশির ওপারে অস্তসূর্যের আভা মিলিয়ে আসছে। মসজিদ থেকে মাগরিবের আজান ভেসে এল। প্রভুর পদপাতে নতজানু হওয়ার আহ্বান।

রাস্তাটা পার হয়ে এল সাহিল। চোখে পড়ল, মসজিদের চুনকাম করা প্রাচীরের গায়ে লেখা আছে পবিত্র কোরানের বাণী : মহান আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, নামাজের ভিতরেই আছে আমার শান্ত দুনয়নের শীতলতা।

হে আল্লাহ্! মহামহিম রব! আমাকে শান্তি দাও। আমার উদ্‌বেগ, অশান্তি দূর করো।

অলংকৃত দ্বারপথ পেরিয়ে সাহিল মসজিদের চবুতরায় এসে ঢুকল। মুসল্লিরা অনেকেই এসে গেছে। মসজিদের রোয়াকে তারা বদনায় জল নিয়ে ওজু করছে। সাহিল ওজু করতে করতেই ভাবছিল, কোন পানিতে যে মনের দুশ্চিন্তা ধুয়ে ফেলা যায়!

মসজিদের প্রার্থনাকক্ষের ভেতরে ঢুকল সাহিল। সম্মুখে ইমাম কেবালামুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরই পিছনে মুসল্লিরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সাহিলও তারই একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। কল্পনা করার চেষ্টা করল, সে যেন এখন মহান আল্লাহ্‌তালার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্তরে নামাজের নিয়ত করল।

দুহাত কান বরাবর তুলে উচ্চারণ করল : আল্লাহু আকবর! আল্লাহ্ মহান—তিনিই এই নামাজের প্রভু।

নাভির নীচে ডান হাত বাম হাতের ওপরে রেখে স্থির হয়ে দাঁড়াল সাহিল। সকলেই

ইমাম সাহেবের অনুকরণে মাথা নীচু করে সম্মুখে সিজদার জায়গার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে আছে। তারপর উচ্চাতি হল সেই সুপবিত্র শব্দগুলি :

'হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র ও মহান। আমি আপনার প্রশংসা করছি। আপনার নাম বরকতময়। আপনার মর্যাদা সু-উচ্চ। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহা নেই।'

শ্বাসের গভীরে অতি সঙ্গোপনে সাহিল বলল : 'আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় চাইছি। আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যিনি দয়াময়, যিনি পরম দয়ালু। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।'

সূরা ফাতিহা পঠিত হচ্ছে। সকলে একসঙ্গে বলে উঠল : 'আমিন'। তারপর অন্য একটি সূরা পাঠ শেষ হলে মুসল্লিরা তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেল। কোমর থেকে শরীর সামনের দিকে ভেঙে বুক, পিঠ, মাথা অনুভূমিকভাবে রেখে দুই হাঁটুর ওপর দুই হাতের আঙুলগুলি প্রশস্ত করে ধরল। সংশ্লিষ্ট প্রার্থনা উচ্চারিত হল।

রুকু থেকে উঠে পূর্বের দাঁড়ানো অবস্থায় ফিরে গেল সকলে। তারপর পুনরায় তাকবীর দিয়ে সকলে সিজদায় গেল। দুই হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে প্রথমে হাত, তারপর কপাল ও নাক মাটিতে স্পর্শ করে দুই হাত কান-বরাবর কেবালামুখী করে দোয়া করতে লাগল।

'পবিত্র, মহান আমার রব! যিনি সর্বোর্ধ্ব!'

এইভাবে পরের পর বিধিবদ্ধভাবে নামাজের ধাপগুলি অনুষ্ঠিত হতে লাগল। প্রাণপণে মনকে প্রার্থনায় ডুবিয়ে দিতে চাইছিল সাহিল। কিন্তু পেরে উঠছিল না। এ কী পরীক্ষায় আজ ফেললে আল্লাহ্? ট্রেজার রক্ষা করা আমার কাজ। অথচ, সেই ট্রেজার খুঁজে বের করার নির্দেশ এল কেন? যে টিপি-চিফকে কেউ কোনোদিন দেখেনি, যিনি এতদিন আল্লাহ্র মতই ছিলেন নিরাকার, সেই সুশীতলবাবু আজ সাহিলকে দেখা দিয়ে নির্দেশই বা দিতে চাইছেন কোন উদ্দেশ্যে? তার বারবার মনে হচ্ছে, সে কোনো একটা নিয়ম ভাঙছে, একটা ভয়ংকর অপরাধ করতে যাচ্ছে। কী একটা গোলমালের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে সে। কোথা থেকে যেন কী এক ভয়ানক প্রতারণার জাল তার চারিদিকে বিছানো হচ্ছে, যার থেকে যেন তার কোনো পরিত্রাণ নেই।

নামাজ শেষ হয়ে এল। 'হে আল্লাহ্! আমি জাহান্নমের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি। কবরের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি। জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি। কুচক্রীর অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।'

নামাজ শেষে অন্য মুসল্লিদের মতো সাহিল তার ডানে ও বামে সালাম ফেরাল। কাঁধের কাছে আল্লাহ্র দিব্য ফেরেস্তারা আছেন। তাঁরাই এই নামাজের সাক্ষী থাকুন। ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে তারপর সে তার দৃষ্টি বাম করতল থেকে মণিবন্ধ, বাজু

পেরিয়ে বাম বাহু ও বাম কাঁধের ওপর ফেরাল। আর তখনই হঠাৎ কেন জানি মনে হল, তাকে যেন কেউ অপলক দেখছে।

পাশের মুসল্লির দিকে চাইল সাহিল। নিতান্ত নিরীহ একজন মানুষ। সাহিলের উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন। কেউ তো তাকে দেখছে না। তবু কেন যে এমন মনে হচ্ছে...

নামাজের পর লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে চিন্তিত মুখে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেও সাহিলের সেই একই অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে লাগল। কেউ তাকে দেখছে। কিন্তু যে দেখছে, সাহিল তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

মনে হল, এই বিরক্তিকর অস্বস্তিটা থেকে তাকে এখনই বেরিয়ে আসতেই হবে। এখানে আর নয়। একটা টোটো আসছে দেখে হাত তুলে তাকে দাঁড় করালো সাহিল।

বটতলা থেকে স্টেশনের রাস্তার দিকে টোটো চালাতে বলল। নিশান্তিকা লজের কাছে একটা কাফেটারিয়া দেখে নেমে গেল টোটো থেকে। মাথাটা ধরেছে খুব।

মৃদু আলোকিত ছোট্টো একটা কাফে। মিউজিক সিস্টেমে হালকা সুর বাজছে। কোণের দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসল সে।

টেবিলের সবুজ কভারের ওপর চুপচাপ শুয়ে থাকা ফোল্ডারটা খুলে মেনুকার্ডে চোখ বোলালো। একজন ওয়েটার সামনে এসে দাঁড়াতেই মেনুকার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে কফি আর স্ন্যাক্স অর্ডার দিল। ওয়েটার চলে গেল অর্ডার নিয়ে।

এখানে তাকে কেউ চেনে না। সাহিল তাকিয়ে দেখল কাফেটার এখানে ওখানে নারীপুরুষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছে। ডানদিকে একটা টেবিলে বসে আছে স্বামী স্ত্রী আর তাদের একটা বাচ্চা। মাঝামাঝি দুই জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। জানালার পাশে বামদিক ঘেঁষা একটা টেবিলে একটি কিশোরী মেয়ে সেলফোনে কী যেন খুটখুট করছে আর ফ্রুটজুসে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। অনেক দূরের একটা টেবিলে চোখে চশমা, সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান এক যুবক একা একা খাবার খাচ্ছে। বেশ সুন্দর দেখতে যুবকটি।

কেউ চেনে না তাকে, অথচ এখানেও অস্বস্তিটা ছেড়ে যাচ্ছে না কিছুতেই। যেন একজোড়া পলকহীন চোখ নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দেওয়াল থেকে, টেবিল থেকে, মেঝে থেকে, এমনকি ছাদ থেকেও। মাথাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে সে বসে রইল খানিক।

ওয়েটার টেবিলের ওপর কফি আর স্ন্যাকস নামিয়ে রেখে চলে গেল। সাহিল খাচ্ছে। একা একা নিরালা টেবিলে বসে এই মধ্যবয়সে খাওয়ার কথা কি ছিল তার? চারিপাশের মানুষজন কত সুখী। নিজের মানুষদের নিয়ে তারা সময় কাটাতে পারে সন্ধেবেলা। শুধু তাকেই গিলতে হবে দিনের পর দিন এই দুর্বহ সময়ের ভার। তা না হয় হোক, তবু এই সমস্ত বিপন্নতার মধ্যে আল্লাহ্‌পাক যেন তাকে রক্ষা করেন।

খাওয়া সেরে একটা পেপার ন্যাপকিনে হাতটা মুছে নিল সাহিল। চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। মাথাটা সামান্য হালকা হয়েছে। মিনিট দশেক পর ওয়েটারটি এসে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেল। তারও কয়েক মিনিট পরে ফোল্ডারের ভেতর বিল নিয়ে এল। পকেট থেকে পার্স বের করে বিল মিটিয়ে দিল সাহিল। ওয়েটার ফোল্ডারটা নিয়ে কাউন্টারে গিয়ে আবার ফিরে এসে টেবিলে ফোল্ডারটা নামিয়ে রাখল।

ফোল্ডার খুলে সাহিল দেখল, বিলটার ওপর ফেরত দুটো দশ টাকার নোট আর কয়েকটা খুচরো পয়সা। একটা নোট তুলে নিয়ে পার্সে ঢোকাতে ঢোকাতে চোখ পড়ল বিলটার ওপর। বিলের নীচে 'পেইড' স্ট্যাম্পটা যেখানে আছে, তার ঠিক নীচে সবুজ রঙের কালিতে কী যেন লেখা আছে। সেই লেখাটা পড়তেই মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল সাহিলের।

'ট্রেজার প্রোটেকটার চিফ স্ট্যান্ডস রাইট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ!'

চমকে মুখ তুলে তাকালো ওয়েটারের দিকে সাহিল। এতক্ষণ ওয়েটারটিকে সে স্পষ্টভাবে দেখেনি। ওয়েটারের ইউনিফর্ম পরা মাঝবয়েসি লোকটা একটা দুর্বোধ্য হাসি ঠোঁটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। আশ্চর্য তার চোখদুটো দেখেই শিউরে উঠল সাহিল। একটু আগে মসজিদের সামনে দেখা সেই পদ্মগোখরোটার মতোই লোকটার চোখের মণি নীল, ক্রূর অথচ একান্তই নির্লিপ্ত।

'গুড ইভনিং, ইব্রাহিম! ওয়েট অন দি আদার সাইড অব দ্য রোড। উই উইল মিট দেয়ার।'

৪

ভোঁদা ভাড়ায় ট্যাক্সি চালায়। পাঁশকুড়া, বাগনান, কলকাতা—আবার অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম কিংবা ঘাটাল, যখন যেমন ট্রিপ পায়, সকাল থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে বেরিয়ে যায় আর ফেরে সেই মাঝরাতে। এই ট্যাক্সিটাই তার একমাত্র সম্বল। তার যাবতীয় রুজিরোজগারের ব্যবস্থা এখন এই ট্যাক্সি থেকেই। কোনোরকমে টেনেটুনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর সে বুঝে গেছিল, তার দ্বারা পড়াশোনা আর হবে না। সবার কি আর পড়াশোনা হয়? মাথা পরিষ্কার হতে হবে, একগাদা কথা মুখস্থ করে মগজে চিটিয়ে রাখতে হবে, পরীক্ষার খাতায় সেসব সঠিকভাবে বমি করে আসতে হবে, সব থেকে বড়ো কথা এই কষ্টকর ঝামেলাটাকে ভালোবাসতে হবে; সে মহা হ্যাঙ্গাম! ছোটোবেলা থেকেই ভোঁদার ভালো লাগে শুধু খেলা আর খেলা। ঘুড়ি ওড়ানো। সাঁতরে নদী পুকুর পার হওয়া। আর প্রতিদিন বিকেলবেলা বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে মুগুর ভাঁজা। এখন অবশ্য আর নিয়মিত সেখানে যেতে পারে না। তবু মনটা ওইদিকেই পড়ে থাকে। এই করে করে উচ্চমাধ্যমিক অবধি উঠে আসতে পেরেছিল যে কোনোমতে, এই না ঢের!

বাবাও মারা গেলেন সাত তাড়াতাড়ি। ভোঁদার জন্যে বাবা যা টাকাপয়সা রেখে গেছিলেন, তাই দিয়ে এই ট্যাক্সিটা কিনেছিল। বাড়িটা নিজেদের ছিল বলেই রক্ষে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই সে আর তার ট্যাক্সি—দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সে আজ কত বছর আগের কথা। ট্যাক্সি চালাতে চালাতে এতগুলো বছর যে সে কখন পার করে দিয়ে এসেছে, খেয়ালই করেনি ভোঁদা। স্কুলের খাতায় তার নাম ছিল প্রতুল। কিন্তু প্রতুল নামটা তার হারিয়েই গেছে একরকম। সবাই তাকে ভোঁদা নামেই ডাকে। সবার কাছেই সে হয়ে গেল ভোঁদা —ভোঁদা ড্রাইভার—ট্যাক্সি চালায়।

তাকে তবু এখনও 'প্রতুল' বলে ডাকে একমাত্র তার স্কুলের বন্ধু রূপেন আর শৌনক। শৌনক মানিকপুরে থাকে, মেদিনীপুর কলেজে পড়ায়। আর রূপেন তো এদেশেই থাকে না এখন। বছর দুই আগে এসেছিল, সে এখন থাকে স্যানফ্রান্সিস্কোতে। ওরা স্কুলের পড়াশোনায় ফার্স্ট সেকেন্ড হত ফিবছর। ভোঁদার আর কিছুই হল না। সেজন্যে ওরা কিন্তু ভোঁদাকে ছোটো চোখে দেখত না কোনোদিন। স্কুলের

বন্ধু—অকৃত্রিম দোসর। তাছাড়া ক্লাসরুমের বাইরে খেলার মাঠে, রাস্তাঘাটে তো ভোঁদাই সর্দার। কতবার মারাত্মক বিপদ থেকে সে রূপেন আর শৌনককে বাঁচিয়েছে। একবার তো বেনাপুকুরে ডুবে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল রূপেন। ওরা তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভোঁদা মাঝপুকুর থেকে চুলের মুঠি ধরে পাড়ে এনে তুলেছিল রূপেনকে। তারপর লোকজন ডাকা, রূপেনের পেট থেকে চাপ দিয়ে জল বের করা, সে অনেক কীর্তি! ভোঁদাদের বাড়িটা বেনাপুকুরের এই পাড়ে, আর রূপেনদের পৈতৃক বাড়ি পুকুরের ওই পাড়ে। বোস ম্যানশনস। বিশাল বাড়ি—প্রাসাদের মতো।

কলকাতা যাওয়ার ট্রিপ থাকলে ভোঁদা ভোরবেলায় উঠে পড়ে। পাতকুয়োর ঠান্ডা জলে স্নান সেরে গণেশকে ফুলজল দেখিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্যাসেঞ্জারদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হাইওয়ের ফাঁকা রাস্তায় দুরন্ত স্পিড তুলে একদম পাঁশকুড়া। পাঁশকুড়ায় মিনিট কুড়ি রেস্ট। চপ, মুড়ি, চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে নেয়। পাঁশকুড়ার চপ আর মেচেদার শিঙাড়া; অতুলনীয় বললেও কম বলা হয়। তারপর আবার তার যাত্রা শুরু। নেক্সট স্টপ বাগনান। হাইওয়ের ধারে একটা ধাবার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দোকানদারের উদ্দেশে ডাক দেয়, 'টি-ফি-ন!'

ধাবাওলার সঙ্গে ভোঁদার বোঝাপড়া আছে। ভোঁদার ডাক শুনেই ধাবার একটা ছেলে তড়বড় করে একটা মাটির খুরিতে ছোলার ডাল, আর একটা শালপাতার ঠোঙায় গোটা পাঁচেক কচুরি, আদা, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা নিয়ে আসে। গাড়ির প্যাসেঞ্জাররাও গাড়ি থেকে নেমে টিফিন-ফিফিন সারে। চা খায়। বাথরুম-টুম যায়।

এরপর আর থামাথামির ব্যাপার নেই কিন্তু। সোজা কলকাতা। হাওড়া ব্রিজ আর বড়োবাজারের জ্যামটা এড়াতে প্রায়ই দ্বিতীয় হুগলি সেতুটাই প্রেফার করে ভোঁদা। তারপর কোনোদিন এসপ্ল্যানেডে অফিস পাড়া, কোনোদিন ভবানীপুরে কারুর বাড়ি, কোনোদিন বরানগর—যেদিন যেমন প্যাসেঞ্জারদের ডেসটিনি। প্যাসেঞ্জার নামিয়ে ভোঁদা গাড়ি নিয়ে চলে আসে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের কাছে। বিগ বাজার থেকে বাঁদিকে টার্ন নিয়ে 'কলাপাতা' বলে একটা ভাতের হোটেল আছে। দিব্যি মাছভাত পাওয়া যায়। গড়িয়াহাট ডেস্টিনি হলে 'মাইতির হোটেল'। আর কলেজস্ট্রিট হলে 'বর্ণপরিচয়' বিল্ডিং-এর ভেতরের দিকের ভাতের হোটেলটায় চলে গেলে একেবারে সোনায় সোহাগা। দুপুরে ডাল, আলুপোস্ত, পাবদা মাছের ঝাল আর চুনোমাছের টক দিয়ে ভাত খেয়ে গলির ভেতর কোনো একটা বাড়ির ঝিমন্ত ছায়ায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ির সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে ভোঁদা ঘুম দেয়। বিকেল হলে আবার প্যাসেঞ্জার তুলে-টুলে মেদিনীপুর ফেরে। এরকমই চলছে আজ এত বছর। ছাড়ানছোড়ন নেই।

আজ একটু অন্যরকম হল। যারা কলকাতা গেছিল, ফেরার পথে তারা সব

পাঁশকুড়ায় নেমে গেল। পাঁশকুড়ায় তাদের কোনো আত্মীয়-বাড়িতে যাবে। ভোঁদা খালি গাড়ি নিয়ে একা একা ফিরছে। রাত বারোটা বেজে গেছে, সোজা চালিয়ে আসছে। হাইওয়ের দুপাশের লাইটপোস্টগুলোর হলুদ আলো আর অনেকটা অন্ধকার মেশামিশি হয়ে আছে। রাস্তার ধারের গাছগুলো, দোকান, বাড়ি সব স্যাট্ স্যাট্ করে পেছনে চলে যাচ্ছে। স্পিডে গাড়ি চালালেও, ভোঁদাকে সতর্ক থাকতে হচ্ছে, হাইওয়ে দিয়ে মালবাহী ট্রাকগুলোকেই যত ভয়।

গাড়িতে অন্য লোক থাকলে তাদের কথাবার্তা হাসিঠাট্টা ভোঁদাকে সজাগ করে রাখে। বুড়োবুড়ি থাকলে মুশকিল। বুড়োরা গাড়িতে চড়লে লং ড্রাইভে ঝিমোয়। আর এই ঘুম অত্যন্ত সংক্রামক। প্যাসেঞ্জারের ঘুম ড্রাইভারের চোখে চালান হয়ে যাওয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর পরোয়ানা। আজ আবার পাঁশকুড়ার পর থেকে গাড়ি ফাঁকা। গাড়ির মিউজিক সিস্টেমটা খারাপ হয়ে আছে তিন মাস, সারানো হয়নি। গান চালালেও জেগে থাকা সহজ হয়, কিন্তু আজ সে উপায়ও নেই। মনে জোর এনে ঘুম তাড়িয়ে চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে ভোঁদা।

খড়গপুর পেরিয়ে মেদিনীপুর ঢোকার মুখে কাঁসাই নদীর ব্রিজের ওপর উঠে এল। ব্রিজটা লম্বা; একটু স্পিড কমাতে হল গাড়ির। বেশ চালিয়ে আসছিল শান্ত মনে, ব্রিজ শেষ হতে আর তিরিশ ফুট মতো বাকি, এমন সময় ভোঁদা উইন্ডস্ক্রিনের মধ্য দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেল।

ব্রিজটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেই জায়গাটায় রাস্তার একপাশ থেকে পাঁচ ছয় জন ইয়াং ছেলে, ধুতি আর শার্ট পরা, হাতে তাদের কী যেন চকচক করছে, ছুটে এসে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে ভোঁদা গাড়িতে স্পিড তুলতে বাধ্য হল। এরা যদি ছিনতাইকারি বা ডাকাত-টাকাত হয়, তাহলে গাড়ি থামানো এখানে একেবারেই ঠিক হবে না।

আর তখনই গাড়ির আয়নায় ব্রিজের অস্পষ্ট আলোয় সে দেখল, তার গাড়ির পেছনে আরেকটা কালো হুডের গাড়ি আসছে। এই বিচিত্রদর্শন গাড়িটা আবার কোত্থেকে এল, এত পুরোনো মডেল? কিন্তু ভাববার এতটুকু অবকাশ পেল না ভোঁদা। গাড়ি নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ওই ছেলেগুলোকে পেরিয়ে যাচ্ছে... আর একটু এগোনো মাত্রই পেছনের কালো হুডের গাড়ি থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, বাংলায় হিন্দিতে মেশানো সে একেবারে মরণান্তিক আর্তনাদ। তারপরই প্রচণ্ড শব্দে গাড়িটা বিস্ফোরিত হয়ে চুরমার হয়ে ছিটকে পড়ল নদীতে। আর তখনই কী যেন ধ্বনি দিতে দিতে যুবক ছেলেগুলো ছুটে গিয়ে রাস্তার ওপাশের ঘন ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল এক লহমায়!

পেছনে কী হল, দেখার জন্য ভোঁদা আয়নায় চোখ রাখল। কিন্তু আশ্চর্য! পেছনে

কোনো গাড়ি বা গাড়ির ধ্বংসাবশেষ, কিছুই সে দেখতে পেল না। ব্রিজের আলোগুলো শুধু নিষ্পলক জেগে আছে। হঠাৎ ভোঁদার মনে হল, তার এই মনে হওয়াটা হয়তো একটা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়, মনে হল গাড়ি থেকে নেমে সে একবার দেখবে। কারা গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে গাড়ির আরোহীদের গুলিবিদ্ধ করে লুকিয়ে পড়ল, কারাই বা আহত কিংবা নিহত হল, এসব জানবার জন্য ভোঁদার মনে একটা নির্বোধ কৌতূহল জেগে উঠল। কী করছে না করছে আগুপিছু না ভেবেই গাড়িটাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। নাহ্, পেছনে কোনো গাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। সব ভোজবাজির মতো উবে গেছে। আর তখনই সেই আলো আঁধারির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভোঁদার হাঁটু বেয়ে ভয়ের একটা শিহরন শরীরের ওপরের দিকে উঠে এল। আর দেরি না করে ভয়ের চোটে আধঘণ্টার পথ পনেরো মিনিটে কভার করে নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছে মনে হল, যেন ধড়ে প্রাণ পেয়েছে।

কী দেখল সে আজ, কী ঘটল, কিছুই বুঝতে পারে না ভোঁদা। বাড়িতে সে একা মানুষ; মা থাকেন দিদির বাড়িতে। উপার্জন কম, প্রবল পরিশ্রমের জীবন ভোঁদার। বিয়েটাও করে ওঠা হয়নি। কাউকে যে সব কিছু বলে হালকা হবে, তারও উপায় নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে সে-রাতে আর ঘুম এল না ভোঁদার।

পরের দিন সকালে কোনো ট্রিপ নেই। মনে হল, ধুর, কালকের রাতের কথা বসে বসে ভেবে কোনো লাভ নেই। রাতে ঘুম হয়নি। গা-টা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। একবার বাজারে যাওয়া দরকার। কোতওয়ালি বাজারে এসে খাসির মাংস কিনে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে, বিশুর সঙ্গে দেখা। বিশু থলি ভরতি করে বাজার করেছে।

'কী রে, আজ এত বাজার? কী ব্যাপার?'

'আর কী! বুড়ির নাতি এসেছে, তাই...। তুই ও-বাড়ি অনেকদিন যাসনি...,' বিশু বলল।

'হ্যাঁ, যাওয়া হয়নি। পরপর ট্রিপ পড়ে গেছে। মাসিমা কেমন আছেন রে?'

'আছে ভালোই। তুই একদিন এর মধ্যে আয়। বাচ্চাটাকে একটু ঘুরিয়ে আনবি। কাকিমা বলছিল।'

'আচ্ছা, যাবো এখন। হ্যাঁ রে, প্রতিমার ছেলেটা অনেক বড়ো হয়েছে?'

'কে, দালি? তা বড়ো হয়েছে। ক্লাস এইটে উঠেছে। একটু পাকাও হয়েছে। কথা শোনে না। গাড়িতে করে সাবধানে নিয়ে যাবি।'

'সে ঠিক আছে। যাবো দু-একদিনের মধ্যেই।'

বিশু চলে গেল হাতে বাজারের ব্যাগ দুলিয়ে। চা খেয়ে কোতওয়ালি বাজারের মধ্যে যে সেলুনটা আছে, সেখানেই গিয়ে ভোঁদা ঢুকল। চুলদাড়ি কাটাবে। সেলুনটা খুব

পুরোনো, ছোটোবেলা থেকে এখানেই আসে সে। দেওয়াল জুড়ে সাবেক কালের আয়না, মাঝে মাঝে তামাটে দাগ ধরে গেছে। আয়নামুখো চেয়ারগুলোতে কয়েকজন লোক কালো রঙের কাপড়ে গা ঢেকে বসে আছে। সবগুলো চেয়ার ভরতি। তাদের পেছনে নাপিতদের কাঁচির খচাখচ আওয়াজ। একটা আদ্দিকালের টেপরেকর্ডারে কিশোরকুমারের গান চলছে : 'তোমরা যতই আঘাত করো নেইকো অপমান, শুধু আমায় দাও গো সুযোগ শোনাতে এই গান...'

যেমন আদ্দিকালের দোকান, তেমনই আদ্দিকালের গান। এই নস্টালজিয়ার জন্যেই কিছুটা সে এখানে আসে এখনও। এসি-ফেসি নেই। সেলুনের বেঞ্চে বাজারের ব্যাগটা রেখে কিশোরকুমারের গলার ওপর আওয়াজ তুলে ভোঁদা সেলুনের একটা ছেলেকে বলল, 'পিকু, দেরি হবে নাকি রে?'

পিকু কাঁচি হাতে আড়চোখে দূরের একটা চেয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে খালি হবে ওটা। তুমি একটু বোসো, ভোঁদাদা!'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কোণের দিকের চেয়ারটায় বসা ভদ্রলোকের ঘাড়ে মাথায় থাবড়ে থুবড়ে ম্যাসাজ করে ছেড়ে দিল। এরা সবাই ভোঁদার চেনা। যে ছেলেটা ভদ্রলোককে ম্যাসাজ করছিল, তার নাম বাবলা। মুখের থেকে খবর কাগজ নামিয়ে ভোঁদা ফাঁকা চেয়ারটায় গিয়ে বসল। বাবলা কালো কাপড়ে ভোঁদাকে মুড়ে মাথায় জল মাখাতে লাগল। তারপর তার কাঁচির কেরামতি শুরু হল। খচখচ, খচখচ।

ঘুম এসে যাচ্ছিল ভোঁদার। বিশুর কথাটা মনে পড়ছিল। সত্যিই অনেকদিন রূপেনদের বাড়ি যাওয়া হয়নি। ও বাড়ি ছিল তার ছোটোবেলার রাজপ্রাসাদ। বেশিরভাগ ছুটির দিন রূপেনদের বাড়িতেই তো কাটাত সে। শৌনকও চলে আসত কখনও কখনও। তারা সবাই তখন ছোটো। রূপেনের বোন প্রতিমা তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। দুপুরে মাসিমার হাতের রান্না খেয়ে রূপেনদের বাড়ির তেতলার ছাদে মেঝেতে ক্যারাম বোর্ড পেতে ওরা চারজন সারা দুপুর ক্যারাম পেটাত। সে আর রূপেন একদিকে। শৌনক আর প্রতিমা আরেকদিকে। ছোটো হলে কী হবে, প্রতিমার হাতের টিপ ছিল পাক্কা। প্রায়ই ওরা জিতে যেত। খেলতে খেলতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখত ভোঁদা সজনে গাছটা পুকুরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ঝিলমিল ঝিলমিল করছে।

কতদিন আগের কথা সেসব। এখন প্রতিমার ছেলেই পড়ে ক্লাস এইটে। ওর ডাক নাম দালি। ভালো নাম উদ্দালক, ভোঁদা জানে... ভাবতে ভাবতে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল ভোঁদা।

হঠাৎ মাথায় কাঁচির খোঁচা লেগে বিরক্ত হয়ে জেগে উঠে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আরে সাবধানে কাট, বাবলা!'

বাবলা বোধহয় একটু হাসল। তারপর বলল, 'তুমি ঘাড় সোজা করে বোসো,

ভোঁদাদা! রাতে ঘুম হয়নি?'

'কলকাতায় ট্রিপ ছিল। ফিরেছিই অনেক রাতে।... হ্যাঁ রে বাবলা, কাল রাতে কাঁসাইয়ের ব্রিজের ওপরে কি কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, খবর পেয়েছিস?'

'কই, না তো! কাঁসাইয়ের ব্রিজে অ্যাকসিডেন্ট হবে আর আমি খবর পাবো না, তাই কখনও হয়? কেন, সেরকম কিছু দেখেছ নাকি?'

'নাহ্, সেরকম কিছু না। তুই সাবধানে কাট...' চেয়ারে টানটান হয়ে বসে কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর ঘাড় এলিয়ে দিল ভোঁদা। আবার সেই নিশ্চিন্ত শৈশব, ছোটোবেলার বোসবাড়ির স্মৃতি ভেসে আসতে লাগল মনে। সত্যিই অনেকদিন যাওয়া হয়নি। যাবে দু-একদিনের মধ্যেই।

কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে বোসবাড়ি যাওয়া হল না ভোঁদার। পরের দিনই ঘাটাল যাবার ট্রিপ পড়ল। শুধু এক পিঠ। ঘাটালে একটা বউ আর তার বাচ্চাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে। ভাড়া অবশ্য তারা দুই পিঠেরই দিয়েছিল। ফেরার পথে উপরি পেয়ে গেল ঘাটাল থেকে একদল লোক। তারা আসবে কেশপুর। কেশপুর থেকে আজও গাড়ি খালি। অগত্যা। বেশ রাত হয়ে গেছে। ভোঁদা আজ মেদিনীপুর শহরে ঢুকবে ধর্মার মোড় দিয়ে। এই মোড়টা একটা চৌমাথা। বড্ড অ্যাকসিডেন্ট হয়। ভোঁদা তাই সাবধানেই চালাচ্ছিল। রাস্তায় অবশ্য এত রাতে তেমন গাড়ি নেই। থমথম করছে অন্ধকার। শুধু অন্ধকার চিরে ভোঁদার ট্যাক্সির আলো দুপাশে চলে গেছে। রাতের বাতাস ঝাপটা মারছে জানালায়, রাস্তার দুপাশের আকাশমণি গাছগুলোর চিরল পাতায়। ধর্মার মোড়ের দিকে আরও একটু এগিয়ে আসার পর পেছন থেকে একটা গাড়ি ভোঁদাকে ওভারটেক করে জোরে বেরিয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে একটা গালাগাল দিয়ে গাড়িটার দিকে তাকাতেই শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল ভোঁদার! এটাই সেই পুরোনো মডেলের কালো হুডের গাড়িটা নয় তো? একইরকম দেখতে যেন! তবে কি একই গাড়ি?

কিছুটা যাওয়ার পর একটা আকাশমণি গাছের নিচে একপাশ ঘেঁসে গাড়িটা দাঁড়াল। ভোঁদা স্পিড আরও কমিয়ে নিয়ে কিছুটা দূর থেকে গাড়িটাকে ফলো করছে। হঠাৎ গাড়িটার ভেতর থেকে কোনো মহিলার ফুঁপিয়ে উঠে কান্নার শব্দ শুনতে পেল ভোঁদা। তারই সঙ্গে কতগুলো পুরুষকণ্ঠের বচসা ও চিৎকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ির পেছনের দিকের দরোজা খুলে কতগুলো পুলিশের উর্দি আর হেলমেট পরা লোক একজন মহিলাকে গাড়ি থেকে টেনে নামাতে লাগল। মহিলা চিৎকার করে কাঁদছেন, তাঁর বুকের আঁচল খসে পড়েছে। চুল খোলা। আর তার পরেই গাড়ির সামনের দরজা খুলে কালো কোটপ্যান্ট আর বাঁকা টুপি পরা যে-লোকটা নামল, তাকে দেখে ভোঁদার তো চক্ষুস্থির! পাক্কা লালচুলো সাহেব একটা। হাতে গোটানো একটা চাবুক। গাড়ি

থেকে নেমেই মহিলার মুখের ওপর শপাং করে চাবুক আছড়ে চিৎকার করে সাহেবটা বলে উঠল, 'সেদিন কে কে অ্যাকশনে ছিল, বলিয়া ডাও, টাহা না হইলে নিস্টার পাইবে না...'

মহিলা চাবুকের আঘাতে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর কাকুতিমিনতি করে বলতে লাগলেন, 'আমি জানি না, সাহেব, আমি জানি না। আমার ছেলের ঘরে কারা আসত, কতক্ষণ থাকত, কী কথা হত, কিচ্ছু আমি জানি না। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দুটি পায়ে ধরি...'

'পায়ে ঢরিলে ছাড়া পাইবে না। যটক্ষণ না বলিবে, চাবুক চলিবে। মারিতে মারিতে উণ্ডেড করিয়া জামাকাপড় খুলিয়া লইয়া রাস্তায় নেকেড করিয়া ফেলিয়া যাইব। চিলে শকুনে ছিঁড়িয়া খাইবে...' সাহেবটা এই কথা বলতে বলতে আবার চাবুক চালাতে লাগল...শপাং শপাং শব্দ উঠছে বাতাসে...

ভোঁদা আর থাকতে পারল না। প্রচণ্ড রাগে হুংকার দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। চিৎকার করে কী যেন বলতে গেল। কিন্তু বলা হল না। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। কী আশ্চর্য! চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, কোথাও কিচ্ছু নেই! সেই মহিলা, সাহেব, পুলিশগুলো, সেই কালো গাড়ি এক লহমায় ম্যাজিকের মতো উবে গেছে আর একা বোকা সে আলো আঁধারির মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মাঠের দিক থেকে শন্‌শন্‌ শব্দে উঠে আসছে রাতের বাতাস!

এসব আসলে কী হচ্ছে তার?

৫

দুপুরের প্রখর আলো থেকে হঠাৎ চিলেকোঠাঘরের অন্ধকারের ভেতর এসে পড়ায় চারিদিকে সব আঁধার দেখল দালি। চোখ সইতে কয়েক পল সময় লাগল। ঘরের ভেতর কী কী আছে, ধীরে ধীরে আবছা আবছা হয়ে যেন ফুটে উঠতে লাগল চারপাশে। উলটোদিকের দেওয়ালে ছোট্ট একটা বন্ধ জানালা, তার পাল্লার ফাঁক চুঁইয়ে এক আঁজলা আলো ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এগিয়ে গিয়ে জানালাটা খুলল সবার আগে। চিলেকোঠাঘরের এই জানালা দিয়ে বাড়ির পেছনদিককার শ্যাওলামাখা কুয়োতলাটা দেখা যাচ্ছে। একটা আকাশমণি গাছ ছাদের সমান উচ্চতায় উঠে এসে দুপুরের বাতাসে ইলিমিলিঝিলি খেলছে রোদের ভেতর—তার চিরল পাতাদের দিকে তাকিয়ে দালি নিজের মনেই হাসল একটু।

এমন নিজের মনে মাঝেমাঝেই সে হাসে আজকাল। তার ঈষৎ শ্যামলা মুখে সেই হাসি কচি বাঁশপাতার নমনীয়তার সঙ্গে একটা অজানা জগতের অপার রহস্য মিশিয়ে দেয়। তার চোয়াল ক্রমশই বাবার মতো ধারালো হয়ে উঠছে, ঠোঁটের ওপর হালকা রোম নদীতীরে সদ্য-জেগে-ওঠা ঘাসের মতন দেখা দিচ্ছে। চোখদুটি তার মায়ের মতো বড়ো বড়ো, যদিও চোখের তারায় নানান দুষ্টুমিভরা অভিসন্ধি খেলা করে প্রায়শই। কপালের ওপর এসে পড়া অবাধ্য চুলগুলোকে হাত দিয়ে মুঠো করে সরিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। ঘরটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

ছোটো ছোটো কাঠের চেয়ার, বেঞ্চ, পুরোনো বাতিল সোফার ওপর বসানো বাক্স, প্যাঁটরা, পুঁটুলি। কতগুলো বেতের ঝাঁপি। একটা কাঠের আলমারির ওপর তিনটে দেওয়ালি-পুতুল। মাটির তৈরি পুতুলগুলো মেয়ে। তারা যেন ঠিক উদ্দালকের দিকে চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে। সামনের দিকে তাদের দুটো হাত বাড়ানো; হাতের তালুতে ছিদ্র, ওই ছিদ্রপথে মাটির প্রদীপ বসানো দুই হাতে। প্রদীপগুলো শেষ কবে জ্বলেছিল কে জানে! পোড়া সলতে কালো হয়ে আছে। মেয়েপুতুলগুলোর কোমরে হলুদ রঙের ঘাঘরা পরা, আর বুকে লাল রঙের ব্লাউজ আঁকা। সেইদিকে তাকিয়ে কেমন একটা লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিল উদ্দালক।

কয়েকটা পেতলের এবং তামার কলসি, হাত দিয়ে একটু ঠেলেই বুঝতে পারল—

ফাঁকা। বন্ধ হয়ে থাকা একটা দেওয়াল ঘড়ি, তার কাঁটাদুটো সময় দেখাচ্ছে দশটা একত্রিশ। সকাল, নাকি রাত্রি? কবে বন্ধ হয়েছে যে, কত বছর আগে, কে বলবে? কালো রঙের দুটো স্ট্যান্ডফ্যান, তাদের পাখার ব্লেডে অব্যবহারের জং ধরেছে, এরাও একসময় ঘুরত! দেওয়ালের আঙটায় দুটো রঙিন মুখোশ, একটা মা দুগ্‌গার, আরেকটা গণেশের। এমন মুখোশ পরে ছৌ নাচ নাচে পুরুলিয়ার শিল্পীরা— দালি টিভিতে দেখেছে। একটা লম্বা কাঠের বাক্স, তার ডালাটায় তালা দেওয়া নেই। ডালা তুলে ধরল দালি, ক্যাঁ-চ্ করে একটা শব্দ হল। ভেতরে একটা কবেকার পুরোনো তানপুরা শুয়ে আছে। ধুলামলিন, একটা তার ছেঁড়া। অক্ষত তারগুলিতে আঙুল দিয়ে টানতেই মৃদু রিনরিনে শব্দ উঠল। তানপুরাটাকে কাপড়ের জামা পরায়নি কেন এরা? কে বাজাতো একে?

বাক্সের পাশেই ডুগি-তবলা। বিড়ের ওপর লাল রঙের জামা পরে বাতিল মাতব্বরের মতো বসে আছে। কাপড়ের আবরণের ওপর হাত রেখে আঙুল দিয়ে আওয়াজ তুলতে চাইল—একটা ভোঁতা আওয়াজ উঠছে। তবলাটা কবে থেকেই যেন ফেঁসে রয়েছে, তারপর সারানো হয়নি আর।

জলপাই রঙের কাঠের বাক্সটার ডালা খুলল উদ্দালক। শাড়ি, জামা, ছোটো বাচ্চা মেয়ের ফ্রক, টেপজামা। একটা পুরোনো দিনের লতাপাতা আঁকা পাঞ্জাবি। বাক্সটার ভেতর লাল মখমলের আস্তরণ। ডালার ভেতর ওপরের দিকে কাপড়ের একটা পকেট গোমড়া বউয়ের মতো গাল ফুলিয়ে মুখ ঝুলিয়ে আছে। কী আছে পকেটের ভিতর? আঙুল দিয়ে টান মেরে উদ্দালক দেখল, কী যেন শক্তমতো জিনিস হাতে লাগছে। বের করে আনল। ও মা! একজোড়া ঘুঙুর! সেও দেখি ধুলামলিন!

আরেকটা ভারী ইয়াব্বড়ো ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের ওপর একটা ছবি আঁকা। গ্রামের রাস্তা দিয়ে চারজন বেহারা একটা পালকি বয়ে নিয়ে চলেছে। পালকির দরজা একটু ফাঁক করে একটি মেয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে আছে পথের দিকে। নাকে নোলক-পরা মেয়েটির মাথায় আবার ময়ূরপালকের মুকুট।

এই ট্রাঙ্কেও তালা দেওয়া নেই। সাবধানে খুলল দালি। ধুলো আর মাকড়সার জাল ধরেছে। চামড়ার খাপে ভরা পুরোনো দিনের একটা রেডিয়ো শুয়ে আছে। 'আকাশবাণী কলকাতা, খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল...' এমনই বেজে উঠত নিশ্চয়ই রেডিয়োটা একসময়। রেডিয়োটার পাশে কতগুলো ডায়েরি। একটা তুলে নিয়ে জানালার কাছে এসে পড়তে গেল সে। হলুদ বিবর্ণ পাতা। শক্ত করে ধরলে ভেঙে যাচ্ছে।

বাদামি রঙের কালিতে কীসব হিসেব লেখা। দুচার পাতা উলটেই আগ্রহ ফুরিয়ে গেল। দুটো তামাক খাওয়ার বাঁকানো পাইপ। পাইপের মুখ আবার রূপো দিয়ে বাঁধানো। একটা পাইপ নাকের কাছে তুলে নিয়ে শুঁকলো উদ্দালক। হালকা যেন

ঝিমঝিমে তামাকের গন্ধ। কেমন ঘুম পেয়ে যায় তার। পাইপটা রেখে, দিল যথাস্থানে। ডায়েরির স্তূপের পাশে ট্রাঙ্কের দেওয়াল ঘেঁষে একটা কী চওড়া খাতা দাঁড় করানো। আস্তে করে টান দিয়ে বের করে আনল দালি সেটাকে। একটা স্কেচবুক। ল্যান্ডস্কেপ সাইজ। ছোটোরা যেমন ড্রয়িং বুকে ছবি আঁকে, তেমনই একটা খাতা।

খাতাটা উলটে উলটে দেখছিল উদ্দালক। মোটা মোটা পাতা। রংপেন্সিলে আঁকা কীসব ছবি, আলো-আঁধারিতে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না। খাতাটার প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ বোধ হল তার। আরও ভালো করে দেখতে চাইছে, এমন সময় বাইরের বারান্দায় কার যেন পায়ের আওয়াজ পেল। কে যেন আসছে! বিশুমামা ফিরে আসছে নাকি? তাকে এঘরে দেখলে নিশ্চয়ই ভীষণ বকুনি দেবে।

খাতাটাকে রোল করে পাকিয়ে বারমুডার ইলাস্টিক টেনে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে টিশার্ট দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কের ডালা নামিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে এল সে।

নাহ্, বারান্দায় কেউ তো নেই! ভুল শুনল? তাই হবে।

চিলেকোঠাঘরের দরজায় তালা দিয়ে একতলায় নিজের ঘরে ফিরে এল উদ্দালক। জোরে জোরে ওপরে নীচে হাঁটাচলা করায় সামান্য হাঁপাচ্ছে। এতক্ষণ চিলেকোঠাঘরে থাকার ফলে কপালে, নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। তাকে যে এ অবস্থায় খুব সুন্দর দেখায়, উদ্দালক সেকথা জানে না। ঝট করে ফ্যানটা চালিয়ে পেটের থেকে ড্রয়িং খাতাটা বের করে ধড়াস করে বিছানায় উপুড় হয়ে শুলো বালিশটা বুকের নীচে রেখে। খাতাটা মেলে ধরল চোখের সামনে।

মোটা হ্যান্ডমেইড পেপারে তৈরি কভার। ভেতরের পাতাগুলোও মোটা আর্ট পেপারের। খাতার প্রথম পাতায় নীচের দিকে কাঁচা গোল গোল অক্ষরে নাম লেখা : প্রভাতী মিত্র। ক্লাস ফাইভ।

প্রভাতী মিত্র? সে আবার কে? তার মামার বাড়ির সবাই তো বোস। এ বাড়িতে মিত্র এল কোথা থেকে? সবাই তো এবাড়িতে 'বসেই' থাকেন! কথাটা ভেবেই একটু নিজের মনে ফুলুক করে হেসে উঠল উদ্দালক।

পাতা ওলটাতে লাগল। প্রথম পাতায় একটা পাখির স্কেচ। ঝুঁটিওয়ালা কাকাতুয়া একটা। বেশ! পরের পাতায় সেই কাকাতুয়াটাই একটা দাঁড়ের মধ্যে বসে আছে। দাঁড়টা বৃত্তাকার, মাঝে শুধু একটা রড। পরের পাতাতেও সেই একই দাঁড়ে বসা কাকাতুয়ার ছবি। অন্য কোনো কোণ থেকে দেখা। এ কী! পরের পর ফরফর করে পাতা উলটে উলটে উদ্দালক দেখল, গোটা খাতা জুড়ে প্রতি পাতায় ওই একটাই পাখির স্কেচ! বিভিন্ন দিক থেকে আঁকা। কোনোটায় কাকাতুয়াটা দানা খাচ্ছে, কোনোটায় ডানা

ঝাপটাচ্ছে, কোনোটায় দাঁড়ের রডটা কামড়ে ধরেছে। মোটমাট একটাই পাখি নানাদিক থেকে স্টাডি করা হয়েছে।

কিন্তু ছোটোরা তো এরকম আঁকে না। উদ্দালক নিজেও ছোটোবেলায় এমন স্কেচবুকে কত ছবি এঁকেছে। পাহাড়ের ছবি, নদীর ছবি, পাখির ছবি, বাড়ির ছবি, কুকুরের ছবি। কিন্তু এরকম এক খাতা জুড়ে শুধু একটা পাখিকেই নানাদিক থেকে আঁকা? নাহ্, ব্যাপারটা কেমন যেন ঠেকছে!

অথচ ছোটো কোনো বাচ্চারই আঁকা ছবি এসব, তাতে সন্দেহ নেই। পেন্সিলের টানগুলো কাঁচা কাঁচা। কোথাও কোথাও কাকাতুয়ার গায়ে যা-তা রং করা। একটায় তো কাকাতুয়ার গায়ে ঘন নীল রং। হাঃ! কাকাতুয়া আবার অত নীল হয় নাকি? কোনো বাচ্চারই আঁকা হবে ছবিগুলো নির্ঘাত।

শেষ পাতায় আবার একটা চমক। শুধু দাঁড়টা পড়ে আছে—শূন্য। পাখি নেই; হাওয়া। খালি দাঁড়। আর সেই দাঁড়ের বৃত্তাকার ব্যবধানের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা লোকের অস্পষ্ট আদল! লোকটা যেন হাসি হাসি মুখে তার ডানহাতটা তুলে পেছনের দেওয়ালে আলতো করে ছুঁইয়ে রেখেছে। কে রে বাবা লোকটা?

দালি খাতাটা আবার উলটোতে পালটাতে লাগল। প্রথমবার দেখেনি, এবার তার চোখে পড়ল, ড্রয়িং বুকের মাঝামাঝি একটা পাতার নীচে কোণের দিকে সেই কাঁচা হাতের অক্ষরেই লেখা: 'গৌরী'।

'গৌরী' বলে তার মামাবাড়িতে সে কাউকে চেনে না। 'প্রভাতী' নামের কারও কথাও সে শোনেনি। কী জানি, কী ব্যাপার! এক খাতা ভরতি একটাই পাখির স্কেচ। এবং এগুলো এঁকেছে প্রভাতী মিত্র বা গৌরী নামের ক্লাস ফাইভের কোনো অচেনা মেয়ে।

খাতাটা বালিশের নীচে ঢুকিয়ে দালি চিত হয়ে শুলো। মাথার ওপর লোহার কড়িবরগা থেকে নেমে আসা পুরোনো আমলের ফ্যানটা খটর খটর আওয়াজ করে ঘুরছে। বাইরে জানালায় ঝিমঝিম করছে দুপুর। ভাবতে ভাবতে হাই উঠল। চোখ ভারী হয়ে এল তার।

ঘুম ভাঙল দিদার ডাকাডাকিতে। হাতে একবাটি পায়েস নিয়ে দিদা ডাকছে, 'দালি, দালি, ও দাদা! ও ছোড়দা! ওঠো, উঠে পড়ো এবার...'

বিছানার ওপর আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে দালি জড়ানো গলায় বলল, 'তুমি আমাকে ছোড়দা বলো কেন?'

বাম হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে দিদা বলল, 'তোমার রূপেনমামার ছেলে আরুণি মানে রণো হচ্ছে আমার বড়দা, যে আমেরিকায় থাকে। আর তাহলে তুমি হচ্ছ আমার ছোড়দা... উঠে পড়ো, আর কত ঘুমোবে, দাদু? মুখ ধুয়ে পায়েসটা খেয়ে নাও দিকি!'

সন্ধেবেলা দিদার খাটের ওপর লুডো খেলার আসর বসল। বিশুমামা হলুদ, শীলুমাসি নীল, দিদা সবুজ আর উদ্দালক লাল রঙের গুটি। গুটি কাটার দান পড়লেও শীলুমাসি উদ্দালকের গুটি কাটতে চায় না। অন্য জায়গায় গুটি সরিয়ে দান দেয়। উদ্দালক কিন্তু কাটার দান পড়লেই শীলুমাসির গুটি কেটে দেয় খচখচ করে। দিদার হাতে খুব ছয় পড়ছে। বিশুমামার গুটি অনেকক্ষণ পর গদাইলস্করচালে ঘর ছেড়ে বেরোলো। বিশুমামা বেজারমুখে দান দিচ্ছে আর শীলুমাসির ওপর গজগজ করছে, 'আহ্ শীলু, কী যে খেলিস! পাকা গুটিটাকে এগিয়ে না নিয়ে গিয়ে কাঁচা গুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লি কেন?'

শীলুমাসি বলল, 'অ বিশুদা! সব গুটি ঘরে বসিয়ে রেখে কী হবে? আমি গুটি জোড়া করব। তখন তোমরা আর আমার জোড়াগুটি পেরোতে পারবে না, বুঝলে?'

ওদের দুজনের বকবক শুনতে শুনতে দিদা বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে টেনে টেনে বলল, 'আঃ, শীলু! এত কথা না বলে খেল না! কী যে এত কটকটি কথা তোদের? মুখটি না থাকলে সব সত্যপীর হয়ে যেতিস!'

...খেলা শেষের দিকে। বিশুমামা, শীলুমাসি হারছে। দালির তিন-তিনটে গুটি হোমে উঠে গেছে। আরেকটা গুটিও ওঠার মুখে। দিদার শেষ দুটো গুটি হোমের সামনের অনাক্রম্য করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পুট পড়ার অপেক্ষা, আরেকটা উঠতে হলে তিন পড়তে হবে। শীলুমাসির দুটো গুটি উঠে গেলেও বাকি দুটো হোম থেকে অনেক দূরে জোড়া সেজে বসে আছে। সব বেজোড় দান পড়ছে শীলুমাসির। জোড়াগুটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না।

বিশুমামার একটি মাত্র গুটি উঠেছে। দুটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখনও। এবং বিশুমামার আর একটি হলুদ গুটি মাঝমাঠ থেকে কেটে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছিল দালি। ছয়ও পড়ছে না বিশুমামার, আর সেই গুটি ঘর থেকে বেরোচ্ছেও না। বিশুমামা হতাশ গলায় বলে উঠল, 'তুই জোড়া গুটি ভাঙ, শীলু। জোড়াগুটি ষষ্ঠীঠাকুরের মতো বসিয়ে রাখিসনি।'

দিদাও বলল, 'হ্যাঁ, বেজোড় দান পড়ছে তো কী হয়েছে? বেজোড় দান দিয়েই তুই জোড়া ভেঙে গুটি এগিয়ে নিয়ে যা। বড্ড জ্বালিয়েছিস জোড়া দিয়ে সারাক্ষণ।'

শীলুমাসি তড়বড় করে বলে উঠল, 'আমি যাই, বাবা। রুটি করতে হবে। তোমরা খেলো।'

দিদা বলল, 'নাহ্। খেলা শেষ করে যা।'

'আর খেলা তো শেষ হয়েই গেছে। দালিবাবুই ফার্স্ট। তুমি সেকেন্ড। আমি থার্ড, আর বিশুদা হেরো!' কথাটা বলেই শীলুমাসি খিলখিল করে হেসে উঠল। বিশুমামা অমনই কটমটে চোখে তাকালো ওর দিকে।

শীলুমাসির কথা শুনে ভালো লাগলেও ভেতরে ভেতরে চাপা টেনশন হচ্ছিল উদ্দালকের। দিদাই না জিতে যায়। চার পড়লে দালির শেষ গুটিটা হোমে উঠে যাবে। দিদার চাই পুট আর তিন। তাহলেই দিদার শেষ দুটো গুটি উঠে যাবে।

বিশুমামার তিন পড়ল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গাল চুলকোতে চুলকোতে একটা গুটিকে তিন ঘর এগিয়ে দিল বিশুমামা। দিদা বলল, 'ইশ্, আমার যে কেন তিন পড়ে না?'

শীলুমাসি অনেকক্ষণ ধরে ঘটর ঘটর শব্দ করে ছক্কাটা গড়িয়ে দিল বোর্ডের ওপর। ছয় পড়ল। উল্লসিত হয়ে আবার ঘটর ঘটর...এবার চার পড়ল। শীলুমাসি তার জোড়া নীল গুটি পাঁচ ঘর গুণে গুণে এগিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'ছক্কা চা-র!'

বিশুমামা বলল, 'তবু জোড়াগুটি ভাঙবে না! বলিহারি, যা হোক!'

দালি দান দিচ্ছে। ঘটর, ঘটর, ঘটর... ছক্কা গড়াচ্ছে... আয় আয় বাবা, চার!

যাঃ! ছয় পড়েছে। এখন ছয় নিয়ে কী করবে সে? কোথাও ছয় দেবার জায়গাই নেই।

বিশুমামা দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, 'এই ছয়টা যদি আমার পড়ত! ওফ!'

অনিচ্ছুক দালি হাত গুটিয়ে নিল। দিদার দুই পড়ল। শীলুমাসি তাই দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। 'খুব যে আমাকে জোড়াগুটি করিস না, জোড়াগুটি করিস না বলছিলে, কাকিমা! এবার নাও, তোমারই হয়েছে জোড়াগুটি!'

বিশুমামা বলল, 'হাসছে দ্যাখো!'

হোমের ঠিক একঘর আগে সবুজ জোড়াগুটি আঙুল দিয়ে বসিয়ে দিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'দুটোই এবার পুটের ধাক্কা। কখন যে পড়বে পুট, কে জানে!'

বিশুমামার এবার ছয় পড়ল। তারপর দুই। ঘর থেকে হলুদ গুটি বের করে দুই ধাপ এগিয়ে দিল বিশুমামা।

শীলুমাসি ফেলল তিন। এবার নীল জোড়া ভাঙতেই হবে। অগত্যা...

দালি আবার ঘটর ঘটর করে ডাইসটা বোর্ডের ওপর গড়িয়ে দিল। এই যাহ্! তিন পড়েছে। দালিও আটকাল শেষে পুটের ধাক্কায়।

দিদা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চশমার ফাঁক দিয়ে দালিকে দেখে একটু বাঁকা হাসল। তারপর প্লাস্টিকের সিলিন্ডারটার মধ্যে ছক্কা নিয়ে ঘটর ঘটর করে ছক্কা গড়িয়ে দিল।

দালি উত্তেজনায় চোখ বুজে ফেলেছে। তখনই দিদা আর শীলুমাসির মিলিত হাসির শব্দে চোখ খুলল দালি। ডাইসটা মাঝবোর্ডে চিত হয়ে পড়ে আছে। দুই। ইশ্!

দুই মানে জোড়াগুটি এক লাফে হোমে ঢুকে যাবে। দিদা দুটো সবুজ গুটিই বোর্ড থেকে তুলে নিয়ে দালির থুতনি নেড়ে দিয়ে সুর করে বলল, 'হে-রো-ও। দালি হে-রো-ও!'

এরপর আর খেলার উৎসাহ থাকল না। লুডোর বোর্ড গোছাতে গোছাতে দালি বলল, 'আচ্ছা, কাল আমি ঠিক জিতব।'

শীলুমাসি বলল, 'কাল সাপ-লুডো খেলব, হ্যাঁ?'

বিশুমামা শীলুমাসির উদ্দেশে গোপনে ভেংচি কাটল।

রাতে খাওয়ার পর নিজের ঘরে এল দালি। জানালার বাইরে ওদিকটা স্ট্রিট লাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে। পুকুরের হাওয়ায় গাছগুলো দুলছে। ঘরের আলো জ্বালল। পাখা চালাল। শীলুমাসি আগেই বিছানা পরিপাটি করে দিয়ে গেছে। ব্যাগ থেকে একটা বই বের করল সে। হ্যারি পটার অ্যান্ড ডেথলি হ্যালোজ। ঘরের আলো নিভিয়ে মাথার কাছের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালল। বালিশে মাথা দিতে যেতেই তার মনে পড়ল, বালিশের নীচে চিলেকোঠাঘরের ড্রয়িং খাতাটা রেখেছে।

উঠে বসল উদ্দালক আবার। ড্রয়িং খাতাটা বের করে বালিশের ওপর রেখে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুঁকে বসল। নীল, সবুজ আর বেগুনি রঙের পেন্সিলই ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কালো পেন্সিলের দাগও আছে।

তন্ময় হয়ে খাতাটা দেখছিল উদ্দালক। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল তার, ঠিক তার ঘাড়ের পেছনে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলল। চমকে এক লহমায় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, দিদা দাঁড়িয়ে আছে।

'ওহ, তুমি! আমি ভাবছিলাম... আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম!' কথাটা বলতে বলতেই দালি খাতাটা ত্বরিতে বালিশের নীচে চালান করে দিল।

'এই নাকি আমার বীরপুরুষ নাতি! ভয় পেয়ে গেছিলে তো?... আমি এলাম দেখতে, ছোড়দা মশারি টাঙিয়েছে কিনা।'

'মশারি? ইঃ! আমি মশারিতে ঘুমোই না তো!'

'তা বললে কি হবে, ছোড়দা? মেদিনীপুরে মশা কত জানো? তোমাকে মশারা তুলে নিয়ে একেবারে পিড়িপুকুরের জলে গিয়ে ফেলবে। মশারি টাঙিয়ে দিই, আয়। খুব ডেঙ্গু হচ্ছে আজকাল।'

'না-আ! আমি মশারিতে ঘুমোবো না।'

'লোকখি, দাদা! মশারি দিতে দাও। কথা শোনো। তুমি বড্ড দুষ্টু হয়েছ আজকাল। না বলে কোথায় কোথায় চলে যাও।'

মশারির দড়ি আঙটায় লাগাতে লাগাতে দিদা বলল, 'চিলেকোঠার ঘরে গিয়েছিলে আজ আমাকে না বলে?'

বিস্ময়ে দালির নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। বলল, 'তুমি কেমন করে? নিশ্চয়ই বিশুমামা...'

'নাহ্, বিশু কিছু দেখেনি। চিলেকোঠাঘরের জানালা খুলেছিলে, মনে আছে? বন্ধ করতে ভুলে গেছ। আমাদের কুয়োতলা থেকে ও ঘরের জানালাটা দেখা যায়। বিকেলে গা ধুতে গিয়ে দেখলাম, জানালা খোলা। বুঝতে আর বাকি রইল না, কার কাণ্ড এটা।'

দালি জিভ কাটল। এঃ, তাড়াতাড়িতে জানালা বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

দিদা বলল, 'সেটা কোনো ব্যাপার না। আসলে বারণ করি কেন? এ বাড়ি খুব পুরোনো হয়েছে। কোথায় কখন কী ভেঙে পড়বে। আমি সবদিক দেখতেও পারি না। এত বড়ো বাড়ি, কোথায় পোকামাকড়, সাপ, বিছেটিছে ঢুকে বসে আছে। তাই আমাকে নিয়ে যেতে বলি আর কি।'

দালি উঠে এসে দিদার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আর এমন করব না, দিদা! তোমাকে নিয়ে যাবো সবখানে। ও দিদা। ও দিদা, শোনো না...'

দিদা অবাক হয়ে আধখানা মশারি টাঙিয়ে বলল, 'কী বলবি, বল।'

'বলছি, তোমরা তো বোস। তোমাদের বাড়িতে মিত্র এল কোথা থেকে?'

'কী যে বলছিস মাথামুণ্ডু, দালি, কিছুই বুঝছি না।'

'বলছি, তোমাদের টাইটেল তো বোস। মিত্র এল কীভাবে?'

'ও মা! আমিই তো মিত্তির বাড়ির মেয়ে। মিত্র আমার বাপের বাড়ির টাইটেল। তোমার দাদুর সঙ্গে বিয়ের পর হলাম বোস। বিয়ের পর মেয়েদের টাইটেল পালটে যায়, জানো না?'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! তাহলে এখন যে তোমার নাম প্রিয়বালা বসু...'

'বিয়ের আগে ছিলাম প্রিয়বালা মিত্র।'

'তোমার ডাকনাম কী, দিদা?'

দিদা হেসে বলল, 'আমার ডাকনাম বুড়ি। কেন বলো তো?'

দালি ভেতরে ভেতরে হতাশ হয়ে গেল। মিলছে না, কিছুই মিলছে না।

একটু থেমে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল দালি, 'তুমি প্রভাতী মিত্র নামে কাউকে চিনতে, দিদা?'

দিদা একেবারে চুপ হয়ে গেল। হাত থেকে মশারিটা খসে পড়ল মেঝেতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দালির পাশে এসে বসল দিদা। অনেকক্ষণ পর ঘরের প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্য ভেঙে দিদা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি কীভাবে তাকে জানলে, দালি? তোমার মা বলেছে?'

দালি দুপাশে মাথা নেড়ে বলল, 'না।' তারপর বালিশের নীচ থেকে ড্রয়িং খাতাটা বের করে এনে দিদার হাতে দিল। খাট থেকে উঠে ঘরের বড়ো আলোটা জ্বালল।

গভীর মমতায় ড্রয়িং খাতাটা খুলে পাতাগুলোর ওপর হাত বুলোচ্ছে দিদা। উদ্দালক দেখল, দিদার চশমার কাচে বাষ্প জমেছে। বলিরেখাঙ্কিত গালের ওপর গড়িয়ে নামছে জল।

দালি দিদার পাশে এসে বসে তার শিরা-ওঠা হাতটায় হাত রেখে বলল, 'কে দিদা? প্রভাতী কে?'

চশমাটা খুলে চোখ মুছে আঁচলে চশমার কাচদুটো মুছতে মুছতে দিদা ভারী গলায় বলল, 'দিদি। আমার দিদি।'

'তোমার দিদির কথা তো তুমি কখনও বলোনি আমাকে।'

'না, বলিনি। আমার ঠিক ওপরে এক দিদি ছিল। আমার থেকে দুবছরের বড়ো। ওরই নাম প্রভাতী। ডাকনাম গৌরী। খুব ফরসা ছিল তো দিদি, ওই জন্যেই। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় নিউমোনিয়াতে ভুগে মারা যায়।... এটা ওরই আঁকার খাতা। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি আসার সময় দিদির এই একটামাত্র স্মৃতি আমি এ বাড়িতে সঙ্গে করে এনেছিলাম, দালি।'

'এগুলো সেই দিদারই আঁকা? মানে তোমার দিদির?'

'হ্যাঁ রে, ভাই। ও খুব ভালো ছবি আঁকত। ওই-ই এইসব ছবিগুলো এঁকেছে।'

'আচ্ছা, দিদা, সারা খাতা জুড়ে একটাই ছবি এঁকেছে কেন? শুধু কাকাতুয়া পাখির ছবি?'

'সে আছে একটা ব্যাপার। দত্তগলি দিয়ে বেরিয়ে বাঁ হাতের দিকে একটা রাস্তা মসজিদের দিকে গিয়েছে, দেখেছ?'

'হ্যাঁ তো! সেখানে কী?'

'মসজিদের একটু আগে একটা বাড়ি আছে, বুঝলে? সেই বাড়িতে একটা ধপধপে সাদা কাকাতুয়া বিশাল একটা দাঁড়ে বসে থাকত। বাইরে থেকে কেউ গেলেই বলত, ও অরুণেশ! কে এসেছে? ও যোগেশ, কে এসেছে? দ্যাখ, দ্যাখ!'

'আচ্ছা! দারুণ তো!'

'হ্যাঁ। ওই বাড়িতে আমি আর দিদি একজনের কাছে আঁকা শিখতে যেতাম।'

'ওই বাড়িরই লোক?'

'হ্যাঁ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন ভদ্রলোক। কী যেন নাম... কী যেন নাম... যাহ্ নামটা মনে পড়ছে না। উনিই আমাদের কাকাতুয়াটার ছবি বারবার আঁকাতেন।'

'আচ্ছা, দ্যাখো তো, দ্যাখো তো—এই ভদ্রলোক?' উদ্দালক তাড়াতাড়ি খাতার শেষ পাতার ছবিটা দেখায়, যেখানে পাখি নেই, খালি দাঁড়ের ওদিকে একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে।

ছবিটা দেখতে দেখতে দিদা আত্মগত স্বরে বলল, 'ঠিক। এবার মনে পড়েছে।

সুবিমলকাকু। আমাদের আঁকা শেখাতেন। কিন্তু ছোড়দা, দাঁড়াও দাঁড়াও... দেখতে দাও।'

উদ্দালক দিদার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ছবিটা দেখতে দেখতে মুখ তুলে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে দিদা বলল, 'এই শেষ ছবিটা কিন্তু দিদির আঁকা নয়। সুবিমলকাকুই এঁকে দিয়েছিলেন দিদিকে। মনে পড়ে গেছে। সব মনে পড়ে গেছে। বলেছিলেন, খাতাটা খুব যত্ন করে রাখিস, গৌরী।'

'আচ্ছা, ওই বাড়িটার কী হল?'

'বাড়িটা তো আছে এখনও।'

'পাখিটা?'

'পাখিটা মরে যায়। দিদি মারা যাওয়ার বছরেই। ওই জন্যই ও কথাটা মনে আছে।'

'আর ওই ভদ্রলোক?'

'কে? সুবিমলকাকু? তা বিশেষ আর জানি না। আমার তো বাপের বাড়ি সিপাইবাজারে। কাকাতুয়া-বাড়িতে যখন আমি আর দিদি আঁকা শিখতে আসতাম, তখন কি আর জানতাম, তোর দাদুর বাড়ি ওই বাড়ির এত কাছে? তোর দাদুকেই চিনতাম না আমি তখন। দিদি মারা যাওয়ার পর কাকাতুয়া-বাড়িতে আর আসিনি। তারপর তো পি ইউ পাশ করার পর আমার বিয়ে হয়ে গেল। এ বাড়িতে সেঁধুবার পর সুবিমলকাকুর আর খবর নেওয়া হয়নি। কানাঘুষো যা শুনেছি, সুবিমলকাকু মারা গেছেন। তার ছেলে সুশীতল এখন নাকি আর মেদিনীপুরে থাকে না। জানি না, কী ব্যাপার ওদের।... নাও, অনেক রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়ো। খাতাটা তোমার দেখা হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে দিও, ছোড়দা!'

মশারি খাটিয়ে বিছানার চাদরের নীচে মশারির প্রান্তগুলো সুন্দর করে গুঁজে দিদা আলো নিভিয়ে চলে গেল। মশারির ভেতর ঘুম আসছিল না দালির। পাখার শনশন শব্দ, অন্ধকার ঘর, জানালার কাচে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের দীর্ঘ ছায়া... হলুদ পথবাতির আলো...

কতগুলো নাম অসংলগ্নভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দালির তন্দ্রাতুর মনে। প্রভাতী... গৌরী... প্রিয়বালা... বুড়ি... সুবিমল... সুশীতল... কাকাতুয়া-বাড়ি...

ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুমের ভেতরে একটা স্বপ্ন... আলোছায়ার অবাস্তবতা...

যেন একটা বাড়ি। ঢোকামাত্রই একটা কাকাতুয়া দাঁড়ে বসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও অরুণেশ! কে এসেছে? কে এসেছে?'

তারপর কাকাতুয়াটা আর নেই। শূন্য দাঁড়ের ওধারে দাঁড়িয়ে আছেন ধপধপে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন লোক। মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। চোখে মোটা

ফ্রেমের চশমা। ডান হাতটা তুলে একটা দেওয়াল দেখালেন। না, দেওয়াল কই? ও তো একটা দরজা! না দরজাও তো নয়... একটা বড়ো আলমারির পাল্লা। ভদ্রলোক সেই আলমারির পাল্লায় তর্জনী দিয়ে টক্ টক্ শব্দ তুলে বলে উঠলেন, 'এইখানে... এইখানে... ঠিক এইখানে...'

তারপরই নিতল ঘুমের সমুদ্রে একেবারে সাড়হীন ডুবে যেতে লাগল দাদি।

দুপুর গড়িয়ে এবার বিকেলকে ডেকে আনবে। আলোর রং বদল হচ্ছে ক্রমাগত। শীতের রেশ চলে যাচ্ছে। সমতলে যদিও গরমকাল চলে এসেছে এখনই, তবু এসব পাহাড়ি জায়গায় শীতের হাওয়ায় একপ্রকার স্থবিরতা আছে—যেতে যেতেও রয়ে যায় আরও বেশ কিছু দিন। কটেজের পেছনে ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এই বিশীর্ণ পথ নেমে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের স্যাঁতসেতে জায়গাটায়। ওখানে একটি জলধারার দেখা মেলে। নিঃশব্দ সাক্ষী হয়ে অনেক দেখেছে ওই কলস্বনা জলধারা, কিন্তু ভাগ্যিস মানুষের ভাষায় জল কথা বলতে পারে না!

সমস্ত স্থানটি সবুজ হয়ে উঠছে দিন দিন। পথের ওপর ইউক্যালিপটাস আর পাইনের শুকনো পাতা পড়ে পথটাকে পিছল করে রেখেছে। পা হড়কালেই পাশের অতলস্পর্শ খাদের ভেতর হারিয়ে যেতে হবে। তখন শরীরটার খোঁজও পাবে না কেউ। বেঁচে থাকলেও দিন দু-এক আহত হয়ে পড়ে থাকবার পর বাঘের পেটে চালান হয়ে যেতে হবে নির্ঘাত।

সেই জন্যেই সতর্ক পদক্ষেপে থেমে থেমে এ পথে পা ফেলছে বিরূঢ়ক। এমনিতেই তার পায়ে একেবারে শব্দ হয় না; অনেকদিনের অভ্যেস। কেবল হাতের লাঠিটা ঠুকে ঠুকে মাটির অবস্থা আঁচ করতে করতে এগোচ্ছে সে। মৃদুস্থির একটা অস্ফুট শব্দ উঠছে মাটির গা থেকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। এছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। বিশেষত কটেজের এদিকটায় পাখি, ঝিঁঝি বা অন্যান্য পতঙ্গের আওয়াজও থাকে না। কেন, সেটা বিরূঢ়ক ভালোভাবেই জানে।

রোদের রং হলুদ থেকে জাফরান হয়ে উঠছে এবার। এরপর অনুজ্জ্বল খয়েরির আভা, তারপর ধূসর, অন্তিমে অন্ধকার। এভাবেই বহুরূপীর মতো রোজ অপরাহ্ণের আভা বদল হয়। দিনের আলো উজ্জ্বল থাকতে থাকতেই একটি বিশেষ কাজ সমাধা করতে প্রতিদিন বিরূঢ়ককে এদিকে আসতেই হয়।

গড়ানে পথটা শেষ হল একটা বিশৃঙ্খল ঝোপের সামনে। এখানে গাছগুলো ঘনসন্নিবিষ্ট, মানুষ-প্রমাণ উঁচু। হাতের লাঠিটা দিয়ে দুপাশে ঝোপঝাড় সরিয়ে বিরূঢ়ক গাছেদের আড়ালে চলে গেল। মাথার ওপরের খোলা আকাশ ছাড়া এখন আর অন্য

কোনো দিক থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে না। অনেক ওপরে আকাশ থেকে দেখলে ঘাসজঙ্গলের মধ্যে হেঁটে যাওয়া তাকে দেখাবে এখন একটা ধীরধাবিত কালো বিন্দুর মতন।

লতাপাতা সরিয়ে সে এসে দাঁড়ালো এইখানে। একটা পরিত্যক্ত পাথুরে কুয়ো, সিমেন্ট দিয়ে পাড়টা বাঁধানো। কুয়োর মুখটা লোহার ভারী জাল দিয়ে ঢাকা। জালটা অবলীলায় একপাশে সরিয়ে দিল সে। ঝুঁকে দেখল একবার। সিঁড়ির গা বেয়ে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি সর্পিলাকারে কোন অতলে নেমে গেছে। হাতল ধরে সিঁড়ি বেয়ে বিরূঢ়ক নীচে নামতে লাগল। হাতের লাঠিটা দুই আঙুলের মধ্যে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে অস্ফুটস্বরে সে গুনগুন করে উঠল :

'স্নেক চা-র-মা-র!
হোয়েন ইউ ব্লো মাই ফ্লুট, আই উইল মেক ইউ কাম হার্ডার,
স্পিট মাই পয়জন ইনটু ইয়োর আইজ,
স্নেক চা-র-মা-র!

ট্রাই টু হিপনোটাইজ ইট,
সুপারসাইজ ইট,
পে দ্য পাঞ্চ অ্যান্ড ফরম আ কোবরা—
উ-উ-উ কাম আউট অফ দ্য বাসকেট। স্নেক চা-র-মা-র...'

গাইতে গাইতে নিজের মনেই নিঃশব্দে হাসতে লাগল বিরূঢ়ক। ডিজে অ্যান্টোনির গান। খুব গাইত অ্যারিজোনায় থাকার সময়। অনেক একাকী মুহূর্তের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এ গানের সুতোর ভেতর।

কুয়োর তলাটা একেবারে খটখটে শুকনো। সর্পিল সিঁড়ি দিয়ে নেমে মুখে একটা অদ্ভুত শিস দিতে দিতে কুয়োর একদিকের দেওয়ালে একটা নিরেট লোহার দরজার সামনে সে এসে দাঁড়াল। কম্বিনেশন লক। চাকার মতো জিনিসটা একটা বিশেষ সংখ্যা অনুযায়ী ঘোরানো মাত্রই দেওয়ালের বাঁদিকে লোহার দরজাটা এক ঝটকায় ঝট করে সরে গিয়ে অন্ধকার একটা মাটির তলার ঘর দেখা গেল। আর তখনই একটা দুঃসহ ভ্যাপসা গন্ধ সেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কুয়োর বদ্ধ হাওয়ায় ঝাপটা মারল।

যে গন্ধে মানুষের নাড়িভুঁড়ি উলটে আসার কথা, তা কিন্তু বড়ো সুগন্ধি, বড়ো মনোরম বোধ হল বিরূঢ়কের। নাসাপথে সেই ঘ্রাণ অপরিসীম তৃপ্তির সঙ্গে টেনে নিতে

নিতে ঘরের ভেতর ঢুকে ডানদিকের দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপল। একসঙ্গে গোটা তিরিশেক সিয়েফেল জ্বলে উঠল।

'হাই ডারলিংস! হাই সুইটিজ! হাউ আর ইউ?' বলতে বলতে শিস দিয়ে বিরূঢ়ক ঘরের দেওয়ালঘেঁষা কতগুলো কাচের চেম্বারের দিকে হেঁটে গেল।

সারি সারি অজস্র বড়োছোটো চেম্বার। শক্ত কাচের দেওয়ালে পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্রাকার কক্ষ সব। প্রতিটি চেম্বারের মাথায় একটা করে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। চেম্বারের ওপরের ঘুলঘুলিগুলো ধাতব ঢাকনা দিয়ে শক্ত করে বন্ধ। সেইসব চেম্বারের প্রতিটির ভেতরে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে ভয়ংকরদর্শন এককেটি সাপ।

দুধরাজ, কালকেউটে, পদ্মগোখরো, চন্দ্রবোড়া, কালনাগিনী, বোড়া, শঙ্খচূড়, ক্রেইট, ব্ল্যাক মাম্বা, গ্রিন মাম্বা, ভাইপারস, র‍্যাটল স্নেক, বেলচেরি—আরও কত! দেশি-বিদেশি, চেনা-অচেনা সেসব সাপেদের কী অপরূপ রূপ! কী মাদকতাময় দেহকান্তি, কী অপার্থিব সৌন্দর্য! সেই সাপগুলো যেন স্নানঘর থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা মদালসা সুন্দরীদের মতো কাচের চেম্বারে গা এলিয়ে দিয়ে অপরিমিত যৌবনের দর্প নিয়ে সিয়েফেল আলোর নীচে শুয়ে আছে। কী মসৃণ উজ্জ্বল তাদের ত্বক! কী সুচিক্কণ তাদের চেরা জিভের আস্ফালন! কালো পুঁতির মতন, প্রবালখণ্ডের মতন উজ্জ্বল তাদের চোখে কী সম্মোহনকারী কটাক্ষ!

এত যে উজ্জ্বল চোখ তাদের, তবু সেসব চোখে দৃষ্টিশক্তি প্রায় নেই। সৃষ্টির আদিমকাল থেকে উষার আলো দেখেনি সাপেরা, লক্ষ লক্ষ বছর অন্ধকার বিবরের ভেতর শুয়ে থেকেছে, ফলত অন্য প্রাণীদের মতো স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি পায়নি। স্পষ্ট আকার দেখতে পায় না, শুধু আবছা আভাস হয়ে অক্ষিপটে দেখা দেয় পরিপার্শ্ব। বিরূঢ়ক যে দাঁড়াচ্ছিল প্রতিটি চেম্বারের সামনে, তার চেহারাও নিশ্চয়ই কুয়াশামাখা, কাদামাখা-মতো কিছু একটার অস্পষ্ট ছায়া হয়ে ধরা পড়ছিল সাপেদের চোখে। প্রেমিকার কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে এসে প্রেমিক যেমন করে কথা বলে, তেমনই স্ফুট-অস্ফুট সোহাগের কত কথা বলে চলেছিল বিরূঢ়ক সাপেদের প্রতি। তার কণ্ঠস্বর পাতালঘরের দেওয়ালে তীক্ষ্ণ অথচ বিষণ্ণ ইতালিয়ান চেলোর মতো মন্দ্রস্বরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যদিও, তবু হায়! সাপের তো কর্ণপটহ নেই যে তারা সেসব আওয়াজ শুনবে। তাদের মাথার খুলির ভেতর উচ্চ কম্পাঙ্কের কম্পন কোনোমতে গিয়ে আঘাত করে একটা কিছুর উপস্থিতির বোধ জাগিয়ে তোলে মাত্র। প্রায়-অন্ধ, প্রায়-বধির এইসব প্রগাঢ় রূপসীরা তবু তাদের প্রিয়তমের উপস্থিতিটুকু টের পেয়ে মন্থর ভঙ্গিমায় নড়ে চড়ে উঠছিল, কেউ কেউ তাদের তীব্র কামনায় কাচের দেওয়ালের ওপর যাবতীয় আক্রোশ ঢেলে দংশন করছিল।

ঘরের অন্যদিকের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল বিরূঢ়ক। সেদিকে যাওয়ামাত্রই

সিমেন্টের চৌবাচ্চাগুলোতে যেন প্রচণ্ড হুড়মুড় শব্দে আলোড়ন উঠল। চৌবাচ্চাগুলোর ওপরের পাথরের স্ল্যাব সরিয়ে লম্বা চিমটে দিয়ে বিরূঢ়ক পিটপিটে চোখের ব্যাঙ, ইঁদুর, চামচিকে, বাদুড় তুলে নিয়ে জারিকেনের মধ্যে গাদা করে রাখছিল। আসন্ন বিপদ কীভাবে যেন বুঝে যায় এইসব নিরীহ প্রাণীরা। তারা এ ওর ঘাড়ের ওপর ভিড়বহুল শহরের রাস্তার চৌমাথায় ব্যস্ত অফিসযাত্রী ভদ্রলোকদের মতো লাফিয়ে উঠছিল প্রবল জিজীবিষায়। তাদের দেখে হাসতে হাসতে 'কাম অন, বেবি। কাম ডাউন, বেবি' বলতে বলতে জারিকেনভর্তি মণ্ডুক, ইঁদুর ও চামচিকেদের সমারোহ নিয়ে বিরূঢ়ক বারবার এগিয়ে যাচ্ছিল সাপগুলোর চেম্বারের দিকে।

চেম্বারের ওপর ঘুলঘুলির ধাতব ঢাকনা খুলে ত্বরিত গতিতে সাপেদের খাদ্য সরবরাহ করে ঢাকনা শক্ত করে লাগিয়ে বিরূঢ়ক সরে এল তার প্রিয় গ্রিন মাম্বার খাঁচার সামনে। একটা অসহায় থপথপে ইঁদুর চেম্বারের এক কোণে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। অনেকগুলো ইঁদুর দেওয়া হয়েছিল, বাকিগুলোকে সাপটা খেয়ে ফেলেছে, এটাই শুধু বাকি। সুন্দরী উজ্জ্বল সবুজ মাম্বা বিশালাকার চেম্বারের অপর প্রান্তে অনিচ্ছুক ভঙ্গিমায় শুয়ে ছিল বিড়ে পাকিয়ে। মাঝে মাঝে চকিতে চেরা জিভ বের করে বাতাসে বিরহযন্ত্রণা ছুঁড়ে দিচ্ছিল বন্দিনী নাগিনী। মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে প্রায় উপেক্ষার দৃষ্টিতে সে ইঁদুরটার দিকে দেখছিল। ওটা যেন একটা উচ্ছিষ্ট তার কাছে। ওই কোণে কিছু একটা জরদ্গবের মতন পড়ে আছে সে টের পেয়ে থাকবে। দৃষ্টি দিয়ে নয়, শ্রুতি দিয়ে নয়, এক বিশেষ ঘ্রাণপ্রক্রিয়ায়। 'ওহ্ নো, নো, ডিয়ারি! গো, কনজিউম ইট,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিল বিরূঢ়ক।

মিনিট পনেরো পরে ইঁদুরটার যেন একটু সাড় ফিরল, একটু নড়েচড়ে উঠল। যেন বুঝতে পারল, সামনে কালান্তক মৃত্যু। অথচ মৃত্যু তাকে তাচ্ছিল্য করছে, উপেক্ষা করছে। এই অপমান কি বোধ করতে পারে মহাস্থবির ইঁদুর? সেটুকু আত্মসম্মানবোধ তার নেই। সে শুধু বাঁচবার জন্যে সকরুণ আর্তি ও ভয়মাখানো চোখে প্রাণপণে চেম্বারের ভেতর ছোটাছুটি করে কাচের দেওয়াল বেয়ে উঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

আর তখনই ওই নড়াচড়ার অস্পষ্ট ছায়া গ্রিন মাম্বার নিষ্ঠুর অক্ষিপট শনাক্ত করে ফেলল। দু-একটি মুহূর্ত শুধু, তারপরই এক ভয়াবহ সবুজ বিদ্যুৎ-রেখার মতন সেই মহানাগ লাফ দিয়ে ইঁদুরটাকে যেন শূন্য থেকে পেড়ে নিয়ে তার ব্যাদিত মুখগহ্বরের ভেতর ধরে ফেলল। ইঁদুরটার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে, যন্ত্রণায় এবং বাঁচবার অন্তিম আকুতিতে তার দুটো পা সাপের মুখ থেকে বেরোনোর জন্য ছটফট ছটফট করছে। গ্রিন মাম্বার ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটি সবুজ ঘাগরা-পরা আরব্য নর্তকীর মতো এক অবর্ণনীয় ছন্দোসুষমায় দুলতে দুলতে ইঁদুরটাকে গ্রাস করতে লাগল।

হা-হা করে হেসে উঠে সোল্লাসে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বিরূঢ়ক। 'ইটস আ টেরিবল ফিট—আহ্ ইট'স অলমোস্ট সাবলাইম।' বলতে বলতে দুলতে দুলতে আরেকবার চৌবাচ্চা থেকে নধর খাদ্যদের নিয়ে এসে সাপেদের চেম্বারের মাথার ঢাকনা খুলে সে খাওয়াতে লাগল।

এইসব কাজ সারতে প্রায় সোয়া ঘণ্টা সময় বেরিয়ে গেল। খাওয়া শেষ করে সাপেরা আবার নিজেদের চেম্বারে গুটিয়ে শুয়েছে, কেউ কেউ ঝুলে আছে চেম্বারের দেওয়ালে। সিমেন্টের চৌবাচ্চাগুলোতে ইঁদুর, ব্যাঙ, বাদুড়ের চাঞ্চল্য থেমে এসেছে। বাইরের পৃথিবীর রোদের মতই এবার নিষ্প্রভ হয়ে আসছে বিরূঢ়কের চেতনা। একেকটা প্রবল উত্তেজনার পরেই এমন নিস্তেজ, নিরুত্তাপ হয়ে আসে তার মন। অবসাদের কুয়াশার ভেতর দিয়ে সে সাপেদের খাঁচার দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে একটা কাঠের টুলের ওপর বসে আছে। একটু আগে ইঁদুরটার দিকে গ্রিন মাম্বা যেমন করে বিরস দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল, এ মুহূর্তে বিরূঢ়কের চোখেও তেমনই এক উদাসীন দৃষ্টি।

নাহ্, এদের দেখে এখন আর ভয় হয় না বিরূঢ়কের। ভয় পাবার মতো কোনো এলিমেন্ট নেই সাপেদের মধ্যে। সাপ অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী। খিদে না পেলে কিংবা কোনো কারণে ভয় না পেলে সাপ কাউকে কামড়ায় না। তা সত্ত্বেও মানুষের মনে সাপের ভয় কেন এত, তা নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছে সে একসময়। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত।

বিবর্তনের নিয়মে পৃথিবীতে মানুষ আসারও আগের ধাপে, মানুষের আদিতম পূর্বপুরুষেরা হিংস্র মাংসাশী পশু ও শিকারি-পাখিতে পরিপূর্ণ এক ভয়াল প্রতিবেশে বাস করত, যেখানে ছিল পদে পদে অনিবার্য মৃত্যুর আশঙ্কা। এর থেকে বাঁচবার তাগিদে এক বিচিত্র এসকেপ-ইন্সটিংক্ট বা পলায়নী প্রবৃত্তির জন্ম হয় সেইসব আদিম পূর্বপুরুষের মনে। একটা মৌলিক খাদ্য-খাদক সম্পর্কের ধারণা তৈরি হয়েছিল তাদের চেতনায়, যার ফলে বিপদ কোনদিক থেকে আসছে বুঝতে পেরে মানুষের সেইসব আদিম পূর্বপুরুষ পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সময়টুকু অন্তত পেত। কিন্তু এই মৌলিক খাদ্য-খাদকের জ্ঞান একেবারে ভন্ডুল হয়ে গেছিল সাপের ব্যাপারে। সাপের নিরীহ চলাচল, তুচ্ছ লাঠি বা দড়ির মতন নির্জীব পড়ে থাকা দেখে প্রাইমেটেরা ভাবতেই পারেনি কী বিপজ্জনক হতে পারে সাপেদের উপস্থিতি। ফলত, অনেকেই শেষ হয়ে যায় সাপের কামড়ে।

তখন ধীরে ধীরে আমাদের সেইসব আদি পূর্বপুরুষের মস্তিষ্কে সাপের বিপজ্জনক উপস্থিতি শনাক্ত করার পদ্ধতি জেগে উঠতে লাগল। ভয় এল; মগজের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক বিশেষ স্নায়বিক সংবেদনার আবির্ভাব ঘটল। সেই সংবেদনাই পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের মনে। কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আমাদের

প্রাচীনতম পূর্বপুরুষের মনে সাপেদের প্রতি যে ঘৃণা, যে ভয় জন্মেছিল, আজও তা রয়ে গেছে আমাদের কালেকটিভ আনকনশাসে; সাপ দেখলেই সমষ্টি নির্জ্ঞানের সেই আদিম বিবর থেকে সেই ভয়, সেই ঘৃণা আজও উঠে আসে এঁকেবেঁকে আমাদের চেতন-মনের উপরিতলে। সাপের তির্যক গতি, তার হিলহিলে চেহারা, যখন তখন পায়ে জড়িয়ে যাওয়ার ইচপিচে অনুভূতি এই কারণেই আমাদের কাছে এতটা ভয়োদ্দীপক—এছাড়া সাপকে ভয় পাওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আর নেই।

কিন্তু সাপের সঙ্গে থাকতে থাকতে সেই ভয় চলে গেছে বিরূঢ়কের। অচেতন বা অবচেতনের ওপর সচেতন মনের আধিপত্যও তো বড়ো কম নয়। অথচ এই ভয়ই তো সে চেয়েছিল একদিন। ছোটোবেলা থেকে আত্মীয়দের মধ্যে অবহেলায় অনাদরে বেড়ে ওঠা মাতৃপিতৃহীন বালক—সে ছিল ভীষণ মুখচোরা, ইন্ট্রোভার্ট টাইপ। কেউ তার বন্ধু হয়নি, কারও সঙ্গে ভালো করে সে মিশতে পারত না। একাকিত্বের সেই আড়াল ভেঙে একমাত্র ঢুকতে পেরেছিল দেবলীনা, যে তাকে প্রণয়ের, শরীরের প্রথম আভাস দিয়েছিল একদিন। কিন্তু দেবলীনাও চলে গেল তাকে ফেলে বালির বিছানায়, সেই রিক্ততার অনুভূতি থেকে আপন মেধার জোরে কোনোমতে বেঁচে উঠেছিল বিরূঢ়ক। তার সামনে তখন একটা নির্মম রুক্ষ প্রতিযোগিতার পৃথিবী।

পাঠপ্রস্তুতি, পরীক্ষা, স্কলারশিপ, অন্যকে হারিয়ে-ছাপিয়ে-ঠকিয়ে এগিয়ে যাওয়া, 'অন্যের মুখ ম্লান করে দেওয়া'র প্রিয় স্বাদ সেই পৃথিবীতে। এই সুখ, এই উত্তেজনা নিয়েই সে বেঁচেছিল এতগুলো বছর। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউট, দিল্লি। তারপর মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমিয়ে যোগ দিয়েছিল অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির ডাব্লু পি কেরি স্কুল অফ বিজনেসে গবেষণার কাজে, অ্যালেক্স আর্চারের কাছে। মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে অ্যালেক্সকে না দেখলে বিরূঢ়ক জানতে পারত না। অ্যালেক্সের সুন্দর সুভদ্র মুখের আড়ালে সাপের থেকেও লক্ষ গুণ ভয়ংকর একটা দাম্ভিক, শোষক, স্বার্থপর মানুষ লুকিয়ে ছিল। দিনের পর দিন বিরূঢ়ককে ভারবাহী পশুর মতো খাটাত অ্যালেক্স। রাতের পর রাত জেগে যে গবেষণাপত্রগুলো লিখেছিল বিরূঢ়ক, সেগুলো একটির পর একটি অ্যালেক্স আত্মসাৎ করে নেয় এবং নিজের নামে প্রকাশ করতে থাকে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একদিন অ্যালেক্সের ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টের ড্রয়িং রুমে বসে সে সরাসরি এর ব্যাখ্যা জানতে চায়। অ্যালেক্সের বহু ব্যক্তিগত জৈব ও জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে বিরূঢ়ককে প্রায়শই সেখানে যেতে হত। প্রশ্ন শুনে মিষ্টি হেসে অ্যালেক্স বলেছিল, 'এগুলো তো একেবারে তোমার প্রাথমিক কাজ, বিক! এর ওপরেই তো দাঁড়াবে তোমার আসল গবেষণা। তুমি ভীষণ ট্যালেন্টেড এবং পরিশ্রমীও। তোমার কাজও খুবই ব্যতিক্রমী এই অপারেশন্স রিসার্চের ফিল্ডে। তবে কী জানো, তোমার

তো এখানে কোনো পরিচিতি নেই। তাই এই বেসিক কাজগুলো আমি আমার নামেই বের করে দিচ্ছি, যাতে অতি সহজেই আইডিয়াগুলো বিজ্ঞানীমহলে অন্তত প্রাথমিক স্বীকৃতি পায়। ইতোমধ্যে তুমি তোমার মূল গবেষণাপত্র আমার কাছে জমা করতে শুরু করো। সেটা যখন আমাদের দুজনের নামে বেরোবে, বুঝতেই পারছ, তোমার চলার পথে আর একটিও অবস্ট্যাকল থাকবে না। বলো, তোমাকে আমার থেকে কেউ বেশি ভালোবাসে, বিক?'

এমন ভালোবাসা আর মুরগিপোষার মধ্যে তফাৎ বেশি নেই। দিনের পর দিন এই ক্লান্ত দিনযাপন করতে করতে চরম হতাশা আর অবসাদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল বিরূঢ়ক। ড্রাগ নিচ্ছিল বহুদিন, তবু সে নেশাও তাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারছিল না। নানারকম নেশা, বহু মেয়েমানুষ, হাজারটা অবসেশন—শেষ পর্যন্ত তার নিরুত্তেজ মনে এতটুকু উদ্দীপনাও আর রইল না। আর তখনই মনে হয়েছিল ভয় পাওয়া আর ভয় দেখানোর উত্তেজনাটাই পেতে বাকি আছে তার। রাশ অফ অ্যাড্রিনালিনের জন্য মনটা উন্মুখ হয়ে উঠল। ভয় ছাড়া জীবনের আনন্দ কোথায়? ভয়, ত্রাস, আতঙ্ক, থ্রেট—এই তো জীবনের মোক্ষ। কিন্তু ভয় পাওয়ার জন্য যে সামান্য সূক্ষ্মতার প্রয়োজন হয়, সেটুকুও হারিয়ে ফেলেছে তখন তার মন।

হাজারটা হরর মুভি দেখে, অ্যান্টিসোশালদের সঙ্গে মিশে, চোরাগোপ্তা ক্রিমিনাল অফেন্স করে, সাইবার ক্রাইমে জড়িয়ে পড়েও কিছুতেই ভয় আর পাচ্ছিল না বিরূঢ়ক। দুবার সুইসাইড অ্যাটেমপট করেও মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এল সে। মনে হল সমস্ত জীবনটা ড্যাম্প, টেস্টলেস, ইনসিপিড হয়ে গেছে।

ঠিক এমন সময়েই একটা জুলজিকাল স্টাডি তার নজরে আসে। পুরো কাজটা ডেটা এনালিসিসের জন্যে ইউনিভারসিটিতে তার এক জুনিয়রের কাছে এসেছিল। সেই পেপারে চোখ বুলোতে বুলোতে অনেকদিন পর প্রথম শিউরে ওঠে বিরূঢ়ক।

কাজটা নানান ধরনের সাপ নিয়ে; সাপেদের বিহেভিয়ারাল স্টাডি। এবং সেই গবেষণা একটি বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ। সাপ কীভাবে শিকারের উপস্থিতি টের পায় বা কীসের প্রভাবে সাপ আকৃষ্ট হয় তার শিকারের প্রতি—এই হচ্ছে গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয়। শুধু শিকারই নয়, যৌনসঙ্গীর উপস্থিতি কীভাবে আকর্ষণ করে সাপকে, সেটাও সেখানে খোঁজা হয়েছে। সেই সব উদ্দেশ্যেই নানা জাতের সাপ ও সাপের খাদ্য—ব্যাঙ, ইঁদুর, পোকামাকড়, বাদুড়—এদের নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলের ওপর স্যাম্পল স্টাডি করে পাঠিয়েছে 'স্নেক কালচার' নামক একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা। লরা বেসমেইন নামক এক প্রাণীতত্ত্ববিদের অধীনে শতাধিক বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন।

খবরটা পাওয়ার পর বিরূঢ়ক আর দেরি করেনি। লরার সঙ্গে দেখা হল তার ল্যাবে।

কৃষ্ণাঙ্গী কুঞ্চিতকেশা সুন্দরী লরা। বিরূঢ়কের থেকে কয়েক বছরের ছোটো বয়সে। ল্যাবে বসেই লরার সঙ্গে তার কাজ নিয়ে কথা হচ্ছিল দিনের পর দিন। সব শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল বিরূঢ়ক।

শিকারের উপস্থিতি, তার শরীরের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি অনুভব করার জন্য সাপ তার শরীরের এপিডারমাল লিপিড বা মিথাইল কিটোন ব্যবহার করে থাকে। ব্যাপারটা সহজ করে বললে অনেকটা এইরকম। লরা কাজ করছে উত্তর আমেরিকায় সুলভ গার্টার সাপ ও যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'রানা টেম্পোরারিয়া' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, সেই সাধারণ ব্যাঙ নিয়ে। ব্যাঙের গায়ের চামড়ায় এক ধরনের কিউটেনিয়াস মিউকাস বা চর্মসংলগ্ন শ্লেষ্মা থাকে। এই জন্যেই ব্যাঙের গা-টা ওরকম ভেজা ভেজা হড়হড়ে মতো লাগে। এই মিউকাসের কাজ হল পরিবেশ থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে ধরে রাখা। ওই জলীয় বাষ্প থেকেই অক্সিজেন গ্রহণ করে ব্যাঙ; ব্যাঙের শ্বসনে এই মিউকাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এখন এই কিটেনিয়াস মিউকাসে আলফা ও বেটা পারভালবুমিনস নামক প্রোটিন পাওয়া গেছে, যা লরাদের গবেষণায় বিশেষ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। দেখা গেছে, এই পারভালবুমিনস-এর জন্যেই সাপ ব্যাঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুধু ব্যাঙ নয়, প্রায় সমস্ত উভচর ও মৎস্য গোষ্ঠীর প্রাণীর ত্বকে উপস্থিত মিউকাসে এই পারভালবুমিনস বা পারভালবুমিনস-এর মতো প্রোটিনের উপস্থিতি লরা খুঁজে পেয়েছে।

সে তো হল, কিন্তু শিকারের দেহে পারভালবুমিনস-এর উপস্থিতি অনেক দূর থেকে সাপ টের পায় কী উপায়ে? সাপের নাসাপথে অতি উন্নত এক প্রকার অতিরিক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে, যাকে বলা হয় ভোমেরোন্যাজাল অরগ্যান বা জ্যাকবসন'স অরগ্যান। উভচর, অন্যান্য সরীসৃপ এমনকি অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীশরীরেও এর উপস্থিতি আছে, তবু সাপের দেহে এর সক্রিয়তা সাংঘাতিক। ডাচ বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক রুইস ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দেরও আগে এই অঙ্গটির উপস্থিতি টের পান। পরে ১৮১৩ সালে ড্যানিস সার্জেন লুডুইগ জ্যাকবসন এই অঙ্গটির উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। সাপের নাসাপথ-সংলগ্ন এই জ্যাকবসন্‌স অরগ্যান বহুদূরে উপস্থিত শিকারের দেহে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থের সংকেত পেয়ে থাকে।

এখন লরা বলছে, সাধারণ ব্যাঙের গায়ে যে কিউটেনিয়াস মিউকাস বা ত্বকীয় শ্লেষ্মা আছে, সেই শ্লেষ্মার মধ্যে উপস্থিত পারভালবুমিনস-ই হচ্ছে এক ধরনের কেমো-অ্যাট্রাকটিভ প্রোটিন, যার গন্ধ জ্যাকবসন্‌স অরগ্যানের সাহায্যে সাপ অনেক দূর থেকে টের পেয়েই ব্যাঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বিরূঢ়ক জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পারভালবুমিনস দিয়ে কি সাপকে ব্যাঙের কাছে টেনে আনা গেছে তোমার ল্যাবে?'

লরা বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

বিরূঢ়ক আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পারভালবুমিনস ব্যাঙের গা থেকে এক্সট্র্যাক্ট করতে পেরেছ?'

লরা উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, মাছের এবং ব্যাঙের গায়ের চামড়া থেকে আলফা ও বেটা পারভালবুমিনস এক্সট্র্যাক্ট করেছি।'

—কী রেজাল্ট?

—প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে গার্টার সাপ ওই কেমিকালের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে এসে পাত্রের ওপর ছোবল মেরেছে।

—গুড!

—কেন বলো তো?

—না, কিছু না। চলো তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট দেখি। আপত্তি আছে?

—না, না, আপত্তি কীসের?

ঘুরে ঘুরে বিরূঢ়ককে তাদের পরীক্ষানিরীক্ষা দেখিয়েছিল লরা। খাদ্য-খাদক; সাপ ও ব্যাঙ, শিকার ও শিকারী, প্রলোভন-প্রলুব্ধ। খাদ্যের আকর্ষণ, সঙ্গিনীর আকর্ষণ। ক্ষুধা শারীরিক, ক্ষুধা জৈবনিক।

দিনের পর দিন লরার সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলতে বলতে বিরূঢ়কও একটা বিশেষ আঘ্রাণ পেতে থাকে। ব্যাঙ বা ইঁদুরের নয়। লরার। যদিও বিরূঢ়কের দেহে জ্যাকবসন্স অরগ্যান নিষ্ক্রিয় অঙ্গ, তবু সাধারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মগজ আর মন দিয়েই সে লরার ঘ্রাণ পাচ্ছিল। 'মানুষ যেমন করে যায় তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে'—জীবনানন্দের লাইনটি যথারীতি পাক খাচ্ছিল তার লরা-আচ্ছন্ন চেতনায়।

কিন্তু লরা সর্পিণীর থেকেও অনেক বেশি সতর্ক। বিরূঢ়কের মাথায় সে আরও একপ্রকার আলোড়ন দেখতে পেয়েছিল, যা প্রেম নয়, যৌনতা নয়, উত্তেজনা আর জিঘাংসা। একটা ভয়ংকর মতলব।

সেই জন্যেই লরা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল বিরূঢ়কের থেকে। সাপিনী যেমন করে নিজের শরীর মিলনের পর খুলে নেয় সাপের আশ্লেষ থেকে, ঠিক তেমনই।

লরা যদি সরে না যেত, তাহলে হয়তো বিরূঢ়কের জীবন আলোময় হত, অনিলময় হত।

যাক। সে নিয়ে আক্ষেপ নেই বিরূঢ়কের। যা জেনে নেবার, ততদিনে তা তার জানা হয়ে গেছে। এর পরের কাজটুকু বিরূঢ়ককে একাই করতে হবে। আলাদা একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে সেখানে ল্যাব বানিয়ে ব্যাঙ বা মাছের গা থেকে আলফা ও বেটা পারভালবুমিনস এক্সট্র্যাক্ট করত। যেমনটা লরা তাকে শিখিয়ে গিয়েছিল। তারপর যে কাজটা সে করল, সেটার কথা বিরূঢ়ক ছাড়া আর কেউ ভাবতেই পারত না। সে এক বিশেষ ধরণের পারফিউম বানাতে পারল। যে পারফিউম আসলে আলফা ও বেটা পারভালবুমিন-সমৃদ্ধ।

নামেই পারফিউম, আসলে সাপকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার রাসায়নিক।

জীবনটা ততদিনে বড়ো অবাস্তব হয়ে গেছে বিরূঢ়কের। অ্যাবসার্ড। পরিসংখ্যান তত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন। অর্থহীন জীবন। ক্লান্তির জীবন। কিন্তু জীবনের এই অ্যাবসার্ডিটিকেই তো বাঁচার আমন্ত্রণ করে তুলতে হবে। 'আ ল্যুসিড ইনভিটেশন টু লিভ অ্যান্ড টু ক্রিয়েট ইন দ্য ভেরি মিডস্ট অফ দ্য ডেজার্ট'।

হায় কাম্যু! কই আর হল তা? মরুপথে ফুল ফুটল কই? সারা জীবন ধরে প্রাচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে হালের জয়েস, কাম্যু, কাফকা, মার্কেজ, মুরাকামি—আরও কত কী ঘাঁটল। বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখায় ভাইপার সাপের মতো ঝুলে রইল। কিছুই আত্মস্থ করল না, বাঁচতে শিখল না। নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারল না, অন্যকে ভালোবাসা দিতে পারল না, অন্যের ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যও হতে পারল না কোনোদিন।

ততদিনে সে অজস্র সাপ আকর্ষণ করতে শিখেছে। ওই পারফিউমের আকর্ষণ অমোঘ। জলা জায়গা বা জঙ্গলের ধারে স্প্রে করে দিলে সাপ আসত। সাপ ধরতে, সাপ ঘাঁটতে, সাপের মুখে যথাসময়ে যথাযোগ্য খাদ্য তুলে দিতে শিখেছিল সে। এসব কাজে যে রোমাঞ্চ, যে ভয়, যে আতঙ্কের স্রোত তার স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে নেমে যেত, সেই অনুভূতির জন্যেই আবার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হল বিরূঢ়কের।

তবু অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে ভয়ও চটকে যায়। তখন দরকার পড়ল আরও নতুন উত্তেজনার। তা না হলে বাঁচবে কী নিয়ে?

অ্যালেক্সের সঙ্গে কথায় কথায় বিরূঢ়ক জেনেছিল, তিরিশে এপ্রিল অ্যালেক্সের মৃতা স্ত্রী বারবারা-র জন্মদিন। ওইদিন অ্যালেক্সের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিল বিরূঢ়ক। হালকা চালে একথা ওকথা হতে হতে বিরূঢ়ক অ্যালেক্সকে ওই পারফিউমটা উপহার দিয়েছিল বারবারা-র স্মৃতিতে। কিছুটা পারফিউম সৌজন্যবশত অ্যালেক্সের গায়ে স্প্রে করেও দিয়েছিল, অবশ্যই অ্যালেক্সের অনুমতি নিয়ে। বিষণ্ণ, মধুর, স্মৃতিভারাতুর সুরভি। একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর পারফিউমটা অন্য ঘরে রেখে আসার জন্য উঠে গেছিল অ্যালেক্স।

আর তখনই রুকস্যাক থেকে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় লুকোনো বাক্স টেনে বের করে এনে, সেই বাক্স থেকে কোরাল স্নেকটা তুলে নিয়ে ড্রয়িং রুমের টেবলের ওপর রাখা ঝাঁকড়া ক্যাকটাসের টবের ভেতর সাপটাকে ফেলে দিয়েছিল বিরূঢ়ক। কিছুক্ষণ পর অ্যালেক্স এ ঘরে ফিরে এলে দু-এক কথার পরেই তড়িঘড়ি অ্যালেক্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল সেদিন। অ্যালেক্স যথারীতি ঢুকে গেছিল তার স্টাডিতে।

পরের দিন অ্যালেক্সের মৃতদেহ পাওয়া যায়। রহস্যজনক মৃত্যু। হার্টফেল করেছে। ঘরের মেঝের ওপর চেয়ারটা উলটে পড়ে আছে। আর অ্যালেক্সের নিথর শরীরটা পড়ে আছে তিন দিক খোলা পোর্টিকোতে। মৃত্যুর আগে ভয়ংকর কিছু একটা দেখেছিল বোধহয়

অ্যালেক্স। তার চোখের মণি বিস্ফারিত, দরজা খুলে সে পোর্টিকোতে বেরিয়ে গিয়েছিল। ভয় ছাড়া মৃত্যুর আর কোনো কারণ ফরেন্সিকে পাওয়া যায়নি। তীব্র ভয়জনিত মৃত্যু।

কোরাল স্নেক—ভয়ানক বিষাক্ত সাপ। তবু সে বিষ ঢালেনি। তার মূর্তি দেখেই আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে গেছিল অ্যালেক্স। আহা। সাপটা কামড়াল না তবে? আপশোস। একটা প্রকাণ্ড দশাসই লোক সামনে হঠাৎ উলটে পড়ায় তার পতনজনিত কম্পনে ভয় পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক সাপটার পক্ষে। সাপ নিতান্তই নিরীহ প্রাণী।

ভালোই হয়েছে একদিক থেকে। মৃত অ্যালেক্সের শরীরে সাপের বিষ পাওয়া গেলে মুশকিল ছিল। ভয়ের চোটে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল অ্যালেক্স, একটু পরে সাপটাও নিশ্চয়ই ওই পথেই...। তা না হলে বদ্ধ ঘরের মধ্যে সাপটাকে ট্রেস করতে পারত হয়তো পুলিশ কোনোভাবে। সেক্ষেত্রেও সমস্যা হয়ে যেত। বিস্তর সমস্যা!

ভারতীয় হলে সাপ দেখে এত সহজে এতটা ভয় পেত না। দুজন কৌতূহলী নেপালি ভৃত্য, তারপর সুশীতলবাবু—এদের প্রত্যেকের বেলাতেই এত সহজে ধরাশায়ী করা যায়নি। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

ইব্রাহিম অবশ্য প্রভাবিত হয়েছে অন্য ভাবে। যদিও ধর্মভাবুক ইব্রাহিমের ব্যাপারে এখনও সংশয় থেকে যাচ্ছে অনেক। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী করে ইব্রাহিম। খেলাটা চলুক। শেষে অবশ্য আড়াই ঘর চালে ঘোড়া বোড়েকে খাবেই। ঘোড়ার মুখটাও তো সাপের ফণার মতোই।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাইরে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নেমে আসছে। অন্ধকার নেমে আসার আগেই এখান থেকে বেরোতে হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে সাপেদের দিকে তাকিয়ে বিরূঢ়ক বলল, 'গুড নাইট!' তারপর সুইচ অফ করে ঘরের দরজা লাগিয়ে দীর্ঘ ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে অত্বরিত পদক্ষেপে উঠতে লাগল। কুয়োর খোলা মুখ দিয়ে শুকনো ইউক্যালিপটাসের পাতা বাইরের পৃথিবী থেকে চুঁইয়ে নেমে আসা অপরাহ্নের আভার ভিতর ঘুরে ঘুরে পড়ছে।

প্যাঁচালো সিঁড়িটা শেষ হল কুয়োর মুখের কাছে এসে। মনটা বড্ড বিরক্তিকরভাবে আজ ধীর, শান্ত হয়ে আছে। সেই আড়ষ্টতা ভাঙতেই যেন লাফ দিয়ে বিরূঢ়ক সিঁড়ির থেকে কুয়োর পাড়ের ওপর উঠে এল।

আর ওঠামাত্রই দেখতে পেল, কুয়োর একেবারে সামনে অবিশ্রান্ত জঙ্গলের ভেতর অবিরাম ছেত্রি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তার কৌতূহল-বিস্ফারিত দুটি ছোটো ছোটো ধূমল চোখ মেলে।

আহ্! এতদিন পর তাহলে আবার উত্তেজনা। আবার উল্লাসপ্রদ স্বয়মাগত শিকার!

৭

বিষ্ণুপুর খুব ভালো লেগেছে উদ্দালকের। এখন ট্যাক্সির সামনের সিটে বসে জানালা দিয়ে হাইওয়ের পাশে খোলা মাঠে আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে ফিরছে। ভোঁদা বারবার বলছিল, 'এসিটা চালিয়ে দিই, দালি? বড্ড গরম যে! তোমার কষ্ট হচ্ছে না?'

না, এসি তার ভালো লাগে না। জানালার কাচের বাইরের পৃথিবীটাকে কেমন পর পর লাগে। তাও সে ভোঁদাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার এসি লাগবে, প্রতুলমামা?'

'নাহ্, আমিও এসি বেশি পছন্দ করি না। বিষ্ণুপুর কেমন লাগল, বলো।'

'দারুণ,' দালি উজ্জ্বল চোখে বলল, 'তবে সব থেকে ভালো লেগেছে দলমাদল কামান। সত্যি ওটা নিয়ে যুদ্ধ করত?'

—করত বোধহয়। তুমি কিছু খাবে?

—নাহ্, খেলাম তো একটু আগেই।

স্টিয়ারিঙে হাত রেখে ভোঁদা একটু হাসল। দালির 'একটু আগে' মানে ঘণ্টা তিনেক আগে। কী প্রাণশক্তি ছেলেটার! সকালবেলা বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছে। তারপর বিষ্ণুপুরে ঘোরাঘুরির মাঝে একটা মিষ্টির দোকানে ওরা দুজন সামান্য কিছু খেয়েছিল। সারাদিন এত ঘোরাঘুরি। সব সময় উৎসাহে যেন টগবগ করে ফুটছে। তাড়াতাড়ি মেদিনীপুরে ফিরে কোনো রেস্তোরাঁয় দালিকে খাওয়াতে হবে। চেপে চালালে আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

ফিরতে কিন্তু বিকেল হয়ে গেল। দালি আপন মনে গান গাইছে। মোবাইলে খুট খুট করছে। মাঝে একবার দিদার সঙ্গে কথাও বলল। 'আমরা ফিরছি, তুমি চিন্তা কোরো না... হ্যাঁ, মা ফোন করেছিল... দারুণ ঘুরেছি আজকে... প্রতুলমামার সঙ্গে কথা বলবে? এই নাও, ধরো... প্রতুলমামা, দিদার ফোন...'

ফোনে কাকিমাকে আশ্বস্ত করেছিল ভোঁদা। 'সব ঠিক আছে। দালিবাবু খুব মজা করেছে সারাদিন।'

নিশান্তিকা লজের উলটো দিকের ফুটে গাড়িটা দাঁড় করাল ভোঁদা। দালিকে বলল, 'চলো, কিছু খেয়ে নিই। এতক্ষণ পেট খালি রাখা ঠিক না।'

ক্যাফেটারিয়ার ভেতরে দেওয়ালের দিক ঘেঁষে একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা দুজন। ভোঁদা বলল, 'বলো, কী খাবে?'

মেনুকার্ডে আঙুল বুলোতে বুলোতে একটা জায়গায় থেমে দালি বলল, 'চিলি চিকেন!'

খাবার অর্ডার দিয়ে দালির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ভোঁদা। দালি বলল, 'তুমি জিম করো, প্রতুলমামা?'

প্রতিমা মনে হয় দালিকে শিখিয়ে দিয়েছে 'প্রতুল' বলতে। ভালো নামে তাকে ডাকত রূপেন। তার দেখাদেখি প্রতিমাও। বোসবাড়িতে অন্তত সে ভোঁদা নয়, প্রতুল। শুধু বিশুই তাকে 'ভোঁদাদা' বলে ডাকে। তা বিশু এসেছে ও বাড়িতে বেশি দিন নয়।

'করিই তো। তোমাকে কে বলল?' ভোঁদা জিজ্ঞেস করল উৎসুক চোখে।

—মামা। ওই যে গেলবার কলকাতা এসেছিল, তখনই বলেছিল তোমাদের ছোটোবেলার কথা। তোমার গায়ে নাকি খুব জোর?

'হুঁ, হুঁ! খুব জোর। একদম সুপারম্যান,' ভোঁদা কনুই থেকে হাতটা ভাঁজ করে দেখাল। শার্টের ওপর দিয়ে তার বাইসেপস ফুলে উঠেছে। 'বানাবে তুমি এরকম? জোরে ঘুসি মেরে দ্যাখো!'

—আহ্! আউচ! একদম লোহা!

—বানাবে এরকম?

—বানাব। শেখাবে তুমি?

—শেখানোর বিশেষ কী আছে? খুব খাটতে হয়। চলে এস বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে রোজ।

ভোঁদার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছিল দালি। একেবারে প্রতিমার চোখ দুটি পেয়েছে। এরকম করেই হাসত প্রতিমা ছোটোবেলায়। কী আশ্চর্য ছোটোবেলা ছিল তাদের! এই কাফেটারিয়াতেই তো এসেছিল সে আর প্রতিমা একবার। দুর্গাপূজার সময়। অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলির পর। প্রতিমার তখন দালির মতোই বয়েস। ক্লাস নাইনে উঠেছে। ভোঁদাদের তখন পরের বছর হায়ার সেকেন্ডারি আসন্ন।

হঠাৎ কাউন্টারের দিক থেকে সামান্য উচ্চস্বরে ক্যাফেটারিয়ার মালিকের কথাবার্তা শুনে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল ভোঁদার। লোকটা তার পাশে ল্যাপটপ নিয়ে বসা একজনকে বলছে, 'এদের কী ব্যাপার, জানি না, বাপু! কদিন কাজ করে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। এই সেদিন একটা লোক, বেশ ভদ্র, সভ্য। ওয়েটারের কাজ নিল। আমি ভাবলাম, ভালো মানুষ। ও মা! একমাস যেতে না যেতেই বলে আমার মাইনে মিটিয়ে দিন, কাজ ছেড়ে দেব!'

'কে? ও, ওই লোকটা? ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ও বেশিদিন কাজ করবে না,' ল্যাপটপ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল।

—কেন?

—কেমন যেন লোকটা। খুব ঠান্ডা। চট করে রাগে না। সারাদিন কী যেন ভাবে!

আমার মনে হয়েছিল, লোকটা খুব পড়াশোনা জানা লোক।

—ওই জন্যে ইগোটা একটু বেশি। তা কাজ কন্টিনিউ করবি না তো কাজ নেওয়ার দরকারটা কী?

—সেই। কে জানে!

—কিচেনের দিকটা ভালো করে লক্ষ রাখছ তো?

—হ্যাঁ, সে আর বলতে। গ্যাস ওভেনের ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে শাঁখামুটি সাপ বেরোল যা একখানা।

—ভালো করে কিচেনের বাইরে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানো দরকার।

—কার্বলিক অ্যাসিড আজকাল আর খোলা মার্কেটে সহজে পাওয়া যায় না। সরকারের নিষেধ। এনেছি দু-বোতল ঘুরপথে।

—হ্যাঁ, খুব খেয়াল রাখবে। আমাদের কত পুরোনো কাফে। এতদিনের গুডউইল। কোনোমতেই যেন নষ্ট না হয়।

চিলি চিকেন এসে গেল। এক প্লেট দুজনে দুটো প্লেটে ভাগ করে খেতে শুরু করল ভোঁদা আর দালি। দালির ঝাল লেগেছে। জল খাচ্ছে বারবার।

'বেশি ঝাল?'

—নাহ্, ঠিক আছে।

সেই একই বৈশিষ্ট্য। ভোঁদা মনে মনে হাসল। প্রতিমাও হার মানত না কখনও।

কিন্তু সেসব খুব ছোটোবেলার কথা। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, কাকিমার নজর এড়িয়ে মিটসেফের তালা খুলে কামরাঙার আচার চুরি করে আনা, ক্যারাম খেলতে বসে বলে বলে গুটি ফেলা, পাড়ার মোড়ে ইটের ওপর ইট সাজিয়ে গলি-ক্রিকেটে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে ক্রিকেট খেলা, রাগ করে সারাদিন উপোস করে থাকা, সবটাতেই জেদ দেখাত প্রতিমা। কিন্তু ওই যে—সেসব ছোটোবেলার কথা। তারপর ক্লাস সিক্স বা সেভেনে ওঠার পরেই প্রতিমার সঙ্গে আর দেখাদেখি হত না বাইরের ছেলেদের। সম্ভবত ওর খেয়ালি স্বভাব, অতিরিক্ত জেদের কারণে বাড়ির থেকেই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল প্রতিমাকে। সেই নিষেধের ঘেরাটোপে প্রতিমা তার জেদ নিয়ে কেমন করে যুদ্ধ করছিল বা কী করছিল, ভোঁদা জানে না।

তারপর দেখা হল একেবারে বছর তিনেক পর। সামনে ভোঁদাদের হায়ার সেকেন্ডারি। কী করে পাশ করবে ভোঁদা ভেবে পেত না। বইগুলো যা মোটা মোটা, দেখলেই জ্বর আসত। তবু পুজোর দিনগুলো কি আর বইমুখো হয়ে বসে থাকা যায়? সে কি শৌনক, নাকি রূপেন? অষ্টমীর দিন সকালবেলায় মল্লিকচকে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে গেছিল ভোঁদা। ঠাকুর দেখা, অঞ্জলি দেওয়া, প্রসাদ পাওয়া। সবার মাঝে ফুল, বেলপাতা হাতে নিয়ে ঠাকুরমশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণ যা শুনতে পেল আদ্ধেক আদ্ধেক বলে শেষে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে 'হায়ার সেকেন্ডারিটা উতরে দাও, মা' জানাতে

জানাতে হঠাৎ মেয়েদের সারির একেবারে সামনে প্রতিমাকে দেখতে পেয়েছিল ভোঁদা। প্রতিমা চোখ বুজে অঞ্জলি দিচ্ছে। কী আশ্চর্য। ওদের নিজেদের বাড়িতে পুজো। এখানে অঞ্জলি দিচ্ছে কেন?

পুষ্পাঞ্জলির পর মল্লিকবাড়ির বিশাল সিং-দরজার কাছে আবার দেখা হল। প্রতিমা! কত পালটে গেছে। একটা বাসন্তী রঙের শাড়ি আর ওই একই রঙের কাজ করা ব্লাউজ পরেছে সে। তাতে তাকে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। সে যেন আর আগের সেই প্রতিমা নয়। অনেক বড়ো হয়ে গেছে, অনেক সুন্দর। শুধু চোখদুটো একই আছে। ভোঁদা হাঁ করে দেখছিল প্রতিমাকে। প্রতিমা যেন লজ্জা পেল তাতে। বলল, 'প্রতুলদা, তুমি আর আসো না আমাদের বাড়ি?'

—অ্যাঁ? হ্যাঁ। না। না রে, বেশি যাওয়া হয় না। বাবার দোকানটাতে বসতে হয় মাঝে মাঝে। দোকানের অবস্থাও খুবই খারাপ। মনে হয় চালাতে পারবে না বাবা আর। সামনেই আবার হায়ার সেকেন্ডারি। কী করে পার হব, জানি না। জানিসই তো, আমার লেখাপড়ায় মাথা নেই।

'ও, তাই বুঝি এসেছিলে মাকে বলতে?' প্রতিমার সেই ঝরঝরে হাসির মধ্যে কেমন যেন থতিয়ে যায় ভোঁদা।

—তুই এখানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এলি? তোদের বাড়িতে পুজো না?

—প্রত্যেক বছরই তো বাড়ির পুজোয় অঞ্জলি দিই। এবার এখানে দিলাম।

নিশ্চয়ই বাড়িতে কিছু একটা অশান্তি হয়েছে। বাড়ির ওপর রাগ করে মেয়ে বেরিয়ে এসে মল্লিকবাড়িতে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে। ভোঁদা আর ও-বিষয়ে কথা বাড়াল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'তোকে একা ছেড়ে দিল কাকিমা?'

—কেন ছাড়বে না? আমি কি খুকি? আমি বড়ো হইনি? একা একা স্কুলে যে যাই, সেই কোথায় অলিগঞ্জ...

—না, না, অনেক বড়ো হয়ে গেছিস, প্রতিমা।

—ধুর, তুমি ছাড়ো তো। সত্যিই আমাকে বেশি বাড়ি থেকে বেরোতে দেয় না। স্কুল যাওয়া ছাড়া।

—স্কুলে যাস কীভাবে?

—সাইকেলে।

—আজ সাইকেল এনেছিস?

—আরে, তুমি যে কী বলো না, প্রতুলদা। মীরবাজারের এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসা যায়?

—কেন, গলির মধ্যে দিয়ে আসতে পারতিস।

—তাহলে পুজোর ভিড় দেখা হত?

—তা সত্যি।

'শোনো না, প্রতুলদা। এক জায়গায় যাবে?' প্রতিমার গলায় আগের সেই দুঃসাহসী সুর।

—কোথায়?

—স্টেশনের দিকে ঠাকুর দেখতে?

—দুর, পাগলি। তোর বাড়ির লোক জানতে পারলে বকবে তোকে। আমাকেও বকবে। আমি যাই।

—বাড়িতে পুজোর ভিড়। সব শেষ হতে দুপুর দুটো তো হবেই। ততক্ষণ আমার খোঁজ পড়বে না। দুটোর মধ্যে আমরা ঠাকুর দেখে ফিরে চলে আসব। চলো না।

—যাবি কীভাবে?

—কেন তোমার সাইকেলটার কী হল?

—আমার সাইকেলে যাবি?

—ও মা! তাতে কী? যেন আকাশ থেকে পড়লে যে বড়ো? বলো না, সাইকেল কোথায়? বাড়িতে রেখে এসেছ?

—নাহ্। কোতওয়ালি বাজারের কাছে একটা সাইকেল রাখার দোকানে জমা আছে।

—তো নিয়ে এসো। তুৎ, তুমি কী যে ভাবো না, প্রতুলদা! ও প্রতুলদা আ!

প্রতিমার গলায় আবদার মেশানো। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে ভোঁদা বলেছিল, 'ঠিক আছে। তুই কোতওয়ালি বাজারের পেছনের দিকটায় গিয়ে একটু দাঁড়া। আমি সাইকেলটা দোকান থেকে আনছি।'

সাইকেল রাখার দোকান থেকে সাইকেল নিয়ে এসে ভোঁদা দেখে ঝুপ্পুস হয়ে থাকা বটগাছটার নীচে প্রতিমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে। ভোঁদা বলল, 'কিন্তু এই রে! আমার সাইকেলে তো কেরিয়ার নেই। যাবি কী করে? যেতে পারবি না।'

—কেন সাইকেলের সামনের রডে বসে যাব। সরো, সরো, তুমি সাইকেল চালাবে না আমি চালাব? তুমিও রডে বসতে পারো। আমি চালিয়ে নিয়ে যাই?

—ধ্যাৎ, কী যে বলিস! ওঠ, সামনে ওঠ।

শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে সামনে উঠে বসেছিল প্রতিমা। খানিক ইতস্তত করে সাইকেলের সিটে উঠল ভোঁদা। শক্ত করে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরেছিল।

'ও মা! তুমি আমাকে ফেলে দেবে না তো! সামলে কিন্তু। যা টলমল করছ। স্টেডি, স্টেডি!'

নাহ্, বেশি আর টলমল করেনি ভোঁদা। তখন সে ভোঁদা থেকে প্রতুল হয়ে গেছিল। কোতওয়ালি বাজার থেকে গোলকুয়ার চক হয়ে কলেজিয়েট স্কুলের মাঠের পাশ দিয়ে গলি তস্য গলি দিয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল।

'তুমি এত গলি গলি দিয়ে যাচ্ছ কেন? বড়ো রাস্তা দিয়ে চলো না?... ভয় পাচ্ছ?' প্রতিমা জিজ্ঞেস করে।

শরতের আলগা রোদ আর বড়ো বড়ো বাড়ির ছায়াচ্ছন্ন পথের মধ্য দিয়ে একটি কিশোর আরেকটি সদ্যোকিশোরীকে সাইকেলের সামনে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কাঁসাইনদীর হাওয়ায় দোলা নিমগাছের পাতাদের ফাঁক দিয়ে একটা আলটপকা ছুটির আকাশ আর পালকের মতো হালকা মেঘ হাসছিল মুখ টিপে। উল্লাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা অব্যর্থ শিরশিরানি কিশোরটির সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল অতর্কিতে। সাইকেলের সামনে বসা মেয়েটিকে পেছন থেকে দুহাত দিয়ে বেষ্টন করে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরার ফলে ছেলেটির শরীরে স্নায়বিক শিহরন জাগছিল, সেকথা ঠিক। কিন্তু আরও একপ্রকার শিহরন এর সঙ্গে মিশে ছিল। সেটা ভয়ের শিহরন। মেদিনীপুর তখনও একটা ফাঁকা ফাঁকা শহর ছিল। এখন যদি তাদের দুজনকে কেউ এ অবস্থায় দেখে ফেলে, তাহলে পরিণাম কী ভয়াবহ হবে—সেই কথা ভেবে একটা গভীর উত্তেজনা বোধ করছিল প্রতুল। সেই ভয়টাই আনন্দের কারণ হয়ে উঠছিল তার।

স্টেশনের দিকে চার-পাঁচটা ঠাকুর দেখার পর প্রতিমার নতুন আবদার। চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিল, 'প্রতুলদা! আইসক্রিম খাবে?'

—আইসক্রিম এখানে কোথায় পাবি আবার?

—নিশান্তিকা লজের উলটো দিকে একটা কফিশপ আছে। সেখানে দ-দ্দারুণ আইসক্রিম বানায়! চলো না, চলো-ও!

হ্যাঁ, আর সেখানে তাদেরকে কেউ দেখে ফেলুক আর কি! প্রতিমার যা সব কারবার। এ মেয়ে প্রতুলকে আজ ডোবাবেই। প্রতুল সামান্য ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'তুই যাবি তো যা। আমি যাব না। কেউ দেখে ফেললে...'

'দেখলে দেখবে। দাদার বন্ধুর সাথে কেউ কফিশপে আসে না বুঝি?' প্রতিমা চোখ সরু করে পাশের দিকে চেয়ে চোখের পাতা পিটপিট করতে লাগল।

—বেশ, চল। কিন্তু কিছু হলে আমি জানি না। বলব, তুই নিয়ে যেতে বলেছিলি।

বহু বছর আগে এই দেওয়ালঘেঁষা টেবিলটাতেই মুখোমুখি বসেছিল ওরা দুজন। ওই কাউন্টারের ওপর কী একটা মেশিনে ফুলের পাপড়ির মতো করে কেক বানাচ্ছিল একটা লোক। আইসক্রিম অর্ডার দিয়ে সেই কেক-বানানো দেখছিল ওরা। দোকানটা তখন ঝাঁ-চকচকে ছিল না এত। দুপুরের কফিশপ; একেবারেই ফাঁকা। ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না সেদিন।

চামচ দিয়ে আইসক্রিমের টুকরো তুলে নিয়ে মুখে ভরে চোখ বুজে বসে থাকছিল প্রতিমা। প্রতুল বলল, 'চোখ বুজে আছিস কেন রে?'

প্রতিমা বলল, 'তুমিও চোখ বুজে আইসক্রিম খাও, প্রতুলদা। বুঝতে পারবে।'

—কী বুঝব? কী হবে?

—আইসক্রিম মুখে ভরে চোখ বুজে খেলে ভবিষ্যতের ছবি দেখা যায়। বুজলে চোখ?

—বুজলাম।

—কী দেখছ?

—কিচ্ছু না।

'ধ্যাৎ! তুমি না একটা'—হিহিহি করে হাসছিল প্রতিমা।

তারপর দুজনেই চোখ মেলে আইসক্রিম খাচ্ছিল। আইসক্রিম খেতে খেতে প্রতুল তাকিয়ে ছিল প্রতিমার দিকে। প্রতিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছ?'

—বর্তমান। তুই অনেক বড়ো হয়ে গেছিস, বুলি।

—আরে তুমি আমার ছোটোবেলার নামটা মনে রেখেছ তো বেশ। বড়ো তো হবই। আর কিছু হয়েছি?

প্রতুলের বুক টিপটিপ করছিল। কোনোরকমে বলল, 'আর... আর খুব সুন্দর...'

প্রতিমার ফরসা মুখ সামান্য রাঙা হয়ে উঠল লজ্জায়। বলল, 'তুৎ! কী সব বলছে!'

আইসক্রিমের বিল মেটাতে চেয়েছিল প্রতুল। প্রতিমা তাকে কিছুতেই তা দিতে দিল না। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে রাখতে বলল, 'বাবা আজ সকালেই একশো-ও টাকা দিয়েছে আমাকে। ও নিয়ে কী করবটা কী আমি?'

ওয়েটার ফোল্ডারটা নিয়ে চলে গেল কাউন্টারে। প্রতিমা বলল, 'একটা কথা রাখবে, প্রতুলদা? না করতে পারবে না। আমাকে ছুঁয়ে বলো কথা রাখবে?' হাতটা সামনে বাড়িয়ে ধরে সে।

—কী কথা আগে শুনি, তারপর...

—তুমি আজ থেকে আমাকে আর 'তুই' বলবে না। 'তুমি' বলবে।

কিছুটা রক্ত চলকে মাথায় উঠছিল প্রতুলের। কিন্তু সেসব কিছুকে আমল না দিয়ে সে দোনোমনো করে বলল, "তা কী করে হয়, বুলি? তোকে আমি যে খুব ছোট্টোবেলা থেকে 'তুই' বলে ডেকে আসছি। আজ হঠাৎ..."

হাতটা গুটিয়ে নিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে গেল প্রতিমা। তার মেঘলা মুখে আর হাসি নেই কোনো। কী হল ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবস্থা সামাল দিতে প্রতুল হাঁ হাঁ করে উঠল, 'না, আমি বলছিলাম... আমি...'

প্রতিমা ঈষৎ হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, "থাক। 'তুমি' বলতে হবে না তোমাকে। কিছুই বলতে হবে না।"

একেবারে চুপ হয়ে বসে রইল সে। প্রতুল হঠাৎ দেখল, আঁচলের খুঁটে চোখ মুছছে প্রতিমা।

—অ্যাই বুলি! কী হল কী তোর? তুই কাঁদছিস কেন? আমি কী বললাম? আচ্ছা, ঠিকাছে, ঠিকাছে। আজ থেকে...

আর 'আজ থেকে'! হাত থেকে তির বেরিয়ে গেছে ততক্ষণে। একটাও কথা আর

বলছিল না প্রতিমা। শুধু বারবার চুল ঠিক করছিল গম্ভীর মুখে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছছিল।

কিছুক্ষণ পর প্রতুল বলল, 'আচ্ছা, চল এখন। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

সারাটা পথ আর কোনো কথা নেই। দত্তগলির ভেতর এসে প্রতুল বুলিকে সাইকেল থেকে নামিয়ে দিল।

'তুই রাগ করলি, বুলি? কেমন সুন্দর আমরা ঘুরলাম! আইসক্রিম খেলাম। তারপর এমন...'

বুলি কিছু বলে না। আবার জিজ্ঞেস করল প্রতুল, 'কীরে, রাগ করলি?'

আবার প্রতিমার চোখে জল। গালের ওপর অভ্রর কুচির মতো চিকচিক করছে। আঙুল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে প্রতুল বলল, 'ছি! কাঁদিস না। পুজোর দিন। রাগ করিস না। আচ্ছা, বলছি তো, আমি না হয় আজ থেকে তোমাকে—'

কথাটা শেষ করতে দিল না বুলি। প্রতুলের হাতটা সরিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'নাহ্। ঠিক আছে, রাগ করিনি।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিমা বলল, 'আসলে তুমি বড্ড বোকা, প্রতুলদা।'

আমি তো বোকাই, বুলি। আমি যে ভোঁদা। আমি কি আর কিছু বুঝতে পারি? সেই জন্যেই তো টেনেটুনে পাশ করি কোনোমতে। তোমার দাদার মতো বা দাদার বন্ধু শৌনকের মতো আমি কি বুদ্ধিমান? আমি বোকা ভোঁদা। তুমি কেন আজ আমার সাইকেলের সামনে চেপে ঠাকুর দেখতে গেলে, কেন কাফেতে বসে আমাকে 'তুমি' বলতে বললে, কেন চোখ বুজে ভবিষ্যৎ দেখতে বলেছিলে, আমি কি তার কিচ্ছু বুঝি? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমি তো বোকা। আমার বাবা আরও বোকা। বাজারের মধ্যে একটা মনিহারির দোকান চালায়; সেই দোকানটুকুও টিকিয়ে রাখার মতো বুদ্ধি তাঁর নেই। আমাদের দোকানটা থাকবে না, আমরা কী খাব তারপর জানি না। আমাদের বাড়িশুদ্ধু লোক সকলেই বোকার হদ্দ বোকা। আমি তো বোকা হবই। কিচ্ছু বুঝতে পারব না। বুঝতে পারলে চলে কী করে আমাদের? আমি তো ভোঁদা। বোকা। জানি তো, বুলি। জানি তো! কেন সেকথা আবার মুখ ফুটে বললে তুমি? না বললে চলছিল না? এমন একটা আশ্চর্য দুপুর উপহার দেওয়ার পর এই কথাটা বলে সেই মায়াটা ভেঙে না দিলে খুব ক্ষতি হত তোমার, বুলি? আর কোনোদিন ভুল করেও যাতে তোমাকে 'তুমি' না বলতে পারি, তারই ব্যবস্থা করে গেলে?

এমন অনেক কথাই ভোঁদার মনে জেগে উঠছিল। কিন্তু একটা কথাও বলা হল না তার মুখ ফুটে। কিছু বলবার আগেই সাইকেল ধরে একটা বাড়ির ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ভোঁদা দেখছিল, বুলি চলে যাচ্ছে। পেছন ফিরে একবার দেখল শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে চলে গেল ছায়াক্রান্ত রোদের ভেতর...

'ও প্রতুলমামা! তুমি খাচ্ছো না দেখি! কী ভাবছ?' দলির কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে আসে ভোঁদার।

—নাহ্, কিছুই ভাবছিলাম না। তোমার দেখি খাওয়া হয়ে গেছে। দাঁড়াও, আমি খেয়ে নিই। আইসক্রিম খাবে? এরা খুব ভালো আইসক্রিম সার্ভ করে। ভ্যানিলা? আচ্ছা, দাঁড়াও... ওয়েটার...

আইসক্রিম খেতে খেতে ভোঁদা বলল, 'আইসক্রিমের টুকরো মুখে পুরে চোখ বুজে খেয়েছ কখনও?'

—না।

—খাও। মজা দেখতে পাবে।

মুখে আইসক্রিম নিয়ে অমনি চোখ বুজে দলি বলল, 'কই কিছু তো দেখছি না?'

—কিছু না?

—উমমম্! কেমন হিম হিম সিম সিম... ছোটোবেলায় একবার কার্শিয়াং গিয়েছিলাম আমরা, সেই কার্শিয়াঙের কথা মনে পড়ছে...

—কিন্তু আইসক্রিম না খেয়েও গাড়ি চালাতে চালাতে আমি যে কতগুলো অদ্ভুত ব্যাপার হতে দেখছি কদিন ধরে...

দলি ঝট করে চোখ খুলে বলল, 'কী দেখছ, প্রতুলমামা?'

—সেইটেই বুঝতে পারছি না। কীসব গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট... একটা সাহেব... একজন মহিলা কাঁদছে... কতগুলো লোক... নাহ্, কিছু বুঝতে পারছি না।

—মানে? সত্যি?

—সত্যি। তবে মনে হয়, সেগুলো এখনকার কোনো ঘটনা নয়। অতীতের ঘটনা। চলো উঠি।

বিল মিটিয়ে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উদ্দালককে তুলে ভোঁদা ফিরতে লাগল। বোসবাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসবে দলিকে। কাকিমা হয়তো চিন্তা করছেন এতক্ষণে।

বটতলার কালীমন্দিরের কাছে টার্ন নিচ্ছে, এমন সময় দলি চেঁচিয়ে উঠল, 'সবুজমামা! সবুজমামা দাঁড়িয়ে আছে। আমি নামব। নামব।'

বাঁদিকে চোখ তুলে ভোঁদা দেখল, সত্যিই শৌনক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপারে। বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। গাড়িটা একদিকে পার্ক করি। তারপর তো নামবে।'

লম্বা, ছিপছিপে চেহারার মানুষটি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। ছোটোবেলা থেকেই চশমা ছিল শৌনকের। ইদানীং পাওয়ার আরও বেড়েছে। চশমার কাচের আড়ালে চোখদুটো জ্বল জ্বল করে। ব্যাকব্রাশ করা চুলের মধ্যে একটা দুটো রুপোলি রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। জিনসের ওপর একটা ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি চাপিয়েছে

সে। হাতা কনুইয়ের একটু নীচ অবধি গোটানো। তার বাইকটা সে দাঁড় করিয়েছে রিকশা স্ট্যান্ডের পাশে। ভাবছিল, সিগারেট খাবে কি না। কিন্তু ওপন পাবলিক প্লেসে ধূমপান করা চলে না আজকাল।

উদ্দালককে দেখে শৌনক সহর্ষে বলে উঠল, 'আরে, দালিবাবু! তোর যে আসার কথা ছিল আমাদের বাড়ি কাল! লিলি আর পেখম তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল বারবার। কবে যাবি?... প্রতুল, ওকে নিয়ে গেছিলি কোথাও?'

ভোঁদা বলল, 'হ্যাঁ রে। বিষ্ণুপুর নিয়ে গেছলাম। সারাদিন ঘোরাঘুরি, খুব উৎসাহ ছেলের। দ্যাখ না, এখনও লাফাচ্ছে!'

—হুঁ-উ! দারুণ! তা কেমন দেখলে, দালিবাবু, বিষ্ণুপুর? মল্লরাজাদের কীর্তিস্থল?

উদ্দালক তাড়াতাড়ি শৌনকের কাছে সরে আসে। চাপা স্বরে বলে, 'আমি কালকেই যাচ্ছি, সবুজমামা, তোমার কাছে। একটা ব্যাপার হয়েছে। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

—ইন্টারনেট?

—না, না। সে একটা অন্য ব্যাপার।... একটা খুব পুরোনো ড্রয়িঙের খাতা... অনেক আগেকার...

ভুরু কুঁচকে উদ্দালকের মুখের দিকে চেয়ে হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো সরাতে সরাতে চিন্তামগ্ন স্বরে শৌনক বলল, 'স্কেচবুক? ড্রয়িঙের খাতা? কী আছে তাতে?'

—সে বলব তোমাকে কাল। খাতাটা নিয়ে যাব।

—বেশ, কাল চলে আয় সকালে। দাঁড়া, আমিই গিয়ে তোকে নিয়ে আসব আটটা নাগাদ। এখন তো সামার ভ্যাকেশন। আমার আর পেখমের কলেজ বিলকুল বন্ধ! তোর লিলিমামি একেবারে মুখিয়ে বসে আছে তোর জন্য। আয়, খুব মজা হবে...। চলি রে, প্রতুল। অনেকদিন যাসনি আমাদের বাড়ি। তুইও আয় না কাল।

'নাহ্, কাল হবে না। কাল ট্রিপ আছে। যাবো সময় করে। প্রোফেসর সাব, আমার তো আর তোমাদের মতো সামার ভ্যাকেশন পড়ে না। হা হা হা!' ভোঁদা হাসতে লাগল।

বাইকে স্টার্ট দিয়ে হাত নেড়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল শৌনক। ভোঁদা আর দালি গাড়িতে এসে উঠল।

৮

জানলার পাশে বড়ো টেবিলের ওপর ডাঁই করা অজস্র বইপত্রের মাঝখানে ড্রয়িং খাতাটা খোলা। টেবিলের তিনদিক ঘিরে বসেছে শৌনক, দালি আর পেখম। খাতাটার প্রতিটি পাতা শৌনক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অসম্ভব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। এত কী দেখছে স্যুভমমা, দালি ভাবছে। প্রায় একই রকম মনোযোগ দিয়ে দেখে চলেছে, খাতার ওপর থেকে চোখটাও সরাচ্ছে না পেখমদিদি। দালি দু-একবার কেশেটেসে পেখমের নজর কাড়ার চেষ্টা করল; কিন্তু পেখম পাত্তা দিল না।

'এর তো একটা মানে থাকবে...' শৌনক চিন্তামগ্ন স্বরে বলল।

'হ্যাঁ, একটাই পাখির ছবি বারবার করে আঁকানোর ব্যাপারটার। তাই না, বাবা?' পেখম বলল।

'এগজাক্টলি। রংগুলো দেখেছিস? পালটে পালটে যাচ্ছে। দেখার অ্যাঙ্গেলগুলোও আলাদা আলাদা।'

'আচ্ছা যদি নিছক আঁকা শেখানোর জন্যেই এটা করা হয়?' দালি প্রশ্ন করল।

শৌনক একটু হেসে চোখ নাচিয়ে পেখমের দিকে তাকাল। যেন উত্তরটা পেখমকেই দিতে বলল শৌনক। একটু ভেবে নিয়ে পেখম বলল, 'দালি, তুই যেভাবে আঁকা শেখানোর কথা বলছিস, ওরকম বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে একটাই অবজেক্টকে স্টাডি করার ব্যাপারটা, ওভাবে আর্ট কলেজগুলোতে বড়োদের আঁকা শেখানো হয়। কিন্তু বাচ্চাদের সাধারণত ওভাবে আঁকা শেখানো হয় না। বাচ্চাদের ধৈর্য কম এবং তারা বৈচিত্র্য ভালোবাসে। যদি ওভাবেই এক্ষেত্রে বাচ্চা মেয়েটিকে... কী নাম যেন...?'

শৌনক কথা জুগিয়ে দিয়ে বলল, 'প্রভাতী মিত্র ওরফে গৌরী—ক্লাস ফাইভ।'

পেখম বলল, 'হ্যাঁ, প্রভাতী। প্রভাতী একটা ক্লাস ফাইভের মেয়ে। তাকে আঁকা শেখাতে একটাই কাকাতুয়াকে এতগুলো দিক থেকে আঁকতে বলা হবে, সেটা আমার একটু আনইউজুয়াল... কী বলব, মোস্ট আনলাইকলি লাগছে, বাবা!'

দালি তড়বড় করে বলে উঠল, 'তবে কি এগুলো প্রভাতীর আঁকা নয়? মাঝেমাঝে টানটোনগুলোও যেন পাকা হাতের। আবার অনেক জায়গায় রং রেখা বেশ কাঁচা। কেসটা কী?'

শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কি তেমন কোনো একটা ব্যাপার, ভাগ্নে? সেটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। একজন ভদ্রলোক প্রভাতীকে ছবি আঁকা শেখাতেন। তাঁর নাম সুবিমলবাবু। কোনো কোনো সময় তিনি নিজে এঁকে দেখাতেন, কখনো প্রভাতীকে আঁকতে বলতেন। ফলত, খাতায় দুজনের কাজই মিশে রয়েছে। সিম্পল।'

দালি স্তিমিত স্বরে বলল, 'দিদাও যেত প্রভাতীদিদার সঙ্গে ছবি আঁকা শিখতে...'

পেখম অমনি উদ্দালককে খোঁচা মেরে বলল, 'নস্টালজিক হয়ে যাস না, দালি। ডোন্ট বি পোয়েটিক নাউ।'

অন্যদিন হলে দুই ভাইবোনের এই দ্বৈরথ খুব উপভোগ করত শৌনক। আজ কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে একটুও নড়ছে না। বলল, 'তাহলে বিভিন্ন দিক থেকে একটাই পাখির ছবি আঁকানোর কারণটা কী বলবি, পেখম?'

'আমার মনে হয়, জায়গাটাকে ভালো করে চেনাতে চাইছেন ভদ্রলোক। আর দ্যাখো, প্রত্যেকবারই দেওয়ালের গায়ে একটা রেক্ট্যাঙ্গলের আভাস, দেখেছ?' ছবিগুলোতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে পেখম বলল।

আরিব্বাস! এটা তো দালি আগে লক্ষ করেনি। টেবিলের ওপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠল, 'আর এই শেষ ছবিটা... এই যে খালি দাঁড়, পেছনে সুবিমলবাবু দাঁড়িয়ে... দিদা বলল, এটা উনি নিজেই এঁকেছেন। সুবিমলবাবু ওদের বলেছিলেন, খাতাটা খুব যত্ন করে রাখতে।'

'হুঁ। সেলফ পোর্ট্রেট। ওই জন্যেই দাঁড়টা খালি, যাতে ওঁকে স্পষ্ট দেখা যায়। পাখিটা না আড়াল করে। হাতটা আবার দেওয়ালে ঠেকানো। যেন ওই পেছনের দেওয়ালটাকে বিশেষভাবে নজর করতে বলছেন ভদ্রলোক। কিন্তু কাকে কী বার্তা পাঠাতে চাইছিলেন উনি?' শৌনক যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছে।

পেখম বলল, 'সেটা এখন আর বোঝা যাবে না, বাবা। হয়তো প্রভাতীর বাড়ির কাউকে। কে কে ছিল সেই বাড়িতে, তাদের মধ্যে কে কে বেঁচেবর্তে আছে এখন তাও বের করা মুশকিল। আর প্রভাতীও তো মারা গেছে কিছুদিন পরেই।'

শৌনক তেরছা চোখে পেখমের দিকে তাকিয়ে চশমায় ঝলক তুলে বলল, 'পসটেরিটি?'

'হ্যাঁ, হতেই পারে, বাবা। হয়তো ভবিষ্যতের মানুষদের জন্য একটা কোনো সংকেত দিতে চেয়েছিলেন সুবিমলবাবু।'

দালি বলল, 'আমি একটা কথা বলব?'

পেখম চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'তুই আবার কী বলবি এখন?'

দালি অমনি অভিমানের সুরে বলল, 'কেন আমি কি কিছু বলতে পারি না?'

শৌনক বলল, 'আহা, ওকে বলতে দে না! বলো তো, দালিবাবু, তোমার কী মনে হচ্ছে ব্যাপারটা?'

'কিছুই মনে হচ্ছে না। আসলে...' একটু ইতস্তত করে দালি যোগ করল, 'আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেদিন রাত্রে এই ভদ্রলোককে নিয়ে...'

'স্বপ্ন! স্বপ্নের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?' পেখম যেন দালির কথায় আকাশ থেকে পড়ল।

'ওহ্ নো, পেখম! স্বপ্ন ব্যাপারটাকে অত হালকাভাবে নিস না। বেশিরভাগ স্বপ্নই এলেবেলে ঠিকই, কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ধরনের স্বপ্নে সত্য তার আভাস দিয়ে যায়। সত্যানুসন্ধানে স্বপ্নের ভূমিকা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানী কেকুলের বেঞ্জিন আবিষ্কারের ঘটনাটা ভুলে গেলি? স্বপ্নের ব্যাপারে ফ্রয়েড সাহেবের, তারপর ইয়ুং সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ আছে—সেসব তোকে আমি পরে একদিন বলব 'খন। এখন বলো তো দালিবাবু, স্বপ্নে ঠিক কী দেখেছিলে তুমি?' শৌনক প্রশ্ন করল।

দালি অমনি দারুণ উৎসাহে চোখ গোল গোল করে বলতে লাগল, 'দেখলাম কী...সেই ঘর... সেই দাঁড়... আমি ঢুকতেই পাখিটা বলে উঠল, ও অরুণেশ কে এসেছে?... তারপর পাখিটাখি সব হাওয়া, কিচ্ছু নেই... খালি দাঁড়টা দুলছে আর দাঁড়ের ওদিকে একজন ধুতিপাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা... তিনিই যেন সুবিমলবাবু... তাঁর পেছনে দেওয়াল... দেওয়ালের গায়ে একটা বন্ধ আলমারি... সেই আলমারির পাল্লায় আঙুলে টোকা দিয়ে বলতে লাগলেন, এইখানে এইখানে ঠিক এইখানে...'

দালির গলা নকল করে পেখম টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বলল, 'এইখানে... এইখানে... ঠিক এইখানে... হি হি হি!'

দালি খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেখমদি, আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি। আমি কিন্তু তাহলে তোমাকে এখন থেকে সবার সামনে ইমলিদিদি বলে ডাকব।'

পেখমের ছোটোবেলার নাম ইমলি। খুব ছোট্টোবেলায় তার মুখে কিছু দিলে সে জিভ দিয়ে টাকরায় টক খাওয়ার মতো টক্ টক্ করে আওয়াজ করত। সেইজন্যেই তার মা লিলি তার নাম রেখেছিল 'ইমলি' অর্থাৎ তেঁতুল। বড়ো হয়ে মেয়েটি এই নামে ঘোরতর আপত্তি করে। তখন তার নাম রাখা হয় 'পেখম'। পেখমের মা-বাবা আর দালিদের বাড়ির লোকেরা ছাড়া এই 'ইমলি' নামটা বেশি কেউ জানে না। দালি বিপদে পড়লেই সেই অ্যাডভান্টেজটা নেয়। যখনই পেখম ওর পেছনে লাগে, ও অমনি পেখমকে সবার সামনে ইমলিদিদি ইমলিদিদি বলে ডাকবে বলে ভয় দেখায়।

কিন্তু ভাইবোনের এই তর্জাটাকে কৌশলে ঘুরিয়ে দিল শৌনক। বলল, 'দেওয়ালের গায়ে আলমারি দেখালেন ভদ্রলোক তোকে স্বপ্নে?'

—হ্যাঁ তো।

—তাহলে একবার ওই বাড়িটা খুঁজে দেখতে হচ্ছে রে, দালি।

—যাবে?

—যাবই তো। এবং সেটা এক্ষুনি।

'আর আমি যাব না?' পেখম জিজ্ঞেস করল।

তাদের এই কথার মাঝখানেই এক প্লেট চিকেন পকৌড়া আর তিন মগ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল লিলি। বলল, 'তোমরা কোথাও একটা বেরোনোর মতলব করছ মনে হচ্ছে? যেখানেই যাও, বাপু, লাঞ্চ করে যেও।'

শৌনক বলল, 'আরে এখন তো মোটে সকাল দশটা। আমরা যাবো আর আসব। এই ধরো, দুটোর মধ্যে ফিরে চলে আসব। তুমি রান্নাটান্না করো না। আমরা এলাম বলে। তোমারও তো সময় লাগবে নাকি?'

'তা বেশ। তবে বেশি দেরি কোরো না যেন। আমার আবার সন্ধেবেলা রিহার্সাল আছে। একটু গড়িয়ে নিয়ে বেরোবো,' কথাটা বলতে বলতে লিলি দালির মাথার চুলগুলো ঘেঁটে আদর করে কিচেনের দিকে চলে গেল।

শৌনকের বাইকের পেছনে পেখম আর দালি। আধঘণ্টার মধ্যে মাতঙ্গিনী হাজরার স্ট্যাচুর সামনে এসে দেখল, জায়গাটা তখন বেশ সরগরম হয়ে রয়েছে। কিন্তু একে ওকে জিজ্ঞেস করেও কাকাতুয়া বাড়ির কোনো হদিস মিলছিল না। অবশেষে দত্তগলির মুখে তাসখেলায় ব্যস্ত এক বুড়ো মানুষ শৌনককে বললেন, 'কাকাতুয়া বাড়ি? তা আছে একটা মসজিদের আগে। কিন্তু ওই নামে সেই বাড়িকে এখন আর কেউ চেনে না। আমরা এ মহল্লার পুরোনো লোক, তাই আপনার কথা বুঝতে পারলাম। তা সেখেনে কী দরকার?'

'একটু কাজ আছে। আচ্ছা, একটু মনে করে বলুন দেখি, ওই বাড়িতে সুবিমলবাবু বলে কেউ থাকতেন কিনা?' শৌনক জিজ্ঞেস করল।

লোকটার নাকের ডগায় চশমাটা ঝুলে পড়েছিল। চশমা যথাস্থানে তুলে তিনি বললেন, 'সুবিমলবাবু? নাহ্! চিনতে পারছি না তো কাউকে ওই নামে...'

—সুবিমলবাবু... তার ছেলে সুশীতল... কিচ্ছু মনে পড়ছে না?

লোকটি মাথা নেড়ে 'না' বলে আবার তাসখেলায় মন দিল।

তাসাড়ু ভদ্রলোকের নির্দেশ অনুযায়ী বাড়িটা লোকেট করতে পারল শৌনক। মসজিদের গায়ে গায়ে একতলা একহারা বাড়ি। বেশ নির্জন। সামনের বারান্দা ধুলামলিন। বারান্দার দুপাশে দুটো সিমেন্টে বাঁধানো চেয়ার। আলকাতরা লেপা কাঠের বিশাল দরজা। কড়া নাড়ল শৌনক। চেঁচিয়ে বলল, 'বাড়িতে কেউ আছেন?'

কিছুক্ষণ পর একজন বৃদ্ধ মানুষ দরজা খুললেন। গায়ে একটা ফতুয়া আর লুঙ্গি।

'নমস্কার। আমার নাম শৌনক মিত্র। এ আমার মেয়ে পেখম। আর এটি ভাগ্নে—উদ্দালক। আমরা এসেছিলাম এই বাড়ি নিয়ে একটু খোঁজখবর করতে।'

—খোঁজখবর? কেন? এ বাড়ি তো ভাড়া দেওয়া হয় না।

—না, না, সেজন্য নয়। আসলে একটা রিসার্চের ব্যাপারে এসেছি। আমি মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক। এই বাড়ি নিয়ে একটা পেপার তৈরি করব।

—অ! তা ভেতরে আসা হোক। ভালো বুঝতে পারছি না, কী চাইছেন।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে প্রায়-অন্ধকার সামনের ঘরটা পেরিয়ে ভদ্রলোকের পেছন পেছন ভেতরের দিকের একটা উঠানে এসে দাঁড়াল ওরা তিনজন। তিনদিকে উঁচু পাঁচিল-তোলা বাড়ি। মাঝখানে সিমেন্ট-বাঁধানো উঠানের একপাশে একটা পেয়ারা গাছ। বড়ো বড়ো থামওলা বারান্দার এক ধারে একটা আর্ম চেয়ার। আর্ম চেয়ারের মাথার দিকে একটা বালিশ। একপাশে একটা জলচৌকির ওপর একটা কী মোটা বই। তার খোলা পাতার ওপর মোটা ফ্রেমের একটা বাইফোকাল চশমা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ভদ্রলোক মনে হয় বইটা পড়তে পড়তে শৌনকদের ডাক শুনে উঠে গেছলেন। বারান্দার এখানে ওখানে বহু জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে। বিবর্ণ হলুদ রঙের মধ্যে জলের দাগ, স্থানে স্থানে শ্যাওলা। ছাদের কোণের দিকে মাকড়সার জাল ঝুলছে। বেশ বয়েস হয়েছে বাড়িটার। ভদ্রলোকের মতোই।

ভদ্রলোক ঘরের ভেতর থেকে একটা মোড়া আর দুটো চেয়ার নিয়ে টানাটানি করছিলেন। ওরা তিনজন ভদ্রলোককে সাহায্য করল। মোড়া, চেয়ার পেতে তাঁর মুখোমুখি বসল ওরা। চোখে চশমা পরে নিয়ে বুড়ো মানুষটি উদ্‌বিগ্ন স্বরে বললেন, 'বলুন, কী ব্যাপার?'

শৌনক বলল, 'তেমন কিছুই না। এই বাড়িটা নিয়ে একটু জানবার ইচ্ছে। তা আপনার নামটা...?'

—আমার নাম সত্যসাধন প্রতিহার।

—আপনি কি এবাড়িতে একাই থাকেন, সত্যসাধনবাবু?

—না, আমার মেয়ে-জামাই-নাতনি ওরাও থাকে এখানে। দুদিন হল, ওয়ালটেয়ারে বেড়াতে গেছে। নাতনির তো এখন গ্রীষ্মের ছুটি... তাই। এই আপনার মেয়ের মতোই বয়েস নাতনির। আমি এই কদিন একাই আছি। বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। একটি মেয়ে এসে খুব সকাল সকাল রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়...

দালি জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এ বাড়িটাকে কাকাতুয়া বাড়ি বলে কেন? কাকাতুয়া আছে বুঝি?'

—এখন আর নেই। অনেক আগে ছিল। এত আগে যে, আমিও দেখিনি। শুনেছি, ওই সামনের ঘরটায় ঝুলত কাকাতুয়াটা দাঁড়ে। আমি দেখিনি। আমি তো তখন ছোটো ছিলাম। এ বাড়িতে আমরা যখন আসি, আমি তখন তোমার থেকেও ছোটো। আমার বাবা বাড়িটা কিনেছিলেন এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

পেখম সামনের দিকে ঝুঁকে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, সেই ভদ্রলোকের নাম কি সুবিমলবাবু? মনে পড়ে?'

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তো। তা তুমি কী করে জানলে, দিদি? ভদ্রলোক একটা স্থানীয় স্কুলে আঁকা শেখাতেন। বিপত্নীক। তিনি আর তার ছেলে—এই যা দুজন থাকতেন এ বাড়িতে।'

'সেই ছেলের নাম সুশীতল। তাই তো?' শৌনক জিজ্ঞেস করল।

—না। সুশীতল কেন হবে? ওর নাম ছিল রাজু।

'রাজু? সুশীতল নয়?' ওরা তিনজনই একসঙ্গে চমকে উঠেছে।

—না। সুশীতল আবার কে? রাজু।

—আপনি একটু মনে করে দেখুন তো। রাজু না সুশীতল?

বয়স্ক মানুষটি সামান্য বিরক্ত সুরে বললেন, 'সুশীতল আবার কে? আমি ওই ছেলের সাথে ডাংগুলি খেলেছি। আমরা আসার মাস দু-এক পরে ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। স্পষ্ট মনে আছে। রাজুই ওর নাম।'

শৌনককে দেখে মনে হল যেন অনেককিছু মিলছে না। মনের সেই অস্বস্তির চিহ্নটাকে চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ওঁরা এখান থেকে কোথায় যান, জানেন?'

—তা বলতে পারব না। অতশত আমি জানতামও না তখন। ছোটো ছিলাম তো! খেলাধুলোতেই মন ছিল বেশি। রাজুর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে একদিন সে কী ঝগড়া...

ভদ্রলোক আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন দেখে শৌনক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কত পুরোনো হবে বাড়িটা?'

'তা তো বলতে পারব না। তবে ব্রিটিশ আমলে তৈরি, এটা বলতে পারি। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'—এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গি করে বললেন, 'তবে একটা কথা আমি আপনাকে বলতে পারি, যা আপনার কাজে লাগলেও লাগতে পারে।'

শৌনক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

—বাবার মুখে শুনেছি, এ বাড়িটা উনিশশো আটাশ... তিরিশ...পঁয়তিরিশ নাগাদ বিপ্লবীদের গোপন শলাপরামর্শের জায়গা ছিল।

পেখম আর উদ্দালক উত্তেজনায় ঝুঁকে বসল সামনে। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'ওই যে কী যেন... বিভি... মানে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বলে যে গুপ্ত সংগঠন ছিল, তাদেরই গোপন বৈঠক বসত রাত্রে রাত্রে এই বাড়িতে। ওই চবুতরা পেরিয়ে ওদিকের ওই যে ঘুপচি ঘরগুলো দেখছেন, ওখানেই বসত মিটিং। যতীশ গুহ, দীনেশ গুপ্ত, হেমচন্দ্র ঘোষ আরও কারা কারা যেন সব আসতেন ওই ঘরে। একটা সুড়ঙ্গও নাকি ছিল ওইদিকে। তা সেসব কথা শোনা কথা। সত্যিমিথ্যে জানি না।'

রোমাঞ্চিত হয়ে শৌনক সহর্ষে বলে উঠল, 'বলছেন কী? এ বাড়ি তো তাহলে সংরক্ষণ করা উচিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবের সুতিকাগৃহ তো তাহলে এই বাড়ি!'

ভদ্রলোক হঠাৎ হা-হা হাসিতে ফেটে পড়লেন। কেন হাসছেন, ওরা বুঝতে না পেরে রীতিমতো অপ্রস্তুত। তারপর হাসি থামিয়ে ওদের তিনজনের ভেবড়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণের নির্বিকার ভাব সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'ভালো বললেন, মশাই! সশস্ত্র সংগ্রাম! সংরক্ষণ! হা হা হা!'

এই বলে তিনি আবার হাসতে লাগলেন। পেখম অপ্রতিভ স্বরে বলল, 'আপনি হাসছেন?'

'হাসব না? ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামায় এখন আর, দিদি? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কে কবে মাথা ঘামিয়েছে এসব নিয়ে? সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন তো এদেশের লিখিত ইতিহাসে ইচ্ছে করেই মোস্ট নেগলেকটেড চ্যাপটার। আর মেদিনীপুর তো আরও নেগলেকটেড। সেই বীর যোদ্ধাদের নিয়ে একটা কি দুটো লাইন কিংবা তাও নয়... ভারতের ইতিহাস! এমনিতেই ইতিহাস ব্যাপারটাই একটা বুজরুকি। মিথ্যের প্রাসাদ। ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে বানানো ফাঁপানো একটা ফাঁকা গল্প—এই হচ্ছে ইতিহাস। হে হে হে! তার ওপর আবার অকৃতজ্ঞ মোস্ট ধান্দাবাজ জাতি... কী লিখবে এরা তাঁদের সম্পর্কে? মুরোদ আছে? মুরোদ নেই। সবাই তাঁদের ভুলে গেছি আমরা! মিউচুয়াল কন্সপিরেসি!'

শেষ কথাটা বলার সময় বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে হতাশার স্পষ্ট সুর ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণ আর কোনো কথা নেই। একটু পরে দালি অনুচ্চ স্বরে শৌনককে বলল, 'কাকাতুয়ার ঘরটা দেখবে না, সবুজমামা?'

শৌনক কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ভদ্রলোককে বলল, 'আচ্ছা, কাকাতুয়া থাকত যে ঘরটায়, সেটা একবার দেখা যায়?'

'হ্যাঁ। দেখা যাবে না কেন? ওই তো সামনের আঁধার আঁধার ঘরটা, যেটা পেরিয়ে আপনারা বারান্দায় এলেন। চলুন!' ভদ্রলোক কোমর ধরে উঠে দাঁড়ালেন। বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।

তাঁকে অনুসরণ করে ওরা সামনের ঘরটায় এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন তিনি। একশো ওয়াটের একটা সাবেক আমলের বাল্‌ব। ওদের তিনজনের চোখ তখন ঘরের ছাদের দিকে। কড়িবরগার মাঝে একটা জায়গায় একটা লোহার আংটা। উদ্দালক বলল, 'এই দেখো, সবুজ মামা, আংটা! এটা থেকেই মনে হয় দাঁড়টা ঝুলত।' ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছ, দাদা। দাঁড়টুকুই আমি দেখেছি। পাখি তখন মরে গেছে। গোলাকার লোহার দাঁড়।'

দাঁড়ের পজিশনটা আন্দাজ করে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পেখম। তারপর উলটোদিকের দেওয়ালের দিকে চেয়ে সহর্ষে বলে উঠল, 'এই দেখ, বাবা! সত্যিই একটা আলমারি গাঁথা দেওয়ালে!'

দালি অমনি পেখমের দিকে চেয়ে চোখ নাচিয়ে ভেংচি কাটল। ভাবখানা এই, এখন হল তো! খুব যে বলেছিলি, আমার স্বপ্নের কোনো দাম নেই।

পেখম আচ্ছন্ন স্বরে বলল, 'আশ্চর্য তো! স্বপ্নের সঙ্গে মিলে গেল তাহলে এভাবে!'

শৌনক গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন এন্ড আর্থ, পেখম, দ্যান আর ড্রেমট অফ ইন ইয়োর ফিলজফি! সত্যিই অবাক কাণ্ড!'

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে ওদের কথা কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

'না, কিছু না।... আচ্ছা, এই আলমারিটা কি একবার খোলা যায়?'

'তালাবন্ধ হয়েই তো পড়ে আছে আজ এত বছর। তবে আলমারি ফাঁকা। অনেকদিন আগে একবার খোলা হয়েছিল, দেখেছিলাম। যাদের বাড়ি ছিল, সেই সুবিমলবাবুরা সব খালি করে নিয়ে গেছে। দেখবেন? আচ্ছা, দাঁড়ান, চাবিটা যদি পাই...'

বৃদ্ধ পা টেনে টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে ওদিকের ঘরগুলোয় গেলেন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন, হাতে একগাদা পুরোনো জং ধরা চাবির গোছা নিয়ে। বললেন, 'দেখুন তো, যদি এর মধ্যে কোনোটা এর তালায় লাগে!'

সেই চাবির জঙ্গল থেকে ট্রায়াল এন্ড এরর করে আসল চাবিটি বের করতে শৌনকের মিনিট পনেরো কেটে গেল। এর মধ্যে দালি উশখুশ করছে। পেখমের কানের রিং-টা টেনে ধরে চাপাস্বরে বলছে, 'বলে দেব? এই ভদ্রলোককে তোমার নাম ইমলিদিদি?'

—উঃ, দালি। কানে লাগে। দুষ্টু করিস না।

—তখন যে বলেছিলে, আমি স্বপ্নে ভুল দেখেছি?

—আচ্ছা, আচ্ছা। তুই ঠিক, আমি ভুল। কী বাহাদুর! কাজের মধ্যে দেখেছেন একটা স্বপ্ন।

—আর খাতাটা যে আমিই খুঁজে বের করলাম। তার বেলা?

—তার মানেটা তো আমিই বললাম। তুই তো মানেটা বুঝতেই পারিসনি। আহাম্মক কোথাকার!

—বলে দেব কিন্তু ইমলি... ইমলি... ইমলিদিদি!

—আরে চুপ কর, চুপ কর...। বাবার আর কতক্ষণ লাগবে বল তো? আর দেরি হলে ওদিকে মা রেগে ফায়ার হয়ে যাবে।

কিন্তু বেশি দেরি হল না আর। ঘটাস্ করে শব্দ তুলে আলমারির পাল্লাটা খুলে গেল। কিন্তু ভদ্রলোক যা বলেছিলেন। একেবারে ফাঁকা। চার-পাঁচটা শূন্য তাক। কিছুই নেই।

'নাহ্, এখানে কিছুই পাওয়া গেল না,' শৌনক বলে উঠল। তা সত্ত্বেও এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাকগুলোর দিকে। বুড়ো ভদ্রলোক এবার একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। অস্ফুটে একবার মুখ ফুটে বললেনও, 'চলুন...'

হঠাৎ মাঝের তাকের দেওয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে শৌনক বলল, 'এটা কী?'

পেখম এগিয়ে এসে আলমারির মধ্যে সেলফোনের আলো ফেলে দেখছে। বলল, 'একটা ছোটো চেম্বার মনে হচ্ছে।'

উদ্দালকও মাথা গলিয়েছে ওদের মধ্যে। বয়স্ক ভদ্রলোক বিরক্ত ভাব ছেড়ে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আরে কী আশ্চর্য! এই চেম্বারটার কথা তো আমি ভুলেই গেছিলাম। অনেক বছর আগে বাবা তখন বেঁচে; এই চেম্বারটা কীভাবে যেন খুলেছিলেন। তা ভেতরে অকাজের একতাড়া কাগজ ছাড়া কিছুই পাননি। যেখানকার জিনিস সেখানেই রেখে দিয়েছিলেন তিনি। তারপর আমি আর এসব খুলেটুলে দেখিনি। আলমারির ভেতরে দেওয়ালের গায়ে এমনভাবেই মিশে রয়েছে যে, সহজে চোখে পড়বে না। কিন্তু অ মশাই! এটাও যে কব্জা দিয়ে বন্ধ!'

শৌনক বলল, 'সেটাই।' সে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল এবার। অথচ, এই চেম্বারটা যে খুলতেই হবে, এটাও বুঝতে পারছে।

'দেখি, দেখি, সরো সরো' বলে দালি তাকের মধ্যে হাত ঢোকালো। কী যেন একটা শক্ত কব্জা হাতে লাগছে। সেই কব্জাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আচমকাই চেম্বারের জং-ধরা দরজাটা আলগা হয়ে খুলে গেল।

মোবাইলের টর্চটা জ্বেলে চেম্বারের ভেতর ফোকাস করল পেখম। মাকড়সার জাল আর কালো ঝুল-সমেত কী কতগুলো কাগজের বান্ডিল বের করে আনল শৌনক।

বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বললেন, 'কী এগুলো?'

বান্ডিলটা বুড়ো মানুষটির হাতে দিয়ে শৌনক বলল, 'দেখুন দেখি, কী ব্যাপার?'

একটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা একতাড়া কাগজ। দড়ির গিঁট খুলতে সময় লাগল ভদ্রলোকের। তারপর ওরা কাগজগুলো এক এক করে দেখতে লাগল। দলিল নয়, ডায়েরি নয়, কতগুলো খুব পুরোনো চিঠি। হলুদ হয়ে গেছে। পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড। চিঠিগুলোর গায়ে কবেকার ব্রিটিশ আমলের ডাকটিকিট।

ভদ্রলোক দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাহ্! দেখলেন তো? বলেছিলাম, এ তেমন কিছুই না? কতগুলো চিঠি। এখানে রেখেছেই বা কেন এমন যত্ন করে? কী জানি!'

শৌনক বলল, 'আচ্ছা, আমি কি চিঠিগুলো কয়েকদিনের জন্যে নিয়ে যেতে পারি? আমার গবেষণায় হয়তো কাজে লাগতে পারে।'

ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন। তারপর হাত উলটে স্তিমিত স্বরে বললেন, 'নিয়ে যান। পড়েই তো ছিল। খেয়ালই ছিল না আমার। কোনো কাজেই লাগত না। নিয়ে যাবেন, নিয়ে যান। যত্ন করে রাখবেন অবশ্য। আর...'

শৌনক ভদ্রলোকের কথা পূরণ করে দিল, '...কাজ হয়ে গেলে আপনাকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিয়ে যাব। আচ্ছা, চলি এখন। নমস্কার!'

৯

কাকাতুয়া বাড়িতে তিন মূর্তির অভিযানের পর দুই দিন দুই রাত্রি কেটে গেছে। সেদিন দুপুরে লিলিমামির হাতের রান্না খেয়ে পেখমদিদির সঙ্গে চাইনিজ চেকার খেলে বিকেলের দিকে মীরবাজারে মামার বাড়ি ফিরেছে দালি। এই আটচল্লিশটা ঘণ্টা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ছটফট ছটফট; পেখমদিদিকে ফোন করেছে বারবার। সবুজমামা নাকি দিনরাত স্টাডিতে বসে চিঠি ঘাঁটছে, বইপত্রের স্তূপের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে আছে, চান-খাওয়াটাওয়া ছাড়া নাকি সে আর টেবিল ছেড়ে উঠছেই না। এমনকি পেখমদিদিকেও চিঠিগুলো ধরতে দেয়নি। শেষে পেখমদিদির ওই চিঠির তাড়া নিয়ে যাবতীয় ইন্টারেস্ট চলে গেছে। এইসব মিনিট-টু-মিনিট রিপোর্ট সে দালিকে ফোনে দিয়ে যাচ্ছিল। দুদিন পর পেখম নিজেই মীরবাজারের বাড়িতে এসে হাজির। অনেকক্ষণ দিদার গলা জড়িয়ে আদর, আদিখ্যেতা করার পর সে দিদাকে নাকি সুরে বলল, 'মাম্মাম্! তুমি কিন্তু দালিকেই খালি ভালোবাসো। আমাকে একটুও না।'

দিদা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'কেন ইমলিদিদি? তুমি এমন কথা আমাকে বলতে পারলে?'

—বলব না? কই, তুমি দালিকে তোমার ছোটোবেলার গল্প বলতে পারো... আমাকে কোনোদিন বলেছ?

—বলিনি? কতবার তো বলেছি তোকে!

—কই, কাকাতুয়া বাড়ির কথা বলোনি তো?

—বলিনি বুঝি? এই দ্যাখো! বুড়ো হয়ে গেছি তো! সব কথা মনে থাকে না। শোন, আমরা যখন ছোটো ছিলাম, আমি আর আমার ওপরের দিদি প্রভাতী... দিদির তখন বয়েস কত হবে? আমারই এই ধর হবে বয়েস বছর আটেক তখন, তাহলে দিদি আর একটু বড়ো...

দিদার সেই একই গল্প পুনরায় পরিবেশিত হল। সেই কাকাতুয়া, সেই ছবি-আঁকা শেখা, সেই সুবিমলবাবু... সব একই।

গল্পের শেষদিকে এসে পেখম প্রশ্ন করল, 'আর সুবিমলবাবুর ছেলে?'

—সে তখন আমাদের থেকেও ছোটো...

—কী নাম তার?

—সুশীতল। সুবিমলবাবুর ছেলে সুশীতল।

—সুশীতল, না রাজু?

—ধুর, রাজু আবার কে?

—ভালো করে ভেবে দ্যাখো তো, সুশীতলকে তার মা কী নামে ডাকতেন?

—মা? মা আবার কোত্থেকে এল? ওর মা তো মারা যান ওর খুব কম বয়সেই। কেন বল তো?

—না, কিছু না। তোমার নাম কী?

—আমার নাম প্রিয়বালা।

—ডাকনাম?

—বুড়ি। হি হি হি!

—আর কোনো নাম নেই তোমার?

—আছে। শুনলে হাসবি তুই। ভুবনেশ্বরী। রাশ্যাশ্রিত নাম।

—কেন? হাসির কী আছে? 'ভুবনেশ্বরী' কত সুন্দর নাম! কিন্তু রাশ্যাশ্রিত নাম মানে কী গো?

—জন্মের সময় কোষ্ঠী তৈরি হয় না? তাতে একটা নাম থাকে। এই যেমন ধর, দালির রাশ্যাশ্রিত নাম গোপীনাথ!

—হ্যা, হ্যা, হ্যা! গোপীনাথ! হি হি হি!... আর আমার রাশ্যাশ্রিত নাম কী?

—তা তো জানি না, দিদি। তোর কোষ্ঠী বের করে দেখতে হবে। দাঁড়া তোর মা-কে বলব।

—বাদ দাও। বলছিলাম, মা কিন্তু আজ দালিকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছে।

—তা নি'গে যা না। ওই তো ঘরে মনখারাপ করে বসে আছে।

পেখমদিদির সঙ্গে দালি যখন মানিকপুরে ওদের বাড়িতে এসে পৌঁছোল, তখন বেলা দুপুর। শৌনককে দেখে মনে হল, দুদিন টানা লোডশেডিঙের পর তার মাথার ঘরে যেন হালকা কারেন্ট এসেছে। দুপুরের খাওয়াটাওয়া সেরে জমিয়ে বসল দুই ভাইবোনে শৌনকের টেবিলের দুপাশে। দালি দেখল, পড়ার টেবিলের ওপর চিঠিগুলো তিনটে গ্রুপে ভাগ করে রেখেছে সবুজমামা। পেখম বলল, 'বাবা, তোমার রিসার্চ-ফাইন্ডিংস কী বলছে?'

শৌনক বলল, 'তার আগে বল তো দেখি, এই তিনভাগে চিঠিগুলো সাজানোর অর্থ কী?'

—অনেক কিছু হতে পারে, বাবা। হয়তো তিনরকম বিষয়। কতগুলোতে হয়তো

মামুলি সাংসারিক কথাবার্তা আছে। তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি। এইসব। আর কতোগুলোতে আছে হয়তো অফিশিয়াল কথাবার্তা। আর অন্যগুলোতে হয়তো চারপাশের খবর, দেশের বা সমাজের। এরকম?

—হতেই পারত। তবে এরকম নয়। আচ্ছা, তোরা চিঠিগুলো হাতে নিয়েই দ্যাখ। তবে সাবধান! তিনটে গ্রুপ মিশিয়ে ফেলিস না যেন।

চিঠিগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল দালি আর পেখম। কিছুক্ষণ পর উজ্জ্বল মুখে পেখম বলল, 'বুঝেছি। তুমি এই তিনটে থাকে তিনটে সময়ের চিঠি রেখেছ।'

'ব্রিলিয়ান্ট! শুধু চিঠির তারিখ থেকেই নয়, চিঠির ওপরের স্ট্যাম্পগুলো থেকেও সেটা বোঝা যায়। এই চিঠিগুলো দ্যাখ। চিঠির গায়ে কিং এডোয়ার্ডের ছবি ডাকটিকিটের ওপর। এগুলো সব থেকে পুরোনো। হবে তা তখন বিশ শতকের প্রথম দিককার সময়। আবার এগুলো দ্যাখ। ডাকটিকিটে রাজার মাথাটা পালটে গেছে। এই রাজা হচ্ছেন পঞ্চম জর্জ। এই ফিফথ জর্জের ছবিওলা ডাকটিকিট উনিশশো এগারো থেকে উনিশশো একত্রিশের সময়কার। উনিশশো একত্রিশের পর প্রথম পিকটোরিয়াল স্ট্যাম্প চালু হয়। এই দ্যাখ, ডাকটিকিটে রাজাগজার ছবি আর নেই। দিল্লির পুরোনো কেল্লার ছবি। উনিশশো পঁয়ত্রিশে ছিল পঞ্চম জর্জের সিলভার জুবিলি। তারপর এই গ্রুপের চিঠিগুলোতে ডাকটিকিটে রাজার মাথা আবার পালটাল। এটা কিন্তু ফিফথ জর্জ নয়, এটা হচ্ছে সিক্সথ জর্জের এফিজি। এই স্ট্যাম্পগুলো উনিশশো সাঁইত্রিশের পর ছাড়া হয়েছিল,' শৌনক বুঝিয়ে বলল ওদের।

'বেশ। তাহলে তিন গ্রুপের ছবি তিনটে যুগের। একটা গ্রুপ উনিশশো এগারোর আগেকার। দ্বিতীয় গ্রুপের চিঠি উনিশশো এগারো থেকে উনিশশো একত্রিশের বা তার কিছু পরের। আর তৃতীয় গ্রুপের চিঠিগুলো উনিশশো পঁয়ত্রিশের পরেকার। হল। তো?' পেখম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শৌনকের মুখের দিকে তাকাল।

'এর মধ্যে দ্বিতীয় গ্রুপের চিঠিগুলোই সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট,' শৌনক বলল।

দালি প্রশ্ন করল, 'কেন?'

—কেননা, এই চিঠিগুলোতেই বারবার অরুণেশ গুপ্ত আর যোগেশ গুহর নাম ঘুরে ফিরে আসছে। দুজন দুজনকে প্রচুর চিঠিও লিখেছেন। চিঠিগুলোর ভাষাও বেশ সহজ নয়।

'কঠিন কঠিন শব্দ? খটোমটো?' উদ্দালক জিজ্ঞেস করল।

—না রে, কঠিন শব্দ নয়। কথাগুলো সোজাই। কিন্তু তাদের মানে তত সোজা নয়।

'কীরকম?' পেখম ছটফট করে উঠল।

—যেমন ধর, একটা চিঠিতে অরুণেশ লিখছেন, 'শ্বশুরবাড়িতে জামাইষষ্ঠীর আদর যা পাওয়া যাচ্ছে, সে নিদারুণ! পথেঘাটেও প্রচুর আদর। এত আদর পেলে যথাসময়ে

তা ফিরিয়েও তো দিতে হয়।'

উদ্দালক বলল, 'কোনো পারিবারিক মজার ব্যাপার?'

—সেটাই প্রথম মনে হবে। কিন্তু সেটা এটার অর্থ নয়। কেননা, আগের চিঠিগুলো থেকে পেয়েছি, অরুণেশ একজন অবিবাহিত যুবক। শ্বশুরবাড়ি আসবে কোত্থেকে?

—তাহলে?

—তাহলে এই কথাগুলোর সাধারণ অর্থ ধরলে চলবে না। শ্বশুরবাড়ি মানে এখানে শ্বশুরবাড়ি নয়। অন্য কিছু। জামাই-আদর মানেও জামাইকে আদর করা নয়। অন্য কিছু। ফিরিয়ে দেওয়াটাও তাহলে সহজ কথা নয়।

পেখম বলল, 'তার মানে সাঁটে লিখেছে। তাই না?'

—একদমই। এটা বুঝতে পারবি, সেসময়কার পরিস্থিতি জানতে পারলে।

'কী হয়েছিল?' উদ্দালক উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করল।

'সময়টা উনিশশো সাতাশ থেকে উনিশশো তিরিশ। সাতাশ সালে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশন ফর্ম করে। উদ্দেশ্য হল ভারতীয়দের আরও ডমিনেট করার জন্য সংবিধান প্রণয়ন। কেবল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারাই তৈরি হয়েছিল এই কমিশন, তাতে ভারতীয়দের নেওয়া হয়নি। আটাশ সালে সাইমন সাহেব এলেন কলকাতায়, প্রচণ্ড অ্যাজিটেশনের মুখে পড়লেন তিনি। গো ব্যাক, সাইমন! গো ব্যাক! লাহোরে পুলিশের লাঠিতে মারাত্মকভাবে জখম হয়ে লালা লাজপত রায় মারা গেলেন। তার প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিং ও তাঁর সহবিপ্লবীরা পুলিশ অফিসার স্যান্ডার্সকে হত্যা করে ফেরারি হলেন।'

এই পর্যন্ত বলে শৌনক একটু থামল। টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা আলগোছে তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে জল খেয়ে শুরু করল আবার, 'উনত্রিশে ভারতীয়রা দাবি তুলল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের। একমাত্র সুভাষচন্দ্র ও তাঁর দ্বারা সাময়িকভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে নেহরু দাবি তুলেছিলেন: ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নয়, ভারত চায় টোটাল ফ্রিডম—পূর্ণ স্বাধীনতা। এই একই দাবি তুলেছিলেন কিন্তু তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও। তারপর ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।'

'কী ঘটনা?' পেখমের অধীর চোখে যেন আর পলক পড়ছে না।

শৌনক বলল, 'উনিশশো তিরিশের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ গান্ধি সবরমতি আশ্রম থেকে ডান্ডির সমুদ্রতীর অবধি অগণিত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে গেলেন। বিনা-ট্যাক্সে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করে ব্রিটিশ আইন ভেঙে দিলেন তিনি। সারা দেশ জুড়ে লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। আর তার ফলেই আরম্ভ হয়ে গেল আইন-অমান্য আন্দোলন।'

দালি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে জিজ্ঞেস করে, 'তারপর?'

—দেশ জুড়ে হরতাল, বিক্ষোভ, পিকেটিং। দিকে দিকে তখন আইন-অমান্য আন্দোলনের ঢেউ। দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে নোনা মাটি থেকে লবণ তৈরি করে ব্রিটিশ-আইনের প্রকাশ্য সংঘবদ্ধ বিরোধিতা করা চলছে। এদিকে এই আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করার জন্য ব্রিটিশ শক্তিও মরিয়া হয়ে উঠেছে। বহু লোকের সম্পত্তি ছিনিয়ে নিচ্ছে ব্রিটিশ। পুলিশের লাঠিচার্জ ও বুলেটের মোকাবিলা করছে হাজার হাজার মানুষ। সারা ভারতে কারারুদ্ধ হয়েছেন মোট নব্বই হাজার লোক, তার মধ্যে কেবল বাংলা প্রদেশ থেকেই রাজবন্দীর সংখ্যাটা ছিল প্রায় পনেরো হাজার। এমন সময় সমস্ত ভারত যেন চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল উনিশশো তিরিশের এপ্রিল মাসে।

—মানে?

—এবার কেন্দ্র চট্টলা। বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন। জাতীয় পতাকা তুলে চট্টগ্রাম নিজেকে ঘোষণা করল স্বাধীন ভূখণ্ডরূপে। ইন্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মির দ্বারা ঘোষিত হল অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। অল্প সময়ের জন্য হলেও এ জিনিস যে হতে পারে, না গান্ধি, না নেহরু কংগ্রেসের কোনো শীর্ষস্থানীয় নেতাই সেদিন সেটা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি।

পেখম বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, তারপরই তো সেই বিখ্যাত জালালাবাদ যুদ্ধ, যেখানে মাস্টারদার অনুগামী বারোজন বিপ্লবী জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে শহীদ হন। তাই না?'

শৌনক উত্তর দেয়, "ঠিক। এই বিপ্লব-আন্দোলনের প্রভাব ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়। আরও বিক্ষোভ, আরও আন্দোলন, ব্রিটিশের সীমাহীন অত্যাচার, ধরপাকড় এবং অগণ্য মানুষের আরও আরও কারাবরণ, নয়তো সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া। গোটা দেশটারই তখন যেন একটা আগুনে সত্তা ফুটে উঠেছে। এই মেদিনীপুর জেলাও তখন ফুঁসছে প্রচণ্ড রাগে। কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল, দাসপুর, নরঘাট, রাউতুড়ি, কেশোপাট সব জায়গায় থরথর করে কাঁপছে মেদিনীপুরের এভার রেবেল স্পিরিট। এই সময়টার কথা মনে রাখলে এই চিঠিটাতে ইঙ্গিতের ভাষায় ঠিক কী বলা হচ্ছে, বুঝতে পারবি। অরুণেশ চিঠিতে লিখছেন, 'শ্বশুরবাড়িতে জামাইষষ্ঠীর আদর যা পাওয়া যাচ্ছে, সে নিদারুণ! পথেঘাটেও প্রচুর আদর। এত আদর পেলে যথাসময়ে তা ফিরিয়েও তো দিতে হয়!'"

পেখম একটু ভেবে বলল, 'তাহলে শ্বশুরবাড়ি মানে হচ্ছে জেলখানা। তাই না?'

—এগজ্যাক্টলি। আর জামাইষষ্ঠীর আদর?

দালি বলল, 'জেলে রাজবন্দীদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন?'

—আ! দেয়ার ইউ আর, দালি! তারপর পথেঘাটে আদর?

—পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি চালনা, অত্যাচার। হুম। আচ্ছা, ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও তো লিখছেন।

—ঠিক। তার মানে বিপ্লবীরা প্ল্যান আঁটছেন আরও বড়ো প্রত্যাঘাতের।

পেখম মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'আচ্ছা, বাবা। তুমি চিঠিটার এরকম পোলিটিকাল ইন্টারপ্রিটেশনই বা করছ কেন? কী করে এত শিওর হচ্ছ? হতেই পারে তো যে, এটা একটা নিরীহ রসিকতা। পারে না?'

শৌনক একটু হাসল। তারপর বলল, 'আমিও একথা ভেবেছিলাম। কিন্তু মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল আরেকটা চিঠি দেখে। আমি নিশ্চিত হলাম, যা ভাবছি তাই। চিঠিটা আমি পরে দেখাচ্ছি। তার আগে বল তো, এই অরুণেশ গুপ্ত আর যোগেশ গুহ সম্পর্কে তোদের কী ধারণা?'

দালি অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরা আসলে কারা বলো তো?'

শৌনক বলল, 'ধীরে, ভাগ্নে, ধীরে। একটু ভাবো। একটু তলিয়ে চিন্তা করো। আচ্ছা, বেশ। কাকাতুয়া-বাড়ির সত্যসাধন প্রতিহার মশাই বাড়িটা সম্পর্কে যা যা তথ্য দিয়েছেন, তার মধ্যে সব থেকে চমকদার তথ্য কোনটা তোদের মনে হয়, বল দেখি!'

পেখম বলল, 'ওই যে অন্ধকার ঘুপচি মতো ঘরগুলো দেখিয়ে বললেন, ওগুলোই ছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের বিপ্লবীদের গোপন শলাপরামর্শের জায়গা। ওই সময়কার বাঘা বাঘা বিপ্লবীরা মাঝরাতে আসতেন ওখানে। ওদিকে নাকি একটা সুড়ঙ্গও ছিল।'

শৌনক হাসতে হাসতে বলল, 'আর কাকাতুয়া পাখিটা কী বলত?'

দালি অমনি তড়বড় করে বলে উঠল, 'বাইরে থেকে কোনো লোক সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলেই পাখিটা চেঁচিয়ে বলে উঠত, ও অরুণেশ কে এসেছে? ও যোগেশ কে এসেছে?'

'কাকাতুয়াকে যা শেখানো হয়, সে তাই বলে। শেখানো বুলি ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না,' শৌনক গম্ভীর স্বরে যোগ করল।

'তাহলে এই কথাগুলোই বা পাখিটাকে শেখানো হয়েছিল কেন?' পেখম আত্মমগ্ন স্বরে কথাটা জিজ্ঞাসা করে। সে খুব ভাবছে ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই উজ্জ্বল চোখে বলে ওঠে, 'ওহো! তার মানে কাকাতুয়াকে অপরিচিত লোক দেখে ও কথা বলতে শেখানো হয়েছিল যাতে করে পাখির ওকথা শুনে বিপ্লবীরা সাবধান হয়ে যেতে পারেন...'

'এবং সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে যেতে পারেন... তাই না?' শৌনকের চশমার কাচে বুদ্ধির ঝিলিক।

—তাহলে অরুণেশ বা যোগেশ নিশ্চয়ই ডাকসাইটে বিপ্লবী। কিন্তু ওই নামে তো

কোনো বিপ্লবীর কথা বিভি-র ইতিহাসে পাচ্ছি না। অরুণেশ গুপ্ত... যোগেশ গুহ... কে জানে!

—ও পেখম, পেখম! আরেকটু ভাব, সোনা। একটা কাকাতুয়া পাখি জোরে জোরে সারাদিন দুজন ভয়ংকর বিপ্লবীর আসল নাম চেঁচিয়ে প্রকাশ্যে বলবে, তার কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে, সেটা একবার ভাববি তো।

—তাও তো বটে! তাহলে?

—তাহলে ও দুটো ছদ্মনাম। দুজন বিপ্লবী নেতার ছদ্মনাম। এবং ওই দুই নামের আড়ালে দুজন ইতিহাসপ্রখ্যাত ডাকসাইটে বিপ্লবী আত্মগোপন করে আছেন।

—কারা তাঁরা?

—সেটা বোঝার জন্যেই ওই আরেকটা চিঠির প্রয়োজন। চিঠিটা পুরোটা আমি এখনও বুঝতে পারিনি। তবে অনেকটাই...

বলতে বলতে শৌনক চিঠির তাড়া থেকে হলদে হয়ে যাওয়া একটা এনভেলপ বের করে উদ্দালকের হাতে দিল। চিঠির খামের গায়ে রাজা পঞ্চম জর্জের মাথাওলা ডাকটিকিট। খামের ওপর ঠিকানা লেখা সুবিমল শাসমল।

পেখম বলল, 'বাবা! এনভেলপের গায়ে তো যোগেশ গুহর নাম নেই?'

—না থাকারই তো কথা, ওটা যদি ছদ্মনাম হয়। ওই নামে পিয়োন কাকে খুঁজে পাবে? মিলে যাচ্ছে।

—আচ্ছা সবুজমামা! একটা কাকাতুয়া কতদিন বাঁচে?

—জানি, কেন এটা জিজ্ঞেস করছিস। কাতাতুয়ার গড় আয়ুষ্কাল কুড়ি থেকে তিরিশ বছর। কখনও-সখনও যত্নআত্তি পেলে এদের বত্রিশ-তেত্রিশ বছর অবধিও বেঁচে থাকতে দেখা গেছে। ধরে নিচ্ছি, কাকাতুয়া-বাড়ির কাকাতুয়াটা তিরিশ বছর বেঁচেছিল। আর তোর দিদা অর্থাৎ আমাদের কাকিমা এ বছর জানুয়ারিতে সেভেনটিতে পা রেখেছেন। এটা দুহাজার পনেরো সাল। তাহলে কাকিমার জন্ম উনিশশো পঁয়তাল্লিশে হবে। কাকিমা তাঁর প্রভাতীদিদির সঙ্গে যখন ওবাড়িতে আঁকা শিখতে যেতেন তখন কাকিমার বয়স হবে কত? এই বছর আটেক। কাকিমার আট বছর মানে তখন উনিশশো তিপ্পান্ন সাল। ওখানে যখন যেতেন, তখন কাকাতুয়াটা নিশ্চয়ই বুড়ো হয়েছে। উনিশশো তিরিশটা হচ্ছে বিপ্লব-আন্দোলনের জ্বলন্ত বছর। কাকাতুয়ার বয়েস তখন ধরা যাক, পাঁচ। তাহলে কাকিমা যখন আঁকা শিখতে ওবাড়িতে যেতেন, তখন উনিশশো তিপ্পান্ন সাল নাগাদ কাকাতুয়ার বয়স হবে আঠাশ। অর্থাৎ, বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত সেই কাকাতুয়ার দেখা পাওয়া কাকিমার পক্ষে মোটেই কিছু অসম্ভব নয়। কী দালি, গোঁজামিল দিইনি তো? হিসেব মিলল?

উদ্দালক মহা খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, 'জলের মতো। কিন্তু সুবিমলবাবু?'

—কাকিমা ও বাড়িতে যখন যেতেন, সুবিমলবাবুর হবে তখন পঞ্চাশের ওপরে বয়স। ছবিটা দেখেও তাই-ই মনে হয়। উনিশশো তিপান্ন নাগাদ সুবিমল পঞ্চাশের মতো হলে উনিশশো তিরিশে তিনি সাতাশ-আটাশ বছর বয়সি এক যুবক। চিঠি তাঁর নামেই আসত।

পেখম গুনগুন করে বলে উঠল, 'সবই তো হল। কিন্তু সুশীতল আর রাজুর দ্বন্দ্বটা...?'

শৌনক সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'সেটা সত্যিই...! আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন। আপাতত সেকথা মুলতুবি রেখে এনভেলপ খুলে চিঠিটা দ্যাখ দেখি। বুঝতে পারবি, কেন আমি কেবলই পোলিটিকালি চিঠিগুলো ইন্টারপ্রেট করছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখি—' বলে তাড়াতাড়ি পেখম খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করতে গেল। শৌনক বলে উঠল, 'আস্তে, আস্তে। একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে কাগজটা। সাবধানে ধরিস। ঝুরঝুর করে ভেঙে যাবে যে!'

অতি সন্তর্পণে চিঠিটা বের করে মেলে ধরল পেখম। বিবর্ণ কাগজের ওপর ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা একটা চিঠি। কী সুছাঁদ হস্তাক্ষর! কী লেখা আছে পড়বার জন্য দালি আর পেখম ঝুঁকে বসতেই শৌনক বলল, 'তার আগে চিঠির উলটো পিঠটা দ্যাখ, পেখম। পরে আসল চিঠিটা পড়িস।'

চিঠির কাগজটা ওলটালো পেখম। সেখানে পরপর উপরে নীচে কালো কালিতে তিনটে তারিখ লেখা।

৭/৪/১৯৩১
৩০/৪/১৯৩২
২/৯/১৯৩৩

তার নীচে গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা : 'তোমাকে ভুলিনি, ভাই। গেভ প্রপার আনসার। তোমার প্রেরিত উপহার মল্লিকবাড়ির মায়ের পায়ের তলায় সঁপে দিলাম'।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে উদ্দালক বলল, 'এগুলোর মানে কী গো, সবুজমামা?'

শৌনক গম্ভীরভাবে বলল, 'প্রথমেই এই ডেটগুলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লক্ষ কর, চিঠির এপিঠের আর ওপিঠের হাতের লেখা এক নয়। তার মানে, চিঠিটা যিনি লিখেছেন আর চিঠির উলটোপিঠে যাঁর হাতের লেখা রয়েছে, তাঁরা দুজন একই ব্যক্তি নন। কারেক্ট?'

'কারেক্ট!'

"তার ওপর ওই যে কথাগুলো—'তোমাকে ভুলিনি, ভাই' ইত্যাদি—পড়ে মনে হচ্ছে না ওই 'ভাই'টি যেন কোথাও চলে গেছে কিংবা ইহজগতে তখন আর নেই? মনে হচ্ছে না কি যে, চিঠির উলটো পিঠে বেশ কিছু বছর পরে অন্য কেউ কথাগুলো লিখেছেন?"

পেখম বলল, 'হ্যাঁ, তাই।'

শৌনক বলে চলে, 'এখন এই তারিখগুলোতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা জানবার জন্যে আমাকে একটু ইতিহাস ঘাঁটতে হল। এই তিনটে তারিখ আসলে মেদিনীপুর জেলার তিন কুখ্যাত ব্রিটিশ ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডি, রবার্ট ডগলাস আর বার্নার্ড বার্জের হত্যার তারিখ। জেমস পেডিকে ৭/৪/১৯৩১ তারিখে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের এগজিবিশনের মধ্যে গুলি করে মারেন বিমল দাশগুপ্ত ও যতীজীবন ঘোষ। ডগলাসকে উচিত শিক্ষা দেন প্রদ্যোত ভট্টাচার্য এবং প্রভাংশু পাল ৩০/৪/১৯৩২ তারিখে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের এক মিটিঙে। তাঁদের রিভলভারের গুলি ডগলাসকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। আর বার্জ নিহত হন ১৯৩৩-র দোসরা সেপ্টেম্বর পুলিশগ্রাউন্ডের এক ফুটবল ম্যাচে মৃগেন দত্ত আর অনাথবন্ধু পাঁজার হাতে। এই ডেটগুলোর অর্থ খুঁজে পাওয়া মাত্রই এ চিঠির সঙ্গে বিভি-র বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এবার বুঝলি তো, কেন আমি এতক্ষণ চিঠিগুলো পোলিটিকালি ইন্টারপ্রেট করছিলাম? এখন তুই কাগজের এই পিঠে মূল চিঠিটা দ্যাখ।'

চিঠিটাকে এবার সোজা করে ধরল পেখম। সুন্দর পাকানো পাকানো অলংকৃত হস্তাক্ষর। পড়তে এত বছর পরেও কোনো অসুবিধে হয় না।

চিঠির ওপরে প্রাপকের নাম নেই। চিঠির নীচেও নেই প্রেরকের নাম বা স্বাক্ষর। তার পরিবর্তে চিঠির ওপরে ও নীচে দুই জায়গাতেই একসার করে সংখ্যা সাজানো।

চিঠির ওপরে ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা : [৪।৭-১৫।৪-১৩।৬]

আর চিঠির নীচে ওই একই ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা :

[১০।৩৮-১৮।৬১-৫।১৪]

সেই সংখ্যাগুলোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল পেখম আর দালি।

শৌনক বলল, 'সংখ্যার ধাঁধা এখনও আমি ভাঙতে পারিনি। তবে যদ্দুর অনুমান করতে পারি, ওই দুই সারি সংখ্যা চিঠির প্রাপক ও প্রেরকের নাম ইঙ্গিত করছে। সংখ্যার ধাঁধাটা ভাঙলে নাম দুটো বেরিয়ে আসবে। মজার ব্যাপার, এই চিঠিরই একেবারে নীচের মার্জিন ঘেঁষে আরও একসারি সংখ্যা কালো কালিতে লেখা [১৬।৪-১৫।৪-১৫।৪-৯।১৮-৫।২৫-১৫।২০-১৫।৪-১১।৩৫, ১০।৯-১৫।১৭-২।৪^]'

পেখম বলল, "নীচের কালো কালিতে লেখা সংখ্যাগুলো আর চিঠির মেইন বডিতে ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা সংখ্যাগুলোও কিন্তু একই লোকের লেখা নয়। হাতের লেখা আলাদা। ৬, ৯ এসবের টানগুলো আলাদা রকমের। আমার মনে হয়, এ চিঠির পেছনে যিনি লিখেছেন 'তোমাকে ভুলিনি, ভাই...'ইত্যাদি, তিনিই মূল চিঠির নীচে সংকেতে

কিছু লিখে রেখে গেছেন।”

শৌনক চশমার ডাঁটি দুটো দুহাতে চেপে ধরে বলল, ‘আমি তোর সঙ্গে একমত। সংখ্যার ধাঁধা তো আমরা এখনও বের করতে পারিনি। মূল চিঠিটাই একবার জোরে জোরে পড়ো দেখি, দালি।’

দালি পড়তে লাগল। প্রথমেই একটা গান :

‘আমের পাতায় ঝামুর-ঝুমুর, কেরাণীতলায় বিয়া।
যাইবেন তিন সোন্দর জামাই, টুপি মাথায় দিয়া।।’

তারপর লেখা :

“দাদা,

দণ্ডবৎ প্রণাম নেবেন। বিয়ে পাকা। বরযাত্রী কেউ যাচ্ছে না। তিন বরেই আসর জমাব। ‘আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে’... ইত্যাদি। তবে একজন যা পেটুক, খাওয়ারদাওয়ার যা ছিল একাই সব সাঁটাচ্ছে। বিয়ের ছাদনাতলায় যাবার আগে আমার একটা চরকি আপনাকে উপহার দিয়ে গেলাম। এটা বেশ লাকি; প্রতিবারই খেলা জমেছে। আমাকে এবার জাঁতি, সুপুরি দেওয়া হয়েছে, চরকিটা তাই আপনাকেই দিয়ে গেলাম। কনের যেসব আত্মীয়রা মাটিপুরে এরপর যাবেন, তাঁদের বিশেষ আপ্যায়ন পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী যাতে হয়, দেখবেন। এমন ব্যবস্থা করবেন, যাতে কনেপক্ষের লোকদের সত্বর রবিনন্দনবাবুর বাড়িতে প্রেরণ করা যায়। দাদা, নো মিসটেক ইন দিস ম্যাটার। আই ট্রাস্ট ইউ!

যাদের হাতে চরকিটা দেবেন, তারা যেন কাজ শেষ হলে আপনাকে এটা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ব্যাপার হচ্ছে, পণের ডাউরি আর জুয়েলারি আমার টি.পি-র লোকের হাতে যা পাঠাচ্ছি, যেন ঠিকমতো গচ্ছিত রাখা হয় ও সময়মতো সদ্ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের ক্ষেত্র এখন না পেলে টি.পি-র লোকেরাই জমা রাখবে। তবে এই টি.পি-র লোকগুলি একটু মোটা মাথা। চোখে চোখে রাখবেন। আপনাকে অধিক কী আর বলব? পূজ্যপাদ সকলকে আমার প্রণাম দেবেন। ছোটোদের জন্য ভালোবাসা। বিয়েবাড়িতে মোচ্ছব যেন ভাল হয়, আশীর্বাদ করবেন। সঙ্গে হজমির পুরিয়া আছে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ফুলশয্যা, কিংবা বউভাত সেরে মধুচন্দ্রিমা অবধি যাওয়ার ইচ্ছে নেই। তারই আগে ‘পরানের সাথে খেলিব আজিকে...’

ইতি

১২/০৯/১৯৩০—”

দালি এতক্ষণ পড়ছিল, তাই টের পায়নি। পেখমও নিবিষ্ট মনে পড়াটা শুনছিল,

তাই খেয়াল করেনি। উদ্দালকের পড়া শেষ হলে দুজনেই চোখ তুলে অবাক হয়ে দেখল, চশমার আড়ালে শৌনকের চোখদুটো পাথরের মতো কঠিন হয়ে আছে। তার মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর। পেখম শৌনককে নাড়া দিয়ে বলল, 'কী হল,বাবা?' সে কখনও তার বাবাকে এত সিরিয়াস হয়ে যেতে দেখেনি।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচদুটো পরিষ্কার করে নিল শৌনক। তারপর দ্রাবিত স্বরে বলল, 'প্রাপক আর প্রেরকের নাম দুটো বের করার আগে সব কথা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তবে আমি যা আঁচ করেছি, তা ভুল হবে না বলেই মনে করি। এই বিয়ে, বরযাত্রী, তিন বর, ছাদনাতলা, চরকি, জাঁতি, সুপুরি, মাটিপুর, রবিনন্দনবাবু, কনেপক্ষের আত্মীয়রা, ডাউরি, জুয়েলারি, এমনকি শ্বশুরবাড়ি-ফুলশয্যা-বউভাত-মধুচন্দ্রিমা সবই রূপক। এর মধ্য দিয়ে কী ভয়ংকর পরিকল্পনা ব্যক্ত করা হয়েছে, ভাবলেই শিহরিত হচ্ছি। সব থেকে করুণ ওই হজমির পুরিয়াটা। কী অপরিসীম বীরত্ব, কী মৃত্যুঞ্জয় সাহস!'

পেখম বলল, 'কী বলছ, বাবা? কিছুই বুঝতে পারছি না! কী বুঝেছ, বলো না!'

'বলব। তার আগে সংখ্যার সংকেতটা ভেদ করি। তোরাও খুব চেষ্টা কর। হয়তো তোরাই আমার আগে ধাঁধাটা ভাঙতে পারবি।'

আর কোনো কথা নেই। তিনজনই হঠাৎ চুপ করে গেছে। ঘরের মধ্যে এখন প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্য। শুধু দেয়ালঘড়ির টকটক আওয়াজ নীরবতার পাথর কাটছে। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে শহরের বাতাস। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা পাখির ডাকও। সে যেন আজকের পাখি নয়, শতাব্দীপ্রাচীন কোনো বিহঙ্গম সুদূর অতীত থেকে কথা বলতে চাইছে আজকের মানুষের সঙ্গে? কিন্তু অতীতের সেই ভাষা হারিয়ে গেছে, এখন তা অবোধ্য। অরুণেশ গুপ্তের সাংকেতিক চিঠির মতোই অতীত ইতিহাসের সেই ভাষা বুঝে নিতে হলে আজকের মানুষকে শুধু বুদ্ধিমান হলেই চলবে না, একই সঙ্গে তাকে হতে হবে সংবেদনশীলও। এই মহানাটকের সাম্প্রতিক প্রান্তে বসে থাকা তিনটি চরিত্র—শৌনক, পেখম আর দালি যেন নীরবতার ভেতর অবগাহন করে সেই দুর্বোধ্য ভাষাটি পড়তে চাইছে।

হঠাৎ সেই নীরবতা ভেঙে লিলি ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল। তার কানে সেলফোন। সে একটা কলের মধ্যে আছে। শৌনককে বলল, 'হ্যাঁ গো, শোনো না! মীরবাজার থেকে কাকিমা ফোন করেছেন। গৌড়ীয় মঠে যাবেন... ওই যে গো বড়োবাজারের ভেতরের গলি দিয়ে। আমাকেও যেতে বলছেন। দালি, পেখম, যাবি আমার সঙ্গে? তুমি যাবে? হ্যাঁ গো?'

মুহূর্তে বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে শৌনক শান্ত স্বরে বলল, 'নাহ্, আমি যাব না। ওদের নিয়ে যাও। যাবে কীভাবে?'

—মল্লিকচক অবধি হেঁটেই যাব বা যদি রিকশা পাই। কাকিমা প্রতুলের গাড়িতে করে আসবেন। গৌড়ীয় মঠ হয়ে জজকোর্ট যাবেন। আমাদের মল্লিকচকে তুলে নেবেন। যাই ঘুরে আসি একটু।

ফোনে বলল লিলি, 'হ্যাঁ, কাকিমা। আসছি এক্ষুনি।' পেখমকে বলল, 'যা, যা, রেডি হয়ে নে।' আর তারপরেই হাসি হাসি মুখে দালির গাল টিপে দিয়ে বলল, 'কাল যে জলপাইয়ের আচারটা দিলাম, খেয়েছিলি? কেমন হয়েছে?'

সেই রহস্যময় চিঠি—

আমের পাতায় ঝামুর-ঝুমুর, কেরাণীতলায় বিয়া।
যাইবেন তিন সোন্দর জামাই, টুপি মাথায় দিয়া।।

[৪।৭-১৫।৪-১৩।৬]

দাদা,

দণ্ডবৎ প্রণাম নেবেন। বিয়ে পাকা। বরযাত্রী কেউ যাচ্ছে না। তিন বরেই আসর জমাবো। 'আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে'... ইত্যাদি। তবে একজন যা পেটুক, খাওয়ারদাওয়ার যা ছিল একাই সব সাঁটাচ্ছে। বিয়ের ছাদনাতলায় যাবার আগে আমার একটা চরকি আপনাকে উপহার দিয়ে গেলাম। এটা বেশ লাকি; প্রতিবারই খেলা জমেছে। আমাকে এবার জাঁতি, সুপুরি দেওয়া হয়েছে, চরকিটা তাই আপনাকেই দিয়ে গেলাম। কনের যেসব আত্মীয়রা মাটিপুরে এরপর যাবেন, তাঁদের বিশেষ আপ্যায়ন পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী যাতে হয়, দেখবেন। এমন ব্যবস্থা করবেন, যাতে কনেপক্ষের লোকদের সত্বর রবিনন্দনবাবুর বাড়িতে প্রেরণ করা যায়। দাদা, নো মিসটেক ইন দিস ম্যাটার। আই ট্রাস্ট ইউ!

যাদের হাতে চরকিটা দেবেন, তারা যেন কাজ শেষ হলে আপনাকে এটা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ব্যাপার হচ্ছে, পণের ডাউরি আর জুয়েলারি আমার টি.পি-র লোকের হাতে যা পাঠাচ্ছি, যেন ঠিকমতো গচ্ছিত রাখা হয় ও সময়মতো সদ্ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের ক্ষেত্র এখন না পেলে টি.পি-র লোকেরাই জমা রাখবে। তবে এই টি.পি-র লোকগুলি একটু মোটা মাথা। চোখে চোখে রাখবেন। আপনাকে অধিক কী আর বলব? পূজ্যপাদ সকলকে আমার প্রণাম দেবেন। ছোটোদের জন্য ভালোবাসা। বিয়েবাড়িতে মোচ্ছব যেন ভালো হয়, আশীর্বাদ করবেন। সঙ্গে হজমির পুরিয়া আছে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ফুলশয্যা, কিংবা বউভাত সেরে মধুচন্দ্রিমা অবধি যাওয়ার ইচ্ছে নেই। তারই আগে 'পরানের সাথে খেলিব আজিকে...'

ইতি

১২/০৯/১৯৩০

[১০।৩৮-১৮।৬১-৫।১৪]

নীচে কালো কালিতে অন্য কারও হস্তাক্ষরে লেখা

[১৬।৪-১৫।৪-১৫।৪-৯।১৮-৫।২৫-১৫।২০-১৫।৪-১১।৩৫, ১০।৯-১৫।১৭-২।৪^]

১০

রিকশা পেল না; অগত্যা লিলি, পেখম আর দালি তাড়াতাড়ি হেঁটে মল্লিকচকে এসে পৌঁছোল—দেখল, ভোঁদার গাড়িতে প্রিয়বালা ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন। সামনের সিটে লিলি, পেছনের সিটে দিদার পাশে পেখম আর দালি টপাটপ উঠে পড়ল। রাস্তায় ভিড় আছে, ধীরে ধীরে ড্রাইভ করছে ভোঁদা। দুই ভাইবোন অন্যদিন হলে হুটোপুটি করত, কিন্তু আজ দুজনেই চুপচাপ। যাচ্ছে দিদার সঙ্গে মঠে, কিন্তু ওদের মন পড়ে আছে শৌনকের টেবিলে—সেই হলুদ বিবর্ণ হয়ে আসা চিঠিগুলো, কালো-ম্যাজেন্টা কালির অক্ষরমালা আর আগুন-ঝরানো সেইসব অতীত দিনের ইতিহাসের চারপাশে মন কী যেন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দিদা বলল, 'আজ দেখি শুম্ভ-নিশুম্ভ চুপচাপ? অন্যদিন তো মুখে খই ফোটে!'

লিলি বলল, 'দাঁড়াও, এখন কী প্ল্যান আঁটছে কে জানে! সারা দুপুর তো ওদের দুষ্টুমির সর্দারের সঙ্গে বকবক করছিল, এখন বোধহয় মনে মনে সেসবই জাবর কাটা চলছে।'

দিদা আর লিলি কথা বলছিল। তার মধ্যেই দালি আপন মনে বলে উঠল, 'এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কীভাবে যে আগের দিনের মানুষ কথা বলত!'

পেখম বলল, 'অন্য সময় কি আর বলত? এসব যে চিঠি! চিঠিতে লিখতে হত তখন এমনই।'

—কিন্তু এমন সাঁটে লিখলে অন্যরা বুঝত কী করে?

—যাকে লিখেছে, সে ঠিকই বুঝতে পারত, দালি। তোর-আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। এসব কথা সাঁটে লেখা ছাড়া তখন উপায় ছিল কি আর?

—কেন বলো তো, পেখমদিদি? এত কায়দা করে লিখতে হত কেন?

পেখম চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'সে সময়টা জানিস, কেমন? এদের প্রত্যেকটা চিঠি খুলে পড়ত পুলিশ। আপত্তিকর কিছু থাকলে সেন্সর করত। সে অনেক ব্যাপার। যখন-তখন রেইড হত, বাড়ি ঘিরে ফেলে খানাতল্লাশি... ঝামেলাজনক বইপত্র থাকলে সঙ্গে, তক্ষুনি অ্যারেস্ট।'

—বইপত্র? কী বইপত্র?

—কিছু কিছু বইপত্র তো তখন সন্দেহের তালিকায়।

—যেমন?

—যেমন ধর, কোনো যুবক বা যুবতীর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', শরৎবাবুর 'পথের দাবী', আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' পাওয়া গেলে সন্দেহ গিয়ে পড়ত তার ওপর। 'পথের দাবী' তো ব্যান হয়েই গেছিল। এমনকি কোনো যুবকের কাছে একখানা 'গীতা' পাওয়া গেলেও মুশকিল ছিল।

—কেন? গীতা কী দোষ করল? গীতা তো ধর্মগ্রন্থ! তাহলে...?

কখন যে লিলিমামি আর দিদা চুপ হয়ে গিয়ে ওদের কথা শুনছে, টের পায়নি দালি। লিলিমামি বলে উঠল, 'ধর্মগ্রন্থ হিসেবে তখন তো দেখত না পুলিশ গীতা-কে!'

—কেন? কী এমন আছে গীতাতে যে, একজনের কাছে গীতা থাকলে সন্দেহ করা হবে?

'আছে রে, আছে!' লিলি হাসতে হাসতে বলল। গাড়ি 'দেশের দোকান'-এর পাশ দিয়ে তখন গলির মধ্যে ঢুকছে।

মায়ের কথাটা বুঝিয়ে বলল পেখম। বলল, 'গীতাতে আছে না অর্জুন যুদ্ধ করতে এসে ভয় পেয়ে গেছিলেন অপোনেন্টের সৈন্যসমাবেশ দেখে? মনে হয়েছিল, এরা সব আমার রিলেটিভ, এদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব কীভাবে? পালাতে চেয়েছিলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন...'

দিদা পেখমের কথা সম্পূর্ণ করলেন, 'কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন! তুমি তো, ভাই, বীরপুরুষ। হয় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদের হারিয়ে তোমার রাজ্য উদ্ধার করো। নয়তো যুদ্ধে বীরের মতো প্রাণ দাও। মোটের ওপর কাপুরুষের মতো কাজ কোরো না, ভাই। পালিয়ে যেও না। বীরের মতো যুদ্ধ করো। দরকার হলে প্রাণ দাও।'

উদ্দালক এবার বুঝতে পারল। বলল, "তার মানে 'গীতা' তখন বিপ্লবীদের ইন্সপিরেশন ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার গাইড-বুক। বুঝলাম! ওই জন্যেই পুলিশ সন্দেহ করত...। আচ্ছা, ইমলিদিদি, তুমি এতো সব জানো কী করে?'

'আবার...?' ভাইয়ের পেটে চিমটি কেটে ওকে থামালো পেখম। তারপর মুচকি হেসে জানালা দিয়ে চেয়ে রইল।

ছিপছিপে চেহারার বুদ্ধিমতী মেয়েটি পেখম। এখন কলেজে পড়ছে। ইতিহাস নিয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই ওকে কোনোকিছুতেই বারণ করেনি শৌনক। নানা দিকে ইন্টারেস্ট। মার্গ সংগীত শেখে আবার মার্শাল আর্টও শিখছে আজকাল। শৌনকের পাঠপ্রবণতা, নিজে নিজে চিন্তা করার ক্ষমতা এগুলো পেয়েছে ও

সহজেই। আর লিলির কাছ থেকে সরল অন্তরঙ্গ মিশুকে ভাব। ওর বয়সের মেয়েদের তুলনায় পেখমের ভাবনার গভীরতাও অনেক বেশি। এখন চিঠির দুর্বোধ্য সংকেত ভেদ করার চিন্তায় ভেতরে ভেতরে বুঁদ হয়ে আছে।

গাড়িটা গৌড়ীয় মঠের বিশাল সিং-দরজার বাঁ-পাশে পার্ক করল ভোঁদা। লিলিকে বলল, 'তোমরা ঘুরে এসো, লিলি! আমি এখানেই ওয়েট করছি।'

গৌড়ীয় মঠের বিশাল সিং-দরজা পেরিয়ে প্রশস্ত চত্বর। চত্বরটি পাথরের স্ল্যাব দিয়ে আগাগোড়া বাঁধানো। মাঝখানে তুলসীমঞ্চ। এখানেই সন্ধেবেলা আরতির পর খোল-করতাল সহযোগে নাম-সংকীর্তন হয়। চারিপাশে উঁচু উঁচু দেবদেউল। চত্বর থেকে মার্বেল পাথরে মোড়া ভারী ভারী সিঁড়ির ধাপ ওপরে চকমিলানো বারান্দায় উঠে গেছে। সেই সমুচ্চ বারান্দায় রাধাকৃষ্ণ মন্দির। সেই বারান্দাটাই মঠটির চারদিকে ছড়ানো রয়েছে। কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ ভক্ত নানাদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মঠ দর্শন করছেন। কয়েকজন ন্যাড়ামাথা গেরুয়াপরা বৈরাগী বাবাজিরও দেখা পাওয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দিদা আর লিলিমামি ঠাকুরপ্রণাম করল। পেখম আর দালি নীচে চত্বরে দাঁড়িয়ে হাত জড়ো করে প্রণাম জানাল। মন্দিরের গর্ভগৃহে সন্ধ্যারতির প্রস্তুতি চলছে; আর-একটু পরেই আরতি আরম্ভ হবে। দালি পেখমের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মঠ দেখছিল। বিকেলের হালকা আলো এসে পড়েছে মঠের প্রাচীরের ওপর।

দেয়ালে নানারকম অলংকরণ। কোথাও কোথাও রিলিফের কাজ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা উপাখ্যান চিত্রিত। কোথাও কালীয়দমন তো কোথাও আবার ধেনুকাসুরবধ। উদ্দালক দিদার কাছে এসব গল্প শুনেছে অনেকবার, তাই ছবি দেখে তার ভারি মজা লাগছিল।

এক জায়গায় রিলিফের কাজ একেবারে দেওয়াল-জোড়া। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপ্রাঙ্গণে রথের ওপর মাথায় হাত রেখে অর্জুন বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন। আর রথের ঘোড়াগুলোর লাগাম হাতে ধরে কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছেন। কৃষ্ণের গায়ে এত জোর যে, তাঁর বাহুর পেশিগুলো ফুলে উঠেছে। লাগামের টানে ঘোড়াগুলোর সামনের পা শূন্যে উঠে গেছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে। এদিকে কৃষ্ণের মুখ যেন বাচ্চা ছেলের মতো কোমল আর শান্ত। মাথায় ময়ূরের পাখাটি একপাশে বাঁকাভাবে হেলানো।

ওই ছবিরই পাশে দেওয়ালের ওপর থেকে নীচের দিকে গীতার কতগুলো বাছা বাছা শ্লোক বাংলা অক্ষরে লেখা। উদ্দালক বলল, 'পেখমদিদি! দ্যাখো, দ্যাখো, ওই যে তুমি বলছিলে, কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা বলছে...'

পেখম কোনো উত্তর দিল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে দালির কথা শুনল। তারপর ছবির কাছ থেকে সরে এসে বারান্দা দিয়ে লঘু পায়ে হাঁটতে লাগল। বারান্দার

একধারে মোটা থামের পাশে একটা ছোটো ডেস্কের ওপরে পুঁথি খুলে এক বাবাজি গীতা পড়ছেন। তাঁর চারপাশে মেঝেতে কার্পেটের ওপর কয়েকজন বয়স্ক মানুষ পাঠ শুনছিলেন। একটু দূরে ভাইয়ের হাত ধরে পেখম খানিক গীতাপাঠ শুনল। কিছুক্ষণ গীতাপাঠ করবার পর সুর করে কথক বললেন, 'ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।'

পেখম দালির হাতে চাপ দিয়ে বলল, 'মোট ক-টা চ্যাপটার আছে রে গীতাতে?'

দালি বলল, 'জানি না। মহাভারতে মোট আঠারোটা চ্যাপটার আছে জানি।'

পেখম অস্ফুটস্বরে বলল, 'গীতাতেও তো মোট আঠারোটা চ্যাপটার! ও হো! বুঝতে পারলি?'

তারপরেই হইহই করে গর্ভমন্দিরের বারান্দায় ফিরে এসে বলল, 'মা, তোমার মোবাইলটা দাও তো। আমারটা ফেলে এসেছি। বাবাকে একটা আর্জেন্ট ফোন করতে হবে।'

'কী হল আবার?' বলে খানিক বিরক্ত মুখে লিলি ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে পেখমের হাতে দিল।

পেখম তাড়াতাড়ি শৌনককে ডায়াল করল। কীসের যেন চাপা উত্তেজনায় সে ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। শৌনকের আওয়াজ পাওয়া মাত্র হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাবা! সংখ্যার সংকেতটা মনে হয় সল্‌ভ করতে পেরে গেছি। আমি আর দালি এক্ষুনি ফিরে আসছি তোমার কাছে।'

ফোনটা কেটে পেখম লিলিকে বলল এখনই তারা বাড়ি ফিরবে। খুব আর্জেন্ট দরকার। লিলি অবাক আর দিদা একেবারে হতভম্ব। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে দিদা বললেন, 'কী বলছিস রে পাগলের মতো! ভাবলাম, মঠ থেকে বেরিয়ে জজকোর্ট যাব তোদের রাঙাদিদার বাড়ি। কত করে বলে রেখেছে তোদের নিয়ে যাওয়ার কথা!'

'তোমরা যাও। আমরা পরে যাব একদিন। আজ আমাদের এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে।'

লিলি বলল, 'পাগলির কাণ্ড দ্যাখো! যা ধরবে, তাই-ই করবে। বেশ, যা তাহলে ভাইকে নিয়ে। প্রতুলকে বল তোদের ড্রপ করে ফিরে আসতে। আমাকে আর কাকিমাকে জজকোর্ট যেতেই হবে আজ।'

বিস্ফারিত চোখে অবাক দালি দিদির পিছু পিছু গাড়িতে এসে বসল। পুরো রাস্তা পেখমের মুখে একটিও কথা নেই। সে যেন উত্তেজনায় ফুটছে একেবারে।

বাড়িতে নেমে প্রতুলমামাকে টা-টা করেই ওরা দুজন সোজা শৌনকের স্টাডিতে ঢুকে গেল। দালি দেখল, সবুজমামাও যেন উদ্‌বেগে অস্থির হয়ে আছে। পেখম

বলল, 'চিঠিটা দাও, চিঠিটা দাও।'

চিঠির ওপরে আর নীচের সংখ্যাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়েই পেখম বলল, 'বাবা, প্রত্যেক জোড়া সংখ্যার মাঝখানে একটা করে দাঁড়ি আছে, দেখেছ? ৪।৭-১৫।৪-১৩।৬?'

শৌনক ঝুঁকে পড়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা তো আছেই।'

'দাঁড়ির আগে প্রথম সংখ্যাটা কখনই ১৮ পেরোচ্ছে না তো?'

শৌনক পরীক্ষা করে দেখল।

[৪।৭-১৫।৪-১৩।৬],

তারপর [১০।৩৮-১৮।৬১-৫।১৪],

তারপর চিঠির নীচে কালো কালিতে লেখা—

[১৬।৪-১৫।৪-১৫।৪-৯।১৮-৫।২৫-১৫।২০-১৫।৪-১১।৩৫, ১০।৯-১৫।১৭-২।৪^]

'সত্যিই, ঠিকই তো। প্রথম সংখ্যাটা সব সময় ১৮-র নীচে। তো, তাতে কী হল?' শৌনক সপ্রশ্ন চোখে পেখমের দিকে তাকাল।

পেখম তড়বড় করে বলে উঠল, 'প্রথম সংখ্যাটা যদি গীতার চ্যাপটার ইন্ডিকেট করে আর পরের সংখ্যাটা যদি শ্লোকের সংখ্যা বোঝায়... মানে ৪।৭ মানে যদি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক হয় তাহলে...'

শৌনক লাফিয়ে উঠে বলল, 'মারাত্মক ব্যাপার! দাঁড়া, দাঁড়া। পাশের ঘর থেকে গীতাটা নিয়ে আসি।'

ঝট করে গীতা নিয়ে এসে পাতা উলটে শৌনক বের করল। চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম শ্লোক।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত... বিখ্যাত শ্লোক,' শৌনক বলল।

—হুঁ, এবার ১৫।৪?

'অর্থাৎ পনেরো অধ্যায়ের চার নম্বর শ্লোক...' পাতা উলটিয়ে শৌনক বলল, 'হ্যাঁ, এই যে পেয়েছি। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং...'

—তারপর ১৩।৬?

'তেরো অধ্যায়ের ছয় নম্বর শ্লোক... হুঁ, পেলাম...' শৌনক পড়ল, 'ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতি...'

'ব্যস, ব্যস!' পেখম ছটফট করে উঠল, 'এই তিনটে শ্লোকের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে দ্যাখো তো?'

'দাঁড়া, দাঁড়া। য, ত, ই।'

উদ্দালক বলল, 'য-ত-ই। মানে যতি।'

—তাহলে এইভাবে [১০।৩৮-১৮।৬১-৫।১৪] এটাতে প্রথমে দশম অধ্যায়ের আটত্রিশ নম্বর শ্লোক হচ্ছে, দণ্ডো দময়তামস্মি... তারপর আঠারো অধ্যায়ের একষট্টি নম্বর শ্লোক হল, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে... তারপর পঞ্চম অধ্যায়ের চোদ্দো নম্বর শ্লোক হচ্ছে, ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি... ইত্যাদি। তাহলে এই তিনটে শ্লোকের প্রথম অক্ষর তিনটে একসঙ্গে নিলে দাঁড়াচ্ছে—

শৌনক কথা শেষ করার আগেই পেখম বলল, 'দ, ঈ, ন'

উদ্দালক যোগ করল, 'দ-ঈ-ন। মানে দীন।'

শৌনকের মুখটা আনন্দে ঝলমল করে উঠল যেন, 'প্রাপকের নাম যতি। প্রেরকের নাম দীন। দীন চিঠি লিখছে যতিকে। হা হা হা।'

পেখম অবাক হয়ে বলে উঠল, 'বা-ব্বা!'

—দীন লিখছে যতিকে। দীন লিখছে যতিকে। যা ভেবেছিলাম, তাই। ব্র্যাভো, পেখম। কুডোস টু ইউ! ... বুঝতে পারলি না? দুজনের নামের শেষেই যে ঈশ। তাই আলাদা করে উল্লেখ করা নেই। দীন-ঈশ। দীনেশ। যতি-ঈশ। যতীশ। দুর্দান্ত! ব্রিলিয়ান্ট!

—দীনেশ মানে কি বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত?

—অবভিয়াসলি। বিভি-র সেই প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী, রাইটার্স-কাণ্ডের অন্যতম নায়ক সেই ক্রান্তিকারী দীনেশ গুপ্ত; যাঁর ছদ্মনাম গুপ্তসমিতিতে অরুণেশ।

—কিন্তু যতি? মানে যতীশ?

—যতীশের কথা তুই বোধহয় জানিস না, মা। যতীশ গুহ। তিনি ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেদিনীপুর শাখার অন্যতম সংগঠক বর্ষীয়ান নেতা। সেজন্যেই দীনেশ তাঁকে চিঠিতে 'দাদা' সম্বোধন করে লিখেছেন। যতীশ গুহর কথা তোদের পরে বিস্তারিতভাবে বলব। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায়, পরে পুলিশ তাঁকে দিল্লির রেড ফোর্টে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে অমানুষিক অত্যাচার করেও তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারেনি পুলিশ। সেই ইনহিউম্যান টরচারেই মৃত্যু হয় যতীশ গুহর। গুপ্তসমিতিতে যতীশ গুহর ছদ্মনাম ছিল তাহলে যোগেশ। সেই জন্যেই এই চিঠির তাড়ার মধ্যে এমন প্রচুর চিঠি আছে, কখনও অরুণেশ লিখছেন যোগেশকে, আবার কখনও যোগেশ লিখছেন অরুণেশকে।

দালি চোখ গোল গোল করে বলল, 'ওই জন্যেই কাকাতুয়াটা কেউ এলে বলত, ও অরুণেশ কে এসেছে, ও যোগেশ, কে এসেছে?'

শৌনক বলল, 'হ্যাঁ, কেউ ট্রেসপাস করছে দেখলেই সাবধান করে দিত ওই বলে।' এই কথা উচ্চারণ করার পরেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শৌনক। তারপর উদাস চোখে অনেক দূরের কোনো দেশের দিকে যেন তাকিয়ে বলে উঠল সে,

'একবার ভাব তো! তারও কতদিন পরে... তখন দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেছে বহুদিন হল... যতীশ গুহকে প্রচণ্ড অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছে লাল কেল্লায়... তারও পর কত কত বছর কেটে গেছে... কাকাতুয়াটা তখনও বেঁচে আছে... কাকিমা আর তাঁর দিদি, তাঁরা তখন আট-দশ বছরের ছোটো মেয়ে... ও বাড়িতে গান শিখতে গেছেন... বৃদ্ধ, জীর্ণ পাখিটা বিষণ্ণ মধ্যাহ্নের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া দুটো মানুষের নাম ধরে টেনে টেনে ডেকে চলেছে ও অরুণেশ, কে এসেছে? ও যোগেশ, কে এসেছে?...'

ঘরের মধ্যে থমথম করছে অখণ্ড নীরবতা। সেই নৈঃশব্দ্য ভেঙে কিছু পরে পেখম ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু বাবা, একটা কথা। অন্য চিঠিতে যদি অরুণেশ আর যোগেশের নাম থাকে, তাহলে এ চিঠিটায় এমন সংকেতের সাহায্য নেওয়া কেন? ছদ্মনামেই তো লিখতে পারতেন?'

ভাবনার সুদূরতম প্রদেশ থেকে ফিরে এসে সজাগ হয়ে শৌনক বলল, '...তার কারণ, এটাতে একটা মারাত্মক সিক্রেট প্ল্যান আছে। ছদ্মনামও যথেষ্ট নয় এর গোপনীয়তা রক্ষার পক্ষে। অন্য কেউ অরুণেশের নাম ভাঁড়িয়ে লিখেছেন কিনা, তা নিয়েও যতীশের মনে সন্দেহ আসতে পারত। সেই সন্দেহ যাতে না আসে, সেটাই এনসিওর করার জন্য বিপ্লবী দলের গোপন কোড ল্যাঙ্গুয়েজে নিজের নাম লিখেছিলেন দীনেশ। গীতা ছিল ওঁদের গাইড-বুক। সেখান থেকেই গড়ে উঠেছিল এই কোডিং সিস্টেম। এই আমার মনে হয়...'

দালি বলল, 'বেশ। এখন চিঠির একেবারে নীচে কালো কালিতে লেখা কথাগুলো চলো ডি-কোড করি। এই যে চিঠির নীচে লেখা—

[১৬।৪-১৫।৪-১৫।৪-৯।১৮-৫।২৫-১৫।২০-১৫।৪-১১।৩৫, ১০।৯-১৫।১৭-২।৪^]—এটার মানে কী?'

'ঠিক। এবার পেখম, তুই একটা একটা করে জোড়া সংখ্যা বলবি। আর আমি শ্লোকটা বের করে তার প্রথম অক্ষরটা বলব। দালিবাবু, তুমি একটা কাগজে অক্ষরগুলো পরপর লেখো দেখি,' শৌনক বলল।

তাড়াতাড়ি কাগজ-পেন্সিল টেনে নিয়ে বসল উদ্দালক।

পেখম বলল, '১৬।৪?'

বই ঘেঁটে শৌনক শ্লোকটা বের করে পড়ল, "দম্ভো দর্পোভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। প্রথম অক্ষর—'দ'।"

—এবার বলো, ১৫।৪?

—ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং। আদ্যক্ষর 'ত'।

—আবার ১৫।৪

—তাহলে আবারও 'ত'।

—৯।১৮?

—গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী। প্রথম অক্ষর 'গ'।

—এবার ৫।২৫ দ্যাখো।

—লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্। তাহলে প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'ল'।

—১৫।২০ বের করো এবার।

—এটা হচ্ছে... দাঁড়া... হ্যাঁ, হয়েছে... ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্। অতএব, আদ্যক্ষর 'ই'।

—আবার এসেছে, বাবা, ১৫।৪

—তাহলে আবার 'ত'।

—১১।৩৫?

—এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য। তাহলে প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'এ'।

—এর পর কিন্তু একটা কমা রয়েছে।

—মানে এখানে একটা শব্দ শেষ হল। সেটাই কমা দিয়ে ইন্ডিকেট করা হয়েছে। দালি, তাহলে বলো, কী কী অক্ষর পেয়েছ?

উদ্দালক কাগজটা চোখের কাছে তুলে পড়তে লাগল, 'দ, ত, ত, গ, ল, ই, ত, এ'

পেখম বলল, 'দ-ত-ত-গ-ল-ই-ত-এ। দত্তগলিতে?'

শৌনক বলল, 'হ্যাঁ। দত্তগলিতে। কাকাতুয়া-বাড়ির কাছেই দত্তগলি। ওই জায়গাটার কথা লেখা হয়েছে। পরের শব্দটা ডি-কোড করি চল।'

উদ্দালক বলল, 'এটা ছোটই। ১০।৯-১৫।১৭-২।৪^'

পেখম বলল, 'প্রথমে তো ১০।৯'

শৌনক বই হাতড়ে বের করল, "হুঁ। পেলাম। মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা—অর্থাৎ কিনা 'ম'।"

—১৫।১৭ কী দাঁড়াচ্ছে?

—উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ। প্রথম অক্ষর 'উ'।

—আর একেবারে শেষে ২।৪

—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন। আদ্যক্ষর দাঁড়াচ্ছে—'ক'।

উদ্দালক বলল, 'ম, উ,ক। ম-উ-ক। মানে মুক?'

—লক্ষ কর, ২।৪-এর পর একটা আপওয়ার্ড অ্যারো আছে কিন্তু। মানে ওখানে স্ট্রেস দিতে বলছে বোধহয়। ক নয়, তাহলে 'খ'। কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে দুটো শব্দ মিলে দ্যাখ।

দুই ভাইবোনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'দত্তগলিতে মুখ। তাই তো?'

'তাই। দত্তগলিতে মুখ! কিন্তু কার মুখ? দত্তগলিতে কার মুখ? নাকি, ওখানে বানান ভুল হয়েছে? মুক নয়, মুক? মানে বোবা? দত্তগলিতে বোবা লোক ছিল কোনো, যে সব ব্যাপারটা জানত?' চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে শৌনক বিড় বিড় করতে লাগল।

শৌনকের ভাবনার মধ্যেই উদ্দালক বলে উঠল হঠাৎ, 'আচ্ছা, এই চিঠির উলটো পিঠে আর চিঠির নীচে কালো কালিতে লেখা—এই দুটো যতীশ গুহ পরে লিখে রেখেছিলেন বললে না তুমি, সবুজমামা?'

'হ্যাঁ, বেশ। তো?' শৌনক চিন্তা করতে করতে কথা বলছিল।

—এখন দুটো লেখা যদি একসঙ্গে করে পড়ি?

'বেশ। পড়ো তো দেখি, কী দাঁড়ায়,' শৌনক সজাগ হয়ে বলল।

উদ্দালক দুই পিঠের লেখা পরপর পড়তে লাগল, "প্রথমে তিনটে ডেট। তিন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট নিধনের। ৭/৪/১৯৩১, ৩০/৪/১৯৩২, ২/৯/১৯৩৩। তারপর লেখা—'তোমাকে ভুলিনি, ভাই। গেভ প্রপার আনসার। তোমার প্রেরিত উপহার মল্লিকবাড়ির মায়ের পায়ের তলায় সঁপে দিলাম'। আর চিঠির নীচে সাংকেতিক ভাষায় কালো কালিতে লেখা—'দত্তগলিতে মুক'। তারপর আপ ওয়ার্ড অ্যারো।"

শৌনক শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? এর থেকে তুমি কী বুঝলে, দালি?'

দালি বলল, 'চারটে ব্যাপার আমি বুঝতে পারলাম।'

পেখম দালিকে খ্যাপানোর জন্য বলল, 'বাব্বা! একেবারে চার-চারটে পয়েন্ট! শুনি, শুনি।'

পেখমকে হাত তুলে নিরস্ত করে শৌনক বলল, 'বলো, দালি।'

দিদির কথায় একটুও না ঘাবড়ে দালি বলল, 'প্রথমত, এই কালো কালিতে লেখাগুলো যতীশ গুহর। এর আগেই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেছে। পেডি, ডগলাস, বার্জ—তিন সাহেবকে হত্যা করে বিপ্লবীরা তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। সেজন্যেই লিখেছেন, তোমাকে ভুলিনি, ভাই। গেভ প্রপার আনসার।'

—গুড! নেক্সট?

—সেকেন্ড, দীনেশ গুপ্ত অ্যাকশনে যাওয়ার আগে যতীশ গুহকে কোনো উপহার পাঠিয়েছিলেন।

—কী উপহার?

—সেটা বুঝিনি। কিন্তু সেই উপহার মল্লিকবাড়ির মা—মনে হচ্ছে কোনো দেবীপ্রতিমা, তাঁর পায়ের নীচে রাখা আছে।

—ভেরি গুড! নেক্সট?

—থার্ড পয়েন্ট, দত্তগলিতে কিছু একটা ব্যাপার আছে, যেটার সঙ্গে মল্লিকবাড়ির যোগাযোগ আছে।

পেখম সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল। শৌনকও উদ্দালকের কথায় ইম্প্রেশড হল, কিন্তু সে অধ্যাপক মানুষ। মুগ্ধতার অনুভূতি কীভাবে ছাত্রের কাছ থেকে আড়াল করে মুখাবয়বকে নিষ্প্রাণ পাথুরে করে রাখতে হয়, সে জানে। বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এই যে 'কোনো একটা উপহার, কোনো দেবীপ্রতিমা, কিছু একটা ব্যাপার'—এগুলো ক্লিয়ার হওয়া দরকার। তা না হলে প্রচুর অ্যামবিগুইটি থেকে যাচ্ছে।"

পেখম বলল, 'আচ্ছা, দীনেশ গুপ্তর মূল চিঠিটা থেকে কিছু কি বোঝা যাচ্ছে কী উপহার দীনেশ পাঠিয়েছিলেন?'

—দেখি তবে আরেকবার চিঠিটা অ্যানালাইজ করে। চিঠির শুরুতেই একটা গান। তাই না?

—হ্যাঁ। আমের পাতায় ঝামুর-ঝুমুর, কেরাণীতলায় বিয়া। যাইবেন তিন সোন্দর জামাই, টুপি মাথায় দিয়া।

—দ্যাখ, এই গানটা আসলে ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রচলিত একটা লোকগান। গানটির নানারকম ভার্শান আছে। পাঠান্তর আছে। যেমন ধর, ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'কোমল-গান্ধার' সিনেমায় গানটি ব্যবহার করেছেন। সেখানে গানটি হচ্ছে এরকম—'আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া, আইসেন গো সোন্দরীর জামাই মুকুট মাথায় দিয়া।' ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ঢাকার জিন্দাবাজারে। দীনেশ জন্মেছেন তখনকার ঢাকা জেলার যশোলঙে। উভয়েই গানটা শুনেছেন শৈশব থেকে। এখানে দীনেশ গানটার কিছু কিছু শব্দ ইচ্ছে করেই পালটে দিয়েছেন তাহলে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে।

'প্রথমেই দ্যাখো, এখানে কলাতলায় বিয়া নয়। কেরাণীতলায় বিয়া!' পেখম নীচুস্বরে বলল।

—হুঁ। তার মানে সাধারণ কোনো বিয়া নয়। একেবারে মৃত্যুর সঙ্গে বিবাহ কিনা! সেইজন্যেই পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে দুবার উদ্ধৃতি দিয়ে সেই কথাটাই ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন—'আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা'। রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন'। দীনেশ গুপ্ত রবীন্দ্রকবিতার ভক্ত ছিলেন, এটা আমরা তাঁর প্রকাশিত চিঠিপত্র থেকে জানি। এখন দ্যাখ, দুবারই ইচ্ছে করেই 'মরণখেলা' শব্দটা অমিট করে গেছেন। তিনি জানতেন, যতীশ গুহ এটা বুঝে নেবেন।

—কিন্তু কেরাণীতলা? মেদিনীপুরে কেরাণীচটি বলে একটা জায়গা আছে কিন্তু।

—উঁহুহ। ওটাই তো মনে হচ্ছে স্পয়লার। যাতে অন্যরা বিভ্রান্ত হয়। কেরাণী

কথাটার ইংরেজি কী বল তো? ক্লার্ক তো হয়ই, বুককিপার হয়, স্ক্রাইব হতে পারে... না, হচ্ছে না। একমাত্র যদি, একমাত্র যদি...

—একমাত্র যদি কী?

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেলে যেমন মানুষের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে যায়, ঠিক তেমনই শৌনকের মুখটা হঠাৎ-ই একেবারে ঝলমল করে উঠল। বলল, "মনে পড়েছে, মনে পড়েছে! ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের ব্যবসাবাণিজ্য আডমিনিস্ট্রেশনের জন্য যেসব জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ করেছিল, তাদের বলত 'রাইটার্স'। আর তাদের কাজের জায়গার জন্য যে বাড়িটা বানায়, সেটারই তো নাম দিয়ে ছিল 'রাইটার্স বিল্ডিং'!"

চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে কী একটা মোটা বই টেনে বার করল পেখম। দালি দেখল হার্ড বাউন্ড বইটার কভারে লেখা—'হেরিটেজ বিল্ডিংস অব ক্যালকাটা'। মিনিট দশেক এ-পাতা ও-পাতা উলটে একজায়গায় থামল সে। নিবিষ্ট মনোযোগে পড়তে পড়তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। ১৭৭৭। টমাস লিয়ন ডিজাইন করেছিলেন। হ্যাঁ, ওই কারণেই এমন নাম। কোম্পানি তার কেরাণীদের রাইটার্সই বলত বটে!'

উদ্দালক বলল, "কেরাণীতলা মানে তাহলে দাঁড়াচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিং। এর পর 'তিন সোন্দর জামাই' আর 'টুপি মাথায় দিয়া' ব্যাপারটা... ?"

পেখম বলল, "সোজাই। তিন সুন্দর জামাই হচ্ছেন বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত স্বয়ং। সুদর্শন স্মার্ট যুবক তাঁরা তিনজন—কোনো সন্দেহ নেই। বিয়ে করতে যাচ্ছেন তাঁরা মৃত্যুকেই। তাই তো 'পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা'। 'টুপি মাথায় দিয়া' অর্থাৎ ইউরোপীয় বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে তাঁরা যাবেন রাইটার্সে।"

শৌনক বলল, 'হ্যাঁ, ইউরোপিয়ান পোশাকে গটগট করে তাঁরা হেঁটে ঢুকে গেছিলেন সেদিন দুপুরবেলার ভরা রাইটার্স বিল্ডিঙে। কেউ সন্দেহও করতে পারেনি। ভেবেছিল, হবে হয়তো তিন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার। পরিচয়পত্র চাইবার সাহসও হয়নি কারও। লিখছেন, বরযাত্রী কেউ যাবে না। মানে তাঁদের সঙ্গে অন্য কেউ যাবে না তাঁদের দলের। তিনজনেই এই অসমসাহসী পরিকল্পনায় জান বাজি রেখে রাইটার্সে ঢুকবেন,' একটু থেমে শৌনক যোগ করল, 'যদিও রসময় শূর এবং নিকুঞ্জ সেন তাঁদের গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়েছিলেন খিদিরপুর পাইপ রোডের মোড় অবধি। তবু রাইটার্সে তো তাঁরা শুধু তিনজনই ঢুকেছিলেন।'

"আচ্ছা, এর পর যে লিখছেন, 'একজন যা পেটুক খাওয়ারদাওয়ার যা ছিল একাই সব সাঁটাচ্ছে'। এর মানে কী?" পেখম প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ, পেটুক বলতে এখানে বাদল গুপ্ত। খাইয়ে হিসেবে খুব গর্ব ছিল ওঁর। অ্যাকশনের আগে মেটিয়াবুরুজের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিনয়। বাদল আর দীনেশ ছিলেন নিউ পার্কস্ট্রিটে। সেই ঐতিহাসিক অভিযানের দিন উনিশশো তিরিশের আট-ই ডিসেম্বর নিকুঞ্জ সেন ভূরিভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন দীনেশ আর বাদলের জন্য। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সামনে অপেক্ষা করে আছে সেই ভয়ংকর অলিন্দ-যুদ্ধ এবং অনিবার্য মৃত্যু। অথচ বিপদ, মরণ সব উপেক্ষা করে বাদল আর দীনেশ মেতে উঠেছিলেন প্রাণখোলা হাসিতে, গানে আর ঠাট্টায়, কে কত খেতে পারে তারই মজাদার প্রতিযোগিতায়। এমন খাওয়ার কম্পিটিশন তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রায়ই হত বোধহয়, নিকুঞ্জ সেন মাঝেমধ্যেই ব্যবস্থা করতেন। সেপ্টেম্বর মাসের এই চিঠিতেও ওই মজার ব্যাপারটাই লিখেছেন। অদ্ভুত!

উদ্দালক বলল, 'এরপরই আসছে চরকি আর জাঁতি-সুপুরির ব্যাপারটা। চরকি উপহার পাঠাচ্ছেন দীনেশ যতীশ গুহকে। বলছেন, চরকিটা খুব লাকি, অনেকবার সফল হয়েছে। কিন্তু এবার ওঁকে জাঁতি-সুপুরি দেওয়া হয়েছে, তাই চরকিটা পাঠিয়ে দিচ্ছেন যতীশ গুহকে। এটা তো ঠিক কী...?'

—ঠিক কী বলতে চাইছেন, আমিও তা ভালো বুঝতে পারিনি। তবে অনুমান করতে পারি। সম্ভবত কোনো অস্ত্র। আগ্নেয়াস্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু চরকি কেন বলছেন বলো দেখি, দালিবাবু?

—হয়তো এমন কোনো অস্ত্র যাতে আগুন দিলে গোল হয়ে ঘোরে চরকিবাজির মতো। নাকি?

'দূর, তাই কখনও হয়? চরকি...চরকি... যা ঘোরে... চরকি কথাটা কীভাবে এসেছে, বলো তো?' পেখম শৌনককে জিজ্ঞেস করল।

—চরকি এসেছে সংস্কৃত 'চক্র' শব্দ থেকে। সেই একই ঘোরার ব্যাপার কিন্তু। এখন কী ঘোরে? কী ঘোরে?... ও হরি! কী উইটি ছেলে রে বাবা! ...এতক্ষণে বুঝলাম।... 'ঘোরা' ভার্বটা ইংরেজিতে হচ্ছে 'টু রিভলভ'। তাহলে যা ঘোরে, তা দাঁড়াল গিয়ে 'রিভলভার'। রিভলভার তো রিপিটিং হ্যান্ডগান, ওইজন্যেই 'রিপিটার'ও বলা হয় একে অনেকসময়—যার মধ্যে অনেকগুলো চেম্বারওয়ালা রিভলভিং সিলিন্ডার থাকে। একেকটা চেম্বারে একেকটা কার্টিজ লোড করতে হয়। 'চরকি' মানে তাহলে আর কিছুই নয়; 'চরকি' হল রিভলভার!

পেখম আর দালি সবিস্ময়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'দীনেশ গুপ্তের রিভলভার?'

'হ্যাঁ, তাই। দীনেশ গুপ্তের রিভলভার। আর সেই প্রিয় রিভলভারটি তিনি পাঠাচ্ছেন যতীশ গুহকে,' শৌনক বলল।

'তাহলে জাঁতি-সুপুরি?' পেখম ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

—জাঁতি-সুপুরি সম্ভবত আরও উন্নত মডেলের কোনো রিভলভার ও তার কার্টিজ—যা তাঁকে এবারের অ্যাকশনের জন্য দেওয়া হয়েছে বিভি-র দিক থেকে। আগেরটার থেকে এটাকে আলাদা করার জন্যেই 'জাঁতি-সুপুরি'র ইমেজারিটা ব্যবহার করেছেন। বিয়ের সময় বরের হাতে থাকেও তো জাঁতি-সুপুরি। তবে পুরোনো রিভলভারটা তিনি যতীশ গুহকে পাঠিয়েছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে। কনের যেসব আত্মীয়স্বজনরা এরপর মাটিপুরে যাবেন, পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী যেন তাঁদের যথাযথ আপ্যায়ন করা হয় লিখেছেন।

'মাটিপুর আমি বুঝেছি। মেদিনীপুর। মেদিনী মানে মাটি,' দালি বলল।

'কনেপক্ষ তো এখানে ব্রিটিশ। তাহলে কনের আত্মীয় মানে—' পেখম ভাবতে লাগল।

'কনের আত্মীয় তাহলে ব্রিটিশ অফিসার। হতে পারে ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁদেরই আপ্যায়ন...' শৌনক বলল।

—এবং রবিনন্দনবাবুর বাড়িতে পাঠানোর কথা লিখছেন! রবিনন্দন কে, বাবা?

—হা হা হা! রবিনন্দন মানে যম রে, পেখম, যম। এর পর মেদিনীপুরে যেসব ব্রিটিশ অফিসাররা যাবেন, তাঁদের যমের বাড়ি পাঠানোর জন্যেই তাঁর লাকি রিভলভারটা পাঠিয়েছেন দীনেশ। এবং প্রতিবার অ্যাকশনের শেষে রিভলভারটা যেন ঘুরপথে যতীশ গুহর হাতে ফিরে আসে, সেরকম ব্যবস্থা করার কথাই বলেছেন।

—এসেছিল কি ফিরে সেই রিভলভার প্রত্যেকবার? পেডি, ডগলাস, বার্জ প্রত্যেককে হত্যা করার পর?

—তা তো জানি না। তবে এরই সঙ্গে পণের ডাউরি আর জুয়েলারি মানে সম্ভবত অনেকটা অর্থসম্পদ আর অলংকারাদি, যা বিভি-র সিম্প্যাথাইজাররা সংগঠনের কাজের জন্য দান করেছিলেন, সেগুলো তিনি পাঠাচ্ছেন যতীশ গুহকে, যাতে ভবিষ্যতের কাজকর্মের জন্য খরচ করা হয় কিংবা এখনই দরকার না পড়লে সযত্নে গচ্ছিত রাখা হয়। চিঠি এসেছে আগে বাই পোস্ট। জিনিসগুলো পাঠিয়েছেন টি.পি-র লোকের হাতে। দরকার পড়লে এই টি.পি-র লোকেরাই এগুলো গচ্ছিত রাখবে।

'কিন্তু টি.পি মানে কী? যার লোকেরা নাকি আবার মাথামোটা! টি.পি কী জিনিস? খায় না মাথায় দেয়?' প্রশ্ন করল পেখম।

'আমি এটা একদম বুঝতে পারিনি এখনও। মূল চিঠির এই একটা ব্যাপারই এখনও একদম অন্ধকার,' শৌনক বলল।

পেখম বলল, "বাকিটা এখন আর বোঝা কঠিন নয়। এই যে লিখেছেন, 'সঙ্গে হজমির পুরিয়া আছে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ফুলশয্যা, কিংবা বউভাত সেরে মধুচন্দ্রিমা অবধি যাওয়ার ইচ্ছে নেই'..."

'হজমির পুরিয়া কি বিষ?' দালি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, পটাশিয়াম সায়ানাইড। জিভে লাগলে অনিবার্য মৃত্যু। শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে জেল। আর ফুলশয্যা?' শৌনক জিজ্ঞেস করল।

—ফাঁসি?

—হ্যাঁ। জেলে গিয়ে তারপর ফাঁসি যেতে চান না দীনেশ। 'বউভাত' মানে কী বুঝেছিস, পেখম?

"বউভাত হয় বিয়ের পরে। তার মানে অ্যাকশনে ধরা পড়ে জেলের ভাত খেতে চাইছেন না। 'মধুচন্দ্রিমা' বা হানিমুন শিওর দ্বীপান্তর। অনেক দিন জেলের ভাত খেয়ে আন্দামানে যাওয়ারও কোনো ইচ্ছে নেই। অ্যাকশন শেষে পটাশিয়াম সায়ানাইডের পুরিয়া খেয়ে পরানের সাথে মরণখেলা খেলবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছেন। ডেথ, বিলাভেড ডেথ! হোয়াট আ ডন্টলেস ক্যারেকটার!" বলতে বলতে পেখমের মুখটা উত্তেজনায় একেবারে লাল হয়ে উঠল।

শৌনক বলল, 'সে ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়নি অবশ্য। পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরলেও তার কাচের অ্যাম্পুলটা দাঁত দিয়েই ভাঙতে হত। তবেই তো জিভের সঙ্গে কনট্যাক্ট হবে। রিভলভারের অবশিষ্ট একটি মাত্র গুলি নিজের গলা লক্ষ করে চালান দীনেশ। গুলি গলায় লাগায় অ্যাম্পুল দাঁত দিয়ে ভাঙার মতো অবকাশ পাননি। ঘটনাস্থলে বাদলের মৃত্যু হয়। বিনয় মারা যান হাসপাতালে। দীনেশের ফাঁসি হয়,' গভীর স্বরে বলল শৌনক।

কিছুক্ষণ তিনজনই চুপ।

তারপর দালি বলল ধীরে ধীরে, 'তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে, দীনেশ গুপ্ত যতীশ গুহকে তাঁর রিভলভার, বিভি-র টাকাপয়সা ও ধনরত্ন বিশ্বস্ত লোকের হাতে পাঠিয়েছিলেন। বিভি-র বিপ্লবীরা তিন ডিএম-কে হত্যা করে দীনেশের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন। গেভ প্রপার আনসার। যতীশ গুহ মল্লিকবাড়ির মায়ের পায়ের তলায় সেগুলো রাখার ব্যবস্থা করেন। তারপর দত্তগলিতে মুক বা মুখ যাই হোক, তার সঙ্গে এই ব্যাপারটা রিলেটেড। আর টি.পি মানে যে কী, বোঝা গেল না।'

শৌনক মাথা নেড়ে বলল, 'ভাবতে হবে। আরও ভাবতে হবে এগুলো বুঝতে গেলে। যা বুঝলাম, তাও কি কম? তবু তার সবটাই কি ঠিক? অনেক সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। কে জানে! দেখা যাক!'

সবুজমামাদের মানিকপুরের বাড়ি থেকে সেদিন সন্ধ্যায় মীরবাজারে ফিরতে ফিরতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল সবকিছু দালির। সারাদিনের সমস্ত কথাবার্তা, চিঠি, তার ব্যাখ্যা, বিনয়-বাদল-দীনেশের সেই রোমহর্ষক অভিযান—এক এক করে সব মনে উঠছিল, আবার এক এক করে নিভে যাচ্ছিল। শেষে শুধু একটা ছবি মন

জুড়ে রইল। বহুদিন আগের কোনো এক দুপুর। এই শহরের ছোটো দুটি মেয়ে একটি নির্জন বাড়িতে আঁকা শিখতে গেছে। দাঁড়ে বসা একটা পুরোনো কাকাতুয়া একদা-উচ্ছল দুজন মুছে যাওয়া মানুষের নাম ধরে সেই বিষণ্ণ দুপুর জুড়ে মন্থর সুরে ডেকে চলেছে... ক্রমাগত ডেকেই চলেছে...

রাস্তার আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ। দালির তখনই মনে হল, কেন জানি মনে হল, সে আজ অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

১১

লিলি দেখল, রাস্তার উলটোদিক থেকে একজন লোক কিছুতেই রাস্তা পার হয়ে এদিকে আসতে পারছে না।

ভরা দুপুর; অফিসযাত্রীদের ভিড় একটু স্তিমিত হয়েছে। এখন যদি অফিস-আওয়ার হত এবং কালেক্টির মোড় থেকে বন্যার জলের মতো গাড়িগুলো ছেড়ে দেওয়ার সিগন্যাল চালু থাকত, তাহলে না-হয় লোকটির এমন আচরণের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। রাস্তায় যে এখন একেবারেই গাড়িটাড়ি নেই, তা অবশ্য নয়। তবু রাস্তা পার হওয়া একেবারেই কঠিন নয় এ মুহূর্তে। তা সত্ত্বেও প্রায় ফাঁকা রাস্তাটা পার হয়ে আসতে মানুষটির কীসের এত দ্বিধা, বুঝতে পারল না লিলি। লোকটিকে ভালো করে দেখল একবার—চোখে কালো চশমা বা হাতে লাঠিও নেই; একমুখ দাড়ি, এলোমেলো অবিন্যস্ত চুল, গাঢ় খয়েরি রঙের একটা জিনসের ওপর ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবিপরা মানুষটিকে কোনোমতেই দৃষ্টিহীন বলে মনে হল না তার। একবার করে রাস্তায় পা রাখছে, একটু করে এগিয়ে আসছে, তারপরেই দূর থেকে একটা গাড়ি আসছে দেখলেই পিছিয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা অস্থির, অস্থির ভাব!

হয়তো লোকটি চোখ দেখাতে এসেছিল এখানে কোথাও, চোখে অ্যাট্রোপিন ড্রপ দেওয়া হয়েছে, চোখের মণি বড়ো হয়ে যাওয়ায় সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না রাস্তাঘাট। তাকে দেখে মাতাল মনে হচ্ছে না, এমনকি পাগলও নয়। সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ। লিলি এতটা মন দিয়ে লোকটাকে দেখছিল, কারণ বারবারই তার মনে হচ্ছিল এ মানুষটি তার পূর্বপরিচিত। কিন্তু কোথায় দেখেছে, কতদিন আগে দেখেছে, সেসব কিছুই সে মনে করতে পারছে না। মিনিট পাঁচেক এইভাবে দেখবার পর সে ভাবল, ওপারে গিয়ে লোকটিকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করবে।

কিন্তু তারও প্রয়োজন হল না। হঠাৎ যেন সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে মানুষটি সজাগ হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় রাস্তা পেরিয়ে এদিকে এল সে। নির্বিকারভাবে লিলির পাশ দিয়েই হেঁটে বেরিয়ে যেতে লাগল। আর ঠিক তখনই তাকে চিনতে পারল লিলি। সামান্য উচ্চকিত স্বরে ডাকল, 'সাহিল! সা-হি-ল!'

প্রায় সন্ত্রস্ত হয়ে চমকে উঠে সাহিল ঘুরে দাঁড়াল। দু-এক পা এগিয়ে গিয়ে লিলি

বলল, 'আমি লিলি। চিনতে পারছ? পারছ না? আমি লিলি।'

সাহিলের চোখে কয়েক মুহূর্ত জুড়ে অপরিচয়ের মেঘ। যেন সেই মেঘস্তূপ পেরিয়ে স্মৃতির ভেতর সে লিলিকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। তারপরই যেন বহু বছর আগেকার অতিচেনা একটা মুখ ভেসে উঠল তার মনে; প্রখর হয়ে উঠল সাহিলের দৃষ্টি। উজ্জ্বল হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আরেহ্ লিলি! ওহ্, কতদিন বাদে... এখানে কোথায়?'

প্রসারিত হাতের পাতা আলতো ছুঁয়ে লিলি বলল, 'আর কোথায়? আমি তো এই শহরেরই মেয়ে, সাহিল। অ্যাদ্দিন দেখা হয়নি, সেটাই আশ্চর্য! তুমি... তুই তো হায়ার সেকেন্ডারির পরই ডুব মারলি। কোনো খবরই পাইনি তোর অ্যাদ্দিন।' 'তুমি' থেকে অজান্তেই পুরোনো দিনের অতি পরিচিত অতি সহজ 'তুই'তে সে নেমে এসেছে।

—আমি মেদিনীপুর ছেড়ে দিয়েছিলাম রে! কলকাতায় ছিলাম বেশ কিছুদিন হায়ার স্টাডিজের জন্য। তারপর কিছু বছর হায়দ্রাবাদ। তারপর মেদিনীপুরে এসে সেটল করলাম...তা ধর, বছর দশেক তো হলই।

—এখন কী করছিস, সাহিল?

—প্রথমদিকে এটা ওটা করছিলাম। তারপর আব্বার ব্যবসাতেই থিতু হয়েছি। তুই তো জানিস, আমাদের অটোমোবাইলের ফ্যামিলি বিজনেস। ওতেই লেগে পড়েছি আর কি!

—চল, কোথাও একটু দাঁড়িয়ে চা-বা খেতে খেতে কথা বলা যাক। এখানে ঠিক জমছে না। এত রোদ... কত বছর হল বল তো?

লিলির পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে একটু চিন্তা করে সাহিল বলল, 'হবে তা সাতাশ-আটাশ বছর, না?... কম নয়!'

রাস্তার মোড়ে একটা বটগাছের তলায় চায়ের দোকান। এই গাছের তলাটাই একটু ছায়া ছায়া মতন। ঝুরঝুরু বাতাস গায়ে এসে লাগছে। ঘাম জুড়িয়ে যাচ্ছে গায়ের। কিছুক্ষণের স্বস্তি।

দুজনে চা নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। লিলি হাসতে হাসতে বলল, 'একটু মোটা হয়েছিস কিন্তু, সাহিল!'

সাহিল হাসতে হাসতেই উত্তর দিল, 'তুই প্রায় একইরকম আছিস। যা চেঞ্জ, তা শুধু একটু ঘরঘরেলুভাব। হা হা হা! তোকে শাড়িতে আমি প্রায় কখনই দেখিনি। সালোয়ার কামিজই বেশি পরতিস। বিয়ে হয়েছে কোথায়?'

—মানিকপুরে। আমার বর মেদিনীপুর কলেজে পড়ায়। শৌনক মিত্র।

—কত বছর হল?

—কীসের? বিয়ের? তাও হল তো, ধর, প্রায় বাইশ বছর।

—বাইশ বছর!...ছানাপোনা?

—পোনা আর নেই, বাবা! ছানাই আছে। একটিই মেয়ে। সে এখন কলেজে পড়ছে। পেত্থম।

—বলিস কী রে? তোর মেয়ে এখন কলেজে পড়ার মতো বড়ো হয়ে গেছে?

—হবে না? মেঘে মেঘে কত বেলা হয়েছে জানিস? তোর কী খবর?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সাহিল বলে, 'আমার খবর ভালো নয় রে, লিলি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ই রুকসানার সঙ্গে আলাপ। দুর্গাপুরের মেয়ে। ওকেই বিয়ে করি। কিন্তু ব্যাড লাক, লিলি। ব্লাড ক্যান্সার। পাঁচ বছর হল রুকসানা নেই।'

দুজনেই চুপ। লিলি স্তিমিত স্বরে বলল, 'তোদের কোনো— ?'

'সন্তানাদি? নাহ্ রে, নেই।... একটা সিগারেট ধরাব?' মাটির ভাঁড়টা টিনের ভেতর ফেলে দিয়ে সাহিল প্রশ্ন করল।

লিলি মাথা নাড়ল। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে অনেক দূরের দিকে তাকাতে তাকাতে সাহিল বলল, 'বাদ দে এসব কথা।... আসলে কদিন বড্ড ঘেঁটে আছি, বুঝলি? জিভে তেতো স্বাদ... তোর মনে আছে সেই সব দিন? অনন্ত স্যারের বাড়িতে আমরা সব কেমিস্ট্রির টিউশন পড়তে যেতাম...'

'থাকবে না? আমি, তুই, কাজল, কৌশিক, শোভন, দেবযানী, সুমন্ত্র, দীপান্বিতা। দারুণ ছিল ব্যাচটা..., বল?' লিলি হইচই করে বলে ওঠে।

—দারুণ! কীসব দিন! স্যার পড়াতে পড়াতে একটু উঠে গেলেই আমরা পেন-ফাইট খেলে খেলে জাহান্নাম বানিয়ে দিতাম। হা হা হা! নোটস ফোটস কোথায় যে যেত! শেষে কাজলের কাছ থেকে নোটস নিয়ে জেরক্স করে পরীক্ষার আগে... ওহ্, সে কী পড়া! একেকটা চ্যাপটার একেকজনের ভাগে পড়েছিল। নিজে পড়া আর অন্যদের বুঝিয়ে দেওয়া... আমার ভাগে পড়ল মেটালারজি... উফ্! ওই চ্যাপটারগুলো মনে হয় সাক্ষাৎ ইবলিশে লিখেছিল...কী বোরিং! শেষে তুই আমাকে উদ্ধার করলি আমাদের বাড়ি গিয়ে... সেসব দিন... সেসব গোল্ডেন পিরিয়ড, লিলি!

কথা বলতে বলতে বারবার সাহিল অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট... অথচ কতক্ষণ টান দিতে ভুলে গেছে। একটু আগে রাস্তা পার হওয়ার সময় কীসের যে ইতস্তত ভাব! কী হয়েছে সাহিলের, লিলি চিন্তা করছিল। রুকসানা মারা যাওয়ার পর থেকেই এমন, নাকি রিসেন্টলি কিছু হয়েছে? চোখের নীচে কালি। রাতে ঘুমোয় না সাহিল? বিয়ে করল না কেন আর? হয়তো রুকসানাকে খুব ভালোবাসত। হবেও বা।

'বাড়িটা তোদের একইরকম আছে? সেই খরগোশগুলো? সেই যে কপির পাতা তুরতুর করে খেত?' বলতে বলতে চায়ের দাম দিচ্ছিল লিলি।

—অ্যাঁ? হ্যাঁ। বাড়ি? সে একইরকম। খরগোশ?... না, খরগোশ এখন আর নেই। বাড়িতে আমি আর আম্মা। আর কেউ নেই। আব্বার এন্তেকাল হয়েছে আগেই।

—একদিন আয় না আমাদের বাড়ি। এই তো মানিকপুরে। আমার বরের সঙ্গে তোর তো আলাপই হয়নি।

—কেমন? খুব গম্ভীর? সিরিয়াস টাইপ?

—না রে, হুল্লোড়ে। তবে ওই বইচাপা মানুষ। মেয়েটাও হয়েছে ওইরকম। আয় একদিন। আমার নাম্বারটা সেভ করে নে।... আমি তোকে মিসড কল দেব? আচ্ছা। তোরটা বল, সাহিল...

—নাইন এইট থ্রি থ্রি সিক্স ওয়ান টু ফোর ...

—দাঁড়া, দাঁড়া। আস্তে আস্তে বল আর-একবার।... সেভ করি। মিসড কল দিচ্ছি, দ্যাখ...

সাহিলের মোবাইল টুং টাং করে বেজে উঠল। নাম্বারটা সেভ করে নিল সাহিল। তারপর বলল, 'চলি রে, লিলি! দেখি কোনো রবিবার দেখে...'

'হ্যাঁ, একদম। চলে আয়! খুব মজা হবে। তোকে রুট ডিরেকশন দিয়ে দেব ফোনে। টাটা!' হাত নেড়ে উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল লিলি। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সাহিল। তারপর চলতে লাগল।

দুপুর গড়িয়ে সাহিল বাড়ি ঢুকল। বাড়িটা সারাদিনই চুপচাপ। গেট খুলে কাগজফুলে ঢাকা ছোটো বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির একপাশে লোহার শিক দিয়ে ঘেরা খরগোশের খাঁচাটা। খালি। লিলি আজ এই খরগোশের কথাই বলছিল না? কতদিন পর দেখা হল আজ লিলির সঙ্গে। কত বছর পর! লিলির কথা মনে করে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সাহিল।... মেদিনীপুর কলেজের প্রোফেসর। শৌনক মিত্র? নামটা সাহিল শুনেছে। বোধহয় ম্যাথসের।

ডাইনিং টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। দুপুর দুটো বাজে। আম্মা নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে। খেতে খেতে রিমোট টিপে টিভিটা চালাল সাহিল। সাউন্ড কমাল। কী একটা সিরিয়াল হচ্ছে। চ্যানেল চেঞ্জ করল। মেয়েদের ক্রিকেট ম্যাচ। একটি কিশোরী মেয়ে ব্যাট করছে। লিলির মেয়েটা কি এই বয়সের? কে জানে!

খেতে পারল না। বারবার গা গুলিয়ে উঠছে। ওয়াক আসছে।

এঁটো থালাবাটি তুলে সিংক-এ রেখে হাতমুখ ধুয়ে এল টয়লেট থেকে। টিভি অফ করে নিজের ঘরে ঢুকল। দরজা ভেজিয়ে বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরাল। খুব ঘন ঘন খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। টেনশনটা বাড়লেই এই...

ফেসবুকে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নোটিফিকেশন নেই। স্ক্রোল করছিল। বাংলাদেশের এক বন্ধু চমক হাসান আর তার স্ত্রী ফিরোজা বহ্নি গিটার বাজিয়ে গান

গাইছে। বেশ ভাব দুজনের মধ্যে বোঝা যায়। চমক খুব ভালো ছেলে। এঞ্জিনিয়ার। এখন বিদেশে থাকে সস্ত্রীক। মাঝে মাঝে ম্যাথসের নানা মজার ধাঁধা নিয়ে ভিডিয়ো বানিয়ে আপলোড করে। আবার মাঝেমাঝে এরকম মজার গান। ওদের একটা ছোট্টো মিষ্টি মেয়ে আছে। বর্ণমালা।

পরের পর পোস্ট। হাবি-জাবি-ভাবী। শাড়ি-গাড়ি-খাওয়া। কবিতা। ছবি। রাজনীতি। খবর। এত পোস্ট, এত্ত আইডিয়া কোত্থেকে পায় লোকে আল্লা মালুম! আবার এল একটা মজার ভিডিয়ো। ঝাড়গ্রাম কলেজের অধ্যাপিকা। পৃথিদীপা। তিনি আর তাঁর ছেলে। গোলুগোলু বাচ্চাটার সঙ্গে ডুয়েট গাইছেন। গানের কথাগুলো এরকম—'সহজ বলেই যেটাই ম-নে হয়, তা-আ-র কিছুই সহজ নয়; সহজ শুধুই স-হজ বলা, ক-রা সহজ নয়।' দারুণ গাইছেন পৃথিদীপা। বাচ্চাটা আরও সুন্দর। কেমন মাথা নেড়ে নেড়ে গাইছে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। দারুণ!

হুঁ, কিছুই সহজ নয়। জীবন তো কঠিন দুর্বহ বটেই। এমনিতেই কঠিন। তার ওপর আরও কঠিন হয়ে গেছে সাহিলের জীবন গত একমাসে। এমন একটা সমস্যা, যা কারও সঙ্গে সে শেয়ার করতে পারছে না। অথচ নিজেও সল্‌ভ করতে পারছে না। ঠিক করতে পারছে না, কী করবে এবার। এমন একটা ভয়ানক অভিজ্ঞতা একা একা হজম করা... মনের ভেতর জাহান্নামের আগুন জ্বলছে তার... এই জাহান্নামের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি, হে আল্লাহ্! আপনার নাম বরকতময়।

সেদিন কাফেটারিয়ায় অমন অতর্কিতে ওয়েটারের ছদ্মবেশে ট্রেজার প্রোটেকটার চিফ তার সামনে এসে দাঁড়াবে, তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না সাহিল। নির্দেশমতো কাফে থেকে বেরিয়ে রাস্তার উলটোদিকে কিছুক্ষণ একাবোকা অপেক্ষা করার পর একটা টাটা সুমো তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল। দরজা খুলে যেতেই ভেতর থেকে ধাতব কণ্ঠস্বরে নির্দেশ এল, 'ভেতরে উঠে এসো।'

সাহিল অবাক হয়ে দেখেছিল, ড্রাইভারের আসনে সেই একই লোক, যাকে সে একটু আগে ওয়েটারের ভূমিকায় দেখেছিল। গা শিরশির করে উঠল সাহিলের। এই লোকটা কি ম্যাজিক-ট্যাজিক জানে? কখন কাফে থেকে বেরোল... কোন পথ দিয়ে বেরোল... কখন আবার গাড়ি নিয়ে এল... কিছুই মেলাতে পারছিল না। ততক্ষণে গাড়ি স্টেশনের দিকে চলেছে। কিন্তু ফ্লাইওভারে উঠল না। ফ্লাইওভারের নীচ দিয়ে গিয়ে কার্ল মার্কসের স্ট্যাচু আর জলট্যাংকটাকে ডানদিকে রেখে সোজা বাঁদিকে বাঁক নিল।

একটু ইতস্তত করে সাহিল প্রশ্ন করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

সেই একই ধাতব কণ্ঠস্বরে জবাব এল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবে।'

সাহিল দেখল, গেট-বাজার পেরিয়ে ডাকবাংলো রোড দিয়ে গাড়ি কাঁসাই নদীর দিকে যাচ্ছে। ডিএভি পাবলিক স্কুলটার প্রকাণ্ড বিল্ডিং ক্রস করে হঠাৎ মেইন রোড

ছেড়ে আবার বাঁক নিয়ে ভেতরের দিকের একটা সরু ঝুপসি পথ ধরল... তারপর ঘরবাড়িটাড়ি ছাড়িয়ে দুপাশে গাছপালা ঝোপঝাড়, উঁচুনীচু লাল পাথুরে জমি, নদীর ঠান্ডা ঠান্ডা ঝটকা বাতাস...

সন্ধে হয়ে আসছে। অস্পষ্ট তরল অন্ধকার জমে আছে গাছগুলোর নীচে। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে দিয়েছে লোকটা। এসব জায়গায় অনেক দূরে দূরে বিমূঢ় পাহারাওলার মতো দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টগুলোর আলো থমকে আছে গাছপালার সবুজ ডালের ফাঁকে, আর বাকিটা নিকষ আঁধার। এর মধ্যে দিয়ে গাড়ির আলো অন্ধকার চিরে ফোকাসের মতো গিয়ে পড়ছে এই অযত্নবর্ধিত বনভূমির ভেতর।

গাড়িটা টার্ন নিয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। লোকটা সাহিলকে চোখের ইঙ্গিতে নামতে বলল।

সাহিল দেখল, বাঁদিকে অনেক দূরে রেলব্রিজের সারি সারি আলো। এতটা রাস্তা পেরিয়ে এসেছে তারা? খেয়াল করেনি তো! সাহিল যেন তার নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ইয়া মাবুদ! বান্দাকে রক্ষা করো।

ধঞ্চে গাছের ঝোপঝাড় পেরিয়ে উঁচুনীচু পাথুরে জমি মাড়িয়ে লোকটা কাঁসাই নদীর একেবারে খাড়া একটা পাড়ের ওপর এসে বসল। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে সাহিলকেও বলল সামনে বসতে। তারপরই উশখুশ করে উঠল কী যেন অস্বস্তিতে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'এখানে বড্ড সাপ। সাবধানে বসা দরকার।'

এই বলে ঢোলা-জামার একটা পকেট থেকে কী একটা স্প্রে-র মতো বের করে ওরা যেদিকে বসেছিল, তার একদিকে আকন্দ গাছের ঝোপের মাথায় স্প্রে করতে লাগল। একটা ঝিমঝিমে নেশা-ধরা গন্ধ স্প্রেটার।

সাহিল একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল। জিজ্ঞেস করল, 'সাপ তাড়ানোর ওষুধ?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ। কার্বলিক অ্যাসিড।'

কিন্তু কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ তো এ নয়! সাহিল ভাবছিল, গন্ধের কথাটা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তারপর কী ভেবে চুপ করে গেল। আরও একটা প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরছিল। লোকটা তাদের বসার জায়গার চারিদিকে গোল করে স্প্রে না-করে কেবল একদিকে স্প্রে করল কেন? যাকগে, চুপচাপ বসে থেকে দেখা যাক কী হয়।

লোকটা সাহিলের মুখোমুখি বেশ মৌজ করে বসে সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচিস বের করে প্যাকেটটা সামনে এগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাভ আ স্মোক?'

'নো, থ্যাংকস,' সাহিল ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে গিয়ে বলল।

সিগারেট ধরিয়ে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে লোকটা বলল, 'ওয়েল, দেন, ইব্রাহিম! এই ফার্স্ট টাইম আমরা মিট করছি। তাই না?'

—ট্রেজার প্রোটেকটারের ইতিহাসে সম্ভবত প্রথমবার কোনো চিফ কোনো মেম্বারের সঙ্গে দেখা করলেন।

—হ্যাঁ, অ্যাট টাইমস সিচুয়েশন ডিম্যান্ডস। এখন বলো, ট্রেজারটা আসলে কী, তুমি কি তা বুঝতে পেরেছ?

—না। আপনার কী ধারণা?

'আমার ধারণা কোনো ভ্যালুয়েবল কিছু। হয়তো প্রেশাস জুয়েলারিজ বা অন্য কিছু। যার মূল্য এখন কোটি কোটি টাকা। কত কোটি তা বলতে পারব না,' লোকটার গলা যেন লোভে হিসহিস করে উঠল।

—কিন্তু এসব জিনিস কেন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল?

—তার আগে বলো, অরুণেশ গুপ্ত বা যোগেশ গুহ সম্পর্কে তুমি কী বুঝেছ?

—আমার মনে হয়, এঁরা উনিশশো তিরিশ সালের মেদিনীপুরের কোনো বিপ্লবী দলের সদস্য। সম্ভবত শীর্ষনায়ক। এর বেশি কিছু বুঝতে পারিনি। আপনার কী ধারণা?

—আমারও তাই মনে হয়, ইব্রাহিম। যদিও আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। তবু এঁদের দুজনের মধ্যে একজন, অর্থাৎ অরুণেশ গুপ্ত আসলে যে কে, সেটা আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি। যোগেশ গুহ কে, বুঝতে পারছি না। সেটার কারণ সো লিট্‌ল ইনফরমেশন লেফট উইথ আস রিগার্ডিং দেম। কিন্তু এঁরা ট্রেজার প্রোটেক্ট করার জন্য একটা গোটা সিক্রেট সোসাইটি বানালেন কেন কিংবা কী প্রয়োজনে এল এত ধনসম্পদ...

সাহিল মাঝপথেই বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সেটা আমারও প্রশ্ন।'

—উত্তরটা খুব কঠিন নয়, ইব্রাহিম। আর্মড রেভোল্যুশন বা সশস্ত্র আন্দোলন কোনোদিনই মাস-মুভমেন্ট হয়ে ওঠেনি। সমাজের নানা স্তর থেকে মানুষ উঠে এসে এতে অংশ নিলেও, বিপ্লবীদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। কারণ একটা সোসাইটিতে ওরকম ডেয়ার-ডেভিল লোক খুব কমই হয়। এঁদের কারও মুভমেন্ট কক্ষনো প্রকাশ্য ছিল না।

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু-তিনবার সিগারেটে টান মেরে আধখাওয়া সিগারেটটা মাটিতে ঘষে নিভিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আবার শুরু করল, 'এ ধরনের সংগঠন চালানো ব্যয়সাপেক্ষ। আর্মস আমুনিশন নিয়ে কারবার। তার জন্য চাই টাকা। প্রতিটি অ্যাকশন ফেইল করার হাই রিস্ক ছিল। এবং ফেইল করতও অনেক সময়। তখন মামলা-লড়ার খরচ, উকিল নিয়োগ থেকে শুরু করে আরও নানান রকম... প্রচুর টাকার ব্যাপার। প্রথম প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি থেকে টাকা আসত, পরে বিপ্লবীরা সে পথ অন্যায্য মনে হওয়ায় ছেড়ে দেন।'

—তাহলে টাকা আসত কোন পথে তখন?

—আমার ধারণা, বেশ কিছু সিম্প্যাথাইজার ছিল গুপ্তসমিতির। তারা ধনী হতে পারে, মধ্যবিত্ত কিংবা গরিব সাধারণ লোকও হতে পারে। সেই টাকার কিছুটা হয়তো খরচ হয়ে গেছিল দলের কাজে। বাকিটা ট্রেজার প্রোটেকটারের মেম্বাররা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু কোথায়? তুমি কিছু জানো?

সাহিল টের পেল, অন্ধকারের মধ্যেও লোকটা যেন শ্যেনদৃষ্টিতে সাহিলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সাহিল উত্তর দিল, 'না, আমি জানি না। কয়েকটা জায়গা শুধু জানি, আমাদের ওপর নির্দেশ এসেছিল, ওই স্পটগুলোতে নজর রাখার জন্য। যেন কোনো অবাঞ্ছিত খোঁড়াখুঁড়ি না করা হয়।'

'বেশ। তাহলে খুঁজে বের করো। সময় নাও,' আদেশের সুরে লোকটা বলল।

উত্তরে সাহিল কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তখনই দূরের রেলব্রিজের ওপর দিয়ে ঝমাঝম শব্দ করে সন্ধের একটা ট্রেন উঠে এল। সেই প্রচণ্ড শব্দ নদীর প্রবল বাতাসের মধ্যে ভেসে এসে সাহিলের কণ্ঠস্বর ঢেকে দিল। ওরা দুজনেই তাকিয়ে দেখল, ট্রেনটার অগণ্য আলোকিত জানালা ব্রিজের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছে।

মিনিট পাঁচেক পর ট্রেন ও ব্রিজের সংঘাতজনিত ধাতব শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে এলে সাহিল বলল, 'কিন্তু... টি.পি-র সদস্যদের অন্যতম শপথ হচ্ছে, তারা ট্রেজার প্রোটেক্ট করবে। কখনও ট্রেজার খুঁজবে না।'

—আই নো দ্যাট। ইজন'ট দ্যাট আ বিট ফুলিশ? একদল লোক দিনের পর দিন ট্রেজার প্রোটেক্ট করে যাবে অথচ জানবে না কী তারা গার্ড করে চলেছে কিংবা কোথায় আছে সেসব সম্পদ? আ ভেরি অকওয়ার্ড প্রোপোজিশন! আর এখন ওসব জিনিস জমিয়েই বা রাখা হবে কোন কাজে?

'আপনি কী চাইছেন?' সাহিল ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল।

—আমি ওই ট্রেজার চাই। আমরা দুজন। তারপর এই সংগঠন ভেঙে দেব। তুমি খুঁজে বের করবে। আমি হেল্প করব তোমাকে। অ্যাট ফার্স্ট গ্যাদার সাম নেসেশারি ইনফরমেশন।

সমস্ত সাহস একত্র করে সাহিল বলল, 'কিন্তু আমি তো এটা পারব না। এটা করলে আমার আব্বা, দাদাজান, দেশের সব মানুষের সঙ্গে গদ্দারি করা হবে।'

লোকটা অন্ধকারের মধ্যে যেন হাসল। তারপর মোবাইল বের করে এনে টর্চটা অন করল। ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে অত্বরিত ভঙ্গিতে আকন্দ গাছের ঝোপের ওপর টর্চটা ফোকাস করল।

সেই দিকে টর্চের আলোয় উদ্ভাসিত আকন্দঝোপের দিকে তাকানো মাত্রই আতঙ্কে সারা শরীরের রক্ত যেন জমে হিম হয়ে গেল সাহিলের। ইয়া আল্লাহ্! একটা বিশালকায় কী সাপ আকন্দঝোপটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ফণা তুলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো

বসে আছে সাহিলের থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল সাহিল, 'আপনি কী ছড়িয়েছিলেন আকন্দ গাছের মাথায়, সুশীতলবাবু? কার্বলিক অ্যাসিড তো নয়। কার্বলিক অ্যাসিডে তো সাপ পালায়!'

লোকটা খল খল করে হেসে টর্চের আলো আকন্দ ঝোপের মাথায় এদিকে ওদিকে এধারে সেধারে ইতস্তত ঘোরাতে লাগল। সাহিল দেখল, গোটা জঙ্গলটা জুড়ে অজস্র সাপ—শাঁখামুটি, চন্দ্রবোড়া, চিতি, খরিশ, আরও কীসব সাপ সাহিল চিনতে পারল না কিলবিল কিলবিল করছে। ঢালু জমি বেয়ে উঠে আসছে আরও আরও অজস্র সাপ।

—এসব জলা জায়গাতেই ওরা থাকে। ডাকলেই চলে আসে। এই গন্ধটা খুব ভালোবাসে ওরা। প্রচণ্ড সেডাকটিভ। তোমার গায়েও একটু স্প্রে করে দিতে পারি। মানুষের চামড়ার সঙ্গে মিশে একটা আশ্চর্য ঘ্রাণ উঠবে, আকন্দঝোপ ছেড়ে তোমাকে সবাই মিলে চুম্বন করতে এক্ষুনি চলে আসবে ওরা।

আতঙ্কে নীল হয়ে উঠে সাহিল বলল, 'না, না-আ!'

'ট্রেজার খুঁজে বের করো ইব্রাহিম, এক মাস সময় দিচ্ছি। কোথাও একটা মিসিং লিংক আছে। নিশ্চয়ই কোনো গোপন নথি বা কাগজপত্র আছে কোথাও, যাতে ট্রেজারের লোকেশনটা বলা আছে। সেসব কাগজ এখনও আমার হাতে আসেনি। খুঁজে বের করো। আমার সময় অল্প,' ইস্পাতকঠিন গলায় লোকটা ধমক দিয়ে বলে উঠল।

বিহ্বলের মতো উঠে দাঁড়াল সাহিল। লোকটা তার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটার পেছন পেছন টলতে টলতে যেদিকের জমির ওপর স্প্রে ছড়ানো ছিল না সেই দিকটা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এসে সাহিল কোনোমতে গাড়িতে উঠল।

নদীতীরে জঙ্গলের ভেতর অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে গাড়িটা অবশেষে প্রধান সড়কে এসে পৌঁছোল। কিছুক্ষণ চালানোর পর মেদিনীপুর হাসপাতালের সামনে এসে সাহিলকে নামিয়ে দিয়ে লোকটা গাড়ি সমেত কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

কোনো কোনো অভিজ্ঞতা এত বেশী প্রবল হয় যে, তার অভিঘাত মানুষের শরীর মনকে আমূল নাড়িয়ে দিয়ে যায়। সেদিনের সেই সন্ধ্যা, নদীতীর, ট্রেজার প্রোটেকটার চিফের আকস্মিক আবির্ভাব, লোকটির ভয়ানক ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি আকন্দঝোপে বিষাক্ত সাপগুলোর গা-গুলোনো দৃশ্য আর ওই হুমকি সাহিলকে যেন কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। কিছু খেতে গেলেই বমির ওয়াক উঠছে, রাত্রে ঘুম প্রায় নেই, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ সন্দেহ!

হ্যাঁ, সন্দেহ! তার কেন জানি মনে হচ্ছে, টি.পি চিফের রূপ ধরে যে-লোকটা তার সঙ্গে দেখা করল, ভয় দেখাল, সে আদৌ সুশীতলবাবু তো? কোথায় যেন একটা ভীষণ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কাকে সে বলবে তার এই মানসিক উদ্‌বেগের কথা? আম্মুকে বলা যায় না। বেচারি

আম্মু! কিছুই জানেন না এসব গুপ্তসমিতির ব্যাপারে। আব্বা কোনোদিন তাঁকে এসব বলেনইনি।

রুকসানা... যদি রুকসানা বেঁচে থাকত... যদি একটাও বন্ধু থাকত তার... যার ওপর নির্ভর করা যেত...

বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে এল, আচ্ছা লিলিকে বললে হয় না? সময়ও তো শেষ হয়ে আসছে। টি.পি চিফকে কিছু হদিস না দিতে পারলে তাকে যে এমনিই মরতে হবে, সে বুঝে গেছে। লিলির হাজব্যান্ড কেমন লোক? যদি কোনোভাবে হেল্প করেন। পুলিশের কাছে যাবে সাহিল? পুলিশ বিশ্বাস করবে তার এসব কথা?

মোবাইল ঘেঁটে লিলির নম্বরটা বের করল সে। এখুনি একবার ফোন করে লিলিদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানটা ফিক্স করে ফেলবে। তারপর যা হয়, এসপার কি ওসপার, বলবে ওদের সব ব্যাপার খুলে। যদি কিছু সাজেস্ট করতে পারে ওরা... এই একাকিত্ব সে আর নিতে পারছে না...

ডায়াল করতেই যাচ্ছিল নাম্বারটা, হঠাৎ দেখল মোবাইলে একটা মেসেজ এসেছে কিছুক্ষণ আগে। এখুনি তাকে ভিপিএন কানেক্ট করতে বলা হচ্ছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ এসে জমা পড়ে রয়েছে তার জন্য।

ল্যাপটপ অন করে তড়িঘড়ি ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কে ঢুকল সাহিল। দেখল, ওয়ান্ডারলাস্ট নামে টি.পি-র একজন এজেন্টের দিক থেকে একটা নির্দেশ এসেছে। খুলল সে মেসেজটা।

'...সাসপিশাস এন্ট্রি ইনটু কাকাতুয়া-বাড়ি। ফিফটিন্থ জুন। একজন সন্দেহজনক ভদ্রলোক, সঙ্গে দুটো বাচ্চা—একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কাকাতুয়া বাড়িতে ঢুকেছিল। ভদ্রলোকের নাম শৌনক মিত্র। কী এদের পরিচয়, কীজন্য ঢুকেছিল, কী পেয়েছে তারা, খুঁজে বের করো। ফাইন্ড দেম আউট। অ্যান্ড ফাইন্ড দেয়ার পারপাস...ইনটিমেট আস ইম্মিডিয়েটলি...'

১২

'আপনাদের তাহলে তিন পুরুষের অটোমোবাইলের ব্যবসা মেদিনীপুরে?' শৌনক জিজ্ঞেস করল।

'জি। আমার দাদাজান সাজ্জাদ হুসেন ব্যবসাটা আরম্ভ করেন। আব্বাই প্রধানত বড়ো করে তুলেছিলেন দোকানটা। তারপর আমি...' সাহিল উত্তর দিল।

ছাদটা বেশ বড়ো লিলিদের। চারিপাশে অনেক গাছগাছালি। একটা আকাশমণি গাছ দোতলা বাড়িটার ছাদ ছাপিয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে। সরু জিভের মতো তার বিবর্ণ ঝরা পাতা ছাদের ওপর এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। ছাদ থেকে আশপাশের বাড়ি, সেসব বাড়ি ছাপিয়ে দূরের সন্ধ্যাকালের আকাশ দেখা যায়। একটা ওভাল শেপের নীচু টেবিল ঘিরে ওরা বসেছে তিন জন। লিলি, শৌনক আর সাহিল। ফ্লাস্কে করে চা আর প্লেটভরতি কাজুবাদাম নিয়ে এসেছে লিলি নীচ থেকে। আড্ডা চলছে।

'তোর মেয়ের সঙ্গে দেখা হল না,' সাহিল বলল লিলিকে।

'হ্যাঁ রে, কখন দুপুরে বেরিয়েছে মেয়েটা। হয়তো ফিরে যাবে এবার,' লিলি সামান্য চিন্তিত স্বরে উত্তর দিল।

শৌনক বলল, 'তার মানে আপনারা বহু প্রজন্ম মেদিনীপুরে আছেন? আপনার ঠাকুর্দার মানে দাদাজানেরও আগে...?'

'সেটা আমি ঠিক জানি না। তবে আমাদের অনেক পুরুষই যে বাসিন্দা এ শহরের, তা ঠিক। কেন বলুন তো?'

হাসল শৌনক। বলল, 'আসলে পুরোনো মেদিনীপুর নিয়ে আমার একটা বিশেষ ইন্টারেস্ট আছে। অনেক অনেক পুরোনো তো এই শহর। সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'বুঝলাম। তা ঠিকই বলেছেন। তবে খুব বেশি খবর এসবের এখানে রাখে না কেউ। বিশেষ করে এই পুরোনো মেদিনীপুরটার। এই যেমন ধরুন, ক্যাদেনবাবুর গলি। ছোটোবেলা থেকেই আসাযাওয়া করছি আমরা গলিটা দিয়ে। গোলকুয়ার চক থেকে সরু গলিটা বেরিয়ে এসে মাতঙ্গিনী হাজরার স্ট্যাচুর পেছনের শিবমন্দিরের চত্বরে মুখ খুলেছে। একবারও কি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, ক্যাদেনবাবু আসলে কে?' হাসি-হাসি

মুখে বলল সাহিল।

'কে রে ক্যাদেনবাবু? সত্যি আমিও কোনোদিন ভাবিনি,' লিলি বলল।

'শুধু তুই কেন? মেদিনীপুর শহরের শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় নয় নয় জনই জানে না এখন ক্যাদেনবাবু কে। আমি শুনেছিলাম দাদাজানের কাছে। বিপ্লবী সত্যেন বসু, যাঁর ফাঁসি হয়ে যায়...'

'যাঁর স্ট্যাচু আছে না কলেজিয়েট স্কুলের কাছে?' শৌনক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, শহীদ সত্যেন বসু। তাঁর ভাইয়ের নাম ছিল ভূপেন বসু। তিনিও ডাকসাইটে বিপ্লবী ছিলেন। এই ভূপেনের ডাকনাম ছিল ক্যাদেন। ওই গলি সেসময় বিপ্লবীদের আনাগোনায় বারুদ হয়ে ছিল। আর এখন বিশেষত্বহীন নিরীহ একটা নির্জন গলিপথ,' সাহিল বলল।

'ইন্টারেস্টিং,' শৌনক বলল, 'রিসেন্টলি মানে এই কয়েকদিন আগেই আমিও ক্যাদেনবাবুর গলি দিয়ে ওপাড়ায় গেছিলাম একটা কাজে।'

আগ্রহটা বুঝতে না দিয়ে নিরীহ মুখে সাহিল প্রশ্ন করল, 'পুরোনো মেদিনীপুর নিয়ে কিছু খোঁজাখুঁজি করছিলেন নাকি?'

'তা বলতে পারেন। আসলে ওপাড়ায় আমার ছোটোবেলার বন্ধু রূপেনের বাড়ি।'

'কোন বাড়িটা বলুন তো?'

'বোস ম্যানশন। জানেন?

'জানব না? ওপাড়ায় ওটা তো খুব পুরোনো বাড়ি। আপনার বন্ধু বোধহয় এখন আমেরিকায় সেটল্ড।'

'হ্যাঁ। ছোটোবেলায় ওই বাড়িতে আমার খুবই যাতায়াত ছিল। আমি, আমার বন্ধু প্রতুল, রূপেন, রূপেনের বোন প্রতিমা কত যে দুষ্টুমি করেছি ওখানে। এখনও যাই মাঝেমাঝে। কাকিমা আছেন এখনও। ওই কাকিমার কথাতেই ওপাড়ার আরেকটা বাড়িতে একটু খোঁজখবর নিচ্ছিলাম,' শৌনক বলল।

'আরেকটা বাড়ি? কোথায়?' সাহিল জিজ্ঞাসা করে।

শৌনক মিটিমিটি হেসে চশমায় ঝিলিক তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কোন বাড়িটা বলুন তো? দেখি, গেস করতে পারেন কিনা!'

প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে যায় সাহিল। ডান হাতটা মুখের ওপর বোলাতে বোলাতে থতোমতো খেয়ে বলে, 'আ-আমি... আমি কী করে বলব?'

'আপনি ওই মহল্লার বাসিন্দা। আপনাদের পরিবারও ওখানে তো খুবই পুরোনো। তাই বলছিলাম, পুরোনো মেদিনীপুরের খবর থাকতে পারে এমন কোনো বাড়ির খবর আপনার জানা থাকলেও তো থাকতে পারে, না কি?' শৌনক ঠোঁটের কোণে ধারালো হাসিটা কেন জানি ধরে রেখেছে।

'অনেক... অনেকগুলো পুরোনো বাড়িই তো আছে ওখানে... হতে পারে হয়তো সানুবাবুর বাড়ির পাশের ঘরগুলো... ওখানে তো কোন এক কর্নেল সাহেবের নীলের গোলা ছ্-ছিল একসময়... তাই য-যদি হয়...' সাহিলের কথা তুতলিয়ে যাচ্ছিল।

'যে-বাড়িটা ভেঙে এখন নতুন পেল্লায় বাড়ি উঠেছে? যেটার পাশের দিকের ঘরগুলোতে ছাত্ররা মেস করে আছে, সেটার কথা বলছেন? সেখানে আগের চিহ্ন কি কিছু আছে যে, পুরোনো মেদিনীপুর সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে সেখানে?' শৌনকের দৃষ্টি কেমন ভাবলেশহীন নিথর হয়ে উঠল।

সাহিল হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'তাহলে আমি জানি না। বলতে পারব না।'

'মসজিদের আগের বাড়িটা কেমন?' শৌনক নাছোড় গলায় জিজ্ঞেস করল।

'কাকাতুয়া-বাড়ি? ওখানে গেছিলেন নাকি আপনি?' সাহিল একান্ত নিরীহ চোখে প্রশ্ন করে।

'মসজিদের আগে তো আরও অনেকগুলো পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়ি আছে, মসজিদের আগের বাড়ি বলতেই আপনার হঠাৎ কাকাতুয়া-বাড়ির কথাই মনে এল কেন, সাহিলভাই?' সেই হাসিটা শৌনকের চোখে আবার ফিরে এসেছে। মুখে হাসি নেই, শুধু চোখটা হাসছে।

একটা সুস্পষ্ট অসোয়াস্তির ভাব সাহিলের মুখে ফুটে উঠল দেখেই বোধহয় শৌনক চেয়ার থেকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য উঠে গেল। ছাদের পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে কী যেন দেখল সে। তারপর ফিরে এল আবার চেয়ারে।

লিলি বলল, 'তোমাদের আর-এক প্রস্থ চা দিই? আমিও নেব।' দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। লিলি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে লাগল কাপে। চায়ে চুমুক দিয়ে সাহিল বলল, 'ওখানে পুরোনো অনেক বাড়ি থাকলেও কাকাতুয়া-বাড়িটাই সবচেয়ে পুরোনো। তাই বলছিলাম। আপনি কি সত্যিই ওখানে গেছিলেন?'

'সাহিলভাই, আপনি যদি কারও কাছে কিছু কথা গোপন করেন, তাহলে সেও আপনার কাছ থেকে তার কথা গোপন করবে, তাই নয় কি?' শৌনক কেটে কেটে বলল।

লিলি চমকে উঠে শৌনকের দিকে তাকাল। বলে উঠল, 'এই! তুমি কী এসব বলছ সাহিলকে? ও আজ প্রথম দিন এসেছে আমাদের বাড়ি।'

সাহিলও চমকে গেল শৌনকের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু বাইরে তা ফুটে উঠতে দিল না। শান্ত, নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'আমি কেন আপনার কাছে কথা গোপন করব, শৌনক? কী কথা আছে আমার, যা গোপন করার মতো?'

'সেটাই তো প্রশ্ন, সাহিলভাই। সেটা তো আমি জানি না। গোপনীয় কিছু কথা,

আড়াল করার মতো কিছু কথা আপনার কাছে না থাকলে আমার প্রশ্নের এমন শান্ত, নিরাবেগ উত্তর দিতে পারতেন আপনি? সেক্ষেত্রে আপনি অবাক হতেন আমার কথা শুনে,' এই পর্যন্ত বলেই শৌনক সাহিলের কাছে কিছুটা সরে এসে নরম স্বরে বলল, 'আপনি বলুন না, সাহিলভাই। আমার মনে হচ্ছে, আপনি কিছু কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। বলে ফেলাই ভালো এক্ষেত্রে। তাতে যা হওয়ার হোক।'

'আপনি কী থেকে এসব বলছেন আমাকে?' সাহিল সামান্য উষ্ণ স্বরে বলল। যদিও ভেতরে ভেতরে সে মিইয়ে আসছে।

চায়ের কাপটা হাত থেকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে শৌনক বলল, 'কিছু একটা চিন্তা আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সেটা এমনই যে, আপনার রাতে ঘুম হয় না। চোখের নীচে অনিদ্রার কালো ছাপ। পুরোনো বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতেই উত্তর দেওয়ার আগে মুখের কাছে ডান হাতটা নিয়ে গেলেন। কথা গোপন করতে গিয়ে মানুষ এটা করে প্রায়শই। অতি সাধারণ একটা প্রশ্নের উত্তরে আপনার কথা আটকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই কথা বলতে বলতে কীসের যেন চিন্তায় বা উদ্‌বেগে নিজের মনে তলিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ারে বারবার বসার পজিশন পালটাচ্ছেন। ভেতরে ভেতরে খুব ঝড় চলছে আপনার, একটু ভালো করে আপনাকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়... আপনি নিজের থেকে না বললে, আমরা তো আপনার অশান্তিটা বুঝতে পারব না, সাহিলভাই। আমাদের আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। লিলি আপনার ব্যাচমেট। আমাকে না বলতে পারেন, লিলিকেই বলুন। আমি উঠে যাচ্ছি...' অনেকগুলো কথা বলে শৌনক চেয়ার থেকে উঠে যাওয়ার আয়োজন করতে লাগল।

লিলি বলল, 'হ্যাঁ রে, কী হয়েছে, বল না!' তারপর শৌনকের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ গো?' আবার সাহিলের দিকে চেয়ে বলল, 'বল। বলে ফ্যাল, সাহিল। দেখবি, হালকা লাগবে।'

শৌনক বাধা দিয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও, লিলি। জোর করার দরকার নেই। আমি একটু নীচে যাই। মেয়েটা ফিরল না এখনও কেন...?'

কিন্তু উঠে যাওয়ার আগেই সাহিল বলল, 'বসুন। যাবেন না।'

শৌনক ফিরে এসে চেয়ারে বসল। সময় দিল সাহিলকে। সাহিল যেন নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিল খানিক। তারপর বলল, 'বলছি। কিন্তু সে অনেক কথা। অনেক দিনের কথা।'

শৌনক আর লিলি উৎকর্ণ হয়ে বসেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ছাদের ওপর নেমে এসেছে। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। দূরের রাস্তার আলো, আশেপাশের বাড়িগুলোর আলো বাঁকাভাবে এসে পড়েছে আকাশমণি গাছটার ওপর।

ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বলতে লাগল সাহিল। যেমনটা সে শুনেছিল তার বাবা

সামশের হুসেনের কাছে ট্রেজার প্রোটেক্টারের ব্যাপারটা। তাদের পরিবার এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কী ধরনের কাজ করতে হয় তাদের, সেসব কথা। কয়েক বছর আগে থেকে যে ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে সে নির্দেশ পেতে শুরু করে সেকথাও। তারপর ট্রেজার প্রোটেক্টারের চিফ কীভাবে তার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেন, সেকথাও এসে পড়ল।

সাহিলের কথা শুনতে শুনতে এই জায়গাটায় এসে শৌনক চমকে লাফিয়ে উঠে বলল, 'ক-কী? কী নাম বললেন চিফের?'

'সুশীতলবাবু। তবে এটা তাঁর আসল নাম হতে পারে না। আমরা ট্রেজার প্রোটেক্টারে প্রত্যেকেই অন্য নাম ব্যবহার করি।'

'তাহলেও... তাহলেও...' কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল শৌনক। যেন কোথাও একটা হিসেব মিলতে গিয়েও মিলছে না। তারপর আবার শান্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, সে থাক। বলে যান।'

সাহিল বলল, 'আসলে এই যে আপনাদের সব ভেঙে বলছি, ট্রেজার প্রোটেক্টারের নিয়মবিরুদ্ধ এভাবে বলা। কিন্তু সুশীতলবাবুর গোপন মেসেজগুলো থেকে আমার ক্রমাগতই আবছা আবছা মনে হতে থাকে...'

লিলি জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হতে থাকে?'

'মনে হতে থাকে, এ যেন সে লোক নয়।'

'কেন মনে হল এমন?' শৌনক প্রশ্ন করল।

'কেননা টি.পি-র চিফ কখনও এমন নিয়ম ভেঙে কোনো মেম্বারের সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর প্রস্তাবটাও অদ্ভুত লেগেছিল। তারপর যেভাবে দেখা হল...'

এই পর্যন্ত বলে একটু থামল সাহিল। তারপর চিফের সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই ভয়ংকর সর্পসঙ্কুল সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে বলল সে। শুনতে শুনতে শিউরে উঠল লিলি। গা গুলিয়ে উঠল তার। শৌনকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

আবার সব চুপচাপ। শুধু সন্ধ্যার শান্ত বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে। খুব হতাশ স্বরে একসময় সাহিল বলল, 'সবই তো বলে ফেললাম। আব্বাকে যে কথা দিয়েছিলাম, রাখতে পারলাম না। নিজেকে সত্যিই খুব অপরাধী লাগছে এখন।'

অন্ধকারের মধ্যেই যেন হাসল শৌনক। তারপর বলল, 'আপনি এখনও সব কথা বলেননি, সাহিলভাই।'

'মানে?'

'আমার উপরেও তো নজরদারি করার নির্দেশ এসেছিল আপনার কাছে, তাই না? কেন গিয়েছিলাম আমি কাকাতুয়া-বাড়িতে, সে ব্যাপারে খবর নিতেই তো বলা হয়েছিল আপনাকে?'

স্তম্ভিত সাহিল কোনোমতে বলতে পারল, 'কিন্তু আপনি কীভাবে... ?'

'কীভাবে বুঝলাম ? বুঝলাম আপনার আচরণ থেকে। আপনি আজ প্রথমে এসেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার স্টাডিটা দেখছিলেন। প্রায় স্ক্যান করার মতো করে। লিলি চা বানাতে কিচেনে গেলে আমি আপনাকে বসতে বলে টয়লেটে গেছিলাম। ফেরার পথে আপনার ছায়া দেখলাম, আপনি আমার স্টাডি-টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে কী যেন খুঁজছেন। আমার পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্রই ছিটকে সরে গেলেন। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

'আপনার পাওয়ার অফ অবজারভেশন সাংঘাতিক,' সাহিল বলল।

'তা নয়। আমার পাওয়ার অফ অবজারভেশন গড়পড়তা মানুষের মতোই। আমি শুধু সেটা ব্যবহার করি। আর কিছু না। তারপর ছাদে এসে কথায় কথায় কাকাতুয়া-বাড়ির কাছের ক্যাদেনবাবুর গলির কথা তুললেন আপনি। কায়দা করে জানতেও চাইলেন, আমি কী খুঁজছি ও পাড়ায়। পুরোনো বাড়ির প্রশ্নে প্রথমে ইচ্ছে করে সানুবাবুর বাড়ির কথা বললেন, যেখানে সব ভেঙে নতুন অট্টালিকা উঠেছে। কিন্তু তারপরই আমার ফাঁদে পা দিলেন। যেই আমি মসজিদের আগের বাড়িগুলোর কথা বললাম, আপনি ঠিক কাকাতুয়া-বাড়ির কথাই তুললেন। আমার সন্দেহটা মিলে গেল আরও একটা ব্যাপার থেকে।'

'আরও আছে?' সাহিল উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'আছে। আপনি আর লিলি গল্প করতে করতে খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, বারবার বাইকের শব্দ আসছিল সামনের রাস্তা থেকে। এই এলাকাটা এসময়ে নির্জন হয়ে যায়। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাও নয় কোনো জনবহুল সড়ক। আমার মনে হয়েছিল, একটাই বাইক বারবার আমাদের বাড়ির চারিদিকে চক্কর খাচ্ছে। একই রকম আওয়াজ। সেজন্যেই মাঝখানে আমি উঠে গিয়েছিলাম ছাদের পাঁচিলের দিকে। দেখলাম, ঠিকই। লাইটপোস্টের ঠিক নীচে একটা বাইক দাঁড় করিয়ে একটা লোক একদৃষ্টে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। আপনার ওপরেও নজরদারি করা হচ্ছে, সাহিলভাই!'

কথাটা শুনে ভয়ে নিথর হয়ে গেল সাহিল। লিলি বলে উঠল, 'এ বাবা! কী হবে?'

শৌনক উত্তর দিল, 'কিছু হবে না। আমার কাছে আপনি কোনো তথ্য পাননি, এই কথাটাই আপনি টি.পি-র লোকেদের ভিপিএন মারফৎ জানিয়ে দেবেন। বলবেন, বাড়িটা এমনি পড়ে আছে দেখে মেয়ে আর ভাগ্নেকে নিয়ে আমি ওখানে গেছিলাম একটা কোচিং ক্লাসের জন্য ভাড়া পাওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে কথা বলতে। বাড়ির মালিক রাজি হননি।'

যেন এতক্ষণে হালে পানি পেয়ে সাহিল বলল, 'ওফ, বাঁচালেন আমাকে। কিন্তু...

কিন্তু আমি যে সব কথা আপনাকে বলে ফেললাম। আব্বাকে দেওয়া কথা রাখতে পারলাম না... গদ্দারি করলাম ট্রেজার প্রোটেকটারের সঙ্গে...'

লিলি বলল, 'সে তো তোদের চিফও করেছে। নিয়ম ভেঙে দেখা করেছে তোর সঙ্গে। আর তার যা মতলব, তাতে তো লোকটাকে শয়তানের অনুচর বলেই মনে হচ্ছে আমার। বলেছিস, বেশ করেছিস। এখন অনেক হালকা লাগছে না তোর?'

'তা লাগছে। আজ অনেকদিন পর রাত্রে ঘুমোতে পারব আমি,' সাহিল কৃতজ্ঞ স্বরে বলল।

শৌনক গম্ভীর গলায় বলল, 'দেখুন, সাহিলভাই। এটাই হয়। যেকোনো অরগানাইজেশন, প্রথমে তা যত মহৎ-ই থাকুক না কেন, ধীরে ধীরে তা বড়ো হয় এবং বড়ো হওয়ার সাথে সাথে তাতে ভুলভাল লোক ঢুকতে থাকে। একটা সময় আসে, যখন সঙ্ঘের আদর্শকে যারা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে সেই সব নেতা-গোছের লোকের সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠ সাধারণ সদস্যদের সংঘাত বাঁধে। স্বার্থপর লোকগুলো সাধারণত অরগানাইজেশনের পাওয়ার স্ট্রাকচারের ওপরের দিকে থাকে, অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় হয়। এবং ওই নেতৃস্থানীয় স্বার্থপর লোকগুলো অরগানাইজেশনের আইডিওলজিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ইন্টারপ্রেট করতে শুরু করে। ফলত, সাধারণ আদর্শনিষ্ঠ সদস্যদের মনে হয়, নেতার বিরুদ্ধাচরণ করা মানে অরগানাইজেশনের মূল নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা। এভাবে ভাবতে গিয়ে সাধারণ আদর্শনিষ্ঠ সদস্যের মনোবল ভেঙে যায়। সে আর বিদ্রোহ করতে পারে না নেতাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে।'

সাহিল মন দিয়ে শুনল ব্যাখ্যাটা। বলল, 'বুঝলাম। ঠিকই বলেছেন। আর এসব তো আবার সিক্রেট অরগানাইজেশন। করাপশনের সব থেকে বেশি চান্স। কিন্তু একটা ব্যাপার বলুন তো!'

'কী, বলুন।'

'বলছি, সুশীতলবাবু এমন পালটে গেল কেন?'

'সেটা আমিও ভাবছি। এখনও সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তার নাম সুশীতল... এ ব্যাপারেও একটা খটকা আছে। আপনাকে সেসব বলব আরেকদিন। এখনও সময় আসেনি,' অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে চেয়ে বলল শৌনক।

'আপনাদের কী বলে যে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাব, জানি না। আই আম রিয়ালি রিয়ালি গ্রেটফুল টু বোথ অফ ইউ। আল্লাহ্ আমার বিপদের দিনে আপনাদের দুজনকে নিয়ে এসেছেন আমাকে বাঁচাতেই...'

আরও কীসব বলতে যাচ্ছিল সাহিল। শৌনক তাকে থামাল। বলল, 'এটা কিছুই নয়, সাহিলভাই। কাউকে তো দরকারই ছিল আপনার সব কথা খুলে বলার জন্য। আর

লিলি তো আপনার পুরোনো বন্ধু। আমিও কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম। আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে সে সমস্ত অন্ধকার জায়গায় হালকা আলোর আভাস এসে পড়ছে একটু একটু।'

আরও দু-এক কথা হওয়ার পর সাহিল বিদায় নিল। ওকে গেটের কাছ অবধি এগিয়ে দিয়ে এল লিলি আর শৌনক। গেটের কাছে এসে শৌনক সাহিলের দিকে ঝুঁকে চাপা স্বরে উচ্চারণ করল, 'সাবধানে থাকবেন।'

দরজা বন্ধ করে শৌনকের কাছে সরে এসে লিলি বলল, 'আমার কিন্তু খুব ভয় করছে, শৌনক। কোন কুক্ষণে যে তুমি এই কাকাতুয়া-বাড়িটাতে গেলে ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে! এমন যে হবে আমি ভাবতেই পারিনি।'

শৌনক লিলির কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুমি তো খুব সাহসী মেয়ে, লিলি! ভয় কোরো না। এখনও কিছুই হয়নি তো! দ্যাখো, যে ভয় পায়, সে মরার আগেই আদ্ধেক মরে যায়। কী হল? তোমার হাত দুটো এত ঠান্ডা কেন?'

লিলি শৌনকের আরও কাছে সরে এল। বলল, 'ও কিছু না। তুমি আমাকে বলো, এখন থেকে যা করবে, আমাকে সব জানিয়ে করবে—কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ সব। ইশ্, দুশ্চিন্তায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার! আর এই মেয়েটা...কোথায় যে গেল... এখনও ফিরল না... ওফ্!'

লিলির কথা শেষ হওয়া মাত্রই কলিং বেল বেজে উঠল। শৌনক দরজার পিপ-হোলে চোখ রেখে দেখল, গেটের সামনে পেখম দাঁড়িয়ে আছে।

১৩

বাড়িটাকে মাঝে মাঝে একেবারে অচেনা লাগছে লিলির। সব সময় নয়, মাঝে মাঝে। বিয়ের পর থেকে এত বছর এই বাড়িটাতেই রয়েছে, শৌনকের মা-বাবার স্মৃতি এখনও এবাড়িটার কোনায় কোনায়, লিলি-শৌনকের সংসার, পেখমের হওয়ার আর বেড়ে ওঠার স্মৃতি—সবই তো অমলিন, তবু হঠাৎ হঠাৎ এমন সব একলা হয়ে যাওয়া দুপুরে রান্নাঘরে কিংবা ডাইনিং স্পেসে কাজ করতে করতে চোখ তুলে দেখে কেমন যেন মনে হয় তার, এ কোথায় এসেছে সে, কোথায় আছে, ঘরটা যেন একদম অচেনা। যেন প্রথমবার চেয়ে দেখছে ঘরটা। কেন যে এমন হচ্ছে তার, লিলি বুঝতে পারছে না।

শৌনক আর পেখমের কলেজ খুলে গেছে। দালিও ফিরে গেছে কলকাতায়। যাওয়ার আগের দিন এসেছিল দালি, শৌনক একগাদা বই দিল দালিকে পড়তে। বলল, 'কিছুটা বোঝা গেলেও কাকাতুয়া-বাড়ির রহস্যের অনেক ক'টা গিঁটই তো খুলল না। আচ্ছা, আর-একটু সময় যাক—ভাবি। তুমি এর মধ্যে বইগুলো পড়ে ফেলো, দালিবাবু। তবে তুমি যা কল্পনাপ্রবণ, সাবধানে পড়ো বইগুলো। বইয়ের ভেতর অক্ষরের অলিগলিপথে নিজেকে হারিয়ে ফেলো না যেন। অক্ষরেরা বড়ো নাছোড়। সময়ে সময়ে পড়ুয়াকে গিলে নিতে থাকে।'

বইগুলো ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের ওপর লেখা।

ওদের স্কুল-কলেজ খুলে যাওয়ার পর দিনের বেশিরভাগ সময়টাই লিলি একা বাড়িতে। লিলিদের নাটকের গ্রুপে এখন কিছুদিন কোনো নতুন প্রোডাকশনও নেই। রিহার্সাল তাই বন্ধ। মাঝে মাঝে শপিং করতে বেরোয়। কিংবা অন্যান্য টুকিটাকি কাজ থাকে বাইরে। কিন্তু সেগুলো তেমন বেশি কিছু নয়। বেশিরভাগ সময়টাই বাড়িতে। কতই আর ঘরের কাজ করা যায়। এমনিতে এটাই লিলির চিরদিনের রুটিন। তবু এবার ওদের সামার ভ্যাকেশনের সময় এতটাই জমজমাট হয়ে উঠেছিল বাড়িটা যে, এখন আবার সব আগের মতো নিস্তরঙ্গ হয়ে যেতেই মনটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

সাহিল আর আসেনি। সেদিন বাড়ি ফিরে ওর মায়ের নম্বর থেকে মেসেজ করেছিল: রিচড সেফলি। নো প্রবলেম অন দ্য ওয়ে। দিস ইজ মাই মাদারস নাম্বার—সাহিল। দুদিন পরে আবার সেই একই নম্বর থেকে মেসেজ এল : ফলোড

ইন্সট্রাকশন অফ শৌনক। সেম মেসেজ সেন্ট। টেমপোরারিলি রিলিভড। পিস রেস্টোরড। বাট নো নট হাউ লং। লাভ—সাহিল।

মায়ের নম্বর থেকে মেসেজ করছে মানে নিজের ফোন-নম্বর নিরাপদ মনে হয়নি সাহিলের। শৌনকের কথামতো সে মেসেজ করেছে টি পি চিফ-কে এই মর্মে যে, শৌনক কাকাতুয়া বাড়িতে কোচিং ক্লাসের ঘর ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলতে গেছিল। বোঝা যাচ্ছে, টি পি-র লোকেরা ওকে এখন আর আপাতত জ্বালাচ্ছে না। কিন্তু এ স্বস্তিও স্থায়ী নয়, কতদিন পর আবার উৎপাত শুরু হবে কে জানে! টি পি-র চিফ লোকটার কার্যকলাপ সম্পর্কে সাহিল যা বলেছে, শুনতে শুনতে ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। বেশ আজব লোকও বটে। যতবার কাঁসাই নদীর চরের ঘটনাটা নিয়ে ভেবেছে লিলি, ততবার ঘৃণায় আতঙ্কে গা-হাত-পা গুলিয়ে বমি-বমি ভাব হয়েছে। কোন অন্ধকার জগতের জীব এরা, কে জানে!

দুপুর দুটো বাজে। রিমোট টিপে টিভি অফ করল লিলি। সারা ঘরে ফ্যানের শন্ শন্ শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। এপাড়াটা এমনিতেই চুপচাপ, তার ওপর দুপুরবেলা তো একেবারে স্পন্দহীন হয়ে যায়। পেখমের সারাদিন ক্লাস আজ, সেই সন্ধেয় ফিরবে। সোফায় অর্ধেক হেলান দিয়ে বসে সেলফোনে খুটখুট করছিল লিলি। কিছুক্ষণ পর আলগোছে হাই তুলল, বড়ো বিরক্ত লাগছে। কোথাও যাবে? কোথায় যাবে? দুপুর-রোদে ঘুরে বেড়াবে এখন কোথায় একা একা? দুপুরে ভাতঘুমের অভ্যেস তার নেই।

শৌনকের স্টাডিতে গিয়ে ঢুকল। এটা ওটা ঘাঁটছে। এ বই সে বই। মোটা মোটা অঙ্কের বইগুলো দেখলেই তার ভয় লাগে। ওই বুকশেলফটা থেকে সরে এসে অন্য দেওয়ালের দিকে গেল। শৌনকের নানারকম ইন্টারেস্ট। পেখমেরও। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, অপরাধবিজ্ঞান, সাহিত্য...। অনেকদিন পর 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' নাটকটা দেখতে পেল লিলি। কোন সে কলেজবেলায় পড়েছিল। তারপর আর খোলা হয়নি। এঘরে এসে খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে পাতা উলটোল। পড়ল একটা অ্যাক্ট। কী দারুণ পড়াতেন শ্রাবস্তীদি! তখন কিন্তু ভালো করে বুঝত না এসব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের এই টেম্পটেশনগুলো এখন ধরতে পারে, নাটকের ক্রাইসিস পয়েন্টগুলো অনেক বেশি ক্লিয়ার লাগছে এখন। বাংলায় অনুবাদ হয়নি এটা? গ্রুপে কথাটা পাড়বে। হোয়াটস্যাপ খুলল। তারপর কেন জানি বেরিয়ে এল অন্যমনস্কভাবে। শৌনকের নম্বরটা খুঁজে বের করে ডায়াল করল।

ফোনটা বাজছে অনেকক্ষণ। ধরবে না মনে হয়। ক্লাসে থাকলে ফোন সাইলেন্ট করে রাখে। ছেড়ে দেবে? ছেড়েই দিতে যাচ্ছিল, একেবারে রিং হয়ে হয়ে ঠিক কেটে যাওয়ার আগে শৌনক ধরল।

'হ্যালো, লিলি! কী হল?'

'কিছু না। ভালো লাগছে না।'

'একা একা বোর হচ্ছ?'

'উপায় কী, বলো? আমার তো আর কলেজ নেই।'

'মন খারাপ কোরো না, লিলি। এই তো আরেকটা ক্লাস। তারপর চলে আসব।'

'অফ-পিরিয়ডে ফোন করলে তো পারো। বিবি বহুৎ পুরানি হো গয়ি হ্যায়—তাই না? কোল্ড টি আর ওল্ড ওয়াইফ, দুই-ই বেকার! হা হা হা!'

'ধুর, তুমি কী যে বলো না! লাইব্রেরিতে একটা কাজে ছিলাম। লাইব্রেরি থেকে তো ফোন করা যায় না, তুমি জানো। এই তো ঘণ্টাখানেক, চলে আসছি।'

মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোন কেটে দিল লিলি। না হয় আজ একটু দিবানিদ্রা দেওয়ারই চেষ্টা করবে লিলি। শৌনকের ফিরতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক। পেখম আরও আরও পরে। আছে ভালো বাপবেটিতে। শুধু তারই জ্বালা; একা একা বসে থেকে নিজের মাথা নিজেই চিবোনো। বিছানার ওপর চিত হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে ছিল লিলি।

ডিং ডং! হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে লিলি ধড়মড় করে উঠে বসল। কে এল এখন এসময়ে? তাহলে বোধহয় কোনো কারণে পেখমের তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই পেখম। হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে মূল দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। পিপ-হোলে চোখ রাখতে ভুলে গেল। ঝট করে তালা খুলে দরজার পাল্লা সরাতেই সামনের কাগজ-ফুলের ঝোপের পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখে একেবারে স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে গেল লিলি।

দেবলীনা! দেবলীনা কীভাবে এল এখানে? কাগজ-ফুলের বর্ণিল উচ্ছৃঙ্খলার পাশে ধূপের ছাইয়ের মতো ধূসর কুর্তি-পালাজোতে মোম-নরম দেবলীনার মুখ পড়ন্ত দুপুরের রোদে কেমন যেন ম্লান, বিষণ্ণ। লিলি তাড়াতাড়ি দরজা থেকে নেমে এসে দেবলীনার ব্যাগটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বলল, 'আয়, আয়, ভেতরে আয়!'

'হঠাৎ দেখে অবাক হয়ে গেছিস তো?' প্যাসেজ দিয়ে বসার ঘরে হেঁটে আসতে আসতে দেবলীনা জিজ্ঞেস করল।

'অবাক হব না? তোর সাথে কবে শেষ দেখা হয়েছিল বল তো? বছর দুই আগে। কলকাতায় একাডেমিতে। তারপর তো শুধুই ফোনাফুনি...'

'সরি, লিলি। ফোন করে আসতে পারলাম না। আসলে...'

'ছাড় তো এসব ফরমালিটি। ঘরে বসে বসে একা একা বোর হচ্ছি। আর এমনি করে চলে না এলে এমন সারপ্রাইজটা কি পেতাম? কী খাবি, বল। ঠান্ডা, না গরম? দুপুরে খেয়েছিস কিছু তুই?'

'না রে, চা-ই খাবো একটু। সকাল এগারোটার দিকে খেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।'

'ও মা! তাহলে তো সে অনেক আগে খেয়েছিস। এখন তো খিদে পেয়ে যাওয়ার কথা। চা-টা খেয়ে টয়লেটে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে। আধঘণ্টার মধ্যে ডাল-ভাত, ওমলেট-টোমলেট যাহোক কিছু একটা বানিয়ে দিই।'

'নাহ্, তুই ব্যস্ত হোস না, লিলি। আমি ওই একটু চা-ই খাব।'

'আচ্ছা, বোস তবে,' ফ্যানটা ফুলস্পিডে বাড়িয়ে দিয়ে লিলি রান্নাঘরের দিকে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

চায়ের জল চাপিয়ে আভেনের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কী হল, বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল লিলি। দেবলীনা। নাটকের ওয়ার্কশপ করতে কলকাতায় গিয়ে বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। পাইকপাড়ার দিকের একটা নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত দেবলীনা। ওর বাপের বাড়ি বর্ধমানে। বেশ অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে যে দেবলীনা, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কথায় কথায় জানা গেছিল, ওর বিয়েও হয়েছে বেশ অবস্থাপন্ন প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে। দেবলীনার স্বামী একজন পেইন্টার। দেশেবিদেশে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয় মাঝেমাঝে। এস আর শ্রীনিবাসন। ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারতীয়, দেখা হয়েছিল একবার রবীন্দ্রসদনের সামনে। বেশ হাসিখুশি অমায়িক সৌম্যদর্শন। দেবলীনার সঙ্গে বয়সের অনেকটা ফারাক নজরে পড়েছিল অবশ্য। তবু ওরা যে বেশ সুখী, পরস্পর-তৃপ্ত দম্পতি, তা তো মনেই হয়েছিল লিলির। পরে আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে দেবলীনার মুখে ওর স্বামীর কথা শুনেছিল টুকটাক। মজার কথাই বেশিরভাগ। ওই দু-চারবারই দেবলীনার সঙ্গে দেখাদেখি নাটকের সূত্রে, তা ছাড়া যা কথা ফোনে আর হোয়াটস্যাপে। সেই মেয়ে হঠাৎ না বলে-কয়ে চলে এল মেদিনীপুর? কেমন যেন ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগছে দেবলীনাকে। কী যে ব্যাপার!

প্লেটে চা আর স্ন্যাকস নিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল লিলি। দুজনে মুখোমুখি বসেছে। একথা সেকথা চলতে লাগল। মাঝখানে হঠাৎ দেবলীনা বলল, 'তোর বাড়িতে কিছুদিন থাকতে দিবি, লিলি? এই ধর হপ্তা দু-এক।'

চমকটা চায়ের সঙ্গে গিলে ফেলে লিলি বলল, 'আরে, এমন করে বলছিস কেন? থাক না তোর যতদিন ইচ্ছে। এই তো ওপরের তালায় একটা ঘরে আমার মেয়ে থাকে। বাকি ঘরগুলো ফাঁকাই। আগে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, ওই ঘরগুলোয় থাকতেন। এখন তালাবন্ধই পড়ে থাকে... কিন্তু কী ব্যাপার বল তো তোর? শ্রীনি-র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

কথাটা শুনে টেবিলের ওপর চোখ নামিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ দেবলীনা। লিলি দেখল, ওর ঠোঁট কাঁপছে। চোখে জল টলমল করছে। একটু সামলে নিয়ে দেবলীনা বলল, 'ঝগড়া করার জন্য মানুষটাকে তো পাশে থাকতে হবে আমার।'

'কী বলছিস কী তুই?'

'আজ মাস তিনেক শ্রীনি-র কোনো খবর নেই।'

'মানে?'

'মানে যা বলছি তাই। শিলিগুড়িতে একটা এগজিবিশন ছিল। কত করে বললাম, সঙ্গে যাই। নিল না। একাই গেল। তারপর আজ অবধি আর কোনো খবর নেই।'

'বলিস কী রে? কোনো ফোন বা মেসেজ?'

'ন-না। কিচ্ছু না। লাস্ট ফোন শিলিগুড়ি থেকে এগজিবিশনের সকালে।'

'সে কী। শ্রীনি তিন মাস হল মিসিং—পুলিশকে জানাসনি তুই?'

'সে তো জানাতেই হবে। দিন পনেরো দেখে ডায়েরি করলাম। পুলিশও ভীষণভাবে খুঁজছে। কিন্তু কোনো ট্রেস নেই এখনও। তবু মিডিয়াকে আড়াল করতেই হল। জানিসই তো শ্রীনি-র একটা পরিচিতি আছে। একবার খবর পেলে মিডিয়া পাগল করে দেবে গল্প ফেঁদে ফেঁদে। পুলিশও গোপনীয়তা রক্ষা করে চলছে আমার অনুরোধে। কিন্তু এভাবে আর কত দিন?'

'ওর বন্ধুদের, ছবির ডিলারদের, আর্ট কনাসাঁদের কী বলেছিস?'

'বলেছি, ফরেন ট্যুরে আছে। কানাডায় যাবে, টেক্সাসে যাবে। বন্ধুবান্ধব ওর চিরকাল একটু কমই। এমনিতেই চাপা স্বভাবের মানুষ শ্রীনি। সবার সঙ্গে মেলামেশা করে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ যোগ কারও সঙ্গেই নেই। ওর জগৎটায় শুধু ওর স্টুডিয়ো আর আমি।'

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল দেবলীনা। লিলি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। ধীরে ধীরে কান্নার মধ্যেই বলতে লাগল দেবলীনা, 'কোথায় যে গেল মানুষটা? সারাদিন নিজে যেমন পাগল, আমাকেও তেমনি পাগল করে রাখত... আর্টিস্ট লোক... খালি ফ্যান্টাসি আর ফ্যান্টাসি... কোনো বাস্তববোধ নেই। এখন আমি বর্ধমানে মায়ের কাছেও যেতে পারছি না। কী বলব গিয়ে? মনগড়া কতগুলো কথা বলে নিজের মনের ভেতর এতগুলো চিন্তা চেপে রেখে কী করে বাঁচব? তাছাড়া শ্রীনি-র আর আমার বিয়েটাও তো ভালোভাবে মেনে নেয়নি আমার বাপের বাড়ির দিকের লোকেরা। ওর আর আমার বয়সের ডিফারেন্স... এইসব। বাপের বাড়িতে যাতায়াত কমেই এসেছিল এই কটা বছরে, তাই এখন আর...'

'বেশ করেছিস, চলে এসেছিস। একদম ঠিক করেছিস।'

'ফোনে বা হোয়াতে এত কথা কীভাবে বলতাম, বল?'

'না, না, সে ঠিকই আছে। ফোনেটোনে না বলে ভালোই করেছিস। কিন্তু আমি ভাবছি, গেলেন কোথায় ভদ্রলোক?'

চিন্তামগ্ন স্বরে দেবলীনা বলল, 'সেই তো ভাবছি!'

'আচ্ছা, এর আগে কখনও এমন হয়েছে? চলে গিয়ে খবর দেয়নি শ্রীনি, তারপর ফিরে এসেছে...এমন?'

'তা হয়েছে। এমনিতেই তো খুব খেয়ালি লোক। লাস্ট গেছিল বছরখানেক আগে। রাজপুতানা। সেবারও কোনো খবর দেয়নি। তবে এত দিনের জন্য নয়। এই ধর দিন কুড়ি-পঁচিশ। এরকম হয়েছে দু-একবার। লাস্ট বার খুব কেঁদেছিলাম ওর ফেরার পর। বলেছিলাম, আমাকে ছুঁয়ে বলো এরকম আর কখনও করবে না। কথা দিয়েছিল। কিন্তু কই? যে-কে সেই। এখন তো বয়েস হয়েছে, প্রেশারের ওষুধগুলো...কে জানে, কোথায় আছে...ঠিকমতো ওষুধটষুধ খাচ্ছে কি না...কী যে করছে... অ্যাতোদিন হয়ে গেল...'

'এবারেও দেখবি ঠিক ওরকমই হবে। হঠাৎ করেই ফিরে আসবে শ্রীনি,' কথাটা বলতে বলতেই লিলির মনে হচ্ছিল নিজের কথাতেই সে তেমন জোর পাচ্ছে না।

'চল ওপরে। ঘর খুলে দিই। সব গোছানোই আছে ঘরে। স্নানটান করে নে। এতটা জার্নি করে এসেছিস। দুটি কিছু মুখে দিলে পারতিস,' তড়বড় করে বলে উঠল লিলি।

সিঁড়ি বেয়ে লিলি উঠছিল প্রথমে। ব্যাগ হাতে দেবলীনা তার পেছন পেছন। দোতলায় এসে দরজার তালা খুলতে খুলতে লিলি বলল, 'ব্যাপারটা বলব আমি শৌনক ফিরলে? ও এসব কথা নিজের কাছেই রাখবে, পাঁচকান করবে না। তুই পুরোপুরি ট্রাস্ট করতে পারিস কিন্তু।'

কী যেন নিজের মনে একটু ভাবল দেবলীনা। তারপর উত্তর দিল, 'বলিস। তবে আজকেই না। আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক শৌনকের, তারপর। কাল বলিস। আমার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত ওর আলাপ-পরিচয়ই তো হয়নি।'

'বেশ। চেঞ্জ করে নে। একটু বিশ্রাম কর। আমি দেখি একটু এদিকে। শৌনক এসে যাবে এবার,' দেবলীনার দিকে এক পলক চেয়ে লিলি ঘর ছেড়ে গেল।

ব্যাগ খুলে একটা চুড়িদার বের করে টয়লেটের দিকে গেল দেবলীনা। স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাড়িটা খুব নির্জন। শান্তি। এই ক-টা মাস যা গেছে তার।

কিন্তু এই শান্তি শুধু বাইরে। যে অশান্ত মন নিয়ে সে এসেছে, তার নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি শান্তি অধরাই থেকে যাবে।

শ্রীনি-র খবর নেই আজ তিন মাস। প্রত্যেকটা দিন ভাবত, আজ আসবে। আজ নয়, কাল। এদিকে শ্রীনি-র দু-চারজন বন্ধু যা আছে, বারবার ফোন করছে দেবলীনাকে। বলছে, শ্রীনিবাসের ফোন বন্ধ, ওরা যোগাযোগ করতে পারছে না। উত্তরে দেবলীনা বলেছে, শ্রীনিবাস বিদেশে গেছে। শ্রীনি-র বিদেশের ফোন নম্বরও চেয়েছে কেউ কেউ। দেবলীনা এড়িয়ে গেছে কোনোমতে। কিন্তু আর তো এখন পারছে না।

ভাগ্যিস শ্রীনিবাসের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই যে ফোন করবে। শ্রীনিবাস ছোটোবেলায় মা-কে হারিয়েছে। কলেজজীবনে বাবাকে। ওরা আদতে মাদুরাইয়ের লোক। এসব কথা ওকে শ্রীনি-ই বলেছিল বিয়ের আগে আগে। পরে শ্রীনিবাস আর্টিস্ট

হিসেবে নামধাম করে একটু টাকাপয়সা হওয়ার পর চেন্নাইতে একটা ফ্ল্যাট কিনেছিল। দেবলীনা শ্রীনিবাসের সঙ্গে ছিলও কিছুদিন চেন্নাইতে। কিন্তু সেই ফ্ল্যাট এখন বিক্রি করে দিয়েছে। গত দশ বছর কলকাতাতেই আছে ওরা। কলকাতার বাড়িতেই স্টুডিয়ো করেছে শ্রীনি।

হ্যাঁ, এভাবে আর পারছে না। আজ নয় কাল ব্যাপারটা চাউর হবেই। তখন কী যে দাঁড়াবে, দেবলীনা ভাবতে পারছে না। এখনই পুলিশ যে ওকেও সন্দেহ করছে, ওদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে দেবলীনা সেটা বুঝতে পারে।

শ্রীনিবাসের সঙ্গে এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটানোর স্মৃতি বারবার মনে পড়ে। খেয়ালি ছিল শ্রীনি। কিন্তু ওকে পাগলের মতো ভালোবাসত। কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে একটা ছবির এগজিবিশনে গিয়ে শ্রীনি-র সঙ্গে প্রথম আলাপ। কয়েকজন চিত্রশিল্পী মিলে প্রদর্শনীটা করেছিল। শ্রীনি-র ছবিও ছিল তাতে। ছবি নিয়েই কথা হয়েছিল সেদিন। শ্রীনিবাসের কথাবার্তা, ব্যবহার সব কিছুতেই একটা আলগা টান অনুভব করেছিল দেবলীনা। ধীরে ধীরে দুজনের দেখা হতে থাকে। ছবি নিয়ে অনেক পড়াশোনা শ্রীনিবাসের। বাধ্য ছাত্রীর মতো বয়সে অনেকটা বড়ো এই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন চিত্রকরের কথাগুলো গোগ্রাসে গিলত দেবলীনা। শ্রীনিবাস জানতে চেয়েছিল, 'তুমি ছবি আঁকতে পারো না, দেবলীনা? ইচ্ছে হয়নি কখনও?'

'না, ছবি আঁকতে পারি না আমি। দেখেছি চেষ্টা করে দু-একবার। ভগবান আমাকে ওই প্রতিভা দেননি।'

'প্রতিভার দিকে তাকিয়ে থাকলে তো মুশকিল। মানুষ চেষ্টা করলে কী না পারে? এই দ্যাখো না, আমিও তো বাংলা জানতাম না আগে। শিখে তো নিয়েছি।'

'হ্যাঁ, সেটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগে। এত ভালো বাংলা শিখলেন কীভাবে আপনি? উচ্চারণে দক্ষিণী টানটুকুও প্রায় নেই!'

'মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায়, দেবলীনা। আমি নিজেকে বলেছিলাম, শিখতেই হবে। এত সুন্দর, এত ঐশ্বর্যশালী ভাষা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা। অবনীন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথের ভাষা। মনকে বারবার তুমি যা বলবে, মন একদিন তা মেনে নিতে বাধ্য হবে,' শ্রীনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল।

'তার মানে আমিও চাইলে পেইন্টিং শিখতে পারি?'

'আলবত পারো। আমার মনে হয়, তোমার মধ্যেই ছবি আছে।'

'আমাকে শেখাবেন?'

'প্রাথমিক যেটুকু, তা আমি তোমার সঙ্গে শেয়ার করতেই পারি। ছবি দেখা, দেখতে শেখা খুব জরুরি এ ব্যাপারে। এসো না হয় একদিন আমার ডেরায়।'

'কোথায় থাকেন?'

'আপাতত সল্টলেকে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকি। ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।'

গেছিল দেবলীনা। সেই যাতায়াত শুরু। শ্রীনিবাস ওকে আঁকা শেখাত। ছবি দেখাত পৃথিবীর প্রখ্যাত শিল্পীদের। নিজের আঁকা পেইন্টিংও। ছবি নিয়ে কথা বলত। আস্তে আস্তে ওদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছিল।

দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের পটভূমিকায় একটি মেয়ের পরপর অনেকগুলো ছবি দিয়ে গড়ে তুলছিল একটি সিরিজ শ্রীনিবাস। সিরিজটার নাম দিয়েছিল 'চারুকেশবতী'। দেবলীনা সোল্লাসে আবিষ্কার করেছিল, ছবির সেই মেয়েটি অনেকটা সে নিজেই। তারই মুখ, তারই অবয়ব শ্রীনিবাস এঁকে চলেছে দিনের পর দিন ক্যানভাসে। তবু কোথাও যেন মনে হত, ছবির মেয়েটি তার থেকে সামান্য আলাদা। অত চুল আছে নাকি তার? কুন্তলের বন্যায় কখনও নদী, কখনও ঝরনা নেমে আসত শ্রীনিবাসের ছবিতে। এ নিয়ে অনুযোগও করেছিল দেবলীনা। শ্রীনিবাস বলেছিল, 'তুমিই তো! এগুলো আমি তোমাকে যেমন ভাবি, যেমন স্বপ্ন দেখি, সেরকম।' তাকে নিয়ে স্বপ্নও দেখে শ্রীনি? লজ্জা পেয়েছিল দেবলীনা।

এই 'চারুকেশবতী'-সিরিজ নিয়ে এগজিবিশনও হয় শ্রীনি-র শীঘ্রই গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায়। দেবলীনা গেছিল একদিন। শ্রীনি-র একজন শিল্পীবন্ধু একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপাস্বরে শ্রীনি-কে বলছিলেন, 'শি ইজ ইয়োর মডেল, ইজন'ট শি? ওহ, শি লুকস লাইক আফ্রোদিতে—অ্যান এক্সকুইজিট ক্লাসিকাল বিউটি, শ্রীনিবাস!'

এই প্রদর্শনীটিই শ্রীনিবাসকে শিল্পবোদ্ধামহলে সর্বাধিক পরিচিতি এনে দেয়। এরই মাস ছয়েক পর তারা বাড়ির অমতে বিয়ে করে।

শিলিগুড়ি যাওয়ার আগের কিছুদিন শ্রীনিবাসের ছবির বিষয় কিঞ্চিৎ অদ্ভুত হয়ে যায়। অবশ্য বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়া শ্রীনি-র স্বভাব। এবার ক্যানভাস জুড়ে সে এঁকে চলছিল কতগুলো কুণ্ডলাকৃতি সরীসৃপের ছবি। নীল, ধূসর আর সবুজ রঙের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল তার।

'এগুলো কী আঁকছ, শ্রীনি? সারা স্টুডিয়ো জুড়ে শুধু সাপ আর সাপ?' দেবলীনা জিজ্ঞেস করেছিল।

ইজেল থেকে বিহ্বল চোখ তুলে শ্রীনিবাস বলেছিল, 'তান্ত্রিক মিস্টিসিজমের ওপর আমার ছোটোবেলা থেকেই খুব আকর্ষণ, লীনা। তন্ত্রে কুণ্ডলায়িত শক্তিকে সার্পেন্টি-পাওয়ার বলা হয়। ভালো হচ্ছে না?'

'ভালো। কিন্তু সাপ দেখলে আমার যে মাথা ঝিমঝিম করে!'

'ভয় না পেয়ে সাপের সৌন্দর্যের দিকে চোখ মেলে দ্যাখো, লীনা। পৃথিবীর প্রাচীনতম সুন্দর প্রাণীদের একটা এই সাপ। খুব নিরীহও। আক্রান্ত না হলে এরা কখনও কারও ক্ষতি করে না।'

'তবু...' দেবলীনা চোখ বুজে ফেলেছিল।

একটা হাত দিয়ে দেবলীনার কোমর জড়িয়ে ধরে ওর নাভিমূলে মুখ নামিয়ে ঘ্রাণ নিতে নিতে শ্রীনি বলেছিল, 'ঠিক আছে। আর আঁকব না এসব। অনেকগুলোই তো হল। ছেড়েই দেব। এবার ভাবছি, আবার তোমাকে আঁকব, লীনা।'

এসব কথার দিন তিনেক পর শ্রীনিবাস শিলিগুড়ি রওনা হয়ে যায়। তারপর আজ মাস তিনেকের ওপর কোনো খবর নেই। কী যে হল মানুষটার?

সন্ধেবেলা শৌনক আর পেখমের সঙ্গে দেখা হল দেবলীনার। শৌনককে বেশ ম্যাচিওর, গম্ভীর, ধীর-স্থির মানুষ মনে হল। সিরিয়াস টাইপ। পেখম চুপচাপ, কিন্তু খুব মজার।

পেখমের মতো একটা মেয়ে যদি থাকত দেবলীনার! এই এত্ত একা হয়ে বাঁচতে হত না। তাকে সব বলতে পারত। সব শেয়ার করতে পারত। সেসব তো কিছুই হল না। আজ কত বছর কেটে গেছে!

পরের দিনও লিলি শৌনককে দেবলীনার ব্যাপার কিছুই বলল না। লিলি চাইছে, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দেবলীনাই বলুক শৌনককে। লিলি শুধু শৌনককে বলেছে, দেবলীনা কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।

পরের দিন রবিবার। দুপুরবেলা। পেখম বেরিয়েছে। শৌনক তার স্টাডিতে। দোতলার ঘরে বিছানার ওপর বসে লিলি আর দেবলীনা গল্প করছিল। কথা বারবার ঘুরে ঘুরে শ্রীনিবাসের দিকে চলে যাচ্ছিল। লিলি সচেতনভাবে সেই কথার স্রোত ফিরিয়ে দিচ্ছিল অন্য দিকে। যাতে দেবলীনা উদ্‌বেগের চিন্তার চারিদিকে না ঘুরে একটুক্ষণের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পায়।

হঠাৎ একটা ফোন এল দেবলীনার সেলফোনে। নম্বরটা দেখেই লিলির দিকে ফিরে দেবলীনা ফিসফিস করে বলল, 'পুলিশ!'

'লাউড কর, লাউড কর,' লিলি উত্তেজিত হয়ে বলল।

একটা স্পষ্ট অথচ সামান্য ভোঁতা পুরুষালি কণ্ঠস্বর। 'ম্যাডাম, শিলিগুড়ির যে-হোটেলে শ্রীনিবাস উঠেছিলেন, সেটা আমরা আগেই ট্রেস করতে পেরেছি। ওখান থেকেই বেরিয়ে যান এগজিবিশনের পরের দিন বিকেলবেলা। উনি যে ঘরে ছিলেন, সেটা সার্চ করে ওঁর ব্যাগ বাক্স সিজ করেছিলাম।'

'লাগেজে কিছু পেলেন? কোনো হদিস?'

'না, ম্যাডাম। কিছু জামাকাপড়, কাগজপত্র, একটা ডায়েরি, টুকিটাকি জিনিস। তাতে কিছুই দিশা মিলছে না।'

দেবলীনা অধৈর্য স্বরে বলল, 'তিন মাস একটা লোক মিসিং। আপনারা এখনও বলছেন, কিছু মিলছে না। আমি আর কত দিন ধৈর্য ধরব, বলতে পারেন?'

ফোনের ওপারের কণ্ঠস্বর শান্ত অবিচলিত স্বরে বলল, 'আমরা তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছি না, ম্যাডাম। জানি, খুবই পেইনফুল। কিন্তু ধৈর্য আপনাকে ধরতেই হবে। একটা রুটিন ওয়ার্কের জন্যই আপনাকে ডিস্টার্ব করতে হল।'

দেবলীনা খসখসে গলায় বলল, 'বলুন।'

'শ্রীনিবাসের এই জিনিসগুলো আমাদের আপাতত কোনো কাজে লাগবে না। আপনি তো কলকাতায় নেই, জানিয়ে গেছেন। আমরা এগুলো আপনাকে পৌঁছে দিতে চাই... শ্রীনিবাসের জামাকাপড় এইসব। কোন ঠিকানায় পাঠাবো?'

'বিকেলের মধ্যে ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছি,' এই বলেই দেবলীনা ফোনটা কেটে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বালিশের ওপর মুখ চেপে সে কাঁদছে। কী যে করবে লিলি বুঝতে পারছে না। কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না দেবলীনাকে।

একতলায় স্টাডিতে কী একটা বই পড়তে পড়তে শৌনক অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল, দেবলীনা হঠাৎ কিছু না জানিয়ে লিলির কাছে চলে এল কেন? কোনো পারিবারিক বিপর্যয়? কী হতে পারে?

এমন সময় একটা কান্নার গোঙানি শুনে সে বেরিয়ে এল স্টাডি থেকে। কে কাঁদছে? লিলির গলা নয়। তবে কি দেবলীনা? এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে দোতলায় উঠে এল শৌনক।

দেবলীনার ঘরের পর্দা তোলা। বিছানায় উপুড় হয়ে দেবলীনা হাউ-হাউ করে কাঁদছে। লিলি ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

খাটের ওপর মাথাটা অসহ্যভাবে ঠুকছে দেবলীনা। তাকে থামানো যাচ্ছে না।

কাঁদতে কাঁদতে একসময় দেবলীনা জড়ানো গলায় বলে উঠল, 'কেন, কেন তুমি আমাকে নিয়ে গেলে না, রাজু? কেন কথা রাখলে না? আমাকে একটাও ফোন কেন তুমি করছ না, রাজু? কেন? কেন? কেন? কী যে হল তোমার!'

নামটা শৌনক ঠিকই শুনল তো? রাজু? 'রাজু'-ই বলল না দেবলীনা?

ঘরভরা বিহ্বলতার ভিতর অজস্র প্রশ্ন আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দাঁড়িয়ে রইল শৌনক।

১৪

'রাজু' নামে হাজার হাজার লোক আছে। বাঙালি, অবাঙালি—দুইই। কাঁদতে কাঁদতে আবেগের মুহূর্তে দেবলীনা শ্রীনিবাসকে 'রাজু' বলছে, তার থেকে কী প্রমাণ হয়? খুব বেশি হলে এই, শ্রীনিবাসের ডাকনাম 'রাজু', কিংবা ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে শ্রীনিবাসকে 'রাজু' বলে ডাকত দেবলীনা। আর বেশি কী? কাকাতুয়া-বাড়ির সুবিমলবাবুর ছেলের নাম 'রাজু' আর দেবলীনার স্বামী শ্রীনিবাসও 'রাজু'—এ দুইয়ের মধ্যে সমীকরণ তৈরি করা একটা লঘু কল্পনার বেশি কিছু নয়; এটা মনে হতেই সন্দেহটাকে মগজ থেকে ঝাড়া দিয়ে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করল শৌনক।

আর তখনই সেই কাশির শব্দে কান্না থেমে গেল দেবলীনার। সে ধড়মড় করে উঠে বসে চোখের জল সামলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল।

শৌনক একটু এগিয়ে খাটের উলটোদিকের চেয়ারে বসে দেবলীনাকে লক্ষ করছিল। শ্রীনিবাসের কী হয়েছে, সে কিছুই জানে না এখনও। কিছু একটা হয়েছে, আঁচ করতে পারছে। দেবলীনার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল শৌনক। মানুষের চোখের ওপর সামাজিকতার একটা অদৃশ্য আবরণ থাকে, সেই আবরণটা যদি না থাকত, তাহলে এক লহমায় চোখ দেখলেই যেকোনো মানুষের মন খোলা বইয়ের মতো পড়ে নেওয়া যেত। কিন্তু সেটা যে হয় না, তার কারণ মানুষ চোখের ওপর ওই সামাজিক ঘেরাটোপটা সারা দিন পরে থাকে। মুখে মুখোশ পরে না মানুষ, মুখোশ পরে এই চোখেই। তবু মাঝে মাঝে চোখের জলে কাজল, মাসকারার সঙ্গে সেই সামাজিক আবরণটুকুও ধুয়ে যায়। তখন হয়তো ভেতরের মানুষটাকে এক পলক আবছা দেখা গেলেও যেতে পারে।

শৌনক দেখছিল। যতটুকু বুঝল, মেয়েটি বিপন্ন। বেশ সরল হলেও কিছু একটা এই মেয়ে লুকিয়ে রাখছে। বিপন্নতার সঙ্গে মিশে আছে সামাজিকভাবে অপমানিত হওয়ার ভয়। কিন্তু সেটা ঠিক যে কী নিয়ে, শৌনক ঠাহর করতে পারছিল না। দেবলীনার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে লিলির দিকে তাকিয়ে শৌনক প্রায় নিস্পৃহ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

তখন লিলি কিছুটা, দেবলীনা কিছুটা শ্রীনিবাসের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা

থেমে থেমে বলল। শেষে দেবলীনা বলল, 'পুলিশ কতটুকু চেষ্টা করছে, কে জানে। একটা মানুষ তিন মাস নিখোঁজ, তাকে খুঁজে বের করা এত কি কঠিন, অন্তত যদি সে বেঁচে থাকে...?' শেষ কথাটা বলার সময় গলা কেঁপে গেল দেবলীনার।

ঘরের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে শৌনক আত্মগতভাবে প্রশ্ন করল, 'একটা টেনিস বল আর একটা জ্যান্ত মানুষ—দুটোর কোনটা হারালে তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া সম্ভব?'

যেন ক্লাসে পড়াচ্ছে সে। এ মুহূর্তে এমন একটা নিরাবেগ উচ্চারণে খুব বিরক্ত বোধ করল লিলি। সে ভুরু কুঁচকে শৌনকের দিকে তাকাল। দেবলীনা কিন্তু বলল, 'টেনিস বল। কেননা সেটা হারালে অল্প জায়গার মধ্যেই হারায়।'

'যদি জায়গাটার কোনো সীমা না থাকে? ধরুন, কোনো মাঠ নয়, এই গোটা দুনিয়ার মধ্যে টেনিস বলটা হারিয়ে গেছে। মানুষটাও হারিয়ে গেছে গোটা দুনিয়ায়। তাহলে? কোনটা আগে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?' শৌনকের গলা সেই একইরকম নিরাসক্ত, নীরস।

দেবলীনা কিছু বলল না। শৌনক নৈঃশব্দ্য ভেঙে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল, 'বলতে পারলেন না তো? আমি বলছি। সেক্ষেত্রেও টেনিস বলটাই আগে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। হারানোর আগে বলটা কোন পথে যাচ্ছিল, তার ট্রাজেকটরি কী ছিল বের করতে পারলেই, কত বেগে সেটাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে জানতে পারলেই এখন এ মুহূর্তে সেটা কোথায় পড়ে আছে মোটামুটি আঁচ করা যায়। কিন্তু মানুষটা কোথায় আছে, তা বের করা অত সহজ নয়। তার কারণ অন্য।'

লিলি খুব বিরক্ত হয়ে নাকটা একটু কুঁচকে বলল, 'কী কারণ?'

'কারণ, টেনিস বলটা মৃত জড় পদার্থ। তার স্বাধীন ইচ্ছা নেই। কিন্তু মানুষ জ্যান্ত, নিজের ইচ্ছামতো সে আত্মগোপন করতে পারে, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। বিশেষত, তার ওপর যখন কোনো চাপ থাকে কিংবা যদি তার খুব অভিমান হয়। শ্রীনিবাস সম্ভবত বেঁচে আছেন বলেই পুলিশের তাঁকে খুঁজে বের করতে এত সময় লাগছে।'

এতক্ষণ পর দেবলীনার মুখে যেন আলো জ্বলে উঠল। কপালের ওপর এসে পড়া চুলের গোছা সে কানের পাশে গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'শ্রীনি বেঁচে আছে? সত্যি?'

'সম্ভবত তাই। বেঁচে আছে বলেই তো মনে হয়... বেঁচে আছে বলেই তো...' নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগল শৌনক। সে আবার দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তে স্বস্তির আলো নিভে গিয়ে আবার আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে উঠল দেবলীনার মুখে। সে স্তিমিত স্বরে বলল, 'কিন্তু পুলিশের গাফিলতিও তো হতে পারে। যদি

এমন হয়, পুলিশ সেভাবে চেষ্টাই করছে না, যদি শ্রীনি এরই মধ্যে...' তার গলা আবার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

আচ্ছন্নতা থেকে টান-টান জেগে উঠে শৌনক বলল, 'আপনাদের এই এক দোষ, দেবলীনা। আপনারা মনে করেন, পুলিশ অপদার্থ। কিন্তু আমি দেখেছি পুলিশ প্রায়শই যথেষ্ট চেষ্টা করে।'

'চেষ্টা করে তো পুলিশ-তদন্তের ব্যর্থতার খবর মিডিয়াতে ফুটে ওঠে কেন রোজ?' অসহিষ্ণু স্বরে বলল লিলি।

'দ্যাখো লিলি, পুলিশ পারে না, এমন জিনিস খুব কমই আছে। আমাদের পুলিশ-ফোর্স যথেষ্ট পরিশ্রমী। তখনই পুলিশ ব্যর্থ হয়, যখন তার ওপর পোলিটিকাল প্রেশার থাকে, যখন ওপর থেকে তদন্ত চেপে দিতে বলা হয়। ফাইল ক্লোজ করে দিতে বলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তো পুলিশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

'কেন এমন মনে হচ্ছে আপনার, শৌনক?' দেবলীনার প্রশ্নের সুরে আন্তরিকতা মিশে আছে।

'দেখুন। প্রথমত, আপনার অনুরোধে এবং বিষয়টার গুরুত্ব বুঝেই পুলিশ গোটা ব্যাপারটা মিডিয়ার কাছ থেকে এতদিন আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু এটা আর বেশিদিন পারবে না। সেক্ষেত্রে লোক জানাজানি হবে যে, পুলিশ ঘটনাটার নিষ্পত্তি করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সেটা হোক, পুলিশ কিন্তু চায় না। দুই নম্বর, শ্রীনিবাস আপনার, আমার বা লিলির মতো সাধারণ মানুষ নন। শিল্পী হিসেবে তাঁর একটা পরিচিতি আছে। আমাদের দেশে সামাজিক সাম্যটাম্য কথার কথা মাত্র। হারিয়ে গেলে বা অন্য কোনো সমস্যা হলে আমরা সাধারণ মানুষেরা যতটুকু সাহায্য সুবিধে পাই, তার থেকে অনেক বেশি পান বিশিষ্টজনেরা। আপনি আমার কথায় কিছু মনে করবেন না, দেবলীনা। পুলিশ যথেষ্ট শক্তিশালী বলেই আমি মনে করি,' শৌনক দৃঢ়স্বরে বলল।

লিলি অমনি ঠোঁট উলটে বলল, 'শক্তিশালী না ব্যাঙ!'

'ওই তো মুশকিল। দুনিয়ার যত থ্রিলার-কাহিনি আর গোয়েন্দা-কাহিনির লেখকেরা, দু-একজন বাদ দিলে প্রায় সক্কলেই চিরকাল পুলিশকে অপদার্থ বলে চিত্রিত করেছেন। তা না করলে গোয়েন্দা-বাবাজিদের পসার জমবে কী করে? আর সেইগুলো পড়ে আর ফিল্ম-এ দেখে সাধারণ লোক তোমার মতোই পুলিশকে অপদার্থ বলে ভাবে। কিন্তু বাস্তবটা ঠিক সেরকম নয়। থ্রিলারের থেকে অনেক কঠিন পরিস্থিতি পুলিশ সামলায়, চাইলে ফয়সালা করতে পারে না পুলিশ, এমন কেস কমই আছে।'

কিন্তু কথায় হার মানতে একদমই ভালো লাগে না লিলির। সে হিসহিস করে ঠোঁট চেপে বলে উঠল, 'পুলিশ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় গুন্ডা।'

শৌনক গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, 'আর তুমি হচ্ছ একটা গুন্ডা মেয়ে!'

এমন বিষম উদ্‌বেগের মধ্যেও হা-হা করে হেসে ফেলল লিলি আর দেবলীনা শৌনকের কথায়। কিন্তু তাদের হাসির হররাকে ছাপিয়ে শৌনক জোরে চেঁচিয়ে ডাক দিল, 'পেখম! পে-খ-ম!'

লিলি বলল, 'কাকে ডাকছ? পেখম বেরিয়েছে।'

'কোথায় গেছে?'

'আমি কীভাবে জানব? আমাকে বলে যায় কবে?' লিলির গলায় স্পষ্ট অনুযোগ।

'তুমি জানবে না তো কে জানবে? কোথায় যায়, না যায়, জানতে হবে না? মেয়ে বড়ো হয়েছে। মা হিসেবে তোমার একটা দায়িত্ব নেই?'

ভীষণ অবাক হয়ে গেল একথায় লিলি। শৌনক তো কখনও এভাবে কথা বলে না। এরকম রক্ষণশীল পিতার মতো কথা কখনও শোনেনি ওর মুখে এত বছরে। রেগে উঠে উত্তর দিল, 'আর তুমি? তুমি তো বাবা! তোমার কোনো দায়িত্ব নেই মেয়ের ব্যাপারে? তুমিই তো চিরকাল আশকারা আহ্লাদ দিয়ে মাথায় তুলেছ!'

বেশ উত্তপ্ত বাগ্‌বিনিময় হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মেয়েকে নিয়ে। এর মধ্যে বসে থাকতে খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল দেবলীনার। সে লিলির হাতে চাপ দিয়ে চাপা স্বরে বলল, 'চুপ কর। কী করছিস?'

লিলি থামল না। বলে চলল, 'আরে জানিস না! এরা সব কলেজ বেরিয়ে যাবে আর একা একা ঘরে আমার মাথাটা আমি...' বলতে বলতেই থমকাল। শৌনক ঠোঁটের কোণে একটা চাপা লুকোনো হাসি নিয়ে মোবাইলে খুটখুট করছে। এই যে এত রেগে গেছিল?

শৌনক পেখমকে ফোনে পেল। বলল, 'কোথায় আছিস রে, মা?'

এখন তার গলা একেবারে মধুমাধবী! নীচের ঠোঁট উলটে দেবলীনার দিকে তাকিয়ে একটা তাচ্ছিল্যসূচক 'হুঁ!' শব্দ করল লিলি।

দেবলীনাও খুব মজা পাচ্ছিল ওদের দেখে। ভেতরে ভেতরে একটু আনমনাও যে হয়ে পড়ছিল না, তা নয়। কিন্তু সেই অন্যমনস্কতার ভাব বারবার ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল শৌনকের কণ্ঠস্বরে।

'ও তুই স্রোতাক্ষীদের বাড়িতে?... বলে যাবি তো!... তুই থাকলে আমরা চারজন বেশ ক্যারাম খেলতাম! আসবি কখন?... কাজ শেষ হয়ে গেছে? এখনই বেরোবি? বেরোসনি এখনও... আচ্ছা, তাহলে আর-একটুক্ষণ থাক স্রোতাক্ষীদের বাড়ি। আমি বাইকে বেরিয়ে তোকে নিয়ে জেলা পরিষদে যাবো। ওখানে হস্ত ও কুটিরশিল্পের প্রদর্শনী

হচ্ছে। ... তোর মা ওরা যাবে কিনা? তা তো জানি না। দাঁড়া, জিজ্ঞেস করছি...'

সেলফোন বাঁ-হাতে কানে লাগিয়ে লিলির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'যাবে তোমরা?'

লিলি কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না। দেবলীনার মনের এই অবস্থায় যাওয়া ঠিক হবে?

শৌনক দেবলীনাকেই বলল এবার, 'চলুন, দেখে আসবেন। পূর্ব আর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার হস্ত ও কুটিরশিল্পের প্রদর্শনী। তাঁতের শাড়ি, মাদুর, গয়না বড়ি, আরও অনেক অনেক কিছু... ভালো লাগবে। যাবেন?'

দেবলীনা সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'বেশ তো। চলুন। বসেই তো আছি। ঘুরে আসা যাবে।'

শৌনক আবার ফোনকলে ফিরে গেল, 'হ্যাঁ রে, যাবে বলছে। না, না, ওরা দুজন একসঙ্গে যাবে। আমি তোকে নিয়ে জেলাপরিষদে গিয়ে ওদেরকে ধরব। তুই রেডি হয়ে থাক... আমি যাব আর তোকে টুক করে তুলে নিয়ে জেলাপরিষদে চলে যাব। ওকে? আচ্ছা, ছাড়ছি...'

ফোন ছেড়েই ঝট করে উঠে দাঁড়াল শৌনক। দেবলীনাকে বলল, 'আপনারা তাহলে রেডি হয়ে আসুন। আমি মেয়েকে নিয়ে জেলাপরিষদে আপনাদের সঙ্গে মিট করছি।'

এই কথা বলেই তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

দেবলীনাকে প্রস্তুত হতে বলে লিলিও নিজের ঘরে একতলায় এল। শাড়িটাড়ি পরে সেজে নিয়ে রেডি হয়ে শৌনকের ঘরে গিয়ে দেখল, শৌনক চিন্তামগ্নভাবে সিগারেট টানছে।

লিলি বলল, 'শৌনক! আমি আমাদের নাটকের গ্রুপে স্যারকে বলব তোমাকে এবার একটা পার্ট দিতে। উফফফ্!'

শৌনক ধীরস্থিরভাবে বলল, 'নাটকটা কেবল মঞ্চেই তো হয় না, লিলি! জীবনের প্রতি পদেই এই অভিনয়কলার প্রয়োজন পড়ে। সেকথা তুমি তোমার নিজের জীবন দিয়েও বহুবার বুঝেছ। শুধু তফাত এইটুকুই, এখানে কোনো তৈরি স্ক্রিপ্ট থাকে না। নিজেকেই তৎক্ষণাৎ স্ক্রিপ্ট বানিয়ে নিতে হয়।'

স্রোতাক্ষীর বাড়ি কুইকোটায়। শৌনক দেখল, পেখম আর স্রোতাক্ষী গেটে দাঁড়িয়ে আছে। গেটের ওপর একটা কাঠগোলাপের গাছ ফুলে ভরা ডাল বাড়িয়ে দিয়েছে। রাস্তার উপরেও গুলঞ্চ ফুলের টুপটাপ, টুপটাপ।

স্রোতাক্ষীকে হাত নেড়ে টা-টা করে বাপের বাইকের পেছনে এসে বসল পেখম। জেলা পরিষদে পৌঁছে দেখল, মা আর লীনামাসি আগেই এসে পৌঁছেছে।

জেলাপরিষদের গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে একটা নতুন বিল্ডিং। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। সেই প্রশস্ত অঙ্গনে হস্তশিল্প আর কুটিরশিল্পের প্রদর্শনী। কেনাবেচারও ব্যবস্থা আছে। চারজনে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কিছুক্ষণের জন্য আজ এতদিন পর দেবলীনা যেন ভুলে গেছে তার উদ্‌বেগ, অশান্তির কথা। সে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল কী অসাধারণ বুননে মেদিনীপুরের গ্রাম-গ্রামান্তরের অজ্ঞাতনামা শিল্পীরা মাদুর, শীতলপাটির বুকে এঁকে তুলেছে বহমান লোকজীবনের ভাষ্য। আহ্! শ্রীনিবাস যদি থাকত এখন, কী যে পাগলামি করত মানুষটা!

দেবলীনা আবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে দেখে লিলি বলল, 'চল, তাঁতের শাড়িগুলো দেখি। তোকে একটা তাঁতের শাড়ি প্রেজেন্ট করব।'

দেবলীনা ময়ূরীর মতো কেঁপে উঠে বলল, 'এই, না, না!'

পেখম দেবলীনার আঙুলে টান দিয়ে বলল, 'চলো-ও!'

ওরা তিনজন অজস্র তাঁতের শাড়ির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে দেখে শৌনক চট করে কেটে পড়ল ওখান থেকে। বাপরে! মেয়েদের শপিং! ট্রেজার প্রোটেকটার চিক্কের সাপের খেলার থেকেও ভয়ংকর!

বেরিয়ে এসে প্রদর্শনী পেরিয়ে ব্রিটিশ আমলের সেই প্রাচীন বিল্ডিং। এটাকে সেই আমলে বলা হত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস। এখন নাম হয়েছে শহীদ প্রদ্যোৎ স্মৃতি ভবন। এখনও এখানে সরকারি কাজকর্ম হয়। বিল্ডিং-এর একপাশে একটা সিমেন্টের বেঞ্চে থিতু হয়ে বসে সিগারেট ধরাল শৌনক। মোবাইলটা অফ করে দিল কী জানি কী ভেবে। মনের মধ্যে অনেকগুলো কথা গুছিয়ে নেওয়া দরকার এই নিরিবিলিতে বসে এখনই।

যেভাবেই হোক, দেবলীনাকে আপাতত ট্রমা আর অবসাদ থেকে বের করে আনা গেছে। অনেকগুলো ঢপ দিতে হল। জীবিত মানুষের থেকে প্রাণহীন জড়পদার্থ খুঁজে বের করা সহজতর হবে এমন কোনো কথা নেই। যেখানে পজিশন আর মোমেন্টাম একসঙ্গে জানা যায় না, সেখানে...! চিন্তাটাকে ফট করে কোয়ান্টাম মেকানিকসের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ধুলো-আলো-মাটির ধরাছোঁয়া পৃথিবীর দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। আরে, একটা লোককে যদি কেটে কুচিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়, কিংবা খুন করে লাশটা যদি একটা বড়ো ফ্রিজারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য, পুলিশের বাবাও খুঁজে পাবে না। আর পুলিশের যে অবিমিশ্র গুণকীর্তন সে করল দেবলীনার কাছে, সেটাও সব সময় সত্যি নয়। গাফিলতি হয় বই-কি! খুবই হয়। বরং রাজনৈতিক নেতাটেতা দিয়ে চাপ দিলে তাড়াতাড়ি হতে পারত।

যাই হোক, দেবলীনার মনে শ্রীনিবাস বেঁচে থাকার ক্ষীণ আশা তো জেগে উঠেছে। তার জন্যে মিথ্যা যুক্তি সাজানো বা অর্ধসত্য উচ্চারণও কিছুই না।

প্রশ্ন হচ্ছে, একেবারে না জানিয়ে লিলির কাছে এসে উঠল কেন দেবলীনা? পাছে লিলি ফোনে 'না' বলে দেয়, সেজন্যেই? বাড়িতে আসার পরেও তো 'না' বলতে পারত। হয়তো তার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়েই এসেছে। মরিয়া হয়ে গিয়েছে দেবলীনা? হতেই পারে।

কিন্তু লিলি কেন? অন্য কারও কাছে নয় কেন? দেবলীনা-শ্রীনির ব্যাপারটা ওর বন্ধুদের প্রায় সবাই জানে। লিলির কাছে শৌনক শুনেছে, দেবলীনা আর শ্রীনিবাসের বয়সের পার্থক্য অনেক। দুজনের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড প্যাশন কাজ করেছিল বলেই বিয়েটা হয়েছিল। এবং সেই প্যাশনটা নিভে যায়নি একেবারে বলেই বিয়েটা আজও টিকে আছে। দেবলীনার দিক থেকে তো নয়ই; সেটা তার উদ্‌বেগ, কান্না থেকে বোঝা যায়। অন্য কিছুর জন্য কাঁদছে না তো? অনুরাগাশ্রু, নাকি অনুতাপাশ্রু? অন্য কোনোরকম বিবেকের দংশন নাকি, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবলীনার অতীত? কে জানে!

ওদের দুজনের এই বয়সের তফাতটার জন্যই দেবলীনার বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে। ওইজন্যেই বর্ধমানে যায়নি। অন্যদিকে দেবলীনার বেশিরভাগ বন্ধুই কলকাতার। সেখানে আত্মগোপন করলে লোকের উৎপাত থেকে বাঁচতে পারত না। অতএব, মেদিনীপুর। অতএব, লিলি।

এই শ্রীনিবাসকেও বেশ রহস্যময় লাগছে শৌনকের। একটা গাট ফিলিং হচ্ছে, শ্রীনিবাস বেঁচে আছেন। যুক্তিহীন অব্যাখ্যাত একটা অনুভব। বেঁচে থাকলে লুকিয়ে আছেন কেন ভদ্রলোক? কেউ নজর রাখছে তাঁর উপর? কোনো ভয়ংকর শর্ত আরোপ করেছে কেউ, যার জন্য দেবলীনার সঙ্গে যোগাযোগটুকুও করতে পারছেন না? কিডন্যাপড হয়েছেন? তাহলে তো র‍্যানসমের চিঠি আসতে পারত। অথবা এমনই কোনো কিডন্যাপিং, যাতে র‍্যানসম দাবি করার প্রয়োজন হয় না?

গুলিয়ে যাচ্ছে সব। নাহ্, শ্রীনিবাস খুনই হয়েছেন মনে হচ্ছে। একটা জ্যান্ত টেনিস বলকে ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে স্পেসের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অথবা টেনিস বলটা যদি অন্য কোনো টেনিস বলের সঙ্গে কোলিশন বাধিয়ে দুটো মিলে একটা টেনিস বল হয়ে যায়? অথবা যদি টেনিস বলটা গলে যায়, গলে অন্য জিনিস হয়ে যায়? কে খুঁজে বের করতে পারবে? অথবা যদি...

'চা-আ। ক-ফি-ই।'

হঠাৎ এক চা-ওয়ালার ডাকে এইসব পাগলাটে ঘোলা চিন্তার টলোমলো আচ্ছন্নতা থেকে যেন জেগে উঠল শৌনক। চায়ে চুমুক দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যা নেমেছে। দূরের হ্যালোজেনের আলোয় মায়াময় হয়ে আছে জেলাপরিষদের

চত্বর। প্রদর্শনীতে লোকের ভিড় বাড়ছে। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে ছায়াছায়া।

আকাশটা এখনও অস্তরাগের আভা মেখে অন্ধকারের ভেতর, শহরের আলোকুয়াশার ভেতর কেমন গম্ভীর আবছা হয়ে আছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। কখনও বাতাসের বেগ বাড়ছে। ভেজা ভেজা বাতাস। কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেল নাকি এইমাত্র? হয়তো অনেক দূরের কোনো অন্ধকার নদীতীরে বৃষ্টি হয়েছে... শিল্পমেলায় মানুষের সম্মিলিত কোলাহল জড়ীভূত অস্পষ্ট, কথাগুলো এখন আর তেমন আলাদা করে বোঝা যায় না... শব্দ ক্রমশই বিলীয়মান...

প্রদর্শনীর আলোগুলো ক্রমশ পরিম্লান হয়ে আসছে, তারপর সেসব আলোরও যেন তেজ নেই আর। গেটের ওধারে যানবাহনের শব্দও ক্রমশ ফুরিয়ে এল। দেখতে দেখতে কেমন একটা আশ্চর্য ঘোর ঘনাতে লাগল শৌনকের চোখে। চারিদিকের ছবিছায়া মুছে গিয়ে কমে আসা আলোর ভেতর শুধু দাঁড়িয়ে আছে এই প্রকাণ্ড লাল রঙের পুরোনো বাড়িটা একা দৈত্যের মতন। সবে যেন সন্ধ্যা নামছে এখানে।

পুরোনো আমলের বাতিগুলো জ্বলে উঠছে। কেন যে সে এখানে বেমানান এসে বসেছে, কোথা থেকে এল, সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে শৌনকের। এ যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ পরিচিত দুহাজার পনেরো নয় আর। যেন অনেক অনেক বছর আগেকার একটা অবসিত সন্ধ্যার মধ্যে বসে আছে সে সময়ের মহা-অসুখে আক্রান্ত, জ্বরগ্রস্ত হয়ে এই বেঞ্চের ওপর। দূরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো আমলের একটা কালো রঙের হুডতোলা গাড়ি। কোথায় যেন গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। সময় এখন উথালপাতাল পলাতক... কল্পনার মায়াবাস্তবতার ভেতর একবার মাথা ঝাঁকিয়ে শৌনক বুঝে উঠতে চাইল... কী হচ্ছে ব্যাপারটা? তবে এই কি সেই দিন—সেই কবেকার ফেলে আসা উনিশশো বত্রিশ, তিরিশে এপ্রিলের সমাসন্ন সন্ধ্যাকাল?

আলো-ছায়া মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে চারপাশে। একটা পুরোনো ঝুপসি হয়ে থাকা গাছের নীচে দুটি কমবয়সি ছেলে এসে দাঁড়াল। একজনের বয়স হবে উনিশ, আরেকজনের আরও কম; হবে হয়তো সতেরো-আঠারো। বয়সে সামান্য বড়ো ছেলেটির পরনে মালকোচা করে পরা ধুতি আর হাফ শার্ট। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করে সিঁথি কাটা। চোখে একটা গোলাকার ফ্রেমের চশমা। বুদ্ধিদীপ্ত, সংবেদনশীল চোখ। পায়ে কেডস জুতো। তুলনামূলকভাবে ছোটো ছেলেটির পরনেও ধুতি-শার্ট, পায়ে একটা চপ্পল। ঠোঁটের ওপর মোটা একজোড়া গোঁফ।

সেই দিকে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত বড়ো ছেলেটি হাসতে হাসতে বলল চাপা স্বরে, 'এটা কী লাগিয়েছিস তুই, প্রভাংশু? যাত্রাদলের রাবণের মতো লাগছে। যে কেউ

দেখলেই ছদ্মবেশ বলে ধরে ফেলবে।'

প্রভাংশু একথায় দমে গেল না। সেও সমানে টক্কর দিয়ে হাসিমুখে বলে উঠল, 'আর তুমি? তোমার ও চশমায় যে কাচই নেই, তার বেলা? দিব্যি মানিয়েছে কিন্তু তোমাকে, প্রদ্যোৎদা।'

'চুপ কর, আস্তে...' এই বলেই সহসা প্রদ্যোৎ বন্ধুর দিকে সরে এল। চাপা স্বরে বলল, 'একটা কথা কিন্তু মাথায় রাখিস, প্রভাংশু। তোর কাছে যে তিনশো আশি বোরের ঘুরনচরকিটা আছে, ওটা কিন্তু দীনেশদার দিয়ে যাওয়া জিনিস। খুব লাকি। বিমলের হাত ঘুরে সুপতিদার কাছে গেছিল কলকাতায়। এখন তোর হাতে। কাজ শেষ হয়ে গেলে যেভাবেই হোক...'

মিটিমিটি হেসে প্রভাংশু বলল, 'কাজশেষে গুহর গুহায় পুনরায় ফিরে যাবে। ও আমার খেয়াল আছে। কিন্তু এসব ছোটোখাটো ডিটেইল নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না এখন তুমি। পাঁচ-পাঁচবার আমরা ফেইল করেছি। কনসেনট্রেট করো।'

প্রদ্যোৎ বলল, 'এবার আর ফেইল করব না।' এই বলেই সে চুপ করে গেল।

ঝুপসি হয়ে থাকা গাছটার পাতা চুঁইয়ে যেন একরাশ অন্ধকার নামছে। সেই অন্ধকারের ভেতর গভীর শ্বাস নিয়ে মনকে এককেন্দ্রিত করছে দুজন সদ্যোযুবক। যেন ইতিহাসের অন্ধকারের ভেতর দুটো কালো ঘোড়া শ্বাসেপ্রশ্বাসে তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে নিচ্ছে। তারপরই দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল আলিঙ্গনে। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, 'ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্!'

সভাকক্ষের পেছনদিকের বারান্দায় ওই উঠে গেল ওরা। সরু করিডোর দিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছে। পুবদিকের বারান্দায় গিয়ে উঠল। এসব পথ প্রদ্যোতের চেনা; কিছুদিন আগেই একটা স্কলারশিপের জন্য এখানে এসেছিল। ভারী ভারী থামের ছায়া বারান্দার মেঝের ওপর এক মহাকাব্যিক শ্লোকের আনত যতিচিহ্নের মতো হেলে পড়েছে। তৈরি হতে যাচ্ছে ইতিহাসের এক আশ্চর্য সন্ধিক্ষণ!

পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট। জেলা বোর্ডের আলোকিত অফিসঘরে অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিলের এপাশে ওপাশে সভা সাজিয়ে বসেছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ডগলাস। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বিভিন্ন সাবডিভিশনের এসডিও, সরকারি-বেসরকারি সদস্যে সভা গমগম করছে। টেবিলের অপরপ্রান্তে বসে আছেন তমলুকের এসডিও মিস্টার বার্জ। বাইরে প্রহরীরা নিশ্চিন্ত হয়ে খোশগল্প করছে।

একটার পর একটা অ্যাজেন্ডা। মেদিনীপুর খুব ঝামেলার ডিস্ট্রিক্ট। সতেরো বছরের সিভিলিয়ান জীবনে এত ঝামেলা কখনও পোহাননি মিস্টার ডগলাস। রোজ কিছু না কিছু অশান্তি লেগেই আছে। গলার কাছে আটকে আছে উদ্‌বেগের কাঁটা। হিজলি জেলের কেলেঙ্কারিটা কিছুতেই গিলে ফেলতে পারছেন না ডগলাস। এর

আগে খুন হয়েছেন জেমস পেডি—ডগলাসের প্রেডেসেসর। এবার কি তাঁর পালা? এইসব চিন্তায় অতিষ্ঠ ডিএম রাত হলেই মদের নেশায় তলিয়ে যান। ঘুম হয় না তাঁর।

হেডক্লার্ক ভুপেনবাবু ডগলাসের টেবিলে কতগুলো কাগজ রাখছেন সই করার জন্য। নয় নম্বর অ্যাজেন্ডা-র আলোচনা চলছে। ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। হঠাৎ একটা কমোশন। ডগলাস টেবিল থেকে চোখ তুলে দেখলেন, ধুতি-শার্ট পরা দুজন নেটিভ যুবক প্রহরীদের ঠেলে বিদ্যুতের মতো ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

কিছু বুঝবার আগেই ডগলাসের চেয়ারের দুপাশে ফিট চারেক দূরত্বে পজিশন নিয়ে উপর্যুপরি গুলি চালাতে লাগল প্রদ্যোৎ আর প্রভাংশু। একটুও সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেলেন না ডগলাস। টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। তিনটে গুলি তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেল।

হতচকিত বাকি লোকগুলোর সম্বিৎ ফেরার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে নেমে উত্তর-পূর্বের গেটের দিকে ছুটতে লাগল ওরা দুজন। গেট পেরিয়ে সদর রাস্তা। পেছনে প্রহরীদের চিৎকার...ধাবমান বুটের শব্দ... 'আসামি ভাগতা হ্যায়, পাকড়ো, পাকড়ো'... গুলির আওয়াজ... দুই যুবকের পা-মাথা-কানের পাশ দিয়ে ছুটে আসছে বজ্রনিনাদিত গুলির ঝাঁক। ঘুরে দাঁড়িয়ে বীর বিক্রমে গুলি চালাতে লাগল বেপরোয়া প্রভাংশু। সে তখন সোয়ান সাহেবের বাংলো-সংলগ্ন মাঠে। প্রভাংশুর দিকে আর এগোতে সাহস করল না প্রহরীরা। অমর লজের পাশের গলি দিয়ে প্রভাংশু যে উধাও হয়ে গেল কোথায়...

প্রদ্যোৎ তখন গিয়ে পড়েছে সায়েন্স লজের ঝোপের দিকে। এটা পেরোতে পারলেই রাস্তা। সেখানে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে ক্ষিতি। আর-একটু। অথচ পেছন থেকে ছুটে আসছে অনর্গল বুলেটের শব্দস্রোত। মরিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার গুলি চালাতে গেল প্রদ্যোৎ। আহ্! রিভলভারটা কাজ করছে না। এদিকে ছুটে আসছে লোকগুলো—সেই সব লোক, যাদের মধ্যে একমাত্র শ্বেতাঙ্গ মিস্টার বার্জ, বাকিরা সকলেই ভারতীয়!

একটা জানালা-দরজাহীন পোড়ো বাড়ি সামনে পেয়ে ঢুকে পড়ল প্রদ্যোৎ। কিন্তু অচিরেই নজরে পড়ে গেল সে। আবারও চেষ্টা করল গুলি করতে। রিভলভার কাজ করছে না। প্রচণ্ড ঘেমে উঠেছে। চোখ থেকে খুলে পড়ে গেছে সেই চশমাটা। মাথার চুলগুলো হিলহিল করছে ঘর্মাক্ত কপালের ওপর। সামনে একটা ল্যান্টানা ঝোপ। এটাই একমাত্র পথ। প্রাণপণে সেই ঝোপটা পেরোতে গেল প্রদ্যোৎ। কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে গেল কাপড়। ধুতিটাকে ছিঁড়ে ছাড়িয়ে নিতে গেল। এটুকু পেরোতে পারলেই আর কেউ তাকে ধরতে পারবে না। মুক্তি!

আর তখনই পেছন থেকে আসা একটা লোক জাপটে জড়িয়ে ধরল তাকে।

চিৎকার করে উঠল লোকটা, 'পাকড় লিয়া। মারো, মারো।' সেই শব্দে ছুটে এল বাকি সবাই। ধ্বস্তাধস্তি চলতে লাগল। প্রদ্যোতের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা ছিনিয়ে নিল কেউ। ল্যান্টানা ঝোপের মধ্য থেকে তারা টেনে বের করে নিয়ে এল প্রদ্যোতের ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, আহত শরীর। শার্টের ডান পকেটটা ফড়ফড় করে ছিঁড়ে দিল কে একজন। একটা খাম। তার মধ্যে দুটো কাগজ। একটা কাগজে লাল কালিতে লেখা—'হিজলি-অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ। ইহাদের মরণেতে ব্রিটেন জানুক। আমাদের আহুতিতে ভারত জাগুক। বন্দেমাতরম্।'

আরেকটা কাগজে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে লেখা—'আমাদের প্রাথমিক পাটিগণিত।'

* * *

'কী গো তুমি এখানে বসে আছ? আর আমরা তোমাকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছি। সেলফোনটাও সুইচড অফ বলছে!'

লিলির কণ্ঠস্বরে শৌনক যেন এক অনির্বচনীয় ঘোর থেকে জেগে উঠল। কোথায় আছে সে, এতক্ষণ কোথায় ছিল... একটু সময় লাগল তার ধাতস্থ হতে। সামনে তাকিয়ে দেখল, লিলি, পেখম আর দেবলীনা উদ্‌বিগ্ন হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল শৌনক। বলল, 'অ্যাঁ? হ্যাঁ। হয়ে গেছে তোমাদের? আমি এই একটু এখানে বসে ছিলাম। টায়ার্ড লাগছিল। মোবাইলটা...'

পকেট থেকে মোবাইল বের করে সুইচ অন করল। টুং টাং শব্দ উঠল। হাঁটতে শুরু করল সে। পেছনে ওরা তিনজন আসছে। এখনও আশ্চর্য ঘোর লেগে আছে তার চেতনায়। তার পায়ে। অভিভূত হয়ে হাঁটছে।

কতদিনকার কথা সব। বইতে পড়েছে। সেসব দিন চলে গেছে। তবু জেলাপরিষদের এখানটায় এসে বসলে সেই সব ঘটনা মনে পড়ে যায় এক এক করে। ওই তো ওই বারান্দাটা... ওই তো হলঘরটা যেখানে মিটিং হচ্ছিল সেদিন...

কে জানে, আজও হয় নাকি!

কিছুটা এগিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল শৌনক। পেছন ফিরে সে দেবলীনাকে বলল, 'ও, একটা কথা। আপনার মনে আছে কিনা, জানি না। পুলিশ আপনার কাছে ঠিকানা চেয়েছিল শ্রীনিবাসের জিনিসগুলো পাঠানোর জন্য। আপনি এখনই পুলিশকে আমাদের বাড়ির ঠিকানাটা মেসেজ করে দিন। দেরি করবেন না।'

১৫

ভোঁদার কী হয়েছে, ভোঁদা নিজেই জানে না। সাধারণ পাতি কথা থেকে শুরু করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন—সব সে আজকাল বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে শুরু হয়েছিল গাড়ি চালাতে চালাতে উলটোপালটা অবাস্তব দৃশ্য দেখার রোগ, এখন তার সঙ্গে এই বাড়তি ভুলে যাওয়ার অসুখ যোগ হল। দিন পাঁচেক আগে কলকাতায় কৌশিকের সঙ্গে দেখা, রূপেন বা শৌনকের মতোই কৌশিকও তার স্কুলজীবনের বন্ধু, এখন সে কগনিজেন্ট-এ চাকরি করে, একথা সেকথার পর কৌশিক ভোঁদার ফোন-নম্বর চাইল। মিনিট তিনেক মনের অতল অবধি হাতড়েও নিজেরই ফোন নম্বরটি মনে করতে পারছিল না ভোঁদা। এমন অপ্রস্তুত সে কখনও হয়নি। শেষে মোবাইল থেকে চেক করে ফোন-নম্বর দিতে হল। কৌশিক তাকে যে কী ভাবল, কে জানে!

পরপর দুটো ট্রিপ সে মিস করেছে এই ভুলে যাওয়ার রোগের জন্য। একটা হাওড়া, আর-একটা বাগনান যাওয়ার ট্রিপ। আগে সে এমনিই মনে রাখতে পারত কবে কোথায় ট্রিপ আছে, এখন ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখতে হয়। তাতেও রক্ষে নেই। ক্যালেন্ডার দেখতেই ভুলে যাচ্ছে ভোঁদা। ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরোনোর কথা, দিব্যি সব ভুলে মেরে দিয়ে সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠেছে। মোবাইল ছিল সাইলেন্ট মোডে; প্যাসেঞ্জার পার্টির এন্তার মিসড কল লাল রঙে খোদাই হয়ে আছে কল-লগে। এরকম চলতে থাকলে তার রুজি-রোজগারে এবার টান পড়বে।

মেদিনীপুরে অগতির গতি ডক্টর নগেন্দ্র খামরুই। ছোটোবেলা থেকে ভোঁদা ডক্টর খামরুইকেই দেখায়। তাঁকে সব কথা খুলে বলাও যায়। ডাক্তারবাবুর বয়েস হবে আশির কাছাকাছি, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বুড়ো বয়সেও ডিসপেনসরিতে বসছেন। ফ্রিতে রোগী দেখেন ডাক্তারবাবু আজ পঞ্চাশ বছর। ভিজিট লাগে না, শুধু ওষুধের দামটা দিতে হয়। ওষুধও সেই আদ্যিকালের ট্যাবলেট আর মিক্সচার; ডাক্তারের চেম্বারের একপাশে প্লাইউড দেওয়া ঘরে বসে মনোরঞ্জন-কম্পাউন্ডার ওষুধ বানায়। কত মানুষ যে ডাক্তারবাবুর দ্বারা উপকৃত, তার ইয়ত্তা নেই। মেদিনীপুরে এখন ডাক্তারের অভাব নেই—অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ—তাঁদের রোগীপরীক্ষা, চিকিৎসাব্যবস্থা সবই যথেষ্ট উন্নত, তবু নগেন্দ্র খামরুইয়ের ওপর মানুষের আস্থা, নির্ভরতার আজও জুড়ি মেলা

ভার। তাঁর সেবাপরায়ণতা, দুরারোগ্য অসুখ ভালো করার ক্ষমতা আজও প্রবাদপ্রতিম।

সকালে নাম লিখিয়েছিল ভোঁদা, এমনকি এ কথাটাও ভুলেই যাচ্ছিল। কোনোমতে মনে পড়ায় হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে খামরুইয়ের ডিসপেনসরিতে সাড়ে দশটা নাগাদ দৌড়ে এসে দেখল, সেখানে মাছির মতো ভিড়। ডাক্তারবাবু নিজেই নাম ডাকেন, দু-একটা নাম ডাকার পর ভোঁদা বুঝল, তাকে আরও একটু বসতে হবে। কাঠের বেঞ্চে ব্যোমভোলের মতো বসে আছে সে; চারিদিকে চেয়ারে, বেঞ্চে, এমনকি মেঝেতেও কেউ কেউ বসে আছে। কিছু লোক ডিসপেনসরির বারান্দায় স্পার্টাকাসের মতো বুকে হাত রেখে পায়চারি করছে। এই দশ-সকালেও জনা চল্লিশেক লোক তো হবেই।

ভোঁদা ভাবছিল, এই জনসমুদ্র পার হয়ে কখন যে তার ডাক পড়বে! নাম লেখার সময় দেখেছিল, তার নামের আগে আরও দশ-বারোজনের নাম লেখা। উঠে গিয়ে যে চা খেয়ে আসবে, তারও জো নেই। যদি এর মধ্যে নাম ডেকে দেয়...! তখন আবার সারাদিন বসে থাকতে হবে।

তার এসব সমস্যা সে কাকেই বা বলতে পারে? পাড়ার লোকজনের ধৈর্য কম। সে সব ভুলে যাচ্ছে, উলটোপালটা হ্যালুসিনেট করছে জানতে পারলে লোকে তাকে পাগল ঠাওরাবে। বলা যেত বন্ধুদের; তা রূপেন তো তাকে আজকাল কালেভদ্রে ফোন করে আর শৌনকের সঙ্গে দেখা হলে ওই পথেঘাটেই যা দেখা হয়। সময় বের করে নিয়ে শৌনকদের বাড়ি যাওয়াই যায়, কিন্তু সেখানে আবার শৌনকের মেয়ে বা বউ-এর সামনে ভোঁদা সহজ বোধ করবে না। ভোঁদার সমস্যা কি একটা? এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ডক্টর খামরুইয়ের ডিসপেনসরির বেঞ্চে শূন্য চোখ মেলে ভোঁদা তার ডাক আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

ভোঁদা জানে না, তার পক্ষে একথা জানা সম্ভবও নয় যে, শৌনকের বাড়িতে গেলে শৌনক হয়তো ভোঁদার কথা মন দিয়ে শুনবার সুযোগই পেত না এই ক'দিন। শৌনক জড়িয়ে পড়েছে দেবলীনা আর শ্রীনিবাসের সমস্যায়। সেদিন জেলা-পরিষদের প্রদর্শনী থেকে ফিরে এসে রাতে খাওয়ার পর সে আর দেবলীনা গেটের সামনে কাগজফুলের ঝোপের পাশের ছোটো বাগানটায় হাঁটছিল। ল্যাম্পপোস্টের তির্যক আলো বাগানের অন্ধকারটাকে ছায়াছায়া করে রেখেছে। হাঁটতে হাঁটতে টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল। শ্রীনিবাসের কথাই বলছিল দেবলীনা থেমে থেমে। মাঝেমধ্যে দু-একটা প্রশ্নও করছিল শৌনক। এ-কথা সে-কথা হওয়ার পর দেবলীনা একসময় বলল, 'সবই ভাগ্য, বুঝলেন। নাহলে এ-ক'বছর তো আমরা খুবই ভালো ছিলাম। কথা নেই, বার্তা নেই, ভালো মানুষ—সে হঠাৎ না বলে উধাও হয়ে গেল? কী যে নিয়তি আমার! ফেট! আজকাল এই ফেটেই বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি আমি। আপনার কী মনে হয়? এই ফেট-ই সত্যি, তাই না?'

'আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি নিয়তি, অদৃষ্ট বা ভাগ্য মানি না। এই ধারণাগুলো আমাদের দেশের জিনিসও নয়। লাক বা ফেট-এর ধারণা এসেছে পশ্চিম থেকে।'

দেবলীনা বলল, 'ইন্টারেস্টিং! বলেন কী। এগুলো আমাদের দেশীয় বিশ্বাস নয়?'

শৌনক বলল, 'না। নয় তো! এদুটো ধারণাই এসেছে গ্রিস থেকে, রোম থেকে এবং পরে সেমেটিক রিলিজিয়ন থেকে।'

'তাহলে এমন আচমকা ঘটনার ব্যাখ্যা কী দিত প্রাচীন যুগে আমাদের দেশের লোক?'

'আমাদের ছিল কর্মবাদ। কর্ম আর তার ফল। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়। আগেই হোক আর পরেই হোক।'

'সেই একই কথা হল না কি?' দেবলীনা প্রশ্ন করল।

'না, হল না। ভাগ্য বলুন আর নিয়তি বলুন, ওর ওপর আপনার কোনো হাত নেই। কিন্তু যে-কর্ম আপনি নিজেই করেছেন, তার ফলটাও আপনাকেই পেতে হবে। ব্যাপারটা আমার অনেক বেশি লজিকাল মনে হয়। আবার দেখুন, যে-দুঃখে আপনি ভুগছেন, তা যেহেতু আপনার কর্মের ফলেই হয়েছে, অতএব সেই দুঃখকে দূর করার শক্তিও আপনারই হাতে রয়েছে। এর জন্য ভাগ্য বা নিয়তির মতো একটা এক্সটারনাল ফ্যাক্টার মানতে হচ্ছে না।'

'কিন্তু শৌনক, আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছু তো ঘটে, যার কারণ হিসেবে আগে করে ফেলেছি এমন কোনো ডেফিনিট কাজের কথা আমাদের তেমনভাবে মনেই পড়ে না...' দেবলীনা দ্বিধান্বিত স্বরে বলল।

শৌনক বলল, 'মনে না পড়লেও, কারণ কিছু তো থাকবেই। এফেক্ট আছে, অথচ কজ নেই, এমন কিছু কখনও হতে পারে?'

'আগের জন্মে ভুল কাজ করেছি, বলছেন?' দেবলীনা হেসে উঠে বলল।

'আগের জন্ম পরের জন্ম থাক না। ওসবে আমারও মন তেমন যায় না। এই জন্মেই এমন অনেক ভুল করে বসি, যার ফল কালক্রমে ভুগতেই হয়,' শৌনক গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল।

'তবে আপনি কি বলছেন, এই যে শ্রীনি আমাকে ছেড়ে চলে গেল, মানে কোনো খবর নেই কিছু নেই আজ তিন মাস, এটাও কি আমার অতীতের কোনো কাজের ফল? আমিও কি কখনও কাউকে এভাবে দুঃখ দিয়েছি? মনে তো পড়ে না এমন কিছু...' দেবলীনার গলা মিইয়ে এল কেন যেন!

হঠাৎ বাগানের ঝিঁঝি-পোকার ডাকটা চারদিক থেকে যেন ঘিরে ধরল ওদের। শৌনক কিছু বলছিল না। চুপচাপ হাঁটছিল।

কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল শৌনক, 'এসব আপনার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবিষয়ে আমার কথা বলা ঠিক নয়। তবে এসময় আপনার মন খুব অশান্ত হয়ে থাকাই

স্বাভাবিক। যদি কখনও কিছু কথা বলে হালকা হতে চান, আমাকে বা লিলিকে বলতে পারেন,' শৌনকের কণ্ঠস্বর বড়ো সতর্ক শোনাল।

'হ্যাঁ, কেমন যেন মনে হয় আমার, আপনাদের দুজনকেই শুধু বলতে পারি,' প্রায় আত্মগতভাবে যোগ করল দেবলীনা, 'সেইজন্যেই তো মেদিনীপুরে চলে আসতে পারলাম হুট করে।'

'যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে একটা প্রশ্ন করব? মানে, কথাটা বলতে ইতস্তত করছি, আপনি যদি আমাকে রুক্ষ বা অভদ্র ভাবেন, তাই।'

'না, না, বলুন না। কিচ্ছু মনে করব না,' দেবলীনা সহজ সুরে বলল।

'বলছি, আপনি মেদিনীপুরই বা বেছে নিলেন কেন? আপনাদের নাট্যদলের সঙ্গে আরও অন্যান্য শহরের মানুষও তো যুক্ত আছেন। তাদের মধ্যে বন্ধু পাননি কাউকে?'

'লিলির মতো বন্ধু পাইনি, যাকে সব খুলে বলতে পারি। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া?'

দেবলীনা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কী জানি কেন, শ্রীনি-র খুব দুর্বলতা ছিল এই মেদিনীপুর শহরটার প্রতি। দু-একবার বলেছিল, আসবে। প্ল্যানও করে ফেলেছিল। কিন্তু একবারও আসেনি। লিলির সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল একবার কলকাতায়। লিলি মেদিনীপুরের মেয়ে জেনে আমাকে পরে বলেছিল, যেতে পারো তো দু-একবার তোমার বন্ধুর বাড়ি।'

'মেদিনীপুরের প্রতি শ্রীনি-র কেন এই দুর্বলতা বলতে পারেন?' শৌনক জিজ্ঞেস করল।

'জানি না। লোকজীবনের প্রতি আগ্রহ ছিল তো খুব শ্রীনি-র। আপনাদের টুসুপরব, ভাদুপরবের ওপর অনেক বই ও জোগাড় করেছিল। গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দিরের ওপর একটা কাজ করার ইচ্ছেও ছিল। হয়তো সেজন্যেই। আমি ঠিক জানি না...'

'শ্রীনিবাস খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ। নানা বিষয়ে ওঁর আগ্রহ বোঝা যাচ্ছে,' শৌনক বলল।

কিছু বলল না দেবলীনা উত্তরে। কাগজফুলের ঝোপের পাশে হাঁটতে লাগল। তারপর নৈঃশব্দ্য ভেঙে বলে উঠল, 'আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, শৌনক?'

'না, তেমন না। কেন বলুন তো?'

'শ্রীনি বিশ্বাস করত। একবার আমাকে বলেছিল। একবারই।'

'কীরকম?'

হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ল দেবলীনা। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে বাগানের মাটি ওপড়াচ্ছে। যেন কথাটা বলবে কি বলবে না ভাবছে সে। তারপর খুব গভীর থেকে বলল, 'সে আমাদের একেবারে প্রথম দিককার কথা। সবে সবে বিয়ে হয়েছে।

আমরা দুজন একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছি...'

শৌনক উৎকর্ণ হয়ে চুপ করে আছে। সে জানে, এখন একটা শব্দও উচ্চারণ করা যাবে না। তা করলেই দেবলীনার চিন্তাস্রোত বাধা পাবে। ব্যাপারটা আর জানা হবে না।

পায়ের নখ দিয়ে মাটি সমান করে দিতে দিতে দেবলীনা বলল, 'সেটা আমাদের প্রথম ঘনিষ্ঠতম মুহূর্ত। সেটাই প্রথমবার। সব হয়ে যাওয়ার পর শ্রীনি আমাকে বলেছিল, ওহ লীনা! ইউ হ্যাভ গিভন মি ব্যাক টুডে দ্য মেমরি অফ মাই পাস্ট বার্থ।'

বাগানের ঝিল্লিরব আবার প্রবলতর হয়ে উঠছে। শৌনক বলল, 'চলুন, রাত হয়েছে।'

তো, এখন ওই কর্ম আর তার ফলের কথা ভোঁদাও ভাবছিল ডক্টর খামরুইয়ের ডিসপেনসরির বেঞ্চে বসে বসে। তবে একটু ভিন্ন অনুষঙ্গে। সে ভাবছিল, আর-একটু ভোরে ঘুম থেকে উঠে এসে যদি নাম লেখাত, তাহলে এই দশ-বারো জনের পেছনে এতক্ষণ বসে থাকতে হত না। দেরি করে ঘুম থেকে উঠল, দেরি করে নাম লেখাল, এখন সেই আলসেমির ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

অবশেষে নাম এল ভোঁদার। ডাক শুনে ডক্টর খামরুইয়ের চেম্বারে ঢুকতেই ডাক্তারবাবু হেসে উঠে বললেন, 'ও তুই, ভোঁদা? আমি ভাবলাম, কে না কে! তোর এই প্রতুল নাম তো আমি জানি না। ভোঁদা বলেই জানি। বল, কী হয়েছে?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করে ভোঁদা বলল তার সমস্যার কথা। ভুলভাল ভিশন দেখছে, কিছু মনে থাকছে না, এইসব।

'খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করছিস? বিয়েথাওয়াও তো করলি না! চল দেখি, খাটে শুয়ে পড়। পরীক্ষা করে দেখি তোকে,' ডাক্তারবাবু বললেন।

পেট টিপে টিপে দেখলেন। চোখের মণিতে টর্চের আলো ফেলে, জিভ টেনে টেনে দেখলেন। পালস দেখলেন। প্রেশার মাপলেন। ওয়েট মেশিনে উঠে দাঁড়াতে বললেন। সব দেখেটেখে বললেন, 'কোথাও তো কিছু সমস্যা দেখছি না, বাপু! ঘুম কেমন হয় তোর?'

'এই তিন-চার ঘণ্টা,' ভোঁদা বলল।

'এত কম? এত কম ঘুম হলে কী করে চলবে? নেশা-ভাং-টাং করিস নাকি কিছু? লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। বল।'

এই প্রশ্নটা শুনলেই গা জ্বলে যায় ভোঁদার। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মাত্রেই মনে করে, ড্রাইভাররা সবাই মদ খায়। মাঝেসাঝে সেও অবশ্য খায় না যে, তা নয়। তবে নেশা বলতে যা বোঝায়, তা কখনই সে করে না। সে জিম করে, যথেষ্ট স্বাস্থ্যসচেতন। ঘাড় নেড়ে একটু বিরক্তভাবে বলল, 'না, না, ডাক্তারবাবু। নেশাটেশা আমি কখনই করিনি।'

'খুব ভালো। তোকে দেখেও মনে হয় না, নেশা করিস। তাও বললাম, ওই সব

হ্যালুসিনেট করছিস কিনা, তাই। কোনো কারণে নার্ভগুলো দুর্বল হয়েছে। ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে দ্যাখ। ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়। আর তোর ওই ভুলে যাওয়ার রোগটা—ওটা কিছুই না রে! ভুলে যাওয়ার কেস আমি যা দেখেছি, সে তোরা চিন্তাও করতে পারবি না। সেই ভুলে-যাওয়ার কাছে তোর ভুলে-যাওয়ার রোগ তো নস্যি!'

'সে কীরকম?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সে ভয়ানক ব্যাপার। আমার বাবাও ছিলেন ডাক্তার, জানিস তো? ডক্টর সুরেন্দ্র খামরুই। এখানেই চেম্বার ছিল। আমার তখন কলেজের শেষ দিক। একটা বছর দশেকের বাচ্চাকে নিয়ে এক ভদ্রলোক বাবার কাছে এসেছিলেন। এটাই বাবার ডিসপেনসরি ছিল, জানিস তো? তো সেই বাচ্চাটা ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল। চোট যা, তা সামান্যই। কিন্তু আসল ধাক্কা লেগেছিল স্মৃতিতে।'

'আচ্ছা! অদ্ভুত তো! কোন বাড়ি?'

'তোদের পাড়াতেই। ওই মীরবাজারের মসজিদটার একটু আগের একটা বাড়ি। ওই যে রে দাঁড়ে কাকাতুয়া ঝুলে থাকত! তোরা বোধহয় দেখিসনি। অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! বাবা অনেকরকম করে পরীক্ষা-টরীক্ষা করলেন। বাচ্চাটার শরীরে কোনো গোলমাল নেই। শুধু আগের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। এমনকি নিজের নামটা পর্যন্ত মনে নেই। নিজের জামাকাপড় চিনতে পারছে না। এতদিন যা পড়াশোনা করেছিল, সব জলে। কিছু মনে নেই। মানে জীবনের প্রায় প্রথম দশ বছরের অভিজ্ঞতা মায়ের ভোগে চলে গেছে।'

'বলেন কী?'

"তবে আর বলছি কী? বাচ্চাটার মা নেই, ভদ্রলোক একলা হাতে ছেলে মানুষ করেছেন। বাবা নানারকম করলেন। কলকাতাতেও দেখানো হল। কেউ কোনো সুরাহা করতে পারলেন না। আমাদের বাড়িতেও বাচ্চাটা খেলতে আসত মাঝে মাঝে। আমার ঠাকুমার খুব পেয়ারের ছিল। বাবা শেষে বললেন, দ্যাখো ওর তো কোনো প্রবলেম নেই আদারওয়াইজ। কেবল পাস্টের সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পারছে না—এইটুকুই। তো একেবারে একটা নতুন জীবন শুরু করাও। পারলে অন্য কোনো শহরে চলে যাও তোমরা। অন্তত বাচ্চাটার একটা নতুন নাম দিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ হোক। আমার ঠাকুমা বাচ্চাটাকে আদর করে ডাকতেন 'রাজু' বলে। সেই 'রাজু'-নামই দেওয়া হল।"

'তারপর কী হল তাদের? নর্মাল লাইফ হল?'

'তা আমি আর জানি না। তারা বোধহয় চলেই গেল মেদিনীপুর ছেড়ে। আমি তখন এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে ক্যালকাটা মেডিকাল কলেজে ভরতি হয়েছি ডাক্তারি পড়ার জন্য। আর যোগাযোগ ছিল না... যাক গে, তুই ওষুধফসুদ খা। রাতে

একটু বেশি করে ঘুমা। ঠিক হয়ে যাবে। চল, অনেকক্ষণ গপ্পো করেছি। একগাদা রোগী বসে আছে বাইরে।'

ওষুধ নিয়ে ডিসপেনসরি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে চা-বিস্কুট খেতে খেতে ভোঁদা নিজের মনেই খ্যা-খ্যা করে হাসছিল। বুড়ো গল্প বলতে পারে বটে! আজগুবি গল্প সব।

হঠাৎ দেখল গোলকুয়াচক থেকে গড়ানে রাস্তাটা দিয়ে বাইকে করে তিরবেগে শৌনক বাংলা ইস্কুলের দিকে যাচ্ছে। ভোঁদাকে দেখে ব্রেক চেপে বাইকটা থামাল। বলল, 'কী রে? একা একা আপনমনে চা খেতে খেতে হাসছিস?'

ভোঁদা চা-ওলার দিকে ফিরে বলল, 'এই আরেকটা চা দাও।' তারপর শৌনককে বলল, 'আর বলিস না, এসেছিলাম খামরুইকে দেখাতে।'

'কেন রে কী হয়েছে?'

'ঘোড়ারোগ। সব ভুলে ভুলে যাচ্ছি। একটা কথাও মনে রাখতে পারছি না।'

'তো ডাক্তারবাবু কী বললেন?' শৌনক চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল।

'পরীক্ষা করে দেখলেন। ওষুধ দিলেন। বলছেন, ও কিছু না। কিন্তু ডাক্তারবাবুর বয়স হয়েছে। সব উষ্টুম-ধুষ্টুম গল্প বলেন। সেই গল্পটার কথাই ভাবছি আর হাসছি।'

'কী গল্প?'

'আরে, ডাক্তারবাবুর বাবাও ছিলেন ডাক্তার। তা তিনি নাকি একটা বাচ্চাকে দেখেছিলেন। মা-মরা বাচ্চা। বাপে মানুষ করেছে। আমাদের পাড়াতেই মসজিদের আগের একটা পুরোনো বাড়ি। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে বাচ্চাটার মেমরি-লস। পুরোনো কথা কিচ্ছু মনে নেই। এমনকি নিজের নামটাও না। শেষে ডাক্তারবাবুর ঠাকুমা বাচ্চাটাকে একটা নতুন নাম দেন। সেই নাম নিয়েই বাইরে গিয়ে সে তার নতুন জীবন শুরু করে। বোঝ একবার ব্যাপারটা!'

'উঃ! বাপরে!' গরম চা চলকে শৌনকের বুড়ো আঙুলের ওপর পড়ল, সেটাকে পাত্তা না দিয়ে শৌনক ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'খামরুই-ডাক্তারের ঠাকুমা বাচ্চাটাকে কী নতুন নাম দিয়েছিলেন, ডাক্তারবাবু মনে করতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, বললেন তো। তার নাম গজু।'

'গজু?'

'এই গজু না, গজু না। রাজু। রাজু। ওহ্, রাজা-গজা সব গুলিয়ে ভেবলু হয়ে যাচ্ছি দিন দিন।'

আধখাওয়া চায়ের ভাঁড় মাটিতে ফেলে দিয়েই শৌনক বাইকে স্টার্ট দিতে দিতে বলল, "তুই শিওর 'রাজু'?"

'হ্যাঁ, শিওর। তাই তো বলল। চললি কোথায়?'

আর একটুও সময় নষ্ট না করে বাইকে করে বেরিয়ে যেতে যেতে শৌনক বলল, 'তোর মেমরি গেছে ভেবলে আর আমার মগজ গেল পেগলে। চলি। টা টা!'

হুশ্ করে বেরিয়ে গেল শৌনক। তার যাওয়ার দিকে বোকার মতো চেয়ে থেকে ভোঁদা ভাবছিল, শৌনকটা চিরকাল এইরকম। কখন কী যে বলে, কী করে! পাগলা একটা।

বাড়ি ফিরে শৌনক দেখল, আমাজন একটা প্যাকেট দিয়ে গেছে। একটা জিনস অর্ডার দিয়েছিল, তারই প্যাকেট। পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে প্যাকেটটা খুলছিল শৌনক। হঠাৎ পেখম জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তুমি জন্মান্তর মানো?'

ছুরি দিয়ে প্যাকেটটা কাটতে কাটতেই তেরছা চোখে পেখমের দিকে তাকাল শৌনক। নাকের কাছে একটা ঢাউস বই নিয়ে পড়ছে। বই থেকে চোখ তুলে প্রশ্নটা করে তাকিয়ে আছে শৌনকের দিকে উত্তরের অপেক্ষায়।

এই ক-দিন আগেই একই প্রশ্ন করেছিল না দেবলীনা? কোনো এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে শ্রীনি বলেছিল, দেবলীনা নাকি শ্রীনি-র পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে। যত্তসব! প্রেমে পড়ে মানুষ অমন কত কথা বলে। আচ্ছা দেবলীনাই কি পেখমের মাথায় এইসব ভুলভাল চিন্তার ভূতগুলো ঢোকাচ্ছে?

কিন্তু পেখমের হাতের মোটা বইটার মলাটের দিকে তাকাতেই শৌনক বুঝতে পারল, দেবলীনা নয়। হাতের ওই বইটিই যত নষ্টের গোড়া।

বিরক্তভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'না, আমি ওসব মানি না। একটাই জীবন। জন্মে শুরু, মৃত্যুতে শেষ। তুই ওইসব আজেবাজে বই পড়া বন্ধ কর।'

'আজেবাজে নয়, বাবা। ভালো-ও-ও!'

ছুরি দিয়ে প্যাকেটটা খুলতে গিয়ে ফট করে হাতের ওপর ছুরি চলে গেল। এই যাহ্! কেটে গেছে। আঙুলটা মুখে পুরে ঠিক করতে করতে শৌনক বলল, 'বইটা আমি পড়েছি, পেখম। বছর তিনেক আগে বেরিয়েছিল। লেখক ইতিহাসের সঙ্গে প্রচুর কল্পনা মিশিয়েছেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিতের জীবন নিয়ে লেখা। সেখানে শান্তরক্ষিতের এক বাল্যসঙ্গিনী কেশিনীর কল্পনা করেছেন, যে আত্মহত্যা করে মরে। মরার পর আরও দুবার সে জন্মায়। একবার সেনযুগে স্বপ্রভাবতী হয়ে, একবার আমাদের সময়ে যামিনী নামে। কোত্থেকে যে পায় এইসব! বোগাস!'

'ও, ওইজন্যেই তুমি বলছ, আজেবাজে বই? এটা তো উপন্যাস, বাবা। কল্পনা তো থাকবেই। তারপর জন্মান্তরের ব্যাপারটা, যা তোমার অপছন্দ, যদি আক্ষরিক অর্থেই এখানে সেটা জন্মান্তর না হয়?'

'মানে?' শৌনক মুখ থেকে আঙুল বের করে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'আক্ষরিক অর্থে নয়? তাহলে কী?'

'ধরো যদি ফিগার অফ স্পিচ হয়? কেশিনী, স্বপ্রভাবতী আর যামিনী—তিনটে চরিত্র যদি মেয়েদের তিনটে বয়সের রোল-মডেল হয়? তিনটি মেয়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে কন্যা, প্রেমিকা আর স্ত্রী—মেয়েদের এই তিনটে ভূমিকার কথা যদি লেখক বুঝিয়ে থাকেন তাঁর লেখায়? জন্ম-জন্মান্তর যদি এখানে স্রেফ অবস্থান্তর বোঝাতে ব্যবহার করা হয় ইঙ্গিতে?'

ফিগার অফ স্পিচ? অলংকার? এক মুহূর্তে পেখমের হাতের বইটার কথা একদম ভুলে গেল শৌনক। তার মনে আসতে লাগল শ্রীনি-র সেই কথাগুলো। 'লীনা, ইউ হ্যাভ গিভন মি ব্যাক টুডে দ্য মেমরি অফ মাই পাস্ট বার্থ!' এখানে 'পাস্ট বার্থ' কথাটা শ্রীনি ফিগার অফ স্পিচ হিসেবে বলেননি তো? 'পাস্ট বার্থ' মানে এখানে পূর্বজন্ম নাও তো হতে পারে। হয়তো এই জন্মেরই কোনো সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া অধ্যায়কে শ্রীনি 'পাস্ট বার্থ' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। সেই হারিয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া শৈশবেরই স্মৃতি ও আত্মপরিচয় শ্রীনিবাসের মনে হয়তো জেগে উঠেছিল তাদের নিবিড়তার মুহূর্তে। ওসব অবস্থায় সাবকনশাস মাইন্ডের ঢাকনা তো খুলে যায়ই!

তাহলে শ্রীনিবাসই কাকাতুয়া-বাড়ির রাজু? সেক্ষেত্রে সুশীতলটা আবার কে? রাজুর ভুলে যাওয়া পূর্ব নাম?

হাতের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে উল্লাসে পেখমের পিঠে বেমক্কা একটা চাপ্পড় মেরে শৌনক বলে উঠল, 'ব্র্যাভাডো, পেখম! সাব্বাস!'

আচমকা এমন চাপ্পড় খেয়ে পেখম ফ্যাল ফ্যাল করে বাবার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

১৬

এটা বোঝার জন্য কোনো চার্লস টেগার্টের দরকার নেই যে, একটি ছেলে স্কুল থেকে ফিরে স্কুল-ইউনিফর্ম না ছেড়েই বিকেলের জলখাবার নাকেমুখে গুঁজে কোনোমতে উঠে যাচ্ছে মানে কাছাকাছি তার মা অনুপস্থিত এবং খাওয়ার পরেই ছেলেটির ভয়ানক কিছু একটা করে ওঠার মতলব আছে। বাড়ি ফিরে ফ্ল্যাটের দরজা তালা দেওয়া দেখেই উদ্দালক বুঝতে পারল, মা কোথাও বেরিয়েছে এবং বাবা যথারীতি কলেজ থেকে এখনও ফেরেনি। একসেট চাবি উদ্দালকের কাছে সব সময়ই থাকে। ফ্ল্যাটে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলের ওপর প্রতিমা ওর জন্য আলুপরোটা রেখে গেছে দেখে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবারগুলোর মোটামুটি একটা নিষ্পত্তি করে নিজের ঘরে এসে ঢুকল উদ্দালক। ব্যাগ আর ইউনিফর্ম চেয়ারের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বারমুডার ওপর জামাটা গলিয়ে নিয়েই বিছানায় সোজা ডাইভ দিল। অত্যন্ত কড়া ভাষায় সে স্কুল যাওয়ার আগে মাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল, যেন তার বিছানায় ছড়ানো বইগুলো গুছিয়ে রাখার চেষ্টা মা কোনোভাবেই না করে।

এসব নিয়ে প্রচুর অশান্তি হয়েছে, কিন্তু দালি কী করতে পারে? মা ছোটো মেয়ে, মায়ের পক্ষে এসব বিপ্লবীদের ব্যাপার বোঝা সম্ভব নয়; তার জন্য দালির মতো বড়ো হতে হয়। তাছাড়া কোন বিপ্লবীর মা-ই বা ছেলেকে বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন? মা বাড়ি ফিরে বকবকম করবে করুক, ঘরের কোণে টিভি চালিয়ে রাখলেও ওরকম অনর্গল কথা শোনা যায়, তাতে দালির বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না—সে নিজের কাজে দিব্বি কনসেনট্রেট করতে পারে।

সবুজমামা এবার মেদিনীপুর থেকে চলে আসার সময় একগাদা বই দিয়েছিল, তারপর কুরিয়ারে পাঠিয়েছে আরও অনেকগুলো। আপাতত বইয়ের তাক থেকে বিছানায় নেমে এসেছে শৈলেশ দে-র 'আমি সুভাষ বলছি', ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়-এর 'সবার অলক্ষ্যে', বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত-এর 'আমার মামা বাদল গুপ্ত', মধুমন্তী সেনগুপ্ত-এর 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স', পৃথ্বীশ গুপ্ত-এর 'শহীদ দীনেশ', অনন্ত সিংহ-এর 'সূর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা' এবং সম্বিতের লেখা 'আগুনপাখির ডানা'। শেষ বইটা দালির হাতে ধরা এখন, বাকি বইগুলোর বিভিন্ন পাতা খোলা, কোনোটাতে বা

বুকমার্ক গোঁজা। চিত হয়ে শুয়ে বুকের ওপর সম্বিতের লেখা বইটা খুলে সে পড়ছে, স্কুলে যাওয়ার আগে যতটা পড়ে গেছিল, ঠিক তারপর থেকেই।

দালি জানে, শুধু 'সম্বিৎ' বলে কারও নাম হয় না, এটা নিশ্চয়ই লেখকের ছদ্মনাম। ও নিয়ে তার মাথাব্যথাও নেই, আপাতত খুব পুরোনো হয়ে আসা জরাজীর্ণ বইটার হলুদ পাতার মধ্যে সে একেবারে ডুবে আছে। লেখাটা খুব পুরোনো বলেই হয়তো বর্ণনাগুলো আবেগবর্জিত এবং বাস্তবসম্মত। এই সম্বিৎ লোকটি নির্ঘাত কোনো বিপ্লবী-দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই সময়, দালির কেন জানি মনে হল। স্কুলের লেখাপড়া তার ডকে উঠেছে, সে মজে আছে উনিশশো তিরিশে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘটনাগুলো পড়ছে, চেনা জায়গাগুলোর সঙ্গে মেলাচ্ছে আর নিজেই নিজের মধ্যে আগুন হয়ে উঠছে। আগুনপাখি তার দুপাশে জ্বলন্ত ডানা ঝাপটাচ্ছে দিনে-রাতে, সকালে-দুপুরে সমানে।

দালি পড়তে লাগল :

'ডাক্তার অনিমেষ রায় ও ডাক্তার হিমাংশু ব্যানার্জি নিউ পার্ক স্ট্রিটের বাড়িটির দোতলা ডিসপেনসরির নিমিত্ত ভাড়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ডিসপেনসরি ছিল ছল মাত্র, বস্তুত ইহাই ছিল বিভি-র একটি গোপন আস্তানা। এই বাড়িতে দলের দুই বরেণ্য সদস্য নিকুঞ্জ সেন ও সুপতি রায়চৌধুরী বাস করিতেন। সম্প্রতি দীনেশ ও বাদল—দুই পলাতক বিপ্লবীকে এখানে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। বিশেষত দীনেশের উপর পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি ছিল। উনিশশো তিরিশের আটই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে দশটা হইবে; নিকুঞ্জ সেন এক ট্যাক্সি ডাকিয়া আনেন। ওই ট্যাক্সিতে করিয়াই বাদল ও দীনেশ আসন্ন সংগ্রামের পথে যাত্রা করিবেন, স্থির হইয়াছিল। মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহর আস্তানা হইতে বিনয়কৃষ্ণ বসু আরেকটি পৃথক ট্যাক্সিতে রসময় শূরের সহিত আসিয়া পৌঁছাইবেন, স্থির ছিল। উভয় ট্যাক্সি খিদিরপুরের পাইপরোডের মোড়ে আসিয়া মিলিবে। সেস্থল হইতে তৃতীয় একটি ট্যাক্সি বিনয়-বাদল-দীনেশ এই ত্রয়ীকে লইয়া রাইটার্সের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা। নিকুঞ্জ সেন চিন্তিত মুখে সিঁড়ি দিয়া শশব্যস্তে দোতলায় আরোহণ করিতে লাগিলেন।'

দালি বালিশটাকে উঁচু করে খাটের ছত্রিতে উঠিয়ে শুল। তারপর কী জানি কী হল, থুতনি ও দাড়ির কাছটা একটু চুলকে প্রথমে সোজা হয়ে বসল। তারপর বইয়ের ওপর অখণ্ড মনোযোগে ঝুঁকে বসে পড়তে লাগল : "নিকুঞ্জ সেন সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে দীনেশের উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। দীনেশ মন্দ্রস্বরে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। ক্ষণতরে আত্মনিমগ্ন হইয়া নিকুঞ্জ বুঝিলেন, উহা রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা। দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, দীনেশের মন্দ্র কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে চড়িয়াছে আর বাদল চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছেন। ঘরের পরিবেশ যেন অনুপ্রেরণার বিদ্যুতে একেবারে আহিত হইয়া আছে। দীনেশ যখন উচ্চারণ করিলেন,

'সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।'

তখন বাদল আর চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রাণিত দীপ্ত চক্ষে বাদল দীনেশদার সেই আগ্নেয় মূর্তি দেখিতেছিলেন। সহসা দ্বারপথে দুইজনেরই দৃষ্টি পড়িল। চৌকাঠে নিকুঞ্জ সেন দাঁড়াইয়া হাতঘড়ি দেখিতেছেন। আর বিলম্ব না করিয়া দুইজনেই দ্রুতবেগে সৈনিকের বেশ পরিধান করিয়া লইলেন। বাদল গাঢ় বাদামি রঙের কোট-প্যান্ট, দীনেশ ছাই ছাই রঙের একটি প্যান্টের উপর একটা কালো কোট পরিলেন। দুইজনই শিরোদেশে শোলার হ্যাট পরিতেই তাঁহাদের মূর্তি যেন একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে বাঙালি যুবক আর নাই, ইউরোপিয়ান পোশাকে সুসজ্জিত একেবারে পাক্কা দুই ইংরাজ সাহেব। আর এক মুহূর্ত দেরি না করিয়া জুতা পরিয়া নিকুঞ্জবাবুর পশ্চাতে সিঁড়ি দিয়া খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে দুইজনে বাড়ির বাহিরে দণ্ডায়মান কালো ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিলেন।"

পড়তে পড়তে দালির শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। সে যেন সেদিনের ছবি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। তার ঘরের দরজা-জানালা, খাট-টেবিল যেন তার চেতনা থেকে কোথায় উবে যাচ্ছে। এক্ষুনি একটু পরেই সেই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে। ইংরেজের দুর্ভেদ্য দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিঙে গিয়ে প্রবেশ করবেন সাহেবি পোশাকে সজ্জিত তিন অকুতোভয় তরুণ। প্রচণ্ড উত্তেজনায় দালি বইটা দুহাতে তুলে চোখের কাছে নিয়ে এল।

আর অমনই সে দেখল, সে একটা অদ্ভুত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা লম্বা টানা বারান্দা। পায়ের নীচে মেঝেটা কালো কালো স্ল্যাব দিয়ে বাঁধানো। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, স্ল্যাবগুলো সব সমান আকারের নয় এবং তাদের মধ্যে আবার একটু একটু করে ফাঁক আছে। ওপরের দিকে তাকাল। দেখল, মাথার ওপরে ছাদটাও একইরকম কালো কালো পাথর দিয়ে বাঁধানো। সেই পাথরগুলোর মধ্যেও যেন একটু একটু ফাঁক। দালি বারান্দাটা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল; এ কী হল তার? কোথায় এসে পড়ল সে? বারান্দাটার একপ্রান্তে একটা কালো রঙের কলাম সোজা দাঁড়িয়ে আছে দেখল। কলামটা ছুঁতেই সেটা যেন সট্ করে একপাশে সরে গেল। তারপর পায়ের নীচে আরেকটু বড়ো একটা ফাঁক। সেটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে দেখল সেই একইরকম আরেকটা বারান্দা। মেঝেতে আর ছাদে সেই একইরকম কালো কালো পাথরের স্ল্যাব। আরেকটু এগোল; হঠাৎ সামনে কালো রঙের কী একটা জিনিস ছাদের ওপর

থেকে কাঠবিড়ালির মতো লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে দেখতে পেল। জিনিসটার মাথাটা ঢুমকো গোল বলের মতো, সেই গোলাকার মাথা থেকে লম্বা একটা লেজ নীচে নেমে এসেছে। জিনিসটাকে দেখবার জন্যই দালি একটু থামল; আর অমনই এবার মাথার ওপর থেকে শুধুই একটা লেজ নীচের দিকে ঝুলে পড়ল, তারপর আবার সেই আগের মতোই একটা লম্বা কালো কলাম। এ কী রে বাবা?

বারান্দার এদিক থেকে ওদিক হাঁটাহাঁটি করতে করতে দালি আচম্বিতে বুঝতে পারল, সে আসলে বইয়ের পাতার ছাপা লাইনগুলোর মাঝখানের স্পেস দিয়ে হেঁটে চলেছে। পায়ের নীচের কালো স্ল্যাবগুলো নীচের লাইনের শব্দ আর মাথার ওপর সামান্য ব্যবধান রেখে সাজানো কালো পাথরগুলো আসলে ওপরের লাইনের শব্দ। গোলাকার জিনিসটা থেকে নেমে আসা লেজের মতো ব্যাপারটা আসলে একটা প্রকাণ্ড সেমিকোলন; ওপর থেকে নীচের দিকে ঝোলানো লেজটা আসলে কমা, কালো রঙের কলামগুলো আসলে বাক্যশেষের পূর্ণচ্ছেদ। কমা, ড্যাশ, সেমিকোলন, কোলন, হাইফেন, পূর্ণচ্ছেদে সাজানো একেকটা লাইনের বারান্দা দিয়ে দালি হাঁটছে!

হঠাৎ ওপরের লাইনের একটা ৎ-এর লেজ দালির কপালে বেড়ালের রোমশ লেজের মতো ছুঁয়ে যেতেই তার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। তার ভয় লাগছে না, বেশ মজা লাগছে। এ তো দারুণ ব্যাপার হল! এবার আবার সামনের কালো রঙের কলামের নীচে একটা কালো রঙের গোলাকার বল। ও, ওটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন!

বারান্দাটা দিয়ে হাঁটা বেশ ঝামেলার ব্যাপার দেখল দালি। ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার প্রভৃতির উড়নি কিংবা রেফ-চিহ্নের তির্যক খোঁচা বারান্দার মেঝে থেকে ওপরে উঠে আছে। সেসব এড়িয়ে বারান্দা দিয়ে হাঁটা এক দুর্ঘট ব্যাপার।

চমকিত, উত্তেজিত দালি তবু সেই বারান্দাটা দিয়েই হাঁটতে লাগল। একটু পরেই মসমস শব্দ করে কতগুলো লোক দালির পাশ দিয়ে কী যেন বলতে বলতে হেঁটে গেল। তারপরেই বুটের শব্দ তুলে এক ইংরেজ সাহেব দর্পিত ভঙ্গিতে বারান্দা-সংলগ্ন একটা ঘরের সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে চলে গেলেন। দালি আবার বারান্দাটার দিকে তাকাল। বারান্দাটা ইতোমধ্যে কখন যেন আমূল পালটে গেছে। সেই অক্ষর দিয়ে সাজানো বাক্যের বারান্দা আর নয়, এ যেন একটা সত্যিকারের স্বাভাবিক বারান্দা একটা। ছাদটা অনেক ওপরে উঠে গেছে দ্যাখো কোথায়! লোহার বিম দিয়ে তৈরি ছাদের কড়িকাঠগুলো সোজাসুজি ও আড়াআড়িভাবে সাজানো। বেশ গম্ভীর পরিবেশ চারিদিকে। লোকজন যাতায়াত করছে, অথচ অন্যরা কেউ দালিকে দেখছে না কেন? দালি চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে শুনছেন?'

যাকে বলল, সে লোকটা দালির কথা শুনতেই পেল না। ইংরেজ সাহেবসুবো, ধুতির ওপর কোট চড়ানো বাঙালি বাবু, খাঁকি ইউনিফর্ম-পরা তকমাধারী সান্ত্রী সব

বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। কেউ দালিকে পাত্তাই দিচ্ছে না। একদল লোক দালির দিকেই হেঁটে আসছে দেখে, দালি একপাশে সরে যেতে চাইল, যাতে ধাক্কা না লাগে। কিন্তু তার আগেই তারা দালিকে অবাক করে দিয়ে দালির শরীর ভেদ করে চলে গেল!

তার মানে, এদের কাছে দালি অদৃশ্য হয়ে আছে। বাতাসের শরীর হয়ে গেছে তার? লোকগুলো দালিকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু দালি ওদের দেখতে পাচ্ছে। লোকগুলো দালির কথা শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু দালি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে। মজার ব্যাপার তো! এমন থমথমে পরিবেশ, এটা কি তাহলে কোনো একটা অফিস?

বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, কেন জানি মনে হল, এই বারান্দা দিয়েই কারা যেন একটু পরেই হেঁটে আসবে। ওই চওড়া সিঁড়িটা দিয়েই যেন জুতোর শব্দ তুলে উঠে আসবে। কারা তারা? দালি চোখ তুলে তাকাল, বারান্দার রেলিঙের ওপর দুপুরের রোদ এসে পড়েছে। কোথায় যেন ইতিহাসক্লান্ত মন্থর সুরে ঘুঘু ডাকছে, ঘু-ঘু!

দূরের আকাশটায় কী একটা পাখি পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে দিঘিটার কালো জলের ওপর। সেই পাখিটার দিকে তাকাতে তাকাতে দালির মনে হল, সে যেন বারান্দাতে আর নেই। ওই পাখিটার সঙ্গেই তার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে আকাশপটে। না, পাখিটাই হয়ে গেছে সে। এখন দালি অর্থাৎ পাখিটা আকাশে আর পাক খাচ্ছে না। চিকন রৌদ্রের উজ্জ্বল উত্তাপের ভেতর দিয়ে পাখিটা যেন দালির প্রাণ মুখে নিয়ে শহর কলকাতার ব্যস্ত রাজপথগুলো পার হয়ে উড়ে যাচ্ছে ভেসে ভেসে সামনে, সামনে, কোথায় যেন শুধুই সামনে...

একটা তেমাথার মোড়ে এসে দালি নামল। নামামাত্রই দেখতে পেল, নিউ পার্ক স্ট্রিটের সেই পুরোনো আমলের কালো ট্যাক্সিটা এই তেমাথায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির বাইরে পথের ওপর সতর্ক চোখ মেলে অপেক্ষা করছেন নিকুঞ্জ সেন। একটু পরেই আরেকটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সেই ট্যাক্সি থেকে নামলেন একজন সুদর্শন ফিরিঙ্গি যুবক। ফিরিঙ্গিদের তুলনায় যুবকটির গায়ের রং সামান্য চাপা। পরনে কোট-প্যান্ট, পায়ে পয়েন্টেড শু, মাথায় একটা কানা-উঁচু শোলার টুপি। ফিরিঙ্গি যুবকটি রাস্তা ক্রস করে নিকুঞ্জ সেনের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'একটু দেরি হয়ে গেল, নিকুঞ্জদা! আসলে বউদিদিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বেরিয়ে আসতে সময় নষ্ট হল,' পরিষ্কার বাংলায় খুব চাপা স্বরে ফিরিঙ্গি যুবকটি কথা বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, তাই একটু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, বিনয়। তবে তেমন কিছু দেরি হয়নি। চলো!' এই বলেই নিকুঞ্জ সেন প্রথম ট্যাক্সিটির কাচের ভেতর দিয়ে ট্যাক্সিতে বসে

থাকা আরোহীদের চোখের ইঙ্গিত করলেন। তখনই ট্যাক্সির দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন ইউরোপীয় পোশাক-পরিহিত আরও দুজন যুবক। এঁদের দুজনকে দলি যেন আগেই দেখেছে। আরে, এঁরাই তো একটু আগে সেই নিউ পার্ক স্ট্রিটের বাড়ির দোতলায় বসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছিলেন না? হ্যাঁ, তাই তো। দুজনের মধ্যে চশমা-পরা অপেক্ষাকৃত বড়ো ছেলেটি দীনেশ আর ছোটো ছেলেটি বাদল।

দলি এতক্ষণ লক্ষ করেনি, রাস্তার মোড়ের অপরদিকে তৃতীয় একটা ট্যাক্সি এতক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। সেটা এবার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে তিনজন যুবকই গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসলেন। নিকুঞ্জ সেন দ্বিতীয় ট্যাক্সিটির ভেতরে বসে থাকা আরোহীদের দিকে তাকিয়ে কী যেন ইশারা করলেন। দ্বিতীয় ট্যাক্সিটি অমনই ছেড়ে দিল। নিকুঞ্জ সেন রুমালে মুখ মুছে তৃতীয় ট্যাক্সিটার জানালার কাছে মুখ নামিয়ে এনে সন্তর্পণে ফিসফিস করে বললেন, 'গুড লাক! বন্দে মাতরম্!'

ট্যাক্সির ভেতরে বসে থাকা তিন যুবক শ্বাসের গভীরে উচ্চারণ করলেন, 'বন্দে মাতরম্!' তার পরমুহূর্তেই তাঁদের ট্যাক্সিও ছেড়ে দিল।

অদৃশ্য দলি ইতোমধ্যেই ট্যাক্সির ভেতরে এসে বসেছে। পেছনের সিটে মাঝখানে বসেছেন বিনয়; তিনি সামান্য স্থূলাকৃতি। তার একপাশে বাদল, অন্যপাশে দীনেশ।

দলি বসেছে ড্রাইভারের পাশের সামনের সিটে। সে বুঝতে পারছিল, উনিশশো তিরিশের সেই ঐতিহাসিক আটই ডিসেম্বর অলিন্দ-যুদ্ধের বীর সেনানীদের সঙ্গেই সে রণাঙ্গনে চলেছে। কী আশ্চর্য! বই পড়তে পড়তে এটা হচ্ছেটা কী?

'খিদিরপুরের পাইপরোডের মোড় হইতে তৃতীয় আরেকটি ট্যাক্সিতে করিয়া বিভি-দলের মেজর বিনয়কৃষ্ণ বসু, লেফটেনান্ট সুধীর ওরফে বাদল গুপ্ত এবং ক্যাপটেন দীনেশ গুপ্ত তাঁহাদের অন্তিম সমরাঙ্গনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গাড়ি কে চালাইতেছিল, তাহা আজ আর বলিতে পারি না। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী ঢাকার মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বিনয়ের বয়স বাইশ বৎসর। উনিশশো তিরিশ সালের উনত্রিশে আগস্ট তৎকালীন বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মি. লোম্যান-কে বধ করার পর পলাতক বিপ্লবী বিনয় কলকাতার মেটিয়াবুরুজে রাজেন গুহর বাড়িতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। রাইটার্স-অভিযানকালে দীনেশের বয়স বিশ বৎসর এবং বাদলের বয়ঃক্রম অন্যূন আঠারো বৎসর হইবে। এই অসমসাহসী যুবকবৃন্দ দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য সেই দিন নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কেবল মরণের পূর্বে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সংকল্প ও অদম্য প্রতিজ্ঞার আগুন ওই যুবক-ত্রয়ীর চোখেমুখে যেন ক্রান্তিকারী দীপ্তি লইয়া সেইদিন অবিশ্রান্ত খেলা করিয়া ফিরিতেছিল...'

পেছনের সিট থেকে দীনেশ গাড়ির ড্রাইভারের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'কেমন আছেন, সুবিমলবাবু? ওদিকের সব খবর কী?'

ড্রাইভার উত্তর দিল, 'খবর ভালোই। যেমন রেখে এসেছিলেন, তেমনই। পৌঁছে খোঁজখবর নেওয়া চলছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।'

দীনেশ উত্তর দিলেন, 'গুড!' এই বলেই দীনেশ অনুচ্চস্বরে পাশে বসা বিনয়কে বললেন, 'দিস জেন্টলম্যান সুবিমলবাবু ইজ নাউ আওয়ার ট্রেজার প্রোটেক্টার চিফ।'

উত্তরে বিনয় নীচু স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, তোর সেই প্যারানিক্সিটারি ট্রুপ। এদের দিয়ে কাজ হবে।'

বাদল দীনেশকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'তুমি সেই চিঠিটা আর মালপত্র যতীশ গুহদারে পাঠাইয়া দিছ? হ্যারাই সামলাইয়া রাখব তোমার লগে কথা হইছে?'

দীনেশ সম্মতিসূচক কিছু বলবার আগেই বিনয় বলে উঠলেন, 'শশশশ! বাঙাল ভাষায় কথা বলিস না এখন, বাদল। আমাদের আইডেন্টিটি ডিসক্লোজড হয়ে যাবে। গাড়িতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অভ্যাসবশে অ্যাকশনের মধ্যে এই ডায়ালেক্টে কথা বলে ফেললেই সমূহ সর্বনাশ!'

সঙ্গে সঙ্গে বাদল ও দীনেশ এক লহমায় সিরিয়াস হয়ে গেলেন। একটু পরে বাদল গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সরি, মেজর! উই শ্যান'ট রিপিট দিস এগেইন।'

কঠিন স্বরে বিনয় উত্তর দিলেন, 'ইয়েস। রিমেমবার, দিস ইজ দ্য ফাইনাল রুল, হোয়েন আওয়ার ফিউচার কামস টু শেক হ্যান্ড উইথ আওয়ার প্রেজেন্ট!'

ট্যাক্সির মধ্যে অতন্দ্র নীরবতা। কেউ আর কোনো কথা বলছেন না। কোন এক অজানাকে বরণ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পেছনের সিটে বসা তিনজন যুবক যেন অনড় স্তব্ধতায় নিজেদের শেষবারের মতো তৈরি করে নিচ্ছেন।

দালি মনে মনে ভাবছিল, গাড়ির চালক এই ভদ্রলোকই তবে সেদিনের সুবিমলবাবু! ড্রাইভারের ঠিক পাশের সিটে বসেছে দালি, তাই সুবিমলবাবুর মুখটা সে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছিল না।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে সামনে, দুপাশে তাকিয়ে ছিল দালি। এ তার পরিচিত কলকাতা নয়। রাস্তাগুলো অনেক সরু। দুপাশে বাড়িঘর দোকানদানির সংখ্যাও অনেক কম। রাস্তাঘাটে লোকজনের সংখ্যাও অত বেশি নয়। তবু কোথাও যেন একে একভাবে চেনা যায়। কলকাতাই। তবে সেদিনের কলকাতা।

গাড়িটা ধীরে ধীরে লালবাজার স্ট্রিটে এসে পড়ল। আর-একটু এগোনোর পরেই যে-বিল্ডিংটা দেখতে পেল দালি, সেটা চিনতে তার অসুবিধে হল না। রাইটার্স বিল্ডিং। বড়ো ঘড়িটায় সময় বেলা বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট।

ট্যাক্সি থেকে তিনজন নামলেন। দালিও নামল ওঁদের সঙ্গেই। সুবিমলবাবু গাড়ি

ঘুরিয়ে চলে গেলেন। রাইটার্সে দুপুর বেলার কর্মমুখর ব্যস্ততা। চারিদিক একেবারে লোকজনে গমগম করছে!

অদৃশ্য অবস্থায় ওই তিনজনের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দালি একবার ওঁদের মুখের দিকে তাকাল। আর সেদিকে তাকানোমাত্রই সে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এতক্ষণ সে যাঁদের দেখে আসছিল, যাঁদের সঙ্গে সে এতটা পথ ট্যাক্সিতে চড়ে এল, এঁরা যেন এখন আর সেই সহজ মানুষ নন। বলদৃপ্ত ভঙ্গিমায় ইউরোপীয় পোশাকে যেন তিন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার নির্দিষ্ট ও পরিমিত পদক্ষেপে পাশাপাশি সমছন্দে হেঁটে চলেছেন। ইস্পাতের মতো ক্ষুরধার, শানিত তাঁদের দৃষ্টি কী যেন এক দুর্বার অনুপ্রেরণার আগুনে ধ্বধ্বক করে জ্বলছে; কী এক অয়স্কঠিন প্রতিজ্ঞার আভা তাঁদের মুখে চোখে চিবুকে ছড়ানো, মাথা উঁচু করে তাঁরা হাঁটছেন—অভয় ও অকুণ্ঠ তাঁদের আগ্নেয় উপস্থিতি! দেখতে দেখতে দালির একেবারে তাক লেগে গেল। এত সুন্দর, এত মহিমময় কোনোকিছু সে কখনও দেখেনি।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর ওয়েস্টার্ন স্টেয়ারকেস দিয়ে গটগট করে তাঁরা উঠে গেলেন। তাঁদের প্রশ্নাতীত চলনে কারও মনে মৃদুতম সন্দেহেরও উদ্রেক হল না। দালি তাঁদের পেছনে পেছনেই আসছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা টানা বারান্দা পড়ল। দালি অবাক হয়ে দেখল, আরে! এই তো সেই বারান্দাটা, যেখানে সে প্রথমেই এসেছিল! তখন ছিল সকাল, আর এখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

বারান্দার একপাশে সারিসারি ঘর, বাদল সবার আগে হেঁটে চলেছেন, বাকি দুজন তাঁর পেছনে। মনে হল, বাদলই পথ দেখিয়ে চলেছেন, সম্ভবত এর আগে কোনোদিন তিনি সাধারণ পোশাকে এখানে এসে কোথায় কোন ঘর, কে কোথায় বসেন, সব ঘাঁতঘোঁত দেখে গিয়ে থাকবেন। দোতলার বারান্দার প্রথম ঘরের সামনে কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট মিস্টার ফোর্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ইউরোপীয় পোশাকে এই তিনজনকে দেখে তিনি কিছু বললেন না। মিস্টার ফোর্ডের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের অফিস পড়ল। অফিসের সামনে সলিসিটর মিস্টার হাডসন দাঁড়িয়ে আছেন। এঁরা তিনজন তাঁকে পাত্তাও দিলেন না। সোজা এসে দাঁড়ালেন বাংলার কারাবিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল লেফটেনান্ট কর্নেল নরম্যান স্কিনার সিম্পসনের ঘরের সামনে।

কক্ষের বাইরে একজন চাপরাশি দাঁড়ানো। বিনয় এগিয়ে এলেন তার দিকে। বললেন, 'উই ওয়ান্ট টু মিট কর্নেল সিম্পসন। সিম্পসন সাহাব কো মিলনা হ্যায়।' চাপরাশিটি উত্তর দিল, 'লেকিন উসকা পিএ রায়সাহাব অন্দর মে হ্যায়।' তারপর কী যেন ভেবে আবার যোগ করল, 'সাহাব, আপ এক কাম কিজিয়ে। আপকা কার্ড দিজিয়ে।'

এসব কথাবার্তার মধ্যেই সিম্পসন সাহেবের হেড চাপরাশি ভাগল খান বেরিয়ে এল। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বিনয় তাঁর সহযোদ্ধা দীনেশ ও বাদলের উদ্দেশে আদেশ দিলেন, 'চার্জ'।

সঙ্গে সঙ্গে চাপরাশিদের ঠেলে ফেলে দিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় তিনজন ঘরের মধ্যে তড়িৎগতিতে প্রবেশ করলেন। সিম্পসন সাহেব টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী লিখছিলেন, পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পিএ রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র গুহ। এই তিনজনের অতর্কিত প্রবেশে সামান্য অবাক হয়ে সিম্পসন টেবিল থেকে মাথা তুললেন। অমনই বজ্রহুংকারে বিনয় আদেশ দিলেন, 'ফায়ার।'

শুধু একটি মাত্র শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের রিভলভার থেকে একঝাঁকে ছ-টি বুলেট সশব্দে বেরিয়ে গিয়ে কর্নেল সিম্পসনের দেহের অব্যর্থ নিশানা বিদ্ধ করল। সিম্পসন মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়লেন কঠিন মেঝেতে। লুটিয়ে পড়ল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির গর্বোদ্ধত অত্যাচারী একটি স্তম্ভ।

সাহেবের পিএ জে সি গুহ কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে দরজার কাছে এসে চেঁচাতে গেল। দীনেশ তখনই জে সি গুহ-র দিকে রিভলভার তুলে ধরলেন। লোকটার গলা দিয়ে আর ভয়ে আওয়াজ বেরোলো না। তবু এসব বাঙালি ভদ্রলোকের প্রভুভক্তির তো সীমা নেই! কোনোমতে ঘর থেকে পালিয়ে রাইটার্স-এর পেছনের লোহার সিঁড়ির কাছে এসে লোকটা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'ফায়ারিং... হেল্প, হেল্প, দে হ্যাভ কিলড হিম।' ইতোমধ্যে সেই প্রহৃত চাপরাশিটি মিস্টার টাফলেন ব্যারেট-এর কাছে গিয়ে রিপোর্ট করেছে, 'সাহাবকো মার ডালা।' ব্যারেট তখনই ফোন তুলে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন।

লম্বা টানা বারান্দাটা এক মুহূর্তে জনশূন্য হয়ে গেল। গুলির শব্দে যে যার প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। বারান্দার কাছে ছুটে এলেন সার্জেন্ট ফোর্ড। দেখলেন, পূর্বদৃষ্ট সেই তিন যুবক বারান্দা দিয়ে ছাদ ও মেঝেতে এলোপাতাড়ি ফায়ার করতে করতে এগোচ্ছে। ফোর্ডের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, ওই যুবকদের থেকে একশো বা একশো কুড়ি ফিট দূরত্ব রেখে দেওয়াল ধরে ধরে নিজের প্রাণটি হাতে নিয়ে তিনি সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন। অদূরে একটা মোটা থামের আড়ালে প্রাণভয়ে লুকিয়ে কলাপাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে সলিসিটর মিস্টার হাডসন লক্ষ করলেন, সেন্ট্রাল স্টেয়ারকেস পেরিয়ে তিন সশস্ত্র যুবক এগজিকিউটিভ কাউনসিলর মিস্টার আলেকজান্ডার মাড়ের অফিসের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে চাপরাশির কাছে বাধা পেয়ে মিস্টার মাড়ের কক্ষের পুবদিকের দরজার সামনে এসে বিনয় বললেন, 'ভলান্টিয়ার্স, চার্জ।'

প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে উঠল রিভলভার তিনটি অফিসঘরের সুইং-ডোরের কাচ

ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। আলেকজান্ডার মাড় পশ্চিমের দরজা দিয়ে পাগলের মতো দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

দালি ভাবছিল, কাজ তো শেষ, সিম্পসন খতম, এঁরা এখনও দেরি করছেন কেন? এবার পালালেই তো হয়।

কিন্তু এই তিন যোদ্ধার ধাতু দালি চেনে না, আজকের আমরা কেউই চিনি না। বারান্দায় বেরিয়ে এসে ছাদ লক্ষ করে দীনেশ গুপ্ত গুলি চালাতে লাগলেন। বিনয় হিসহিস শব্দে উচ্চারণ করলেন, 'লেট দেম কাম ডাউন থ্রু দ্য স্টেয়ারকেস! উই উইল টিচ দেম আ লেশন।'

কাজ হল। তিনতলা থেকে হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে রিভলভার হাতে দলবলসমেত নেমে এলেন ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার ক্রেগ। তিন যুবক তখন বারান্দার শেষ সীমায় চিফ সেক্রেটারির অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে। ক্রেগ তখনই গুলি ছুড়লেন, কিন্তু নিশানা মিলল না। এদিকে দেওয়াল ধরে ধরে ফোর্ড এসে পৌঁছেছেন ক্রেগের পাশে। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের গুলি-বিনিময় হতে লাগল। সমস্ত বারান্দাটা ধোঁয়ায়, ফায়ারিঙের শব্দে, রণহুংকারে, বারুদের গন্ধে একেবারে সুপবিত্র হয়ে উঠল। জানালাগুলো চুরমার, চিনেমাটির ফুলদানিগুলো উলটে পড়েছে, চারিদিক ধূমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে অগ্নিবর্ষী উদ্গীরণ; দালির মনে হল, আহা! যেন শিবতাণ্ডব শুরু হয়েছে!

পাসপোর্ট অফিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বিনয় বললেন, 'দিস রুম ইজ ব্ল্যাংক। ভলান্টিয়ার্স, এন্টার অ্যান্ড রি-লোড। উই উইল নট স্পেয়ার এনি অফ দেম টিল উই হ্যাভ দ্য লাস্ট বুলেট! বন্দে মাতরম্!'

পাসপোর্ট অফিসের বাইরের ঘরে বাদল আর দীনেশ ঢুকলেন রিভলভার রি-লোড করতে। বিনয় বাইরে দাঁড়িয়ে ফায়ার করে চলেছেন। এমন সময় পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ব্রিটিশ সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মিস্টার নেলসন। বিনয়ের অগ্নিমূর্তি দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, আজ আর রক্ষা নেই। নেলসন পালানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আগেই বিনয়ের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। নেলসনের উরুতে গুলি বিদ্ধ হল। সেই অবস্থাতেও নেলসন পলায়নোন্মুখ। কিন্তু বিনয় তাঁকে ছাড়লেন না। নেলসনের পিছু পিছু তাঁরই অফিসঘরে ধাওয়া করলেন। নেলসন মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। বিনয়ের সঙ্গে শুরু হল নেলসনের ধ্বস্তাধ্বস্তি। বিনয়ের রিভলভার-ধরা হাতটা নেলসন প্রাণপণে মুচড়ে ধরলেন।

এদিকে বাদল আর দীনেশ তখন পাসপোর্ট অফিসের খালি ঘরে ঢুকে রিভলভার রি-লোড করছিলেন। এমন সময় পাসপোর্ট অফিসের দরজা বাইরে থেকে খুলে গেল। একজন আমেরিকান মিশনারি মিস্টার জনসন, যিনি পাসপোর্ট করার জন্য

অফিসে এসেছিলেন, পাসপোর্ট অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে। বাদল তখনই তাঁকে নিকেশ করার জন্য রিভলভার তুলে ধরলেন। জনসন ঝট করে দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দা সংলগ্ন রেইন-পাইপ ধরে 'ও যীশাস!' বলে শূন্যে ঝুলে পড়লেন। সরু প্যারাপেটের ওপর পা রেখে খড়খড়ি ধরে ঝুলে রইলেন ধর্মত্রাতা ফাদার জনসন।

দীনেশ ও বাদল রিভলভারে বুলেট ভরে বেরিয়ে এসে বিনয়ের গলার আওয়াজ পেলেন। ত্বরিতে নেলসনের ঘরে ঢুকে দেখলেন, নেলসন ও বিনয়ের দ্বৈরথ চলছে। নেলসন ভয়ানকভাবে বিনয়ের কব্জিটা মুচড়ে ধরেছেন। তাঁর প্রবল নিষ্পেষণে বিনয়ের পাঞ্জার হাড় ভেঙে গেল, তবু নেলসন হাত থেকে রিভলভারটি কেড়ে নিতে পারলেন না। ব্যাপার দেখে বাদল এক প্রবল মুষ্ট্যাঘাতে নেলসনকে ধরাশায়ী করলেন। কিন্তু নেলসনের পড়ে যাওয়ার ধাক্কায় বিনয়ের আড়ষ্ট হাত থেকে রিভলভার মেঝেতে ছিটকে পড়ল। নেলসন মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে রিভলভারটি কুড়িয়ে নিতে গেলেন। তখনই দীনেশ এক লাথি মেরে রিভলভারটিকে ঘরের এক কোণে পাঠিয়ে দিলেন। বিনয় সেটাকে মেঝে থেকে তুলতে গেলেন। তিন যুবকের নজর রিভলভারের দিকে গিয়ে পড়ল। আর এই সুযোগে নেলসন কোনোমতে ঘরের দরজা ঠেলে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

বাদল জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'লেট আস গো নাউ... পেছনে লোহার সিঁড়ি...নামলেই কার পার্কিং...তারপর ব্যাকগেট। গেট পার হলেই লায়ন্স রেঞ্জ। সেখানে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাব। লেট আস গো!'

বিনয় কিন্তু বললেন, 'যাবো তো! কিন্তু তার আগে আরও কয়েকটা সাহেবকে...'

দীনেশ বললেন, 'সে ঠিক আছে, আমি দেখছি। বাট ইয়োর হ্যান্ড ইজ ব্যাডলি ইনজিওরড। উই টু উইল কাভার ইউ।'

ঘরের পুবদিকের সুইং-ডোর দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচু করে বেরোতে গেলেন দীনেশ। এদিকে বাইরে বেঙ্গল পুলিশের অফিসার মিস্টার জোনস এসে যোগ দিয়েছেন মিস্টার ক্রেগ ও সার্জেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে। অন্যদিকে লালবাজার থেকে কলকাতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্ট বিশাল পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে ধরেছেন রাইটার্স বিল্ডিং। পুলিশ ক্রমশই বৃত্ত ছোটো করে আনছে। মিস্টার বার্টলে, মিস্টার গর্ডন, মিস্টার ওয়াটারওয়ার্থ প্রভৃতি পুলিশের বড়ো কর্তারা এবং মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন ডাকওয়ার্থ বিভিন্ন দিক দিয়ে এগিয়ে আসছেন। সঙ্গে সশস্ত্র গুর্খা রেজিমেন্ট।

ঘরের বাইরে বেরোনো মাত্রই দীনেশের সঙ্গে ক্রেগ, ফোর্ড ও জোনসের চোখাচুখি হল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দীনেশ দুবার গুলি ছুড়লেন। ওদিক

থেকেও ফায়ারিং হতে লাগল। আবার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে গেল বারান্দাটা। প্রেন্টিস আর টয়নাম নামে দুই সাহেব অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের ভেতর আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। জোনসের গুলি এসে বিঁধল দীনেশের কাঁধে। ঝাপসা হয়ে এল দীনেশের চশমার কাচ।

ডান হাতে বাঁ কাঁধটা চেপে ধরে দীনেশ অফিস-ঘরের ভেতর ফিরে এলেন। বিনয় ও বাদল একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার রে?'

দীনেশ বললেন, 'একগাদা লোক। নো ওয়ে টু এসকেপ।'

বিনয় জিজ্ঞেস করলেন, 'কটা গুলি আছে আর?'

বাদল বললেন, 'আমার কাছে আর নেই।'

বিনয় নিজের রিভলভার চেক করলেন। একটাই মাত্র গুলি। দীনেশের রিভলভারেও একটিই আর অবশিষ্ট।

দীনেশ বললেন, 'মরার আগে দেশটাকে স্বাধীন দেখে যেতে পারলাম না।'

বিনয় উত্তর দিলেন, 'উই উইল ডাই। বাট আওয়ার মাদারল্যান্ড উইল বি ফ্রি ভেরি সুন। শোন। যুদ্ধ আর সম্ভব নয়, লেট আস সেলফ-ইমোলেট।'

তিনজনের পকেট থেকেই বেরিয়ে এল পটাশিয়াম সায়ানাইডের অ্যাম্পুল। মুখে দেওয়ার আগে তাঁরা তিনজন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনটে রিভলভার সেই আলিঙ্গনের ঊর্ধ্বে তিনদিকে সদর্পে মাথা উঁচু করে রইল। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় তিনজনে সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, 'ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্!'

দালি পলক ফেলতে ভুলে গেল তাঁদের দিকে তাকিয়ে। মুগ্ধ, অভিভূত বালক উদ্দালক জানতেও পারল না তার দুই গাল, বইয়ের পাতা ভেসে যাচ্ছে অবিরল চোখের জলে।

পরমুহূর্তেই আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বাদল সায়ানাইডের অ্যাম্পুল মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলেন। তাঁর দাঁতের চাপে অ্যাম্পুলের কাচাবরণ ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণহীন দেহটি ঢলে পড়ল একটি চেয়ারের ওপর।

বিনয় আর দীনেশ সায়ানাইডের অ্যাম্পুল মুখে দিলেন। কিন্তু চেবানোর আগেই প্রায় অসাড় হাতে রিভলভার ধরে বিনয় নিজের মাথায় ডানদিকের কপালের রগে গুলি করলেন। আর দীনেশ গুলি করলেন তাঁর নিজের চোয়ালে।

বিনয় ও দীনেশ অফিসঘরের মেঝেতে সশব্দে লুটিয়ে পড়লেন।

একটু পরেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার বার্টলে, মিস্টার গর্ডন ও পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্ট। তাঁরা ঘরে ঢুকে দেখলেন, চেয়ারের ওপর একজনের প্রাণহীন দেহ। আর মেঝের ওপর মারাত্মকভাবে আহত রক্তাক্ত দুটি দেহ। ক্যাপটেন ডাকওয়ার্থ পরীক্ষা করে দেখলেন, মেঝেতে পড়ে থাকা

রক্তাক্ত একজনের প্রাণ থাকলেও সংজ্ঞা নেই। অপরজনের চক্ষু বিস্ফারিত, কপালের রগ থেকে রক্তের ধারা গালের ওপর নেমে এসেছে। যুবকটির এত জীবনীশক্তি যে, এতকিছুর পরেও সামান্য সংজ্ঞা অবশিষ্ট আছে। সেকথা জানতে পেরেই বিস্ফারিতচক্ষু সেই যুবকের নিঃসাড় হাতের আঙুলের ওপর চার্লস টেগার্ট তাঁর বুটজুতো পরা পা তুলে দিয়ে ডলতে ডলতে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'হু আর ইউ, সোয়াইন? টেল মি ইয়োর নেম!'

টেগার্টের বুটের চাপে যুবকটির হাতের আঙুলের হাড়গুলো মড়মড় করে ভেঙে গেল। তবু তাঁর মুখে আর একটিও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না।

বিরক্ত টেগার্ট যুবকের হাতের আঙুলের ওপর থেকে বুট সরিয়ে নিলেন। আর তখনই সেই বিস্ফারিতচক্ষু যুবক আহত সিংহের মতো ফুঁসে উঠে বললেন, 'আই অ্যাম আ সোলজার। ট্রিট মি উইথ অনার। মাই নেম ইজ বিনয়!'

তারপরই তাঁর চোখের পাতা দুটি মুদে এল।

১৭

একে কি ঠিক ডায়েরি বলা যায়? সম্ভবত না; অথচ পুলিশ একে ডায়েরিই বলেছে। স্কেচবুক বলা যেতে পারত, কিন্তু এই খাতাটা সব জায়গায় স্কেচবুকের চরিত্রও ধরে রাখতে পারেনি। ছবির চারপাশে, নীচে, মার্জিনের ভেতর নানারকম মন্তব্য ছড়ানো। কোনো কোনো পাতায় কোনো ছবিই নেই, সারাটা জায়গা জুড়ে প্যারার পর প্যারা টানা লেখা চলেছে। ওই অত লেখালেখি আর লেদার-বাইন্ডিং-ওয়ালা জাবেদা খাতা দেখেই ডায়েরি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। কিন্তু দিনলিপি যদি ডায়েরি হয়ে ওঠার শর্ত হয়, তাহলে শ্রীনিবাসের এই খাতা ডায়েরি তো নয়ই, এমনকি জার্নালও নয়।

হ্যান্ড-মেইড পেপার দিয়ে তৈরি খাতাটি মোটা সুতো দিয়ে সেলাই করা। সম্ভবত খাতাটি অনেকদিন ব্যবহার করা হয়েছিল, পরে আবশ্যকবোধে বাঁধাই করা হয়েছে। কারণ, খাতার কাগজগুলোর বয়স বাঁধাইয়ের বয়সের থেকে অনেক বেশিই। পাতাগুলো হলুদ হয়ে এসেছে এবং প্রথম দিকের কালির রংও বেশ পুরোনো। খাতা জুড়ে অজস্র স্কেচ, প্রায়শই ক্রো-কুইল পেন দিয়ে আঁকা, চাইনিজ ইংক ব্যবহার করা হয়েছে। কখনও কখনও পেন্সিল বা সাধারণ জেল-পেনেও আঁকা মনে হয়। কিছু ছবি আবার প্যাস্টেলে আঁকা। লেখাগুলো প্রায়শই মাইক্রোটিপ পেন্সিলে মুসাবিদা করা। লেখার ভাষা ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও তমিড়।

শৌনক তমিড় ভাষা জানে না। তার জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ হতে হবে। তবে এগুলো যে তমিড় বর্ণমালা, তা বুঝতে তার অসুবিধে হচ্ছে না। কোনো কোনো লেখার মাথায় তারিখ আছে, অধিকাংশ লেখাই তারিখহীন। খাতার বয়স এবং আঁকা-লেখার বিবর্তন থেকে এই খাতা যে শ্রীনিবাসের সঙ্গে কিশোরবেলা থেকেই ছিল, ধরা যায়। মলাট খুললেই সামনের পাতায় ওপরে ডানদিকের কোণে পাকিয়ে পাকিয়ে ইংরেজিতে লেখা এস আর শ্রীনিবাসন। নাহ্, কোনো সালটাল কিচ্ছু নেই।

পুলিশের কাছ থেকে শৌনকদের ঠিকানায় জিনিসপত্রগুলোর পার্সেল এল বুধবার দুপুরে। বুধবার দুপুরেই কি? না, না, বুধবার নয়। বৃহস্পতিবার দুপুরবেলাতেই হবে। শৌনক কলেজে ছিল। রিসিভ করেছে দেবলীনা আর লিলি। কিছু জামাকাপড়, কিছু

কাগজপত্র আর এই খাতা। শৌনক যখন বাড়ি ফিরল, তখন জিনিসগুলোকে ঘিরে দেবলীনার বিহ্বলতার ভাব কমে এসেছে। শোক আছে, তবে তা তরল নয় আর, পাথর।

সঙ্গের কাগজপত্রগুলো কিছু অফিশিয়াল চিঠি, কয়েকটি ছবির ক্যাটালগ—সে তেমন কিছু না। খাতা বা ডায়েরি বা স্কেচবুক একে যাই বলা হোক না কেন, প্রথমেই তা দেবলীনার কাছ থেকে চাইতে সঙ্কুচিত বোধ করেছিল শৌনক এর ব্যক্তিগত চরিত্রের কথা ভেবে। কতরকম কথাই তো থাকতে পারে এতে। কিন্তু চাইতে হল না, দেবলীনা নিজেই খাতাটা শৌনকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন যদি কোনো হদিস পান কিছু এর মধ্যে।'

'আপনি আগে কখনও উলটেপালটে দেখেছেন এটা?' শৌনক জিজ্ঞেস করেছিল।

'ন্-না। এই একটি জিনিস শ্রীনি কখনও আমার সঙ্গে শেয়ার করেনি। কোনোদিনও না।'

"আপনি সেদিন 'রাজু', 'রাজু' বলছিলেন। 'রাজু' কার নাম? শ্রীনিবাসের?"

'হ্যাঁ,' দেবলীনা স্তিমিত স্বরে বলল, "আগে জানতাম না। বিয়ের মাস ছয়েক পরে শ্রীনি আমাকে বলেছিল ওকে 'রাজু' বলে ডাকতে।"

'আচ্ছা!' খাতাটা উলটোতে-পালটাতে শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'এস আর শ্রীনিবাসন। পুরো নামটা জানেন?'

'দক্ষিণ-ভারতীয়দের নামের আগে অক্ষরগুলি কোনোটা তার বাবার নাম, গ্রামের নাম, এমনকি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির নামের আদ্যক্ষরও বোঝায়। এক্ষেত্রেও তেমনই হবে।'

'হ্যাঁ, তা জানি। এক্ষেত্রে এস বা আর—এদুটো অক্ষরের কোনোটি শ্রীনিবাসের বাবার নাম ইন্ডিকেট করছে কি?'

'তা বলতে পারব না। আসলে দক্ষিণ ভারতীয়দের মূল নামটা ধরেই সবাই ডাকে। ওতেই কাজ চলে যায়। সার্টিফিকেট বা অন্যান্য নথিপত্রে পুরো নামটা থাকে যদিও, এমনকি নিকট আত্মীয়রাও পুরো নামটা খেয়াল করে মনে রাখতে পারে না। শ্রীনি তার নিজের পুরো নামটা আমাকে বলেছিল এক-দুবার। অত বড় নাম খেয়াল থাকত না। বিয়ের আগে প্রথম প্রথম ডাকতাম শ্রীনিবাসন স্যার। পরে শ্রীনি। তবে ওর নামের মধ্যে ওর বাবার নামের আদ্যক্ষর নেই বলেই আমার মনে হয়।'

'কেন? আপনার শ্বশুরমশাইয়ের নাম কী ছিল, আপনি জানেন?'

'আমাদের সল্টলেকের বাড়িতে ওর বাবার একটা বাঁধানো ছবি আছে। তার নীচে নামটা এমবস করা। তুইমইয়ানাদু পেরুমল।'

শৌনক নামটা শুনেই একেবারে হতাশ হয়ে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসল। কোথায় সে আশা করছিল, এস হচ্ছে সুবিমল, আর হচ্ছে রাজু! তা নয়, তুই মুই? হায় রে!

এইখানে এসেই শৌনকের থিসিস হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। শ্রীনিবাস তার বউয়ের কাছ থেকে 'রাজু' ডাক শুনতে চাইত, মেদিনীপুর শহরের প্রতি তার অস্বাভাবিক টান, কোনো এক অবচেতন-নিয়ন্ত্রিত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বলেছিল, দেবলীনা তাকে তার আগের জন্মের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে প্রতুলের মারফত ডক্টর খামরুইয়ের ন্যারেটিভ। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল কাকাতুয়া-বাড়ির এক ছেলের। তাকে নতুন নাম দেওয়া হয় 'রাজু' এবং সে আর তার বাবা কিছুদিন পর মেদিনীপুর ছেড়ে ভিনরাজ্যে চলে যায়। সত্যসাধনবাবু বছর দশেকের ছেলেটিকে ওই নতুন নামকরণের পর দেখেছেন, তাই তাকে 'রাজু' নামেই চেনেন। রূপেনের মা ওই একই ছেলেকে দেখেছেন ছেলেটির স্মৃতিভ্রংশের আগে, ছেলেটি তখন বছর ছয়েকের শিশু, তাই তিনি বলছেন, তার নাম 'সুশীতল'। সাহিলের বক্তব্য, ট্রেজার প্রোটেকটার চিফের নামও 'সুশীতল'। সেই টিপি-চিফ বদলে গেছে বলেই সাহিলের ধারণা। তাহলে সুশীতলবাবু হয় খুন হয়েছেন, নয় তাঁকে গুম করে রাখা হয়েছে—প্রথমটা হওয়াই বেশি সম্ভব। এদিকে চিত্রশিল্পী এস আর শ্রীনিবাস কয়েক মাস হল মিসিং। সুবিমলবাবু ছবি আঁকা শেখাতেন, তাহলে সুশীতলেরও আঁকার দিকে একটা হেরিডিটারি লিনিং থাকতে পারে। এই সব থেকে শৌনক একটা ইকুয়েশন তৈরি করেছিল। সেটা হচ্ছে, শ্রীনিবাস=রাজু=সুশীতল।

সেই সমীকরণ অবাস্তব ঠেকত না, যদি শ্রীনিবাসের বাবার নামটা সুবিমল আয়েঙ্গার বা সুবিমল পেরুমল-টাইপ কিছু একটা হত। কিন্তু তা না হয়ে, তা হল তুইমইয়ানাদু পেরুমল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শৌনক বলেছিল, 'খাতাটা নিয়ে গিয়ে একটু দেখি, যদি কিছু বেরোয়।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় নেমে দেখল, লিলি ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দিচ্ছে। শৌনক কাছে গিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার এই শ্রীনি আর তার শ্রীদেবীর বয়সের তফাত কতটা জানো?'

প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল লিলি। দোতলার সিঁড়ির দিকে একবার চোখ তুলে মুখটা একটু নামিয়ে নীচু স্বরে বলল শৌনককে, 'অনেকটাই, বুঝলে। দেবলীনা তখন থার্ড ইয়ারে পড়ছে। তাহলে কত হবে? কুড়ি-একুশ। আর শ্রীনিবাস তখনই মাঝবয়সি পুরুষ। চল্লিশ তো পেরিয়েছেই। তবে পঁয়তাল্লিশের ওপরে না। ওই অতটা বয়সের পার্থক্যের জন্যেই তো দেবলীনার বাড়ির লোক মেনে নেয়নি ওদের সম্পর্ক। এই সব আর্টিস্ট লোকদের ব্যাপারস্যাপার!'

শৌনক বলল, 'বুঝলাম।'

'কী?'

'বুঝলাম, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। যাই, একটু পড়াশোনা করে দেখি। তুমি কাজ করো। একটু কফি দেবে?'

'দেব। তোমার হাতে ওটা কী?'

'শ্রীনিবাসের জাবেদা খাতা।'

সেই খাতাটাই দেখছিল শৌনক। কিন্তু মন দিতে পারছে না। মনে একটা পরাজয়ের গ্লানি। এক ঝাঁক ইকুয়েশন একেবারে শেষ লাইনে এসে ক্র্যাশ করল? এই-ই হয়। পরপর কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার অবজারভেশন মাথায় এসে সেঁধুলে সেগুলোর ভেতর একটা সম্পর্ক খাড়া করার চেষ্টা করে মগজ। থিয়োরি বানায়। কিছু একটা কোরিলেশন খুঁজেও পায়। কিন্তু সেই কোরিলেশন আসলে কাল্পনিক, যাকে স্ট্যাটিস্টিক্সের ভাষায় স্পিউরিয়াস কোরিলেশন বলে। একটা দেশের কয়লা-উৎপাদন আর আত্মহত্যার হারের ডেটা পাশাপাশি নিয়ে কোরিলেশন কো-এফিশিয়েন্ট বের করলে হয়তো খুব হাই-কোরিলেশন দেখাবে। কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই। আসলে সম্পর্ক জিনিসটাই খুব অদ্ভুত। সম্পর্ক জিনিসটা বাস্তবে অবজেকটিভলি এগজিস্ট করে কি না, কে জানে। হয়তো জগতের সমস্ত সম্পর্কই স্রেফ সাবজেকটিভ। এই যে শ্রীনি-র সঙ্গে দেবলীনার সম্পর্ক বা লিলির সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক—এগুলোও হয়তো মনগড়া ব্যাপার। বাস্তবে যা আছে, তা হয়তো কতগুলো স্ক্যাটারড ডটস, কতগুলো বস্তু বা ঘটনা—যারা আসলে বিচ্ছিন্ন। সেগুলোকে কানেক্ট করে তাদের মধ্যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ তৈরি করা হয়তো বা মনের কারসাজি। হতে পারে না?

লিলি টেবিলের ওপর কফি রেখে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে শৌনক ভাবল, বেশি ভাবছে সে। সম্পর্ক মনের তৈরি—তাতে হলটা কী? মানসিক বাস্তবতা বলে কি কিছু হতে পারে না? সেই মানসিক বাস্তবতার ওপরেই তো জীবনটা চলছে। না হলে কোথা থেকে আসত ভালোবাসা আর যত্ন দিয়ে বানানো এই কফির কাপটা?

খাতার শুরুর দিকের স্কেচগুলো থেকে বোঝা যায়, শ্রীনি-র তখনও শিক্ষানবিশী চলছে। বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবির আলগা স্কেচ করেছেন এখানে ওখানে। আঁরি মাতিসের 'দ্য ইয়ং সেলর', 'ব্লু ন্যুড', 'বাথারস উইথ আ টারট্‌ল'-এর রেখাচিত্র এঁকেছেন। তারপর সেই বিখ্যাত নাচের ছবি। পাঁচজন নগ্নিকা পরস্পর হাত ধরে গোল হয়ে নাচছে। 'দ্য ডান্স'। মোট চারবার ফিগারগুলো এঁকেছেন শ্রী-নি। নীচে এবড়োখেবড়ো বাংলা হরফে লেখা : 'আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি'। বোঝা যায়, সবে বাংলা শিখছেন তখন। 'সহচরি'-তে ভুলবশত ই-কার।

আরও কিছু পরে খাতার মধ্যে উঁকি দিচ্ছেন পল সেজান। কিছু স্টিল লাইফ। কিছু পোর্ট্রেট। 'ওম্যান ইন আ গ্রেট হ্যাট', মাদাম সেজানের সেই বিখ্যাত পোর্ট্রেটের অনুকৃতি করেছেন শ্রীনি। প্রিয় নারীর প্রতিকৃতি আঁকার ইচ্ছেটা কি তখন থেকেই তবে অবচেতনে ছিল?

তারপর 'দ্য কার্ড প্লেয়ারস'-এর অনুকৃতি। মজার ব্যাপার, সেজানের ছবিতে

যেখানে কোটপ্যান্ট পরা দুটো লোক ছিল, তার সঙ্গে তৃতীয় আর-এক ব্যক্তির আদলও যুক্ত হয়েছে শ্রীনিবাসের স্কেচে। এই তৃতীয় ব্যক্তিটি ভারতীয় পোশাক পরা। নিজেকে এঁকেছেন? দেবলীনার কাছে ছবি আছে শ্রীনি-র? দেখা দরকার। আরও অনেক প্রসিদ্ধ ছবির অনুকৃতি। সব চেনেও না শৌনক।

খাতাটা যতই এগিয়েছে, ততই ওই শিক্ষানবিশীর পর্যায় পেরিয়ে নিজের কাছে ফিরে আসার চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। কোথাও যেন গগনেন্দ্রনাথের আলোছায়া, কোথাও গণেশ পাইনের শান্ত বিষণ্ণতা। তবু সেসব প্রভাব ছাপিয়ে উঠছে শ্রীনি-র প্রখর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব।

প্যাস্টেল ঘষে ঘষে আঁকা কিছু ছবি। একটা পালকি, একজন নাচনেওয়ালি, একটা মন্দির। একজন বৃদ্ধ মানুষের শিরাওঠা মুখ, পাশ থেকে আঁকা। মুখে যেন একটা গনগনে আঁচের আভা এসে লেগেছে। নীচে লেখা : 'টি রামমূর্তি, মাই মেন্টার'। এই টি রামমূর্তিটি কে? শ্রীনিবাসের জীবনে নিশ্চয়ই তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 'মেন্টার' কথাটা যখন লিখেছেন। দেবলীনা জানে, টি রামমূর্তি কে? জিজ্ঞেস করতেই হবে।

তারপর কতগুলো ন্যুড। নানা দিক থেকে আঁকা। শরীরী ভাষা তীক্ষ্ণ, ভানহীন। মডেলটিকে যেন আবছা চেনা যাচ্ছে। আয়তলোচনা, মুখে বিষাদের পবিত্রতা, ললিত বাহুলতা, কৃশাঙ্গী। হ্যাঁ, শৌনক ঠিকই ধরতে পেরেছে। এক জায়গায় স্পষ্ট লেখা নীচে—'লীনা রিক্লাইনিং অন এ সোফা!'

শৌনক মনে মনে একটু হাসল। মডেলের প্রেমে পড়েছেন শিল্পী। মডেলটি অবশ্যই দেবলীনা। এক জায়গায় দুটো ফিগার। নারী ও পুরুষ। দুজনেই নগ্ন। ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে শায়িতাবস্থায় আলিঙ্গনরত। মুখচোখ কিছু নেই। পুরুষটি বলিষ্ঠ—মাসকুলার। তার নীচে মেয়েটি ক্ষীণতোয়া। নীচের লেখাটা পড়েই শৌনক সোজা হয়ে বসল। 'শি গেভ মি ব্যাক মাই লস্ট মেমোরি'। এটাই তাহলে সেই অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ। তারপর আর-একটু নীচে : 'নাউ আই নো দ্য সিগনিফিকান্স অফ মাই ফাদারস ইন্সট্রাকশন'—এখন আমি জানি, কেন আমার বাবা আমাকে ওরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। কী মুশকিল? কী নির্দেশ, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।

লেখাগুলো অনেক ক-টাই চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে। কতগুলো আবার মামুলি আয়ব্যয়ের হিসেব। আবার এক জায়গায় বেশ অনেকটা দেবনাগরী হরফে লেখা। কবিতার মতো করে লাইন সাজানো। যতটুকু সংস্কৃত জানে শৌনক, তাতে মনে হয় বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্র। গুগলে চেক করল। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছে। শ্রীনিবাস খুবই ইন্টারেস্টিং মানুষ। মাতিস, সেজান, গঁগ্যা নিয়ে মেতে আছেন একদিকে, অন্যদিকে বিষ্ণুভক্ত। দক্ষিণেই সম্ভব বোধহয়।

সেই মডেলটি ফিরে আসছে আবার। এবার আর নগ্নিকা নয়। নর্তকীর বেশ।

মুখচোখ অবয়ব স্পষ্টতই দেবলীনার। শরীরী আবেদন কিছুটা সংবৃত। তবে কেশভার আগের থেকে অনেক বেশি। অনেক ক'টা স্কেচ। এগুলো মনে হয় একটা সিরিজের খসড়া। মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল শৌনক। শ্রীনি-র কাজ তারিফ করার যোগ্য। নাচের মুদ্রাগুলিও অসামান্য।

দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ব্যাপার শৌনকের চোখ টানল। নৃত্যরতা মেয়েটির নাচের বঙ্কিম ঠাম পালটে পালটে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড সেই একই। ভালো করে খাতার ওপর চোখ নামিয়ে দেখতে লাগল শৌনক। একটাই মন্দিরের চত্বর। অবশ্যই দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির। পেছনে একটা কারুকার্য-করা গোপুরম। একদম তিরুপতি বালাজি মন্দিরের। অথচ গোপুরমটা যেন বহুতল একটা বাড়ির ছাদে বসানো। তিরুপতি মন্দিরের গোপুরম এমন বাড়ির ছাদের ওপর বসানো নাকি?

'আপনারা কখনও তিরুপতি গিয়েছিলেন বেড়াতে বা পুজো দিতে?' থালায় ভাতের মধ্যে ডিমের ঝোল ঢালতে ঢালতে শৌনক জিজ্ঞেস করল সেদিন রাত্রে।

ডাইনিং টেবিলের উলটোদিকে বসা দেবলীনা খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'না তো! কেন?'

'না, এমনিই জিজ্ঞাসা করলাম।... আচ্ছা দেবলীনা, আপনি কি কখনও নাচ শিখেছেন? এই ধরুন, কোনো ক্লাসিকাল ডান্স ফর্ম?'

'ভরতনাট্যম শিখেছিলাম কিছুদিন কলেজে পড়ার সময়।'

'পারফর্ম করেননি কখনও?'

'নাহ্!'

'শ্রীনিবাস জানতেন যে আপনি নাচ জানেন?'

'তা জানত।'

'কখনও দেখেছেন নাচতে? এই ধরুন, হয়তো প্র্যাকটিস করছেন, এরকম সময়?'

জলের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটু হাসল দেবলীনা। লিলি বলে উঠল, 'বাব্বা! কতরকম কলাবিদ্যা দিয়ে মন ভুলিয়েছিলি রে শ্রীনি-র?'

দেবলীনা হাসতে হাসতেই বলল, "ধুর! কী যে বলিস! ওর ছবির জন্য কিছু কিছু মুদ্রা আর বিভঙ্গ করে দেখিয়েছিলাম, মনে আছে। সেও বহুদিন আগে। 'চারুকেশবতী' নামে একটা সিরিজ করেছিল শ্রীনি। কেন, খাতায় কিছু পেলেন?"

'না, তেমন কিছু না। আচ্ছা, টি রামমূর্তি বলে কারও কথা শুনেছেন শ্রীনি-র মুখে?'

'না তো!'

'কখনও কিছু শোনেননি?'

'না। মনে করতে পারছি না,' দেবলীনা ভাবতে ভাবতে বলল, 'আসলে আমার এখন মনে হয়...'

'কী মনে হয়?' লিলি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

'মনে হয়, এত বছর আমরা একসঙ্গে আছি, কিন্তু শ্রীনি-র মনের ভেতর অন্য একটা জগৎ ছিল, যা সে আমার সামনে খুলে দেয়নি। আমিও সেটা খুলে দেখতে যাইনি। হয়তো আমার আগ্রহ দেখলে, শ্রীনি আমাকে বলত সেই জগতটার কথা।'

লিলি তড়বড় করে বলে উঠল, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওরকম আননোন জোন কিছু থাকাই ভালো। সব কিছু কি জানা যায়?'

হাতের আঙুলের নড়াচড়া দিয়ে ইঙ্গিতে লিলিকে থামাল শৌনক। দেবলীনার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল সে, 'কেন এটা মনে হচ্ছে আপনার?'

'ওই যে নিজের স্টুডিয়োতে অনেক রাত অবধি কাজ করত... আমি ঘুমিয়ে পড়তাম বেডরুমে... কী সব খুটখুট করত কমপিউটার খুলে... মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে টয়লেটে যেতে গিয়ে দেখতাম, স্টুডিয়োতে আলো জ্বলছে... দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতাম, রাজু ছবি আঁকছে... কখনও নেটে কীসব কাজ করছে... কখনও ল্যাপটপে হালকা সুরে একটা সরোদের বাজনা... কখনও আপন মনে কীসব বলছে শ্রীনি... কখনও কীসব স্তোত্র আবৃত্তি করছে মন থেকে... সংস্কৃত না তমিড়ে কে জানে... দুটোর একটাও তো আমি জানি না...'

'কখনও তমিড় শেখার চেষ্টা করেননি?'

"করেছিলাম। বড্ড কঠিন। আমার দৌড় ওই 'তমিড় তেরিয়াদে' পর্যন্তই।"

শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'শ্রীনিবাসের কোনো ফোটো আছে আপনার কাছে?'

'সেলফোনে দু-একটা সেভ করা ছিল। অ্যালবাম তো কলকাতায়।'

'দেখাতে পারেন?'

বাঁ হাতে মোবাইলে খুট খুট করে কয়েকটা ছবি বের করল দেবলীনা। দেখাল শৌনককে। বয়স্ক মানুষ। গায়ের রং ফরসা। মাথার চুল একটু পেছনে হটে গেছে। বয়সের তুলনায় বেশ লম্বা শক্তপোক্ত চেহারা। নাকের দুপাশে চশমার দাগ।

'শ্রীনিবাস চশমা পরতেন?' শৌনক প্রশ্ন করে।

'আগে পরত। পরে কনট্যাক্ট লেন্স ইউজ করত।'

শৌনক ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে গেল। হাতমুখ ধুয়ে স্টাডিতে ঢুকল। লিলি আর দেবলীনা ডাইনিং টেবিলে বসেই গল্প করছিল খানিক।

খাতা খুলে ভুরু কুঁচকে তাকাল শৌনক। এই তমিড় লেখাগুলোর পাঠোদ্ধার করা দরকার। তমিড় জানে এমন লোক শৌনকের চেনার মধ্যে আছেন এক এইচ ত্যাগরাজন। বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির সোশিওলজির অধ্যাপক। বিশ্বাস করা যায় তাঁকে। খাতাটা এইচ টি স্যারকেই দেখাবে শৌনক, ঠিক করল।

কিন্তু এই মন্দির-রহস্যের কী হবে? তিরুপতি মন্দির, অথচ তিরুপতি নয়। নিশ্চয়ই

একটাই ইউনিক মন্দিরকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে দেবলীনার নৃত্যরত ছবি এঁকেছেন শ্রীনিবাস। কিন্তু কোন সে মন্দির?

খাতার শেষ পাতাগুলো খুব অদ্ভুত। প্রচুর সাপের ছবি আঁকা। দেখলে গা কেমন করে ওঠে। ছবির পাশে আবার ছোটো ছোটো নোটস। ইংরেজিতে লেখা। সাপের বর্ণনাও আছে, আবার তন্ত্রশাস্ত্রের ষট্‌চক্রভেদের ওপরেও লেখা আছে। তন্ত্রে ওই সারপেন্ট-পাওয়ারের কথা আছে বটে। উডরফের লেখায় পড়েছিল শৌনক। এই ছবিগুলোর কথাই বলেছিল কয়েকদিন আগে দেবলীনা। ছবিগুলো শ্রীনি আঁকুক, দেবলীনা চাইত না।

তারপর এক জায়গায় লেখা : 'আ স্ট্রেঞ্জার কেম টু মি টুডে। কনভার্সিং উইথ হিম আই রিয়ালাইজড, আই নো নাথিং অফ দ্য স্নেকস। আই মাস্ট গো টু নাগালোকা!'

—একজন অচেনা লোক এসেছিল আজ আমার কাছে। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, আমি সাপের কিছুই জানি না। আমাকে নাগলোকে যেতেই হবে।

এর মানেটা কী রে, বাবা? দেবলীনা বাড়িতে ছিল না, কোনো অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি শ্রীনি-র সঙ্গে দেখা করে? সাপ সম্পর্কে সেই লোকটির এত জ্ঞান যে, শ্রীনিবাসের মনে হয়, তিনি সাপ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? নাগলোকটাই বা কী বস্তু কে জানে!

তারপরই একটা লাইন : 'হাউ কুড ইউ হাইড দিস ফ্রম মি সো লং? ইউ ইনডিড নিউ এভরিথিং।'

—কীভাবে তুমি কথাটা এতদিন গোপন করেছিলে? তুমি তো সবই জানতে।

এই 'তুমি'টা কে? সেই অচেনা অতিথি? নাকি, অন্য কেউ, যে শ্রীনিবাসের খুবই পরিচিত? দেবলীনা কি?

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল শৌনকের। কালকেই ত্যাগরাজন-স্যারের কাছে যেতে হবে তাকে খাতাটা নিয়ে।

১৮

...ফিরায়ে দিয়ো না মোরে শূন্য হাতে—
কুঞ্জে এখনও কুহু কূজনে মাতে।
নাই যদি দাও হাসি,
তবু যেন বাজে বাঁশি,
সুরেরই আঘাত দিয়ো এ মধুরাতে...

বেগম আখতারের মোহক কণ্ঠসম্পদে ভরে আছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ড্রয়িং রুম। জানালার ভারী পর্দাগুলো অনড়, হালকা সোনালি একটা আভা ছড়িয়ে আছে মেহগনির ওপর—বুককেস, টেবিল, চেয়ার, সোফাসেট আর কারুকার্য করা ছোটো একটা খাট একপাশে; খাটের ওধারে একটা বুকশেলফ, বুকশেলফের বাঁদিকে দরজা। দরজার পর্দার আড়ালে আভাসিত পথটি ভেতরবাড়ির দিকে গিয়েছে। দেওয়ালে কয়েকটা পেইন্টিং যোগেন চৌধুরীর। দরজার পেলমেটের ওপর চন্দনচর্চিত তিরুপতি বালাজির ছবি।

একজন বুড়ো মানুষ সবিনয়ে জানিয়ে গেছেন, গৃহস্বামীর আসতে একটু দেরি হবে। সূর্যপ্রণাম, স্নান, আহ্নিক, পূজাপাঠ আরও কীসব কীসব সেরে বেরিয়ে আসতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ তো লাগবেই।

অগত্যা।

ইতোমধ্যে অবশ্য মিসেস ত্যাগরাজন দেখা দিয়ে গেছেন। বিনুনিতে বেলিফুলের মালা ও নাকের পাটায় রুপোর নাকছাবির অপরূপ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে, কফি ও পকোড়া দিয়ে আপ্যায়িত করে গেছেন শৌনককে। শৌনক ফোন করেছিল ভোরবেলাতেই। সাড়ে আটটা নাগাদ ত্যাগরাজন স্যার তাঁর শরৎপল্লীর বাড়িতে চলে আসতে বললেন। একথাও তিনি বলেছিলেন যে, একটু বসতে হবে।

সেই বসা-টা ক্লান্তিকর হচ্ছে না আখতারি বাই-এর জন্য। অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ও টাম্বলারে খাস মাদ্রাজি কায়দায় পরিবেশিত কফি ও পকোড়ার সমুষ্ণতা চনমনে করে রেখেছেও। বুককেসের বইগুলোর দিকে চোখ চলে যায় সহজেই। ভারী ভারী

সোশিয়োলজির বই। তার পাশে রবীন্দ্ররচনাবলি, উইল ডুরান্ট, আর্নল্ড টয়েনবি, দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ, কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া-র ভলিউমগুলো এখান থেকেই দিব্বি চেনা যাচ্ছে। ত্যাগরাজন এত বছরে বাঙালি হয়েই গেছেন প্রায়, যদিও বাংলা উচ্চারণে দক্ষিণি ছাপ মুছে ফেলতে পারেননি। কেউই পারে না। বাংলা একমাত্র বাঙালিরাই ঠিকঠিক বলতে পারে। অন্যরা পারে না। কেননা বাংলার শুধু বিশিষ্ট বাগ্‌ধারা ও নিজস্ব উচ্চারণই নেই, আছে তার নিজস্ব সুর। বাংলাভাষার এই সুর আয়ত্ত করতে হলে বাঙালি মায়ের গর্ভে জন্মাতে হয়। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

টেবিলের ওপর একপাশে সাইড-ব্যাগটা শুইয়ে রেখেছে শৌনক, ভেতরে শ্রীনিবাসের সেই জাবেদা খাতা। যে সব পাতাগুলোতে তমিড় ভাষায় লেখা আছে, সেগুলো সকালে কাতুকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলে জেরক্স করিয়ে এনেছে। কাতুর জেরক্স-দোঁকান গোলকুয়ার চকে। বাড়ি দোকানেরই লাগোয়া। ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে জেরক্স করছিল কাতু। শৌনকের এসব কারবারে সে আজ বারো বছর অভ্যস্ত। কখন যে কী দরকার পড়ে! ওই জেরক্স করতেই বেরিয়ে গেল আধঘণ্টাটাক।

এখন শুধু একটাই প্রার্থনা : ফিরায়ে দিয়ো না মোরে শূন্য হাতে...

আখতারীয় আকুতির পরিবেশটার বারোটা বাজিয়ে ত্যাগরাজন স্যার পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন। লম্বাও নন, বেঁটেও বলা যায় না। স্থূলাকৃতি। গায়ের রং কালো। মুখ গোলাকার ও মসৃণ। চোখে সব সময়ই হাসি-হাসি ভাব। সকালে স্নান সেরেই কপালে ভস্ম-চন্দন পরে নিয়েছেন। মোটাপাড় ধুতি দক্ষিনি কায়দায় কোমরে জড়ানো। গায়ে একটি সাদা রঙের ফতুয়া। ঘরে ঢুকেই মিউজিক সিস্টেমের ভলিউম কমিয়ে আখতারিকে স্তিমিত করলেন। তারপর সহাস্য বদনে বললেন, 'গুড মর্নিং, প্রোফেসর মিটরো। আমার একটু দেরি হোয়ে গেলো। ওনেক্কন বোসে আচেন!'

শৌনক বলল, 'না-না! একটু যে দেরি হবে, সে তো আপনি বলেইছিলেন। আয়াম ফাইন! ইয়োর কফি অ্যান্ড পকৌড়া আর সিমপ্লি ডেলিশাস। থ্যাংক ইউ, স্যার।'

তড়বড় করে উলটোদিকের সোফায় এসে বসলেন ত্যাগরাজন। বললেন, 'আমার মিসেসের সোংগে আলাপ হোয়েচে নিশ্চয়? শি ইজ ফ্রম মাদুরাই।'

'ও শিওর, স্যার। মিসেস ত্যাগরাজন একটু আগেই কথা বলে গেছেন। আপনার ছেলে কি এখন স্টেটসে?'

'না, ফিরে এসেচে। ট্রিবান্দ্রামে পোস্টেড। হি ইজ আ প্র্যাকটিসিং লইয়ার L.. আচ্চা বোলুন, প্রোফেসর মিটরো, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'বলছি, স্যার। আসলে আমি কতগুলো তমিড় টেক্সটের পাঠোদ্ধার করার জন্যে আপনার কাছে এলাম।'

'তমিড় লিটরেচার? ওরে বাবা। আমি পারবো? ওল্ড তমিড় ইজ বেয়ন্ড মাই রিচ। সঙ্গম-লিটরেচারের একজন এক্সপার্ট আমার চেনাজানার মোদ্দে আচে, যোদি বোলেন...'

'আরে না, না। সেসব কিছু না। এগুলো একেবারেই হালের লেখা। একজনের জার্নাল বলতে পারেন। দেখাচ্ছি। তার আগে একটা কিউরিয়সিটি...'

'হাঁ, বোলুন।'

'যদি কিছু মনে না করেন, এই যে আপনার নাম এইচ ত্যাগরাজন—এর পুরোটা কী?'

'পুরোটা? মতলব?'

'মানে বলতে চাইছি, হোয়াটস দ্য ফুল ফর্ম অফ ইয়োর নেম?'

'ও, আচ্চা, আচ্চা!' এইবার সারা মুখ জুড়ে হেসে উঠে বুঝতে পারার আনন্দ উপভোগ করে নিয়ে অধ্যাপকসুলভ কায়দায় ত্যাগরাজন স্যার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, 'হেচ স্ট্যান্ডস ফর হয়গ্রীব। মাই নেম ইজ হয়গ্রীবা ত্যাগরাজন!'

'হয়গ্রীব?'

'হয়গ্রীব জানেন না, প্রোফেসর মিটরো? হয়গ্রীব হোচ্চেন শ্রীবিষ্ণু। যাঁর মাতাটা গোড়ার। হর্স-হেডেড। গড অফ উইসডম। লিখাপড়া শুরু কোরার আগে হয়গ্রীবকে স্মরণ কোরতে হোয়। জ্ঞানানন্দময়ং দেবং নির্মল স্ফটিকাকৃতিম্, আধারং সর্ববিদ্যানাং হয়গ্রীবম্ উপাস্মহে। হয়গ্রীবা ইজ আওয়ার ফ্যামিলি ডেইটি।'

শৌনক বলল, 'বুঝলাম। সেই থেকেই আপনার নামের আগে এইচ-অক্ষরটি এসেছে।'

'রাইট ইউ আর।'

'আচ্ছা, দক্ষিণ ভারতীয়দের নাম তো আরও অনেক বড়ো হয়। আপনার নামটা তো বেশ ছোটো,' শৌনক বলল।

হা-হা করে শরীর দুলিয়ে হেসে উঠলেন ত্যাগরাজন। বললেন, 'চোটো না। চোটো কোরে নিয়েচি। আসলে আমার নাম হল—হেচ এ ত্যাগরাজন।'

'এ-টি আবার কীসের জন্য?'

'এ স্ট্যান্ডস ফর মাই গ্র্যান্ড ফাদারস নেম। আমার গ্র্যান্ডপা-র নাম চিলো আরিবরগন। সো মাই ফুল নেম ইজ—হয়গ্রীবা আরিবরগন ত্যাগরাজন। হেচ এ টি। হ্যাট! হা হা হা!'

'এ-টা বাদ দিলেন কেন?'

"আমার প্রথম পোস্টিং হয় দেল্লিতে রামযশ কলেজে। তকন আমি 'হেচ এ টি' লিকতাম। চেলেমেয়েরা এতো দুষ্টু চিলো যে আমাকে আড়ালে ডাকতো হ্যাট-স্যার।

ব্ল্যাকবোর্ডে টুপি এঁকে রাকত। হা হা হা! সেই তেকেই আমি এ-অক্ষরটা সোরিয়ে নিলাম। হোয়ে গেলাম হেচ টি।"

শৌনক মনে মনে বলল, হিরের টুকরোটি আমার! হাসিটা ভেতরে ভেতরে গোপন করে নিয়ে বাইরে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পড়াশোনাও কি দিল্লিতেই?'

'না, না। হায়ার স্টাডিজ বেনারসে। বি এইচ ইউ—বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি। ওকানে তাকতে তাকতেই তো এই আখতারি বাই-এর প্রেমে পড়লাম। হা হা হা! হার হেভেনলি ভয়েস ইজ সিমপ্লি সুপার্ব।'

'ঠিকই। আর যোগেন চৌধুরী?' দেওয়ালের ছবিগুলোর দিকে মুখ তুলে শৌনক প্রশ্ন করল।

'নো, স্যার। দ্যাটস মাই ওয়াইফস ডিপার্টমেন্ট। আমার মিসেস—সৌভাগ্যলক্ষ্মী—উনি পেইন্টিং-এর কুব ভক্তো। ওঁর পড়াশুনা কোলকাতায় লেডি ব্রেবোর্নে। ওনেক দেশবিদেশের চবি উনি দেকেচেন। খুব ইন্টারেস্ট আচে।'

শৌনক খাতাটা সন্তর্পণে বের করল ব্যাগ থেকে। বলল, 'কাজের কথায় আসি। এই খাতাটার জন্যেই আসা।'

'কার কাতা?'

'আমার একজন পরিচিত ভদ্রলোকের। দক্ষিণ ভারতীয়,' কথাটা বলার সময় শ্রীনি-র নামধাম, আর্টিস্ট পরিচয়টা প্রথমেই দিল না শৌনক। মিসেস ত্যাগরাজনের পেইন্টিং-এর ব্যাপারে ইন্টারেস্টের কথা ভেবেই।

'বেশ। তারপোর?' ত্যাগরাজন প্রশ্ন করলেন।

'এই খাতাটার মধ্যে...,' পাতাগুলো উলটোতে উলটোতে শৌনক বলল, 'কিছু এন্ট্রি তমিড়ে লেখা। আমি তমিড় জানি না। এইজন্যেই আসা। আপনি যদি এগুলো পড়ে মোটামুটি কী লেখা আছে, আমাকে বলতে পারেন।'

'কতগুলো পাতা তমিড়ে লেকা?'

'এই ধরুন পাতা বিশেক।'

'ও, তাহলে তো সোমোয় লাগবে। একনই পারবো না। রেকে যেতে পারবেন?'

'তা পারব। আমি পেজগুলো জেরক্স করে এনেছি ফর ইয়োর রেডি রেফারেন্স। হিয়ার ইট ইজ স্যার!'

খাম খুলে জেরক্সড পেজগুলো বাড়িয়ে দিল শৌনক। আসলে খাতাটা হাতছাড়া করতে চাইছিল না সে। কীসের থেকে কী হয়, বলা যায় না। তাছাড়া এ তো তার নিজের জিনিস নয়। দেবলীনার।

জেরক্স পাতাগুলো উলটেপালটে দেখতে লাগলেন ত্যাগরাজন। চিন্তামগ্ন স্বরে বললেন, 'বালো কোরে পোড়ে দেকতে হোবে। টাইম লাগবে। আচ্চা, বাই দ্য বাই,'

কাগজগুলোর থেকে মুখ তুলে শৌনকের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াই আর ইউ সো ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দিস জেন্টলম্যান?'

'কারণ, তিনি আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন।'

'চিলেন? মানে, একন নাই? মারা গেচেন?'

'হ্যাঁ,' অম্লান বদনে বলল শৌনক। এছাড়া অন্য উপায় নেই। 'মিসিং' বললে মুশকিল হয়ে যাবে। তারপরই যোগ করল, 'ওই খাতাটিই তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন। আমি তাঁর সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখতে চাই।'

'আপনার আত্মীয়দের মদ্দে একজন তমিড় জেন্টলম্যান আচেন? দ্যাটস সো সারপ্রাইজিং!'

'হ্যাঁ। আমার এক কাজিন সিস্টারের সঙ্গে এই তমিড় ভদ্রলোকের বিয়ে হয়।'

'দ্যাটস গ্রেট। কিন্তু আমার তো সোমোয় লাগবে! আজ আমার বেলার দিকে একটা ক্লাস আচে। ডে আফটার টুমরো আপনাকে এই তমিড় লেকাগুলোর জিস্ট বোলতে পারবো।'

'বেশ তো। কোনো অসুবিধে নেই। আই শ্যাল বি গ্রেটফুল টু ইউ, ত্যাগরাজন স্যার! আচ্ছা, আর-একটা ব্যাপার...'

'হাঁ, কী বেপার, বোলুন।'

'বলছি, টি রামমূর্তি নামে কোনো ব্যক্তিকে আপনি চেনেন?'

'আঁ...রামামূর্তি ইজ আ কমন নেম ইন তমিড়নাড়ু। তোবে টি রামামূর্তি নামে একজন ফেমাস ফিলানথ্রপিস্ট চিলেন। মারা গেচেন আজ বিশ-বাইশ বচর হোলো।'

'ফিলানথ্রপিস্ট?'

'হাঁ। ওঁর নামে একটা ট্রাস্ট আচে। রামামূর্তি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। ওরা স্কুল, কলেজ, হসপিটাল, ওল্ড এজ হোম, মোবাইল ডিস্পেনসরি এসব চালায়। চেন্নাই-বেসড। ছাত্রদের ফিনান্সিয়ালি হেলপও করে। আমার চেলে স্টেটসে যাওয়ার সময় এদের কাচে অ্যাপ্লাই করেছিল। স্টাডি-লোন পেয়েওচিল।'

শৌনক কী ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি কখনও এই ভদ্রলোক মানে টি রামমূর্তিকে দেখেছেন সামনাসামনি?'

'না। কিন্তু আমার মিসেস দেকে তাকতে পারেন।'—এই বলে দরজার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ত্যাগরাজন ডাক দিলেন, 'সুব্বু-উ-উ।'

আবার সেই বেলফুলের ঘ্রাণ এবং রুপোলি নাকছাবির জ্যোৎস্না। ভদ্রমহিলা ড্রয়িং-রুমে আসতেই ত্যাগরাজন তমিড়ে কী যেন বললেন। তিনিও তমিড়েই উত্তর দিলেন। শৌনকের মনে হচ্ছিল, দুটো কাঁসার বাটিতে করকচ পাথর নিয়ে ঘটর-ঘটর করে কেউ ঢালাঢালি করছে।

স্ত্রী-র সঙ্গে কথা-চালাচালির পর ত্যাগরাজন শৌনককে বললেন, 'শি সেজ দ্যাট শি হ্যাজ সিন টি রামমূর্তি। স্কুললাইফে দেকেচেন। ওঁদের মাদুরাইয়ের স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরেমনিতে রামমূর্তি এসেচিলেন। রামমূর্তির হাত তেকে সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রাইজও নিয়েচেন। ওঁদের ফ্যামিলি অ্যালবামে সেই ফোটোও আচে। কিন্তু সেসব মাদুরাইতে রয়ে গেচে।'

শৌনক মিসেস ত্যাগরাজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনো ছবি দেখালে চিনতে পারবেন?'

সৌভাগ্যলক্ষ্মী দুদিকে ঘাড় দুলিয়ে মিষ্টি সুরে বললেন, 'হাঁ। পারবো মোনে হয়।'

শৌনক হঠাৎ ধাঁ করে শ্রীনিবাসের করা সেজানের 'কার্ড প্লেয়ারস' ছবির অনুকৃতিটা বের করে মেলে ধরল। বলল, 'দেখুন তো এই তাস-খেলার ছবিতে রামমূর্তিকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা।'

ঝুঁকে পড়ে ছবিটা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে দেখে সৌভাগ্যলক্ষ্মী বললেন, "পল সেজানের 'কার্ড প্লেয়ারস'। কিন্তু সেজানের আঁকা নোয় তো! অন্য কেউ কাপি কোরেচেন। মোস্ট ইন্টারেস্টিং হোলো সেজানের ছবিতে যেকানে দুটো ফিগার, এখানে তো তিনটে... ওহ! দিস থার্ড ম্যান ইজ আনমিস্টেকেবলি টি রামমূর্তি স্যার! অ্যামেজিং!"

'আর ইউ শিওর?'

'একদমই। উইথ হিজ ফেমাস টারবান অ্যান্ড ব্রড জজ্। ওই ধরনের পাগড়ি একন আর কেউ তমিড়নাড়ুতে পরে না। আর ওই যে বোললাম ব্রড জজ্, চওড়া চোয়াল, এটা থেকেও ওঁকে চিনতে পারচি।'

স্ত্রী-র বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে ত্যাগরাজন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শৌনক ত্যাগরাজনকে বলল, 'কোনোভাবে এই রামমূর্তি ট্রাস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়? দরকার হলে আমি চেন্নাই যাব খোঁজখবর নিতে।'

'ওদের ফোন নম্বর জোগাড় কোরা কোনো কঠিন কাজ নোয়। আমি জোগাড় কোরে দিতে পারবো।'

'সো কাইন্ড অফ ইউ, স্যার। আচ্ছা, এই ছবিগুলো দেখুন তো...'

এই বলে শৌনক চারুকেশবতী-সিরিজের স্কেচগুলো বের করল। দক্ষিণভারতীয় সেই মন্দিরকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে দেবলীনার বিভিন্ন নৃত্যরত মূর্তি।

ছবিগুলো দেখামাত্রই ত্যাগরাজন দুই হাত দিয়ে দুই কান আড়াআড়ি ধরে স্বগতোক্তি করে উঠলেন, 'ও। শ্রীশ্রীনিবাসা।'

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় সোফা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল শৌনক। কোনোমতে নিজেকে সামলে বলল, 'কী। কী বললেন?'

এতটা উত্তেজনা কী কারণে বুঝতে না পেরে ত্যাগরাজন বললেন, 'শ্রীশ্রীনিবাস। মারি তিরুপতি।'

শৌনক একেবারেই বুঝতে পারছে না দেখে এবার মুখ খুললেন সৌভাগ্যলক্ষ্মী। বললেন, "মারি তিরুপতি হচ্চে বেঙ্গালুরুর একটি মন্দির। কন্নড় ভাষায় 'মারি' শব্দের অর্থ হোলো শিশু বা ছোটো। মারি তিরুপতি মানে ছোটো তিরুপতি। অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরের গোপুরমের অবিকল নকল হল এই মারি তিরুপতি মন্দিরের গোপুরম। আর এই মন্দিরের প্রধান দেবতা হলেন শ্রীশ্রীনিবাস।'

'কিন্তু এই মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং-এর ওপর গোপুরম?'

ত্যাগরাজন বললেন, 'হাঁ। ছয় তালা বিল্ডিং আচে। ভিতরে লিফটও আচে। লিফট দিয়ে উপরে যেতে হোয়। ছয়তালার উপরে গোপুরম আচে। আর গ্রাউন্ড ফ্লোরে...'

'গ্রাউন্ড ফ্লোরে?' শৌনক ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'গ্রাউন্ড ফ্লোরে চোটো চোটো বাচ্চাদের কেশমুণ্ডন করা হোয়। দেবতার উদ্দেশে মাথার চুল অর্পণ করা হোয়। দেবতার নামে তকন নূতন নামকরণও হোয় শিশুদের। দেবতার নাম শ্রীশ্রীনিবাস।' কথাটা বলেই আবার দুই হাত দিয়ে আড়াআড়ি দুই কর্ণমূল ধরলেন ত্যাগরাজন।

আচ্ছা! তাহলে শ্রীনিবাসের নামকরণও ওইভাবেই করা হয়েছিল। অর্থাৎ শ্রীনিবাসের শ্রীনিবাস-নামকরণ পরে করা হয়েছে! ওটি তাঁর আদি নাম নয়। অন্য কিছু। আলো ক্রমে আসিতেছে?

বিহ্বল দশা থেকে শৌনক জেগে উঠল ত্যাগরাজনের প্রশ্নে, 'ইয়োর রিলেটিভ ওয়াজ আ পেইন্টার?'

'ইয়া। সাম সর্ট অফ।... আচ্ছা, ত্যাগরাজন স্যার, প্লিজ টেক ইয়োর টাইম। আমি আপনার সঙ্গে পরশু যোগাযোগ করে নিচ্ছি।' সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল শৌনক।

'টিক আচে,' বলে ত্যাগরাজনও উঠে দাঁড়ালেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাইরের দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন শৌনককে।

ঠিক দুদিনের মাথায় কলেজে ক্লাসের ফাঁকে ত্যাগরাজনের ফোন পেল শৌনক। দক্ষিণ ভারতীয়দের এই ব্যাপারটা সে সাংঘাতিক পছন্দ করে। ওদের কথা ইজ কথা। কোনো কাজ হাতে নিলে, ওরা তা করবেই। যেদিন যে সময় কথা দিয়েছে, ঠিক সেদিনই সেই সময়েই কথা রাখবে। কোনো নড়চড় নেই। কোনোরকম করছি-করব-টাইপ দীর্ঘসূত্রতা নেই। পারফেক্ট ওয়ার্ক-কালচার।

সোৎসাহে ফোন ধরতেই ত্যাগরাজনের গলা, 'আই হ্যাভ রেড দ্য জারনাল অফ ইয়োর রিলেটিভ। আর ইউ ফ্রি দিস ইভিনিং?'

আবার সেই ড্রয়িং রুম। শৌনক দেখল, ত্যাগরাজন স্যার ভেতরে ভেতরে বেশ

এক্সাইটেড হয়ে আছেন। বললেন, 'দিস ম্যান শ্রীনিবাসন ইজ মোস্ট মিস্টিরিয়াস।'

'তাই? কেন এমন মনে হচ্ছে আপনার?'

'সেভারাল রিজনস। একটা লম্বা আর্টিকল আচে টি রামমূর্তির উপর।'

'কী? জীবনী নাকি?'

'না। পারসোনাল অ্যানেকডোটস। আমি পয়েন্ট-ওয়াইজ নোটস তৈরি করেছি লেকাটার থেকে। একটা মজার বেপার হল, রামমূর্তিরও তাসের নেশা চিল। হি ওয়াজ ভেরি ফন্ড অফ কার্ড প্লেয়িং। ব্রিজ।'

'আচ্ছা!' সেজানের কার্ড প্লেয়ারসদের মধ্যে রামমূর্তিকে বসিয়ে দেওয়ার কারণটা এবার ধরতে পারল শৌনক।

'আরও আনেক কিচু আচে। মোনে হয়, ইয়োর রিলেটিভ স্টেইড উইথ মিস্টার রামামূর্তি ফর আ লং টাইম। নানারকম পারসোনাল হ্যাবিটস, ডেইলি অ্যানেকডোটস—একে আপনি টি রামামূর্তির রেমিনিসেন্স বোলতে পারেন।'

'রামমূর্তি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ফোন নম্বর কি আপনি পেলেন?'

'পেয়েচি। শুধু তাই নোয়, আমি ওদের সোংগে যোগাযোগ কোরে আপনার কতাও বোলেচি। রামামূর্তিজ সন আর. রামস্বামী একন ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট। আপনি চাইলে দেকা কোরতে পারেন। হি ইজ ডিপলি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট ইয়োর রিসার্চ অন ইয়োর রিলেটিভ শ্রীনিবাসন।'

'ও, সো কাইন্ড অফ ইউ, প্রোফেসর! আপনি আমার জন্যে এতটা করলেন।'

'না, এ কিচুই না। সামাননো কাজ। কিন্তু শ্রীনিবাসের লেকায় সোবচেয়ে ইন্ট্রিগিং লাগল একটা সিক্রেট সোসাইটির বেপারে লিকেচেন।'

শৌনকের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। কে জানে, শ্রীনি কী লিখেছেন, কতটা লিখে রেখেছেন।

শৌনকের প্রশ্নাতুর মুখের দিকে তাকিয়ে ত্যাগরাজন বলতে লাগলেন, 'শ্রীনিবাসন রোট দ্যাট উনি একটা সিক্রেট রিলিজিয়াস বডির চিফ চিলেন।'

'রিলিজিয়াস বডি? মানে, ধর্মীয় সংগঠন?' শৌনকের ভুরু কুঁচকে গেল।

'হাঁ। ইট ওয়াজ আ মাদার-কাল্ট। এরা মা কালীর পুজা কোরতো। সিক্রেটলি ওথ নিতে হোতো।'

'আচ্ছা!'

'হাঁ। অথচ মেম্বাররা কেউ কাউকে দেকতে পেতো না। প্রত্যেকের একটা কোড-নেম চিলো। মানে আসল নাম নোয়। গোপন নাম। সিউডোনিম।'

'তা শ্রীনিবাসনের গোপন নাম কী ছিল, লিখেছেন?'

'না, তা ইখানে লিকেননি।'

'ও। তা, কী ধরনের কাজ করত এরা?'

'সেটা খুব স্পষ্ট নোয়। তোবে একটা আজিব বাত... একটা মিস্টিরিয়াস প্র্যাকটিস... ভাবলেই আমার রক্তো টান্ডা হোয়ে যাচ্চে...'

'সে কীরকম?'

'এরা হিউম্যান-স্যাকরিফাইস প্র্যাকটিস কোরতো।'

'বলেন কী? এসব লেখা আছে শ্রীনিবাসনের খাতায়? হিউম্যান-স্যাকরিফাইস? মানে নরবলি?'

'হাঁ, তাই তো লিকেচেন। জানি না, এ সোব কতার ওননো মানে আচে কিনা। আরও অদ্ভুত তারা একে অসুর-নিধন বোলতো। অসুর-নিধন কোরবার পর নিজেকে নিজেই মা কালীর চরণে বলি দিতো। তোবে শ্রীনিবাসনদের প্রধান কাজ ছিল মা কালীর গয়না প্রোটেক্ট কোরা।'

শ্রীনিবাস কীসের কথা লিখেছেন, বুঝতে অসুবিধে হল না আর শৌনকের। মা কালী হচ্ছেন দেশমাতৃকা। অসুর-নিধন হচ্ছে সাহেব-বধ। আর আত্মবলিদান কী, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। মাদার-কাল্ট হচ্ছে ট্রেজার প্রোটেকটার। শ্রীনিবাস সবই সাঁটে লিখেছেন। সেটাই স্বাভাবিক। শৌনক ভাবছিল।

'শ্রীনিবাসনের বাবাও এই মাদার-কাল্টের চিফ চিলেন,' ত্যাগরাজনের কথায় চমকে নড়েচড়ে বসল শৌনক।

জিজ্ঞেস করল, 'ও, আচ্ছা! অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ শ্রীনিবাসনস ফাদারস নেম?'

'তুইমইয়ানাদু পেরুমল।'

নামটা শুনেই শৌনক মহা বিরক্ত হয়ে গেল ভেতরে ভেতরে। বিরক্তিটা এক ঢোকে গিলে ফেলে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ত্যাগরাজন স্যার, এই 'তুইমইয়ানাদু' কথাটা কি তমিড়?"

'সার্টেনলি।'

'এর মানেটা কী?'

'তুইমইয়ানাদু কথাটার মানে হচ্ছে পিওর। স্পটলেস।'

শোনা মাত্রই শৌনকের মনটা এক লহমায় একেবারে ফুরফুরে স্পটলেস হয়ে গেল। তুইমইয়ানাদু—স্পটলেস—সুবিমল। অসাধারণ।

সে সহর্ষে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তার মানে আমার ইকোয়েশনগুলো ক্র্যাশ করেনি এখনও। ওয়াও!'

ত্যাগরাজন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিচু কি বোললেন?'

'না, কিছু না,' শৌনক শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, ত্যাগরাজন স্যার। কী বলে যে আপনাকে...'

বাড়ি ফিরে সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত পেখমকে বলল শৌনক। সব শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল পেখম। বলল, 'তাহলে তো মিটেই গেল, কী বলো?'

'না, মিটল না। এখনও অবধি যা দাঁড়াল, সেটা একটা কনজেকচার মাত্র। এটা প্রমাণ করতে হলে আরও সাপোর্টিং এভিডেন্স চাই। মন জিনিসটাকে কোনোদিন বিশ্বাস করিস না, পেখম। স্বাভাবিক নৈরাজ্যের মধ্যে সে একটা নিয়ম আরোপ করে তোকে সত্য ভুলিয়ে রাখতে চায়। মনে হয়, সব বোঝা হয়ে গেছে। আসলে হয়তো কিছুই জানা হয়নি। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া?'

'তা ছাড়া আসল প্রশ্নটারই তো উত্তর পেলাম না এখনও। শ্রীনি গেলেন কোথায়?'

শৌনকের মুখের দিকে তাকিয়ে পেখম বলল, 'আমার কি মনে হয় জানো, বাবা? সেটা জানতে হলে তোমাকে একবার চেন্নাই যেতেই হবে।'

'আমারও অমনই মনে হচ্ছে। আমি তো কিছুদিন ছুটি ম্যানেজ করতে পারব এইচ ও ডি-কে বলে কয়ে। বেশ কয়েকটা সি এল জমে আছে। কিন্তু তুই ক-দিন ক্লাস কামাই করতে পারবি কি?'

কথাটা শুনেই পেখম প্রায় পেখম তুলে নাচতে শুরু করল।

এয়ার-ইন্ডিয়ার টিকিট পেল শৌনক। ফেরাটা এখনই ফিক্স করতে পারল না। ফিরতে বোধহয় ট্রেনেই হবে।

মেদিনীপুর স্টেশন অবধি পৌঁছে দিতে এসেছে লিলি আর দেবলীনা। জিনস আর টপে পেখমকে আরও লম্বা, আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে। চুলটা পনি-টেইল করেছে। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ধরবে ওরা। হাওড়ায় পৌঁছে ওখান থেকে সোজা দমদম।

টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পেখমকে পার্টিং লেকচার দিচ্ছে লিলি উদ্‌বিগ্ন স্বরে। আইসক্রিমের কোনটা চাটতে চাটতে মায়ের সেই সদুপদেশগুলো প্রায় পরিষ্কার করে এনেছে পেখম।

শৌনক স্টেশনের একপাশে কলকে ফুলের ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। তিন ঘণ্টা স্মোক করা যাবে না। কাছেই পত্রপত্রিকা, খবরকাগজটাগজ নিয়ে বসে আছে একজন লোক। প্রতিদিনই সে এখানে বসে।

দেবলীনা লিলি আর পেখমের থেকে পায়ে পায়ে সরে শৌনকের সামনে এসে দাঁড়াল। শৌনক ওকে ডিটেইলসে কিছুই বলেনি। শুধু বলেছে, শ্রীনি-র ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে চেন্নাই যাচ্ছে। আর কিছু না।

শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'কিছু কি বলবেন, দেবলীনা?'

দ্বিধাজড়িত স্বরে দেবলীনা বলল, 'আপনি আমার জন্য এতকিছু করছেন। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, শৌনক!'

শৌনক বলল, 'না, এভাবে বলবেন না। আসলে আমি নিজেই ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়েছি। এর শেষ দেখতে চাই।'

হলুদ ঘাসের ওপর মরে আসা রোদের মতো বিষণ্ণ স্বরে দেবলীনা বলল, 'জানি না, শ্রীনি-র সত্যিই কী হয়েছে। সে বেঁচে আছে কি না। বা থাকলেও কোথায় আছে, কীভাবে আছে। মেয়েকে নিয়ে বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন, শৌনক। আর যাই করুন, নিজেকে বিপন্ন করবেন না, এইটুকুই আমার অনুরোধ। আসলে এই হয়তো আমার ভবিতব্য। কিংবা কর্মফল!'

সিগারেটের বাটটা জুতোর নীচে পিষতে পিষতে শৌনক বলল, 'কর্মফল? কীসের কথা বলছেন, দেবলীনা? অতীতে আপনিও কি কাউকে ছেড়ে গিয়েছিলেন? বিষম ব্যথা দিয়েছিলেন কাউকে?'

মাথা নীচু করে বলল মেয়েটি, 'হ্যাঁ। একটি ছেলে। কলেজ-লাইফে। অন্যায়ই করেছিলাম আমি তার সঙ্গে, আজ বুঝি। সে আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসত। কিন্তু আমি... আমি তার ভালোবাসার মর্যাদা দিইনি।'

'কী নাম ছিল ছেলেটির? বলা যাবে আমাকে?'

আমর্ম বেদনায় ডুবে গিয়ে শ্বাসের গভীরে সঙ্গোপনে উচ্চারণ করল দেবলীনা, 'বিরূঢ়ক সেন।'

১৯

"পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে ঢালিয়া দিয়া বাদল ঘটনাস্থলে আত্মবিসর্জন করেন। বিনয় ও দীনেশও পটাশিয়াম সায়ানাইডের অ্যাম্পুল মুখে দিয়াছিলেন বটে! কিন্তু দাঁতের চাপে অ্যাম্পুলের কাচাবরণ ভাঙিবার পূর্বেই বিনয় নিজের ডানদিকের কপালের রগ লক্ষ করিয়া এবং দীনেশ নিজ চোয়াল লক্ষ করিয়া গুলি চালাইয়াছিলেন। ফলত পটাশিয়াম সায়ানাইডে তাঁহাদের দুইজনের মৃত্যু হইল না। হাসপাতালে লইয়া আসিয়া ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের দুইজনকে বাঁচাইবার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা চালাইতে থাকিল। উদ্দেশ্য তাঁহাদের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়া বিভি-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বাহির করা এবং পরিশেষে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া প্রতিশোধ লওয়া। হাসপাতালে জ্ঞান ফিরিলে ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকাল কলেজের কৃতী ছাত্র বিনয় বসু মাথার ক্ষতস্থানে নিপুণভাবে আঙুল ঢুকাইয়া ক্ষতটিকে সেপটিক করিয়া দেন এবং এইভাবেই বীর বিনয় স্বেচ্ছায় মৃত্যুমুখে ঢলিয়া পড়েন। অন্যদিকে দীনেশ ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠেন। তাঁহাকে লইয়া আলিপুরের সেশন-জজ গার্লিকের সভাপতিত্বে স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারের নামে কূট প্রহসন চলিতে থাকে। বিচারের পরিণাম কী হইবে, তাহা লইয়া দীনেশ গুপ্তের মনে বিন্দুমাত্র উদ্‌বেগ জন্মিল না। তিনি নির্বিকার চিত্তে নির্জন কারাকক্ষে বসিয়া তাঁহার প্রিয়তমা 'মৃত্যুরূপা মাতা'র নিবিড় উপাসনা করিতে লাগিলেন। কারাগারের অভ্যন্তর হইতে সেই উপাসনার ভাবনির্মাল্য পত্রাকারে তিনি তাঁহার আত্মীয়, বন্ধুদের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওই পত্রাবলী মাসিক 'বেণু' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বাঙালির রক্তে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। সকলেই জানিতেন, বিচারের ফল কী হইবে। তথাপি দীনেশ ব্যতীত সকলেই মনে মনে এই প্রার্থনা করিতেছিলেন যেন চরম দণ্ডাজ্ঞা না হয়। এই ক্রান্তিকারী বীরত্রয়ীর এবম্প্রকার আত্মদানের সংবাদে সমগ্র ভারত, বিশেষত দীনেশের হাতে গড়া মেদিনীপুর জেলার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যুবকেরা এককালে আগুন হইয়া উঠিলেন। স্থির হইল, দীনেশ পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পূর্বেই ব্রিটিশের দুর্গে পুনরায় চরম আঘাত হানিতে হইবে।"

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকে বেরিয়ে নির্জন গলিপথ ধরে সাইকেলটা পাশে নিয়ে একা একা হাঁটছিল মাখন। সে আর টিয়া আজ আবার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পুজা দিতে গেছিল।

এসবে মাখনের তেমন বিশ্বাস নেই। সে খুবই প্র্যাকটিকাল ধরনের ছেলে। যদিও বিভি-দলে শপথ গ্রহণের সময় কালীমন্দিরেই শপথ নিতে হয়, আরও অনেকরকম এসোটেরিক প্র্যাকটিস চলে আসছে, তবু মাখন এসব নিয়ে তেমন চিন্তাটিন্তা করেনি। সে যেকোনো সমস্যা নিয়ে সোজাসুজি বাস্তবসম্মতভাবে ভাবতে ভালোবাসে।

টিয়া অবশ্য খুবই ধর্মভাবুক। ওই টিয়ার পাল্লাতে পড়েই সে এই নিয়ে দু-দুবার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গেল। কেন জানি মাখনেরও আজ মনে হয়েছিল, যাওয়ার আগে মা-কে একবার জানিয়ে যাওয়া দরকার। সেসব পর্ব চুকে গেলে ভাবালুতা ঝেড়ে ফেলার জন্যেই যেন অনেকটা সে টিয়াকে টেনে নিয়ে গেল ভানুদার মিষ্টির দোকানে। টপাটপ টপাটপ গরম রসোগোল্লা মুখে ফেলে হাসির হররায় টিয়ার স্তিমিতপ্রায় মনকে চাঙ্গা করে তুলছিল মাখন।

এখন তারা দুজন যে যার নিজের বাড়ির পথ ধরেছে। মাখন টিয়ার কথা ভেবে মনে মনে হাসল। বড়ো নির্মল মনের বন্ধু তার এই টিয়া। 'টিয়াপাখি, টিয়াপাখি' বলে কতদিন যে ওকে খেপিয়েছে মাখন। সেসব মধুর স্মৃতি আজ মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। টিয়ার একটা খুব বড়োসড়ো গালভারী নাম আছে কলেজের খাতায়। যতিজীবন ঘোষ। মাখনের ভালো নাম যেমন বিমল দাশগুপ্ত। এই নামগুলো অবশ্য মেদিনীপুর কলেজের কাগজপত্রেই পড়ে থাকে। তার বাইরে দুজন দুজনের কাছে কেবল মাখন আর টিয়া।

বাড়িতে না গোলমাল হয় শেষ পর্যন্ত। বাবা অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত পুরোনো দিনের কোবরেজ মানুষ। অবশ্য মাখনের চলাফেরায় চিন্তাভাবনায় তিনি কখনও বাধা দেননি। পূর্ববঙ্গের বরিশালের লোক ওরা। ওখান থেকে চলে এসে বাবা মেদিনীপুরে কবিরাজি শুরু করেছেন।

টিয়ার সংস্পর্শে এসে মাখন কেমন না-আস্তিক, না-নাস্তিক গোছের হয়ে উঠেছে। আস্তিকতা ও নাস্তিকতার একটা দ্বন্দ্ব তার মনে প্রায়শই চলে। আস্তিক বা নাস্তিক নয়, হয়তো বা সে সংশয়ী। বিশ্বাসের ব্যাপারে এই যেমন তার মনের ভেতর দ্বিমুখী চেতনার টানাপোড়েন, ভাষার ব্যাপারেও তেমনই সে দ্বিভাষিক। বরিশালে জন্ম তার, ছোটোবেলাও কেটেছে পুববাংলায়, ফলত বাড়িতে বা অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে সে ছোটোবেলা থেকেই বাঙাল ভাষায় স্বচ্ছন্দ। এদিকে আবার এতদিন মেদিনীপুরে থাকার দরুন, কলকাতা-ঘেঁষা ঘটিদের ভাষাতেই সে বাড়ির বাইরে কথা কয়। কিন্তু রেগে গেলে, উত্তেজিত হলে বা কোনো কারণে অবাক হয়ে গেলে মুখ দিয়ে বাঙাল ভাষা ছুটতে থাকে। এই নিয়ে টিয়াও কি তাকে কম খেপিয়েছে?

মাখন থাকে তার নিজের মেজাজে। মুগুর ভেঁজে আর ডনবৈঠক দিয়ে সে একখানা শক্ত শরীর বানিয়েছে। এতখানি চওড়া তার কাঁধ, পেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহু। যে দেখে, সে-ই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। মাখনের অবশ্য সেদিকে দৃকপাত নেই। সে জানে,

দুর্বল শরীর ব্রিটিশের থেকেও মারাত্মক শত্রু। শরীর শক্ত হলে মন শক্ত হয়। প্রচণ্ড সাহস ও ক্ষিপ্রতা আসে। তখন অসম্ভব সম্ভব করা যায়।

হ্যাঁ, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে তাকে। হবেই। জীবনে এমন সুযোগ দুবার আসবে না। বহু প্রতীক্ষার পর সে আর টিয়া এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ পেয়েছে। কেন পারবে না? বাস্তববোধ, উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহস থাকলে করা যায় না, এমন কোনো কাজ জগতে আছে বলে মাখন মনে করে না। কাজটা সে করবেই। শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা।

মুশকিল হচ্ছে টারগেটটিকে নিয়ে। একে তো জেমস পেডি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সমস্ত ক্ষণ উর্দিপরা সশস্ত্র সান্ত্রীরা তাকে ঘিরে রেখেছে। তারপর লোকটা মেদিনীপুরে থাকেই কম। প্রশাসনিক কাজে আজ কাঁথি তো কাল তমলুক। তার ওপর আবার ব্যাটার শিকারের বেজায় শখ। কোথায় না কোথায় যে যায় দলবল নিয়ে শিকারের খোঁজে। তা মানুষ-শিকারও তো কিছু কম করেনি পেডি!

তা যেখানেই ও যাক, সেখানেই গিয়ে ওকে মেরে আসা যায়। কিন্তু খোদ মেদিনীপুর শহরে ডি এম-কে মারতে পারলে ব্যাপারটা বেশ জমকালো হয়। ক্ষিতির মারফৎ সব খবরই নিয়েছে মাখন। নিজেও ভালো করে স্টাডি করেছে। মেদিনীপুর জেলায় এখন পাঁচ মহকুমা। সদর, কন্টাই, ঝাড়গ্রাম, তমলুক আর ঘাঁটাল। এই ব্যাটার কী কী কাজ? রেভিনিউ কালেক্ট করা, জমির জরিপ দেখা, জমির ট্যাক্স ঠিক করা, ডিসপিউট সেটল করা। আর আইনশৃঙ্খলা নিজের নিয়ন্ত্রণে কব্জা করে রাখা।

স্কটল্যান্ডের লোক। তা ভাই, হেইখানেই বইয়া বইয়া কলা খা, মরতে ক্যান আইছস ইন্ডিয়ায়? রক্তচুষা জাত! রক্ত না খাইলে শান্তি অয় না?

আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছর বয়স পেডির। লোকটা জীবনের শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ আর্মিতে ছিল। রক্তপিপাসার একটা ইতিহাস থাকে তো! পরে অসহিষ্ণু আইসিএস। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় চেচুয়াহাট আর নরঘাটে যা কীর্তি করেছে এই পেডি! মেয়েদের উলঙ্গ করে অত্যাচার করা, পুরুষদের বেত্রাঘাতে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা, শিশু-বৃদ্ধ-নারী কেউ বাদ যায়নি। যখন তখন জেলে ঢুকে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ। রাজনৈতিক মামলায় লোকটার দারুণ আগ্রহ। পারলে সবকটাকে ফাঁসিতে চড়াতে চায়। এর সঙ্গে শেষ হিসেব চুকোতেই হবে মাখনকে।

'মরতে তরে হবেই, ভাই পেডি।' মাখন নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, 'আর আমিই তরে মারুম। দীনেশদা ফাঁসির আগেই তর মরার খবর পাইব। বেশি ছটপট করিস না, তর মরণকাল ঘনাইয়া আইতাছে।'

অনেকদিন ধরেই খোঁজখবর নেওয়া চলছে। সুযোগ আর মিলছে না। প্রথমে দায়িত্ব পেয়েছিল ক্ষিতি আর প্রদ্যোৎ। ক্ষিতির জ্যাঠামশাই উকিল। সেই সুবাদে ক্ষিতি ডিএম

সাহেবের পিএ-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছে। সব খবরই টাটকা টাটকা চলে আসছে। ডিএম অফিসের লাগোয়া মাঠে ফুটবল প্র্যাকটিস করার ছলে ক্ষিতি আর প্রদ্যোৎ বারান্দা দিয়ে গাড়িতে ওঠানামার সময় ব্যাটার ভবলীলা সাঙ্গ করা যায় কিনা তা নিয়েও ভেবে দেখেছিল। সে হল না। ফেব্রুয়ারি মাসের ষোলো তারিখ আরেকবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু পেডির বোধহয় কইমাছের জান। পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম পালটে ফেলে সকাল সাড়ে এগারোটায় পেডি কলকাতা চলে গেছে, ক্ষিতি একথা জানত না।

মার্চের মাঝামাঝি আবার একবার। পেডি আসছিল পাঁশকুড়া থেকে। ট্রেনে। ঠিক হল, যা হবে খড়গপুরেই। কমেট-দা দায়িত্ব দিলেন রামকৃষ্ণকে। বা, বলা ভালো রামকৃষ্ণই কান্নাকাটি করে কমেট-দাকে বলে কয়ে সুযোগটা জোর করে কেড়ে নিল মাখনের হাত থেকে। এদিকে কমেট-দা বললেন, 'এখনই অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু কিছু হাতে নেই। যা আছে, তা দেওয়া যাবে না।'

মাখন মনে মনে ভাবে, রামকৃষ্ণটা এক্কেবারে ইম্প্র্যাকটিকাল ছেলে। মেদিনীপুর কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে পটাশিয়াম সায়ানাইড চুরি করে একটা ছুরির ফলাতে মাখিয়েছিল। বলেছিল, ও নাকি খড়গপুরে ট্রেনে পেডির কামরায় উঠে ওই ছুরির আঘাতে পেডিকে মারবে। ধরা পড়বে এবং ফাঁসিতে যাবে।

মাখন তখনই জানত, রামকৃষ্ণ সফল হবে না। রামকৃষ্ণের আত্মদানের প্রেরণা, সাহস এবং পেডিকে নিকেশ করার ইচ্ছাটা খাঁটি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্ল্যানটা একেবারেই বাস্তবানুগ নয়। পেডি কি কামরায় বসে একা একা হাওয়া খাবে? ওকে ঘিরে থাকবে ওর গার্ডরা। কামরার দরজাও নিশ্চয়ই বন্ধ করা থাকবে।

মাখন যা ভেবেছিল, ঠিক হলও তাই। খড়গপুরে ট্রেনে উঠে ফণী আর রামকৃষ্ণ দেখল পেডির ফার্স্টক্লাস কামরার দরজা শুধু বন্ধ নয়, তার ওপর আবার বন্দুকধারী সান্ত্রীরা দরজায় পাহারা দিচ্ছে। রামকৃষ্ণ তখন আবার জানালা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যিস ফণী রামকৃষ্ণকে সেই বেকার চেষ্টা থেকে নিরস্ত করে। নইলে দুজনেরই প্রাণ যেত বেঘোরে। পাশের কামরায় লুকিয়ে থেকে মেদিনীপুর স্টেশনে নেমে ওরা দেখল, পেডি নেমেছে। চার-পাঁচজন গার্ড তাকে ঘিরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল। তারপর ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে দুজনের সে কী কান্নাকাটি!

মাখন জানে, ওরা পারবে না। পারলে সে আর টিয়া-ই পারবে। ক্ষিতিটা একটা রত্ন। ঠিক সময়ে ঠিক প্ল্যানটা ভেঁজেছে। পেডি হচ্ছে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট। ক্ষিতির পরিকল্পনা হল, জেলার সব স্কুল মিলে একটা কম্পিটিশন-কাম-এগজিবিশন হোক। এগজিবিশনটা হবে কলেজিয়েট স্কুলে। ওই এগজিবিশন দেখতে শিওর পেডি আসবে। নয়ত পুরস্কার বিতরণ করতে। ওইটেই পেডির অসতর্ক মুহূর্ত। ওই মুহূর্তেই ওকে শেষ করে দেওয়া যাবে।

কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার হীরালাল দাশগুপ্ত মাখনের কাকা। ক্ষিতি আর নরেন ম্যাট্রিকের ক্যান্ডিডেট। প্রস্তাবটা ওরা তো হেডস্যারকে দিয়েইছিল, তারপর মাখন তার কাকাকে অনুরোধ করায় প্রপোজাল অ্যাপ্রুভ্‌ড হয়ে গেল।

চৌঠা এপ্রিল এগজিবিশন উদ্‌বোধন। উদ্‌বোধন করতে আসবে পেডি স্বয়ং। আগামীকাল সেই ৪ঠা এপ্রিল। ভাবতেই মাখনের মনটা আনন্দে ভরে উঠল। আহ্‌, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র!

এবার আর অস্ত্রের সংকট হয়নি। কমেট-দা কলকাতা চলে গেছেন। তাঁর জায়গায় এখন বিভি-র মেদিনীপুর কেন্দ্রের দায়িত্বে প্রফুল্লকুমার দত্ত। মাখন সোজাসাপটা বলেছিল প্রফুল্লদাকে, 'দেখুন দাদা, ওইসব ছুরিটুরি দিয়ে পারব না। ছুরিটুরি বেকার। রিভলভার চাই। এমন অমূল্য সুযোগ আর আসবে না, দাদা!'

প্রফুল্লদা যোগাযোগ করলেন যতীশ গুহ-র সঙ্গে। রাইটার্সের সেই ঐতিহাসিক অভিযানে যাওয়ার আগে দীনেশদা তাঁর কয়েকটা কীসব জিনিসপত্র ট্রেজার প্রোটেকটার চিফ সুবিমল শাসমলের হাতে যতীশ-দাকে পাঠিয়েছিল। তার মধ্য থেকে পাওয়া গেল একটা রিভলভার আর কিছু বুলেট। টিয়ার জন্য বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত কলকাতা থেকে অন্য একটা রিভলভার জোগাড় করে পাঠালেন।

মাখনের হাতে রিভলভার আর বুলেটগুলো তুলে দিয়ে প্রফুল্লদা বললেন, 'এই রিভলভারটার মান রাখিস, মাখন। দীনেশ গুপ্তের রিভলভার। খুবই লাকি! কখনও মিসফায়ার করেনি। তবে একটা কথা মনে রাখিস...'

মাখন বিস্মিত চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কী, দাদা?'

'যদি সম্ভব হয়, যদি কাজ শেষ করে পালাতে পারিস, তবে এই রিভলভারটা কোনো-না-কোনো ঘুরপথে যতীশদাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করিস। দীনেশ সেরকমই বলে গেছে। তোদের প্ল্যান আমি দেখেছি। পারফেক্ট।... এই অ্যাম্পুল দুটো রাখ। পটাশিয়াম সায়ানাইড। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এগুলো যেন ব্যবহার না করতে হয়। আর দেরি করিস না। সোজা বাড়ি চলে যা।'

প্রফুল্লদার চোখ চিকচিক করছিল। পরিবেশ লঘু করার জন্য মাখন বলল, 'পেডিটার জইন্‌নে দুঃখ অইতাছে। স্কটল্যান্ডে জন্মাইছে, হুইয়া রইব মিডনাপুরে! কী আকাম যে করতে আইলো আমাগো দ্যাশে।'

মাখনের কথায় পরিস্থিতি ভুলে হো-হো করে হেসে উঠলেন প্রফুল্লকুমার।

সেসব তো হল। কিন্তু ভোর হবে কখন? মাখনের আজ রাতে আর ঘুম আসছে না। 'কালি প্রাতে আরম্ভ হইবে মহারণ!'

কিন্তু যুদ্ধটা পরের দিন বাঁধল না। কলেজিয়েট মাঠে বসে বসে মশা তাড়িয়ে বিরক্ত হয়ে গেল মাখন আর টিয়া। বিকেল চারটে-পনেরো। পেডির স্কুলে ঢোকার কথা

চারটেয়। হলটা কী?

কিছুক্ষণ পর ক্ষিতি আর নরেন ভগ্নদূতের মতো এসে জানাল, পেডি আসেনি। তার পরিবর্তে এগজিবিশন ওপন করতে এসেছে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নরেন্দ্রকুমার সেন।

মাখন অমনই সিমেন্টের বেঞ্চ থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর পেডি? পেডি গেল কই?'

ক্ষিতি বলল, 'পেডি গেছল ঝাড়গ্রামে। কী কাজ ছিল!'

টিয়া বলল, 'তারপর? ঝাড়গ্রাম থেকে?'

ক্ষিতি উত্তর দিল, 'তারপর ইস্টারের ছুটি। তাই ঝাড়গ্রাম থেকে সোজা চলে গেছে ঘাটশিলা। শিকারে।'

টিয়া খেপে উঠে সরোষে বলে উঠল, 'চমৎকার! চল মাখন, নরেন সেনটাকেই সাবাড় করে দিয়ে আসি। এ আর সহ্য হচ্ছে না, শালা!'

মাখন শক্ত হাতে টিয়ার কাঁধ চেপে ধরে গর্জন করে উঠল, 'চুপ কর! নরেন সেন ইজ নট আওয়ার টারগেট। ইউ হ্যাভ নো রাইট টু বি ইমোশনাল। অন্য প্ল্যান ভাবতে হবে। তুই কী কস, ক্ষিতি?'

ক্ষিতি ধীর স্থির শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি তোমার কাকাবাবুকে বলে এগজিবিশন এক্সটেন্ড করতে পার? প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন শেষ দিনেই হয়। ওই দিন যদি পেডি আসে...'

ক্ষিতিদের অনুরোধে এগজিবিশনটা আরও কয়েকদিন এক্সটেন্ড করতেই হল হীরালাল দাশগুপ্তকে। হাজার হোক, এটাই ওদের ফাইনাল ইয়ার। ওরা দুজন—ক্ষিতি আর নরেন ছাত্রদের লিডার বলে কথা।

চার, পাঁচ, ছয়। এপ্রিল মাসের তিনটে দিন বেরিয়ে গেল। সাত তারিখ সকালে মাখনের ধৈর্য আর বাঁধ মানল না। সোজা হীরালাল দাশগুপ্তের বাড়ি গিয়ে প্রশ্ন করে ফেলল, 'কাকাবাবু, পেডির কী হইছে? প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশনের লেইগ্যা আওনের কথা আছল না?'

হীরালালবাবু চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তাতে তর অ্যাতো চিন্তা হইতাছে ক্যান, মাখন?'

মাখন প্রমাদ গণল। ভুল করে ফেলেছে প্রশ্ন করে। কিন্তু সে এক মুহূর্তের ভুল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'না, না, কাকাবাবু! চিন্তা আমার জইন্ন না। আমার বোনটা কান্নাকাটি করতাছে। কী সেলাই না ফুঁড়াই কীসে একডা প্রাইজ পাইব। তাই জিগাইলাম।'

ভাইঝির কথা শুনে হীরালালবাবু গলে গেলেন ভেতরে ভেতরে। বললেন, 'দাঁড়া, দেহি। আইজ ইস্কুলে গিয়া পেডি সাহেবেরে রাজি করাইতে পারি কি না!'

মাখন নিজের উত্তেজনা বুকের ভেতর গোপন করে জিজ্ঞেস করল, 'তাইলে পেডি সাহেব ফিরা আইছে?'

'না, আহে নাই। কিন্তু আইজ আইয়াও পরতে পারে।'

দুপুরবেলা স্নান-খাওয়া সেরে নিয়ে তৈরি হয়ে নিল মাখন। তার মন বলছে, আজ পেডি আসবে। এবং আসলেই পেডির আজ শেষ দিন। দুপুরের খাওয়ার পর শোয়ার ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল মাখন। বইয়ের র‍্যাকের পেছন থেকে বের করে আনল রিভলভারটা। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ে ঝকমক করছে আগ্নেয়াস্ত্রটি। কী ভেবে রিভলভার লোড করল সে। শক্ত হাতে রিভলভারটা ধরে নিজের সুদৃঢ় পাঞ্জাখানা আলোর মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল মাখন।

এই সেই হাত, যা দিয়ে পঞ্চাশ বছর পরে এক কিশোরের হাত ধরে ঝাঁকুনি মেরে তিনি বলবেন, 'এঃ! এ যে পালকের লাহান হাত তুমার। এই দিয়া ছবিটবি আঁকা হইতে পারে, সাহিত্যচর্চাও করতে পারব মনে অয়, কিন্তু বিপ্লব? নাহ্, তুমার এই হাত দিয়া কুনোকালে বিপ্লব হইব না!'

এখন সেসব কথা মাখন জানে না। সেসব তো পঞ্চাশ বছর পরে হবে! এখন আপাতত বইয়ের র‍্যাকের পেছনে রিভলভারটা লুকিয়ে সে দরজা খুলে বেরিয়ে চলে গেল।

তিনটে বাজল। কলেজিয়েট স্কুলে এগজিবিশন অন্য দিনের মতো শুরু হয়েছে। দেখতে দেখতে পাঁচটা বাজল। সাড়ে পাঁচটা। ক্রমে দিনের শেষ আলো কলেজিয়েট স্কুলের প্রাচীন সৌধটার ওপর থেকে মিলিয়ে এল।

সন্ধে ছটা। ক্ষিতি আর নরেন প্রাচীরের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীরসংলগ্ন প্রধান তিনটি ঘরে এগজিবিশন চলছে। যেন এক হতাশামলিন অন্ধকার নেমে এসেছে। স্কুলের প্রায়ান্ধকার ঘরগুলোয় লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। ছেলেরা এক এক করে বাড়ি চলে যাচ্ছে। হীরালালবাবুও ভাবলেন, এগজিবিশন এবার বন্ধ করে দিই। প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশন তো হলই না। পেডি সাহেবও এলেন না।

সেরকমই করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা সরকারি গাড়ি এসে দাঁড়াল স্কুলের গেটে। গোলকুয়ার চকের দিকে স্কুলের গেট তখন। হীরালালবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে গেটে হাজির হলেন।

গাড়ি থেকে নামলেন আবার সেই নরেন্দ্রকুমার সেন এডিএম। হীরালালবাবুর মুখ আঁধার হয়েই ছিল। কিন্তু এন সেনের কথায় মুখে হাসি ফুটল তাঁর এবার। এডিএম বললেন, 'পেডি এইমাত্র অফিসে এসেছেন। আপনি অফিসে গিয়ে অন বিহাফ অফ ইয়োর স্কুল ডিএম সাহেবকে এগজিবিশন দেখার জন্য ইনভাইট করতেই পারেন।'

খবরটা ক্ষিতিদের কানে পৌঁছুতে দেরি হল না। তারা কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে অধীর অপেক্ষায় নিরত মাখন ও টিয়ার কাছে এসে বলল, 'বার্ড হ্যাজ অ্যারাইভড। হি

উইল বি হিয়ার এনি মোমেন্ট। গেট রেডি। কুইক।'

বিভি-র স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে অ্যাকশনের ঠিক আগে জামা বদলে অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে আসা। মাখন আর টিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে দৌড়োল।

মাখনের বাড়ি কলেজের কাছেই। সে ধীরে ধীরে হাঁটছিল, যেন কেউ সন্দেহ না করে। অন্ধকার মাঠ থেকে উঠে কলেজিয়েট স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সে দুজন মানুষের কথা শুনে সামান্য অবাক হল। এর আগে কখনও সে এই দুজনকে এ তল্লাটে দেখেনি। একজন বাচ্চা ছেলে, স্কুলের ছাত্রটাত্রই হবে, কেমন একটু অদ্ভুত জামাকাপড় পরা। আরেকজন বলিষ্ঠদেহী মাঝবয়সি লোক।

বাচ্চা ছেলেটা বলছে, 'তুমি এখানে কোথা থেকে এলে, প্রতুলমামা?'

বলিষ্ঠদেহী মানুষটি উত্তর দিল, 'আমিও তো তাই ভাবছি রে! তুই-ই বা কোত্থেকে উদয় হলি, দালি? তুই তো কলকাতা চলে গেছলি। মেদিনীপুরে ফিরে এলি কবে?'

'আমি একটা বই পড়ছিলাম, প্রতুলমামা! পড়তে পড়তে কী যে হল, এইরকম হয়ে গেছে! বইয়ের লাইনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এ কোথায় যে এসে পড়েছি আমি! তোমাকে এখানে দেখব, ভাবিইনি!'

বলিষ্ঠ লোকটি বলল, 'আর বলিস না! আমার কী যে হয়েছে! রাত্রে ঘুম হয় না, কিছু মনে থাকে না, মাঝেমাঝে উলটোপালটা দেখি। এই দ্যাখ না, যাচ্ছিলাম গোলকুয়ার চক দিয়ে, হঠাৎ আমাদের স্কুলের সামনে এসে এইরকম হয়ে গেল। এটা তো আমাদের স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল রে! কিন্তু কেমন পুরোনো পুরোনো! আলোটালো নেই। কীসব লণ্ঠন-টণ্ঠন জ্বলছে। পেল্লায় গেটটাও লোপাট। তার বদলে গোলকুয়ার চকের দিকে একটা ছোট্ট গেট! কী ব্যাপার হল বল দেখি?'

বাচ্চাটি উত্তর দিল, 'চলো তো ভেতরে গিয়ে দেখি, কী ব্যাপার।'

এই বলেই তারা দুজন গেটের ওপাশে মিলিয়ে গেল। মাখন ভাবছিল, এরা কারা? এদের কথাবার্তাও যেন কেমন অন্যরকম। বেশ সন্দেহজনক! কেমন গেটের ওপাশে সুট করে অন্ধকারে দুজন মিলিয়ে গেল! কে জানে বাবা!

কিন্তু, না। এখন ওদিকে কনসেনট্রেট করলে চলবে না। বহু সাধনায় এমন অপূর্ব সুযোগ মিলেছে।

বাড়িতে এসে ঢুকল মাখন। বাবা কোথাও গিয়েছেন। ভাই-বোনেরা এখনও স্কুলের এগজিবিশন থেকে ফেরেনি। তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করে বড়ো ছায়া ফেলে মা ঠাকুরঘরের দিকে চলে গেলেন। সেইদিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে মাখন দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মা-কে নিঃশব্দে নমস্কার করল।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে হ্যারিকেনের আলোয় বইয়ের র‍্যাকের পেছন থেকে রিভলভার, বুলেট আর পটাশিয়াম সায়ানাইডের অ্যাম্পুল বের করে আনল মাখন।

মালকোঁচা দিয়ে ধুতিটা পরল। কোমরের কাছে ধুতির ফেরতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল রিভলভারটা। একটা ফতুয়া চড়াল গায়ে। ফতুয়ার পকেটে বাকি বুলেটগুলো আর সায়ানাইডের অ্যাম্পুল ভরে নিল। তারপর ফতুয়াটা নামিয়ে কোমরের কাছটা ভালো করে ঢেকে নিল সে।

কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে এসে দেখল, টিয়া আগেই এসে গেছে।

মাখন বলল, 'রেডি?'

'হ্যাঁ, রেডি। পেডি এসেছে। স্কুলগেটের সামনে তিনজন ছোটো ছোটো ছেলে ফুলের তোড়া দিয়ে পেডিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। এখন তোর কাকা, অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার, দারোয়ান, মালি এরা সব পেডিকে ভেতরে নিয়ে গেছে। ভেতরে গিয়ে এগজিবিশন দেখাচ্ছে এখন মনে হয়।'

'সঙ্গে কে কে আছে পেডির? সরকারি তরফে?'

'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অশ্বিনী মৈত্র আছে। অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মাইকেল ক্যারিট আছে।'

'সিকিউরিটি?'

'নো সিকিউরিটি। স্কুলের এগজিবিশনে ঢুকেছে, তাই পেডি তার দেহরক্ষীদের গেটের সামনে রেখে গেছে। ভেতরে নিয়ে যায়নি।'

'গুড!' মাখনের ঠোঁটে তৃপ্তিসূচক হাসি খেলে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'ক্ষিতি আর নরেন কোথায়?'

'প্রাচীরের ওদিকে। আর একটা ফাতরা লোকও ওখানে এসে জুটেছে।'

'কে বল তো?'

'সুশীল দাস।'

'আমি আরও দুজনকে দেখলাম, বুঝলি? একটা ষণ্ডাগন্ডা লোক। আর ক্ষিতির বয়সি হবে এমন একটা বাচ্চা ছেলে।'

'কারা রে? আমি কিন্তু দেখিনি তাদের,' টিয়া বলল।

'মরুগগে। এসেছে হয়তো মেদিনীপুরের অন্য কোনো মহকুমা থেকে,' মাখন আরও একটু কাছে সরে এসে টিয়াকে বলল, 'শোন। পাঁচিলের হাইট তিন ফিট। ওইটা টপকাবো। টপকে ঢুকে যাব। বুঝলি?'

'বুঝলাম।'

'নে, ছোট।'

'এখনই?'

'এখন নয় তো কি পাখি উড়ে গেলে ছুটবি? ছুটে পাঁচিলের ওপর লাফ দিয়ে টপকে স্কুলে ঢুকে সোজা এগজিবিশনের ঘরে গিয়ে অ্যাকশন সেরে একই পথ দিয়ে দৌড়ে

বেরিয়ে চলে আসব। শোন, আমরা মরব না। আমার অন্তত মরার কোনো প্ল্যান নেই। জীবন মধুময়। কাজ সেরে পালাতে হবে। তারপর আরও অনেক, অনেক কিছু করার আছে আমার।'

দুজনে একই সঙ্গে উচ্চারণ করল, 'ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্!' তারপরেই দৌড়তে শুরু করল।

আগুনের গোলার মতো দুটো ছেলে অন্ধকার মাঠ থেকে উঠে এসে লাফ দিয়ে পাঁচিল টপকে স্কুলের টানা বারান্দায় পড়ল। পেডি তখন তৃতীয় ঘরে লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় প্রদর্শবস্তু দেখছে। ভলান্টিয়ার্সদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে মাখন আর টিয়া সেই ঘরে তিরবেগে ঢুকে পেডিকে উপর্যুপরি গুলি করতে লাগল। পরপর ছ-বার। গুলির প্রচণ্ড আওয়াজে, আগুনের তীব্র হলকায়, বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে ভয়ার্ত মানুষগুলো এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পালাতে লাগল যে যেদিকে পারে। এদিকে পেডি যে তাদের সঙ্গে নেই, সে খেয়াল কারোই রইল না। ছ-ছখানা গুলি খেয়ে তখন কোনোমতে দেওয়াল ধরে উলটে পড়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মরণের কাল গুনতে লাগল মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ শিকারী-ডিএম জেমস পেডি!

টিয়া আর মাখনের কিন্তু ছোটা শেষ হয়নি। পেডির ওপর অনর্গল আগুন ছড়িয়ে দিয়ে ওরা সেই একইভাবে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে বারান্দা দিয়ে নেমে আবার লাফ দিয়ে উদ্ধত চিতাবাঘের মতো পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেল। মাখন এক পলক শুধু দেখেছিল, পাঁচিলের কাছে ক্ষিতি আর নরেন একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

পাঁচিল টপকে রাস্তায় এসে পড়ল ওরা। দেখল গোলকুয়ার চকের দিক থেকে একজন লোক সাইকেল চালিয়ে আসছে। মাখন সেই লোকটাকে এক ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে সাইকেলে চেপে বসল। টিয়া বসেছে সাইকেলের পেছনে। প্রথমেই সাইকেলটাকে একটা বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা মেরে সাইকেলের লাইট-টার বারোটা বাজিয়ে দিল মাখন। তারপর এপ্রিল মাসের উষ্ণ রাত্রির আকাশের নীচে শন্ শন্ শব্দ তুলে অন্ধকারের মধ্যে দুজন হারিয়ে গেল কোথায়...

২০

প্রকাণ্ড এক্সপ্রেস ট্রেন পুরুলিয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। প্লাটফর্মে মানুষের প্রবল ব্যস্ততা। সেই ব্যস্ততার মধ্যে থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে এসে উঠল অতি সাধারণ দুজন কৃষক-শ্রেণীর মানুষ। ওরা যাবে কলকাতা। দুজনের পরনেই মোটা কাপড়ের আটহাতি ধুতি, উর্ধ্বাঙ্গে ভালো করে গামছা জড়ানো। সঙ্গে একটা মাত্র ছোটো পুঁটুলি। আর কিছুই নেই। এদিক-ওদিক ফ্লুক-ফ্লুক চেয়ে দেখে জানালা থেকে একটু দূরে দুটো মুখোমুখি আসনে ওরা এসে বসল।

একটু পরেই ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। ট্রেনের দুলুনির মধ্যে একজন আরেকজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ চাপা স্বরে বলল, 'চারিদিকে চোখ-কান খোলা রাখিস। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।'

সেকথা বলার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই প্রথমজন অঘোর ঘুমে তলিয়ে গেল। তার নিদ্রিত নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল অপরজন।

টিয়া অবাক হয়ে ভাবছিল, এই ভয়ংকর বিপদের মধ্যে এমন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ে কী করে মাখন?

খুব ছোটোবেলা থেকেই টিয়া তার বন্ধুকে দেখে আসছে। সে নিজেও বিপ্লবী। অনিশ্চয়তা, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়, অমানুষিক নিপীড়ন, আচম্বিত মৃত্যু বিপ্লবীর জীবনপথের প্রতিটি বাঁকে হিংস্র জন্তুর মতো ওঁত পেতে বসে থাকে। একথা জেনেই অসীম সাহস ও অবিচল আদর্শনিষ্ঠা সম্বল করে এই পথে হাঁটতে হয়। কিন্তু বিপদকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মাখনের এই যে নিরুদ্‌বেগ ঘুমিয়ে পড়া—এ জিনিস টিয়াকেও বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। মনে হয়, এত দেখেও, এত মেশামিশি করেও সে মাখনকে আজও যেন পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। ভেতরে ভেতরে ভয়ংকর পরিকল্পনা ও তার এগজিকিউশন চলছে, অথচ বাইরেটা একেবারে অমার্জিতরকমের সোজাসাপটা, সরল ও নির্ভার—ঠিক এইজন্যেই তো মাখন এতখানি রহস্যময়! আর রহস্যময় বলেই সে এতটা আকর্ষণীয়।

তা না হলে কাল সন্ধে থেকে পর পর যা যা হয়েছে, তারপর এমন নির্ভার নির্লিপ্ত থাকে কীভাবে মাখন? কলেজিয়েট স্কুলের সেই ভলক্যানিক ইরাপশনের পর

গোলকুয়ার চক থেকে জনৈক আরোহীর সাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে টিয়াকে সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নয়-দশ মাইল দূরে গোদাপিয়াশালের সুন্দরচটিতে এসে পৌঁছেছিল মাখন। সেখানে আচমকা দুজন মুরুব্বি লোকের মুখোমুখি পড়ে যায় ওরা। কীসব চাবিজাবি ভুজুংভাজুং বুঝিয়ে দিয়ে লোক দুটোকে কিছুক্ষণের জন্য সেখান থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছিল মাখন। আর ওইটুকু সময়ের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গিয়ে অন্ধকারে অন্ধকারে ওরা ঢুকে গেছিল ভাদুতলার জঙ্গলে। সেখানে ঝোপের মধ্যে সাইকেল ফেলে দিয়ে সোজা শালবনি স্টেশন। তারপর কোনোরকমে ট্রেন ধরে সকাল ন-টা, সাড়ে ন-টা নাগাদ পুরুলিয়া। স্টেশনে নেমে কাপড়ের দোকানে নতুন কাপড় গামছা কিনে একটা বনের পুকুরের পাড়ে ঝোপের মধ্যে অ্যাকশনের জামাকাপড় জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে কাপড়-গামছা পরে নির্ভেজাল চাষা সেজে একটা খাওয়ার দোকানে ঢুকে পেটে দুটি দানাপানি দিয়ে আবার স্টেশনে ফিরে এসেছে গুটি গুটি পায়ে পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ধরবার জন্য।

দলের নির্দেশ-অনুযায়ী কলকাতায় গিয়ে উঠতে হবে মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের বাড়ি। কিন্তু কলকাতাই কি পৌঁছুতে পারবে ওরা নির্বিঘ্নে? এই পথে ঠিক কী অপেক্ষা করে আছে, মাখনও জানে না, টিয়াও জানে না। তা নিয়ে টিয়া এত ভাবছে, অথচ মাখন কিছুই ভাবছে না। সে বাচ্চা ছেলের মতো ট্রেনে উঠেই দিব্বি ঘুমিয়ে পড়েছে!

টিয়াকে সাবধান করার দরকার ছিল কি খুব? চোখ খুলে সতর্ক দৃষ্টি মেলেই তো বসে আছে টিয়া! বিশেষত, স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালেই সে একদম অ্যালার্ট। হাই মাইনাস পাওয়ারের চশমাটা চোখে নেই এ মুহূর্তে, ফলত দূরের জিনিস সামান্য ঝাপসা দেখছে। উপায় নেই, চশমা পুঁটুলির মধ্যে রাখতে হয়েছে। তা না হলে ফ্যাশনেবল চশমা পরা চাষা নির্ঘাত সন্দেহের উদ্রেক করত অন্যদের মনে। পুঁটুলিতে চশমাটা ছাড়া আছে দুটো রিভলভার, সায়নাইডের অ্যাম্পুল আর এক প্যাকেট সিগারেট, দেশলাই। পুঁটুলিটা সে কোলের ওপর রেখে বুকে জড়িয়েই বসেছে।

মেদিনীপুর স্টেশন ঢুকতেই বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল টিয়ার। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মেদিনীপুরে ট্রেন দাঁড়াল না। সোজা গিয়ে উঠল কাঁসাই নদীর ওপর রেলব্রিজে। নদীর ঠান্ডা হাওয়া লাগতেই গায়ের গামছাটা মুখে মাথায় মাফলারের মতো করে জড়িয়ে নিল তন্দ্রাচ্ছন্ন মাখন। এখন আর তার মুখটাও দেখা যাচ্ছে না।

দুপাশে মাঠ-ঘাট, গাছপালা, গ্রাম, নদী সব সট্ সট্ করে পেছনপানে সরে সরে যাচ্ছে। চলমান সেই দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে টিয়ার মনে পড়ে যাচ্ছিল তাদের কর্নেলগোলার বাড়ির কথা। বাড়িটার ওপর পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি আছে। বড়দা বিনয়জীবন ওরফে তোতা মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক। টিয়ার পরের দুই ভাই—শালিক ওরফে নবজীবন এবং পায়রা ওরফে নির্মলজীবন—প্রত্যক্ষভাবে বেঙ্গল

অনুশীলনকারীদের সঙ্গে যুক্ত। এই যখন অবস্থা, তখন পেডি-নিধনের অব্যবহিত পরেই বাড়িতে টিয়ার দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি পুলিশের মনে প্রবল সন্দেহ জাগিয়ে তুলতেই পারে। টিয়া ভাবছিল, কী জানি, বাড়িতে এখন কী যে হচ্ছে!

আচ্ছা, মাখনের মনে কি এরকম কোনো চিন্তা আসছে না? দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন অতল ঘুমের সমুদ্রে নিটোল তলিয়ে আছে। এদিকে প্যাসেজের মধ্য দিয়ে কেউ এগিয়ে এলেই সে নড়েচড়ে বসছে। মুখ-মাথা সেই যে গামছা দিয়ে জড়িয়ে বসেছিল, সে আর খোলার নামটি নেই। পেরিয়ে যাচ্ছে পাঁশকুড়া, রূপনারায়ণ নদী, দামোদরের খাল, আন্দুল স্টেশন। গামছার ঘোমটায় মুখ ঢেকে একজন চাষি বেঞ্চে বসে অবিরত ঢুলছে। এ তোমার কেমন আশ্চর্য ঘুম, মাখন?

ঘন্টা পাঁচেক নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। এখনও অবধি কিছুই তেমন সন্দেহজনক চোখে পড়েনি। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে; মাখন উঠে দাঁড়াল। আগের মতো একইভাবে টিয়ার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে আয়। পন্টুন ব্রিজের নীচে মিট করছি।' অতঃপর ট্রেনের স্পিড একটু কমতেই সে হাত নেড়ে লাফিয়ে নেমে গেল প্লাটফর্মে।

ঘুম-জড়ানো গলায় ট্রেন আসা-যাওয়ার ঘোষণা, কুলিদের হই-হাই শব্দ, মাল-টানার চাকা লাগানো কাঠের গাড়ির ঘড়ঘড় আওয়াজ, মানুষের অবিশ্রান্ত ভিড় ঠেলে ও পুঁটুলি সামলে বেরিয়ে এসে টিয়া কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখল, গামছা গায়ে দেওয়া চাষি মাখন নির্বিকারভাবে গঙ্গার ঢেউ দেখছে। টিয়া পেছন দিক থেকে মাখনের কাছে এসে চমকে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু পেছনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই মাখন ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল।

'কী আশ্চর্য! পেছন দিকেও দুটো চোখ আছে নাকি রে তোর?'

মাখন হাসতে হাসতেই বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চল!'

তারপর কলকাতার অন্তহীন জনস্রোতের মধ্যে মাখন আর টিয়া মিশে গেল এক বৃহদায়তন উপন্যাসের অক্ষররাশির ভেতর ডুবে থাকা অকিঞ্চিৎকর দুটি আপাত-নিরীহ শব্দের মতন।

"পেডি নিধন-যজ্ঞের প্রধান দুই ঋত্বিক বিমল (মাখন) এবং যতিজীবন (টিয়া) মেদিনীপুর হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়া দলীয় নির্দেশানুযায়ী মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের গৃহে আশ্রয় নেন। যতিজীবনকে পেডি-কাণ্ডের সময় কেহ চিনিতে পারে নাই ও তদবধি তাঁহাকে লইয়া মেদিনীপুরে কোনো গুজব নাই দেখিয়া দলের নেতারা যতিজীবনকে মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু বিমলের ব্যাপার তত সুবিধার হইল না। মেদিনীপুরে এক গৃহপরিচারিকার পুত্র 'বিমলদা সাহেবকে মারিয়া পলাইয়া গিয়াছে' বলিয়া পুলিশকে সাক্ষ্য দেওয়ায় বিমলের পিতৃগৃহে পুলিশ খানাতল্লাশি করিয়াছিল। পরে সেই

গুজবও স্তিমিত হইয়া আসিল দেখিয়া হাওয়া বুঝিবার জন্য বিভি-দলের অন্যতম নেতা রসময় শূর বিমলকে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিজয় দাশগুপ্তের সহিত কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরে প্রেরণ করেন। গৃহে পদার্পণ করিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিমলের বাড়িতে কোতওয়ালি থানা হইতে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার পিতা কবিরাজ অক্ষয় দাশগুপ্ত বিমলকে লুকাইয়া রাখিয়া বিজয়কে দেখাইয়া বলেন যে, বিমল নহে, তাঁহার কলিকাতায় পাঠনিরত জ্যেষ্ঠপুত্রটি এইমাত্র বাড়ি আসিয়াছে। ইহার পর বিমলকে আর মেদিনীপুরে রাখা সুবিধার নহে। পরদিন প্রাতে স্থানীয় বিহারী গোয়ালা রঘুনন্দন গোপের সহিত গোয়ালার পুত্র সাজিয়া দুধের ড্রাম সমেত বিমল কলিকাতাগামী ট্রেনে আসিয়া উঠিলেন।

এই দ্বিতীয়বার আত্মগোপনার্থে কলিকাতায় আসিয়া বিমল মেটিয়াবুরুজে রাজেন্দ্রকুমার গুহের গৃহে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেই গৃহ তখন নিরাপদ নয়, চতুর্দিকে ওয়াচার ঘুরিয়া ফিরিতেছে, বিমলকৃষ্ণের মাথার দাম সেকালের মূল্যে আড়াই হাজার টাকা ঘোষিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে দলীয় নির্দেশানুযায়ী প্রথমে ধানবাদ এবং পরে লোধনার ঝরিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এদিকে পেডি-হত্যার ঠিক বিরানব্বই দিনের মাথায় উনিশশো একত্রিশের আটই জুলাই রাইটার্স-কাণ্ডে সিম্পসন-নিধনের প্রত্যক্ষ নায়ক বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইয়া গেল। ডেইলি অ্যাডভান্স সংবাদপত্র লিখিল—'ডন্টলেস দীনেশ ডাইজ অ্যাট ডন'। বিমলের স্বপ্ন পূরণ হইল; আত্মাহুতির পূর্বেই বিমলের দীনেশদা তাঁহার সঙ্কল্পিত পেডি-হত্যার সংবাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু যে ট্রাইবুনালের কূটচক্রী সভাপতি মি র‍্যালফ রেনল্ডস গার্লিক দীনেশকে ফাঁসির আদেশ শুনাইয়াছিল, সেই গার্লিকের সহিত শেষ হিসাব কষিবে কে?

তাহাও হইল। দীনেশের আত্মাহুতির উনিশ দিন বাদে আলিপুরের চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন কোর্টের প্রকাশ্য এজলাসে বিপ্লবী কানাই ভট্টাচার্য জজসাহেব গার্লিকের বাকি জমা-খরচ-হিসাব নিঃশেষে মিটাইয়া দিলেন। একটি গুলি গার্লিকের ললাট, বাকি দুইটি গুলি উদর বিদ্ধ করিল। হাসপাতালে লইয়া যাওয়া মাত্রই গার্লিককে মৃত ঘোষণা করা হয়। অ্যাকশনে পুলিশের গুলিতে কানাইয়েরও মৃত্যু হয়। তাঁহার শার্টের পকেট হইতে চিরকুট পাওয়া গেল: 'ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও। ইতি—বিমল গুপ্ত।'

কানাই নিজের নামে দস্তখত করেন নাই, সুকৌশলে বিমলের নাম লিখিয়া আসল বিমল দাশগুপ্তের উপর হইতে পুলিশের নজর ঘুরাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে বিমল কিয়দ্দিন নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কানাই 'দাশগুপ্ত'-এর স্থলে ভুলবশত 'গুপ্ত' লিখিয়াছিলেন। বিমলের পিতামাতাও নিহত কানাইয়ের ছবি দেখিয়া 'এ ব্যক্তি

আমাদের পুত্র বিমল নহে' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলত, বিমলের পক্ষে নিশ্চিন্ত হইবার কাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। আর বিমলও যে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে আর বসিয়া থাকিতে চাহিতেছিলেন, তাহা নহে। পরবর্তী অ্যাকশনের জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। অবশেষে ডাক আসিল। য়ুরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অত্যাচারী ভিলিয়ার্সের ভবলীলা সাঙ্গ করিবার ভার বিমলের উপর পড়িল। দিনক্ষণ, রণক্ষেত্র সকলই স্থির হইল। স্থান—৮নং, ক্লাইভ স্ট্রিট, গিলেন্ডার হাউস। তারিখ—২৯শে অক্টোবর, ১৯৩১। সময়—সকাল এগারোটা।"

গিলেন্ডার হাউসের তিনতলার টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঢোলা সাদা জামা-পাজামা, মাথায় মেরুন রঙের ফেজটুপি পরা একজন মুসলমান ব্যবসায়ী ধীরেসুস্থে পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা সিগারেট ধরালেন। মুসলমানি রীতি অনুযায়ী তাঁর দাড়িটি বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো, গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। হাতে একটা চামড়ার অফিস ব্যাগ। ভদ্রলোককে দেখে মনে হয়, কোনো ব্যবসার প্রয়োজনে এখানে এসেছেন।

সকাল সোয়া এগারোটার মতো হবে সময়। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তারই অনতিদূরে ই ভিলিয়ার্সের অফিসঘর। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরের মধ্যে ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জরুরি মিটিং চলছে। মানে, সেরকমই চলার কথা। মিটিং-এ সদ্য সংগঠিত 'রয়ালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর তিনজন কর্তা-ব্যক্তি ডি ডাব্লু মুলক, এ আর এলিয়েট লকহার্ট ও ম্যাকল্যাকলেন-এরও উপস্থিত থাকার কথা। কী নিয়ে আলোচনা হতে পারে, অর্থাৎ মিটিং-এর আজকের প্রধান অ্যাজেন্ডা কী, তাও মাখন গোপন সূত্রে জেনে এসেছে। সে ভালোমতো হোম-ওয়ার্ক না করে কাজে নামে না। ওদের আজকের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু: 'ভারতীয় বিপ্লবীদের দমননীতি'।

মুসলমানি পোশাকে অণুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না মাখনের। শুধু সাধের গোঁফটি কামিয়ে ফেলায় যদিও একটা সামান্য অস্বস্তি হচ্ছে; তবে সে তেমন কিছু নয়। ছদ্মবেশ এত নিখুঁত হয়েছে যে, চিড়িয়াখানার সামনে অপেক্ষারত বিনয় সেনগুপ্ত তাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেননি। একেবারে এগিয়ে গিয়ে মাখন যতক্ষণ না মৃদু স্বরে বলেছে, 'সর্বাদা, আমি বিমল', ততক্ষণ অবধি বিনয় সেনগুপ্ত তার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়েছিলেন। তারপর চিনতে পেরে বিনয় সেনগুপ্তের সে কী হাসি। খালি বলছেন, 'ইশ্, আমি ভাবছি কোনো রইস মুসলমান। ওহ্, বিমল। তুই যে এত বড়ো ছুপা রুস্তম, আমি তা কেমন করে বুঝব বল, ভাই।'

মাখনের সঙ্গে বিভি-র আরও দুজন সদস্যের যোগ দেওয়ার কথা ছিল। অথচ মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করার পরেও ওই দুজনের দেখা নেই। শেষে অধৈর্য হয়ে মাখন বলল, 'সর্বাদা! ওদের হলটা কী? অ্যাকশনের সময় পিছিয়ে যাবে যে।'

বিনয় সেনগুপ্ত হাতঘড়িতে চোখ রেখে চিন্তিত স্বরে বললেন, 'তাই তো রে। ব্যাপার গুরুচরণ। কী করি বল দেখি? তুই পারবি একা সব দিক সামলাতে? ভালো করে ভেবে বল।'

মাখন মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিন্তা করবেন না। আমার দু-তিন মিনিট লাগবে অপারেশন শেষ করতে। ট্যাক্সি ডাকুন।'

ট্যাক্সিতে উঠে বিনয় সেনগুপ্ত সাবধানে মাখনের ঢোলা ঢোলা মুসলমানি জামার বাঁ-পকেটে একটা অটোমেটিক রিভলভার ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'তিনজনের কাজ একাই সামলাবি, মাখন! তাহলে এটাও থাক না হয় তোর কাছে।'

লিফট দিয়ে উঠে বিনয় সেনগুপ্ত মুসলমানি বেশধারী মাখনকে ভিলিয়ার্সের কামরার সামনে অবধি পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'গুড লাক!' তারপরই লিফট দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

আপাতত বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে দিতে মাখন নীচে যাওয়ার সিঁড়িটা দেখে নিল। এটাই তার এসকেপ রুট হবে। পালানোর সময় লিফটে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। লিফট পাবেই না হয়তো। ভয়ংকর বেগে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে যেতে হবে।

ডান পকেটটা চেক করল সে একবার সন্তর্পণে। দীনেশদার সেই ওয়েব্‌লে ৩৮০ বোরের লাকি রিভলভার, যা দিয়ে এর আগে পেডিকে খতম করেছে। বাঁ-পকেটে সর্বাদার দেওয়া অটোমেটিক রিভলভারটা। দুটোই লোডেড আছে। তবে অটোমেটিকটা দরকার হবে না, মনে হয়। দীনেশদার রিভলভারটাই ভিলিয়ার্সের খেলা সাঙ্গ করার পক্ষে যথেষ্ট।

এছাড়া পকেটের মধ্যে সায়ানাইডের সেই বিরক্তিকর অ্যাম্পুলটা। ওটা ব্যবহার করার কোনো ইচ্ছে মাখনের নেই। সে মরতে চায় না, অত্যাচারীকে নিকেশ করে সে বেঁচে থাকতে চায়। তার কাছে জীবন মধুময়!

আরও একটা জিনিস পকেটে খড়খড় করছে। একটা কাগজ। ওটাও কাজে লাগবে না। হ্যাঃ!

লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে মাখন ভাবছিল, কী করেনি এই ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন? এটা আসলে একটা বণিক-সভা। প্রত্যেকটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পেছনে একটা বিরাট টাকার খেলা থাকে। ক্ষমতার পেছনে বিত্তের পরামর্শ। এখন এদের ব্যবসাতে টান পড়েছে। বিলিতি মাল কেউ কিনছে না। দেশ জুড়ে স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ফলত ব্রিটিশ সরকারকে এরা প্রতিশ্রুতিমতো টাকা জোগান দিতে পারছে না। ব্রিটিশ শক্তি নামেই প্রশাসন। আসলে সেই প্রশাসন তো এই ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের হাতের পুতুল। আগুনের তেজে বেগুন লাফায়। খামোখা দু-একটা ব্রিটিশ সিভিলিয়ান মেরে কী হবে? তারা তো ক্ষমতার পুতুল। কিন্তু

সেসব পুতুল নাচছে যে-পুতুলনাচের কারিগরের আঙুলের টানে, ধ্বংস করে দিতে হবে সেই বিত্তবান বাণিজ্যিক শক্তির উৎসমূলটিকেই।

খড়গপুরে হিজলির বন্দীশালায় নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের ওপর কুড়ি রাউন্ড গুলি চালিয়ে মেরে ফেলা হল সন্তোষ মিত্র আর তারকেশ্বর সেনগুপ্তকে, পঁচিশজন 'ডেটিনিউ' গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, একশো সত্তর জন রাজবন্দী অনশনে বসেছেন, মৃত দুই বিপ্লবীভ্রাতার সৎকার সেরে মানুষের উত্তাল প্রতিবাদকে জ্বলন্ত রূপ দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। রবীন্দ্রনাথও কবিতা লিখে ফেলেছেন প্রতিবাদে। পরিশীলিত ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছেন তাঁর ঋষিকবি-সুলভ সুললিত কণ্ঠে। অথচ বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতেই কেঁদে গেছে! সরকারি তদন্ত করে ব্রিটিশ রায় দিয়েছে, দোষটা ছিল রাজবন্দীদের। পুলিশের কোনো দোষ নেই। তারা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে গুলি চালিয়েছে মাত্র। চমৎকার!

আর এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে, 'এক একটি ব্রিটিশের প্রাণের বিনিময়ে এক একজন বিপ্লবীকে জেল থেকে বের করে এনে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে মেরে ফেলা হোক!' স্টেটসম্যানে বেরিয়েছেও সেই বিবৃতি।

না, ভিলিয়ার্স! নির্মম অত্যাচারের প্ররোচনাদাতা তুমিই সেই রাঘববোয়াল, পৃথিবীর বাতাসে যার শ্বাস নেওয়ার আর কোনো অধিকার নেই। এবং তোমার মৃত্যুও হবে নির্মম। বাকিরা বক্তৃতা করুক, আলাপ-আলোচনা করে নীতিনির্ধারণ করুক, দরকার হলে আরও একবার লর্ড আরউইনের সঙ্গে মিটিং-এ বসে সমঝোতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করুক, কিন্তু আমি বিমল দাশগুপ্ত। আমার হিসেব খুব সোজা। ভিলিয়ার্সকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের পশ্চাদ্‌বর্তী এই বণিক-সভার মুনাফাযন্ত্রে আমি যথাসাধ্য পদাঘাত করে যাব।

একজন চাপরাশি ভিলিয়ার্সের কামরার বন্ধ দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। হাতের খালি চামড়ার ব্যাগটা দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে অমনই চাপরাশিকে ধাক্কা মেরে সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল মাখন। মিটিং চলছে বেশ জমিয়ে। তবে আলোচনা বোধহয় শেষের পথে। সেক্রেটারিয়েট টেবলের চারিদিকে বসে আছে সাহেবসুবোরা, কেন্দ্রে মধ্যমণি ভিলিয়ার্স। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মিটিং-এর মিনিটস লিখছে। ডানদিকে পিএ বাবু শকুনির মতো ঘাড় উঁচিয়ে সাহেবের লেখা অনুসরণ করছে, এক্ষুনি টাইপ করতে হবে তো তাকে।

দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে দেখল ভিলিয়ার্স। একজন মুসলমান লোক। ভুরু কুঁচকে গেল। উইদাউট এনি পারমিশন একে এখানে ঢুকতে দিল কেন চাপরাশি? রুক্ষ স্বরে বলে উঠল ভিলিয়ার্স, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

উত্তরে তিনটি বুলেট সগর্জনে ধেয়ে এল ভিলিয়ার্সের দিকে। 'মাই গড।' বলে বড়ো টেবিলটার তলায় ঢুকে আত্মগোপন করল বীরপুঙ্গব। কিন্তু তার আগেই ভিলিয়ার্সের পিঠে গুলি লেগেছে। মুলক-সাহেব কাঁপতে কাঁপতে ভিলিয়ার্সকে অনুসরণ করল টেবিলের নীচে ঢুকে গিয়ে। লকহার্ট ছুটে গেল দরজার পাল্লার আড়ালে। মাখন ভাবল, গেলি তো গেলি, দরজাটা আড়াল করলি কেন? বেরোবো কীভাবে?

পাশের ঘরে দৌড়ে গিয়ে ঢুকল মাখন। ম্যাকল্যাকলেন একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মারল মাখনের দিকে। মাথা থেকে ছিটকে পড়ল ফেজ-টুপি। মাখন দেখল, আর উপায় নেই। পালানো সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়ই যখন, তখন এসো, মৃত্যু! জীবনকে ভালোবাসি আমি, কিন্তু তোমাকে তো ভয় পাই না। মুহূর্তে ফেলে আসা জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি দ্রুতঘূর্ণিত চিত্ররাশির মতো ভেসে এল মনে। কাঁসাই নদী... মেদিনীপুর শহর... কলেজের লাইব্রেরি রুম... মায়ের মুখ... সন্ধ্যাপ্রদীপের স্তিমিত আলোক...

পটাশিয়াম সায়ানাইডের অ্যাম্পুল বের করতে গেল মাখন পকেট থেকে। কিন্তু না, সেই সুযোগও সে আর পেল না। সবাই মিলে পাশব উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাখনের ওপর।

"বিমলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত (মাখন) ধরা পড়িলেন। লালবাজারে টানিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় বাহির করিতে পুলিশের বিলম্ব হইল না। দুই অ্যাম্পুল সায়ানাইড ও দুইটি রিভলভার ছাড়া 'বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারের মূল্য দাও'-লেখা একটি কাগজের টুকরা তাঁহার নিকট পাওয়া গেল। আরম্ভ হইল পুলিশ হেফাজতে অমানবিক অত্যাচার। সবুট লাথি, ব্যাটনের মার, দন্ত-উৎপাটন, প্রতি আঙুলের নখে বড়ো বড়ো ছুঁচ ঢোকানো, বাঁশ-ডলা, শরীরের অভ্যন্তরে লঙ্কাবাটা প্রবেশ করানো—মানুষ মানুষকে নিপীড়ন করিবার যতগুলি পৈশাচিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার সবগুলিই এক এক করিয়া প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু বিমলের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির করা গেল না। অবশেষে আসামী মরিয়া যাইবে এই ভয়ে চিকিৎসা করা হইল। তাহার পর আবার থার্ড ডিগ্রি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যুবকের অপরিসীম সহ্যশক্তি দেখিয়া অত্যাচারী পুলিশ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বিচার আরম্ভ হইল। স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া অকুতোভয় বিমল বুক টান করিয়া বলিলেন, 'the savage repression in Midnapore, Chittagong and Hijli camp was always instigated by the European Association. So I came to settle the account with its President.'

বিমলের দ্বারা ব্যবহৃত সেই দুইটি রিভলভার কোর্টে বিচারকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইল। একটি ৩৮০ বোরের ওয়েব্‌লি রিভলভার, অন্যটি অটোমেটিক। ভিলিয়ার্স

মরে নাই, রিভলভারের গুলিতে মারাত্মক আহত হইয়াছে মাত্র। ইহাতে বিমলের খেদ হইতেছিল, লোকটা মরিল না কেন? তদুপরি, আরও খেদ এই কারণে যে, প্রফুল্লকুমার দত্তকে সে কথা দিয়াছিল, অ্যাকশন শেষে দীনেশদার প্রিয় ওয়েব্‌লি রিভলভারটি সে যতীশ গুহের নিকট ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু সেই কথা সে রাখিতে পারে নাই। ওয়েব্‌লি রিভলভারটি পুলিশ হেফাজতে গিয়াছে। বিচারকালে আনীত ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলের উপর শায়িত দীনেশ গুপ্তের সেই ওয়েব্‌লি রিভলভারটির দিকে বিমল অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী শরৎচন্দ্র বসুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিমলের শাস্তি লঘু হইল। দশ বৎসরের সশ্রম কারাবাস নির্ধারিত হইল। কিন্তু ভিলিয়ার্স-মামলা মিটিতে না মিটিতেই পেডিহত্যার মামলা রুজু করা হইল। দিনের পর দিন কোর্টে মামলা চলিতে লাগিল।"

* * *

সারাদিন কোর্ট-কাছারির ঝামেলার পর নিজের চেম্বারে রাত্রে একটু জিরোবার অবসর পান নগেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু একে কি ঠিক জিরোনোই বলে? তিনি ব্রিটিশ সরকার-পক্ষের অ্যাডভোকেট জেনারেল মিস্টার এন এন সরকার বলে কথা। রাত্রিটুকুই তাঁর নিজেকে পরের দিনের জন্য তৈরি করে নেওয়ার অবসর। চেম্বার-রুমে পেটমোটা বইঠাসা সারি সারি আলমারিগুলোর মধ্যে বিশাল টেবিলে রিডিং ল্যাম্প জ্বেলে প্রায় সারারাত ধরেই আইনের ফাঁকফোকরগুলো খুঁজে বের করতে হয়। ঘুমোনোর সুযোগ পান একটু শেষ রাতে।

বুঝতে পারেন, বুড়ো হয়ে গেছেন নগেন্দ্রনারায়ণ। সারা জীবন ধরে পড়াশোনা, প্রভূত পরিশ্রম করে কেরিয়ারের তুঙ্গবিন্দুতে এসে পৌঁছেছেন তিনি। স্ত্রী বিনতা মারা গেছেন বছর ছয়েক হল, ছেলে আইনি-পেশাতেই গিয়েছে, থাকে সে মুম্বাইয়ে। কলকাতার এই বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িতে পরিচারক-পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে তিনি একাই আছেন। তবে এই রাতটুকুই যা বাড়িতে থাকেন, বাকি সারাদিন বাইরে বাইরেই নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে কেটে যায়।

দিন দিন কাজকর্ম বড়ো জটিল হয়ে উঠছে। লিগাল প্রফেশন চিরকালই নেফ্যারিয়াস জব, সেকথা তাঁর থেকে আর ভালো করে কে জানে? কিন্তু কথা সেটা নয়। তিনি সরকার-পক্ষের অ্যাডভোকেট জেনারেল। দিনের পর দিন আজকাল ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ওপর এত বর্বর অত্যাচার করে চলেছে যে, তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সশস্ত্র আন্দোলনের চরিত্রও হয়ে উঠছে ক্রমশ আরও আরও ভয়ানক। বিপ্লবীদের হাতে গুলি খেয়ে মরছে শাসকদল। বিপ্লবীরাও মরছে পুলিশের গুলিতে। এখন নগেন্দ্রনারায়ণের কাজ হল সরকারের পক্ষে কথা বলা। এই করে করে তাঁর

মাথার সবগুলো চুল সাদা হয়ে গেল, কিন্তু রিসেন্টলি যা হচ্ছে, তা সামাল দিতে নগেন্দ্রনারায়ণের মতো ধুরন্ধর কৌঁসুলিকেও রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে।

অন্যদিকে ক্রমাগত এই বিবেকের দংশন। তিনি ভারতীয়; কিন্তু ভারতীয় হয়েও ভারতীয়দেরই সর্বনাশের ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকে। আত্মনিপীড়নের থেকে বড়ো শাস্তি কিছু আর আছে? বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো চোখের সামনে মার খাচ্ছে, ফাঁসিতে প্রাণ দিচ্ছে, আন্দামানে পচছে দিনের পর দিন। আর তিনি? তিনি এই অত্যাচারী প্রশাসকদেরই নির্লজ্জভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতে ভাবতে আইনের বইগুলোর নিষ্প্রাণ পাতা থেকে ক্লান্ত, বিনিদ্র চোখ তুলে তিনি বড়ো টেবল ল্যাম্পটার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

বিমলের কথাটাই ধরা যাক। দু-দুখানা কেস ঝুলছে তার মাথার ওপর। একটা—অ্যাটেম্পট টু মার্ডার—ভিলিয়ার্স কেস। দ্বিতীয়টা সরাসরি মার্ডার চার্জ—পেডি কেস। এদিকে নিজেকে ডিফেন্ড করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না বিমল। কিছুই বলছে না। কাঠগড়ায় চুপ করে আছে। এরা যে কী ধাতু দিয়ে তৈরি, কে জানে!

ভিলিয়ার্স-কেসটা মোটামুটি সুকৌশলে ম্যানেজ করে দিতে পেরেছেন নগেন্দ্রনারায়ণ। করতেন না, এমনিতেই বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর এক্সট্রা-সিমপ্যাথির খবর ইতিমধ্যেই ওপরওয়ালাদের কানে পৌঁছে গেছে। কাজেই নগেন্দ্রনারায়ণকে সাবধান হতেই হয়। এই বয়সে কেরিয়ারে জলাঞ্জলি দেওয়ার ইচ্ছে নেই তাঁর।

কিন্তু শরতের অনুরোধে নরম হতেই হল তাঁকে। শরৎচন্দ্র বোস। শরৎ একদিকে যেমন তাঁর দুর সম্পর্কের আত্মীয়, অন্যদিকে আবার ব্যারিস্টারি জীবনের প্রারম্ভে শরৎ তাঁর জুনিয়র হিসেবে জয়েন করে। শরতকে তিনি নিজের ছেলের থেকেও বেশি ভালোবাসেন। তাঁর নিজের ছেলে শচীন্দ্রনারায়ণ ছোটোবেলায় অসৎ-সঙ্গে মিশে গোল্লায় যেতে বসেছিল। এমন অবস্থা হয়েছিল, দুষ্টচক্রের পাকে পড়ে হয়তো মরেই যেত শচীন। শরৎ-ই তাকে সেই অন্ধকার আবর্ত থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দেয়। প্রাণরক্ষা হয় ছেলের। শরতের কাছে তাঁর যে কী অসীম ঋণ! শরতের মুখের কথা তাই তিনি কোনো অবস্থাতেই ফেলতে পারেন না।

শরৎ এমনভাবে এসে ধরে বসল, 'না' বলা গেল না। সুবিধে ছিল, ভিলিয়ার্স মরেনি বলে। কিন্তু সে না মরলেও ব্রিটিশ সরকারের মতলব ছিল বিমলকে ফাঁসিতে ঝোলানোর। সেইখানেই একটু কাঠখড় পোড়াতে হল নগেন্দ্রনারায়ণকে। খুনই যখন হয়নি, তখন চরম শাস্তি তোমরা দাও কী করে? খুনের চেষ্টা—সেও অপরাধ, তবে তার শাস্তি প্রাণদণ্ডের থেকে লঘুতর হতেই পারে। দশ বছরের জেল হয়েছে বিমলের। এইটুকুই যা হোক করা গেছে। প্রাণটা বাঁচানো গেছে বিমলের।

কিন্তু এবার তো পেডি-হত্যার চার্জ। চার্জ বললেই তো হল না, সাক্ষী-সাবুদ এনে

প্রমাণ করতে হবে। তা সাক্ষী ইতিমধ্যেই জুটিয়ে এনেছে সরকার বাহাদুর। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে রাজসাক্ষী করে নিয়ে আসছে সুশীল দাসকে। সে নাকি অ্যাকশনের সময় বিমলকে দেখেছে। আর নিয়ে আসছে কাঙাল দাস পাঠককে। সে লোকটা বিমলকে নাকি দেখেছে সুন্দরচটিতে আরও একটি ছেলের সঙ্গে ঘটনার রাত্রে হেডলাইটভাঙা সাইকেলে চড়ে মেদিনীপুরের দিক থেকে আসতে। এই কাঙাল আবার গোদাপিয়াশালের মাতব্বর লোক। আরও দুচারজন রাজসাক্ষী ঠিকই জুটে যাবে। যদি তারা বিমলকে আইডেন্টিফাই করে, তাহলে ওকে বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে। বিমলের পক্ষে লড়ছে বি সি চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জি যদিও দুঁদে উকিল, তবুও অবস্থাগতিক দেখে শরৎ বোস তো এবার একেবারে ব্যোমকে গেছে।

কিন্তু এতটা বিচলিত হওয়ার দরকার আছে কি? নাহ্, নগেন্দ্রনারায়ণ তা মনে করেন না। শরৎ কেন এত বিচলিত হয়েছে, তিনি অনুমান করতে পারেন। আসলে শরতের কাছে বেশ কিছু ইনফরমেশন নেই, যা নগেন্দ্রনারায়ণের কাছে এসে পৌঁছেছে। খোচড় তো তাঁকেও পুষতে হয়। সব তথ্য জানার পর, নগেন্দ্রনারায়ণের মনে হয়, সরকারের দিক থেকে এই মামলার প্রসপেক্ট নিল। বিমলের বিরুদ্ধে পেডি-মার্ডার-চার্জ প্রমাণ করাই যাবে না।

শরৎ যদি শুধু তার গুণধর ভাইটির কীর্তিকলাপের সব খবরাখবর পেত, তাহলে বোধ করি এতটা ঘাবড়ে যেত না। শরতের ভাই সুভাষ। এ বছরের এপ্রিলের মাঝবরাবর অবধি সে কলকাতার মেয়র ছিল। সুভাষ বোস। একটা এনিগমা-ই বটে! দুর্লভ আইসিএসের চাকরিতে লাথি মেরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। ওর একেবারে একটা স্বতন্ত্র স্বর আছে কংগ্রেসের মধ্যে। পার্টির অন্য নেতাদের সঙ্গে মিশ খায় না, প্রতি পদে মতবিরোধ হয়। এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স তো জন্মেছেই সেই উনিশশো আটাশের কলকাতা কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন থেকে, যখন সুভাষ সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়েছিল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মতিলাল নেহরুকে তার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে। সেই অর্থে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সুভাষের ব্রেন-চাইল্ড বলাই যায়।

যখনই নগেন্দ্রনারায়ণ সুভাষকে দেখেছেন, তখনই অবাক হয়েছেন বই-কি! কত ভালো কেরিয়ার গড়তে পারত সুভাষ, তা না করে উলটে সে এখন ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদেরই ত্রাসে পরিণত হচ্ছে দিনকে দিন। মুখচোখ দেখে বোঝারই উপায় নেই, ওর ভেতরে কী চলছে। বাইরেটা যেন কত শান্ত, প্রায় সাধুসন্তদের মতো মুখচোখ। খুবই গম্ভীর। এ ধরনের মানুষের ফিজিয়োনমি দেখে তার ভেতরের মনের খবর পাওয়া দুষ্কর। সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ব শরতের এই ভাইটির। এত প্রবীণ মানুষ নগেন্দ্রনারায়ণ, এত সফল তিনি তাঁর পেশায়, তবু সুভাষের সঙ্গে কথা বলার সময়

কেমন যেন সিঁটিয়ে যান ভেতরে ভেতরে, কেমন যেন মরমে মরে যান তিনি। ভেতর থেকে একটা হাহাকার উঠে আসে তাঁর নিজের জীবনযাত্রার প্রতি।

এখন শরৎ জানে না, তলে তলে সুভাষ কী করে চলেছে। প্রথমত, বিমলকে ডিফেন্ড করার জন্য বি সি চ্যাটার্জিকে সুভাষই নিয়োগ করেছে। তারপর খুঁজে খুঁজে বের করেছে, বিমলের বিরুদ্ধে প্রধান রাজসাক্ষী সুশীল দাসের বাবা নাড়াজোলের রাজকাছারির কর্মচারী। নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খান সুভাষের বিশেষ অনুরাগী। এখন সুভাষ নাড়াজোলের রাজাকে দিয়ে সুশীলের বাবাকে বলিয়েছে, সুশীল রাজসাক্ষী হলে কাছারিতে সুশীলের বাবার চাকরি নট হয়ে যাবে। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের পিতা হওয়ার অভিসম্পাত।

তাতেও থামেনি সুভাষ। দেবেন্দ্রলাল খানকে দিয়ে প্রচুর টাকা ঢালিয়েছে রাজসাক্ষীদের মুখ বন্ধ করার জন্য। আবার সুভাষের নির্দেশেই বিভি-র মেদিনীপুর শাখার ছেলেরা রাজসাক্ষীদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলছে, বিমলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া মানে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার যখন এতই দুর্বল যে একটা ডিএম-কে প্রোটেকশন দিতে পারছে না, তখন বিমলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার পর রাজসাক্ষীদের প্রোটেকশন দিতে পারবে তো? জানে বাঁচবি তো তোরা কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে?

তার মানে একদিকে অর্থলোভ, অন্যদিকে রাজসাক্ষী হওয়ার প্রতি ঘৃণা এবং মরণের অনিবার্য ভয় চারিয়ে দিতে পেরেছে সুভাষ রাজসাক্ষীদের মনে। তার মানে, মানুষের অবচেতন মনে ঘুমিয়ে থাকা এই তিন আদিম প্রবণতা—লোভ, আত্মঘৃণা আর ভয়কে জাগিয়ে তুলে মোড় ফিরিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভয়াবহ প্রতিরোধ তৈরি করছে সে। যেনতেনপ্রকারেণ উদ্দেশ্যসিদ্ধিই তার লক্ষ্য। এ লোককে তো সমঝে চলতেই হয়!

ফলত, শেষ অবধি সরকার-পক্ষের কোনো সাক্ষীই দাঁড়াবে না বলেই নগেন্দ্রনারায়ণের মনে হয়। বিমলের এগেইন্সটেও কোনো মার্ডার-চার্জ প্রমাণ করা যাবে না। সেকথা তিনি শরৎকে বলেওছেন। কিন্তু শরৎ তা বিশ্বাস করতে পারেনি। কেন রাজসাক্ষ্য দাঁড়াবে না, সেই হেতুটি তো আর বলেননি তিনি শরৎকে। হেতুটি শরতের ঘরেই আছে।

যাই হোক, নগেন্দ্রনারায়ণের কথায় কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেছে শরৎ। কিন্তু যাওয়ার আগে আবার একটি আবদার করে বসেছে। আসলে নগেন্দ্রনারায়ণ শরৎকে খুবই স্নেহ করেন। আর শরৎ সেটা জানেও। তা না হলে আর এমন অবাস্তব আবদার করে বসত?

কথাটা শুনে আক্ষরিক অর্থেই চমকে উঠেছিলেন নগেন্দ্রনারায়ণ। বলে কী শরৎ? এ যে অসম্ভব!

যে-রিভলভারটা দিয়ে বিমল পেডিকে মার্ডার করেছিল সাব্যস্ত করা যায়নি, সেটা দিয়ে সে ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করে, সেই ৩৮০ বোরের ওয়েবলি রিভলভারটি শরতের চাই। পুলিশ কাস্টডি থেকে সেটা বের করে আনতে হবে। যেটা আসলে দীনেশ গুপ্তের রিভলভার। ওটি বিপ্লবীদের অ্যাসেট। সোজা কাজ।

এ জিনিস করা খুব বিপজ্জনক। চাকরি তো যাবেই, জেলটাও হবে। অনেক ভেবেছিলেন এ নিয়ে নগেন্দ্রনারায়ণ।

শেষে এক পুরোনো পাপীর সঙ্গে তাঁর দেখা। তাঁরই মতন ব্রিটিশের চাকরি করার অনুতাপের জ্বালা মফিজের। মফিজুদ্দিন আহমেদ। পুলিশের অপরাধমহলেই আছে সে। সব শুনে বলল, 'করা যাবে সরকারসাব। আপনি যত অসম্ভব ভাবছেন, তত অসম্ভব পুলিশের পক্ষে কিছুই নয়।'

কোত্থেকে আরেকটা ৩৮০ বোরের ওয়েবলি রিভলভার জুটিয়েছে মফিজ। সেটা দিয়ে বিমলের বা দীনেশ গুপ্তের রিভলভারটা রিপ্লেস করেছে পুলিশের রেকর্ড-রুমে। দীনেশের রিভলভারটার সঙ্গে আরও একটা কালো রঙের বাক্সও দিয়ে গেছে মফিজুদ্দিন। সেই বাক্সটার ভেতর কী আছে, শুনেই আঁতকে উঠেছেন নগেন্দ্রনারায়ণ। অনেক অনেক দিন আগে শরৎ চেয়েছিল ওটাও। বলেছিল, 'কত বড়ো জাতীয়-অসম্মান একবার ভেবে দেখুন, স্যার, এ জিনিসটি পুলিশের রেকর্ড রুমে পড়ে থাকলে।' জিনিসটার কথা নগেন্দ্রনারায়ণ বহু বছর আগে বলেছিলেন মফিজকে। ভুলেই গিয়েছিলেন এতদিনে তিনি। মফিজ ঠিক মনে রেখেছে।

রিভলভার আর সেই কালো কাগজে মোড়া বাক্সটা একটা অ্যাটাচির মধ্যে ভরে দেওয়াল আলমারির পেছন দিকের লুকোনো চেম্বারে রেখেছেন নগেন্দ্রনারায়ণ। শরতের কথা অনুযায়ী, আজ শেষ রাত্রেই কেউ আসবে তাঁর কাছে অ্যাটাচিটা নিতে।

সন্ধে থেকে ওই জন্যেই আজ ভৃত্যদের মায় দারোয়ানকেও ছুটি দিয়ে দিয়েছেন নগেন্দ্রনারায়ণ। সবাই যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছে। গেটের চাবি তাঁর ড্রেসিং গাউনের ঢোলা পকেটে। রাত জেগে বসে আছেন তাঁর এই একতলার চেম্বারে। সে অবশ্য প্রায় প্রতিদিনই থাকেন।

কিন্তু সেই লোক আসছে কই? গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে শীতের রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে ঢং ঢং করে রাত্রি দুটো বাজল। কারও কোথাও দেখা নেই। কেমন একটা বেশি বেশি শীত-শীত করছে আজ নগেন্দ্রনারায়ণের। তাঁর ঘরের কাচের জানালা দিয়ে বাড়ির সামনের স্বল্পালোকিত বাগানটা দেখা যায়। বাগান পেরিয়ে বড়ো গেট। গেটের ওপারে রাস্তা। স্ট্রিট লাইটের আলোতে গেটের মাথাটা হালকা আভায় আভায়িত হয়ে আছে। শরৎ কিছু বলেনি, কীভাবে তার লোক আসবে বাড়ির সামনে। শুধু বলেছিল, 'চোখ-কান খোলা রাখবেন।'

কিন্তু কোথায় কে? ধীরে ধীরে রাত্রি আড়াইটে বাজল, এরপর তো ভোর হয়ে যাবে। গেটের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে তন্দ্রা নেমে আসছিল নগেন্দ্রনারায়ণের। টেবিলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নেবেন?

টিন-ঠিন্, টিন-ঠিন্। হঠাৎ কী একটা আওয়াজে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। তীক্ষ্ণ চোখে জানালা দিয়ে গেটের দিকে তাকালেন। যেন ধাতব কোনো শব্দ। ঠিক যেন লোহার কোনো কিছুর ওপর আরেকটা লোহার দণ্ড দিয়ে কেউ মৃদু আঘাত করছে...

আলমারি খুলে লুকোনো চেম্বার থেকে অ্যাটাচিটা বের করে ঘরের দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন নগেন্দ্রনারায়ণ। চুপিসাড়ে পায়ে পায়ে বাগানের ভেতরের শান-বাঁধানো রাস্তাটা অতিক্রম করলেন। গেটের পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, একটা কালো রঙের টাঙা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই বাড়ির সামনে।

তালা খুললেন গেটের। সন্তর্পণে পাল্লা সরালেন, যাতে শব্দ না হয়। তাঁকে গেট খুলতে দেখেই টাঙার দরজাও খুলে গেল। টাঙা থেকে ঝুপ করে নামল একটা লোক। স্ট্রিট লাইটের অল্প আলোয় সেই লোকটাকে দেখে সত্যিই এবার রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন নগেন্দ্রনারায়ণ।

পুরুষ নয়, পা থেকে মাথা অবধি কালো বোরখা পরা একজন মুসলমান রমণী। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে সোজা নগেন্দ্রনারায়ণের সামনে এসে সে দাঁড়াল। বোরখা পরে থাকায় আগন্তুকের মুখচোখ কিছুই নগেন্দ্রনারায়ণ দেখতে পাচ্ছেন না।

চাপা, সতর্ক অথচ কঠোর স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাসওয়ার্ড?'

সেই রহস্যময়ী মুসলমান রমণী অকম্পিত স্বরে উত্তর দিল, 'রত্নরক্ষক!'

হ্যাঁ, এই সংকেতশব্দই আগন্তুক বলবে বলে জানিয়েছিল বটে শরৎ! হাতের অ্যাটাচিটা মহিলার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন নগেন্দ্রনারায়ণ।

কবজি অবধি বোরখার হাতায় ঢাকা হাতখানা বাড়িয়ে দিল আগন্তুক অ্যাটাচিটার দিকে। পথবাতির আলোয় নগেন্দ্রনারায়ণ দেখলেন, বোরখার আবরণ থেকে বেরিয়ে আসা সে হাত নারীর হতেই পারে না। সেই হাত রুক্ষ, অমার্জিত, কোমলতাবর্জিত কোনো পুরুষের।

ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল শৌনক। পুরোনো আমলের একটা বিশাল বাড়ি। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ওই প্রাচীরটাই বাড়ির বাইরের দিকের দেওয়াল। প্রাচীরের গায়ে অলংকৃত ফটক। বাড়িটা যে খুব উঁচু, তা কিন্তু নয়। তাহলে? আসলে বাড়িটার চারপাশে একবার ঘুরে এসেছে শৌনক। ঘুরে এসে ধারণা হয়েছে, বাড়িটার বিপুল বিস্তার সম্পর্কে। সেই বিস্তারের অর্থেই বাড়িটি বিশাল। ফটকের সামনে ওপরে তামিল, নীচে ইংরেজি অক্ষরে লেখা:রামমূর্তি ভবন। টি রামমূর্তি। তার নীচে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা: আর রামস্বামী।

বোঝাই যাচ্ছে, হাল আমলের বাড়ি নয়। বনেদি দক্ষিণি পরিবার। অতএব, কঠোরভাবে রক্ষণশীল। সুতরাং, এ বাড়িতে ঢোকার পর যতক্ষণ না ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ স্মোক করা অসম্ভব। সে কাজটা বাড়িতে ঢোকার আগেই সেরে নেওয়া ভালো।

শৌনক সিগারেট ধরালেই পেখম দশ হাত দূরে সরে যায়। তা ভালোই। প্যাসিভ স্মোকিং না করাই উচিত। কিন্তু দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে নাক-মুখ কুঁচকে পেখম বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে তিরস্কার।

ও আর কী বুঝবে? এই বাড়িটার ভেতর আরেকটু পরেই হয়তো শ্রীনিবাসের খাতার রহস্য সল্‌ভ হয়ে যাবে, এমনকি হয়তো ট্রেজার প্রোটেকটার মিস্ট্রিও আরেকটু পরেই টেস্ট-টিউবের নীচে ফুরন্ত তলানির মতো ল্যাকপ্যাকে সিং হয়ে পড়ে থাকবে, এ অবস্থায় যে-উত্তেজনা শৌনকের নার্ভগুলোকে দপদপাচ্ছে, তাকে ঠান্ডা করতে হলে নিকোটিন ছাড়া অন্য উপায় শৌনকের জানা নেই।

সামনে একটা চওড়া রাস্তা। রামকৃষ্ণ মঠ রোড। রাস্তার উলটোদিকে পাথর দিয়ে পাড়-বাঁধানো একটা পুকুর। পুকুরের ওই পাড়ে কপালীশ্বর মন্দিরের গোপুরমের চূড়া দেখা যাচ্ছে। সামনের রাস্তা দিয়ে অগুনতি বাস, ফোর হুইলার, বাইক, মানুষজনের যাতায়াত। সেদিকে চোখ রেখে রামমূর্তি-ভবনের গেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দ্রুত সিগারেট টানছে শৌনক। নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে।

দু-এক মুহূর্ত শুধু। তারপর সিগারেটের নিভন্ত বাট-টা জুতোর নীচে পিষে ফটক

দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল শৌনক পেখমকে নিয়ে। গলিমতো একটা এন্ট্রি। এত মোটা দেওয়াল যে, ভেতরে ঢোকামাত্রই বাইরের গাড়িঘোড়ার শব্দ ক্ষীণ হয়ে এল। বাইরের উষ্ণতাও আর তত নেই। মাদ্রাজ শহরের পুরোনো দিনের বাড়িগুলো এভাবেই তৈরি। কেমন একটা ঠান্ডা ঠান্ডা শীতলপাটি শীতলপাটি ঘুম ঘুম পরিবেশ। বাইরের হাওয়ার প্রচণ্ড গরম রুখতে মানুষের এই আদ্যিকালের ইনভেনশন সত্যিই তুলনারহিত। একজন সেন্ট্রি কাছে এসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো বাপ-বেটির দিকে। শৌনক তাকে বলল, রামামূর্তি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে রামস্বামী স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে গতকাল। রামস্বামী স্যার সকাল এগারোটায় সময় দিয়েছেন।

ইন্টারকমে ডায়াল করে সেন্ট্রি লোকটি কার সঙ্গে যেন কীসব কথা বলল খানিক দুর্বোধ্য তমিড় ভাষায়। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে ডানদিকের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল। বারান্দার শেষ প্রান্তে অফিসঘরে রামস্বামী স্যার নিজেই নাকি অপেক্ষা করছেন ওদের জন্যে।

সেই মোটা দেওয়ালটা পেরিয়ে একটা চৌঘরা মতো জায়গা। তার চারিপাশে চারটে বারান্দা। বারান্দাগুলো বাইরের দিক থেকে সব খসখস দিয়ে ঢাকা। ডানদিকের বারান্দায় উঠে এল শৌনক আর পেখম। ভেতরে এসির মৃদু গুঞ্জন। বারান্দার ছাদ থেকে মোজেইক-করা মেঝের ওপর সাদা আলোর ফোকাস। ভেতরে এলে দিন না রাত, বোঝা যাবে না।

বারান্দার শেষে অফিস। পেল্লায় কাঠের দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ। দরজায় কলিং বেল দেখে সুইচ টিপল শৌনক। ভেতরে মৃদু একটা সুরময় শব্দ উঠল। একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল: 'ওয়েলকাম! রামস্বামী ইজ ইন হিজ রুম। প্লিজ কাম ইন!'

দরজার পাল্লা ঠেলে অফিসঘরের ভেতরে গেল ওরা। সবুজ কার্পেটে মোড়া বড়ো ঘরটির এক প্রান্তে বিস্তীর্ণ মেহগনির টেবিলের ওদিকে বন্ধ জানালার নীচে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। টেবিলের ওপর স্তূপাকৃতি খাতাপত্র, মোটা মোটা ফাইল। ভদ্রলোকের বামদিকে ছোটো একটা টেবিলে কম্পিউটার। ডানদিকে অনেক ক-টা ট্রেতে টেলিফোন। নানা রঙের রিসিভার। এখনও এই দুহাজার পনেরোতেও এত রকমের টেলিফোনের বাহার? একেই বোধহয় বলে বনেদিয়ানা!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তারই একটা ফোনে নিরতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। রিসিভার কানে চেপে কথা বলার ফাঁকেই শৌনকদের দিকে তাকিয়ে আধোচাঁদের মতো হেসে ইঙ্গিতে উলটোদিকের চেয়ারে বসতে বললেন।

বাইরের গরম থেকে হঠাৎ এসিতে আসায় একটু শীত-শীত করছিল পেখমের। এতক্ষণে গদিমোড়া চেয়ারে আসীন হয়ে একটু স্বস্তি পেল। সে রামস্বামী স্যারকে খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে দেখছিল। গায়ের রং শ্যামলা, চকচকে চৌকোনো মুখ, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা, কপালে বিভূতির রেখা টানা, চোখে একটা মোটা ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। পরনে সাদা ধুতি মাদ্রাজি কায়দায় পরা, গায়ে একটা সাদা রঙের কনুই-হাতা ফতুয়া। ফতুয়ার বোতামগুলো ঝিনুকের।

রামস্বামীর পেছনের দেওয়ালে ওপরের দিকে একটা খুব পুরোনো অয়েল-পেইন্টিং। শৌনকও তাকিয়েছিল সেই দিকে। ছবিতে একজন বিশাল পাগড়িপরা মাঝবয়সি স্বাস্থ্যবান পুরুষ। পাগড়িটা অনেকটা সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণানের পাগড়ির মতো। চওড়া চোয়াল। মুখেচোখে আত্মবিশ্বাস ও কোমলতার মিশেল। সন্দেহাতীতভাবে টি রামমূর্তি। ঠিক যেমনটি এঁকেছিলেন শ্রীনিবাস তাঁর খাতায় 'কার্ড প্লেয়ারস'-এর অনুকৃতির মধ্যে। শৌনক একবার ছবির দিকে, আর-একবার রামস্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। রামস্বামী একেবারেই তাঁর পিতার অবয়ব পেয়েছেন। সেই একই প্রায় চোখমুখ, চওড়া চোয়াল। তফাৎ শুধু এই, রামস্বামীর পাগড়ি নেই আর চোখে একটা অতিরিক্ত চশমা আছে।

ফোনে বাক্যালাপ সেরে রামস্বামী বললেন, 'নমস্কারম্! টি অর কফি?'

দুটোর কোনোটাই এখন খাওয়া সুবিধের হবে না, ভাবল শৌনক। কেননা গরম কিছু এখন পেটে গেলেই আবার মন ধোঁয়ার জন্য উশখুস করতে থাকবে। কিন্তু রামস্বামীকে রিফিউজ করাটাও অভদ্রতা হবে। তাই একটু ইতস্তত করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলল সে, 'ওয়েল... টি...'

রামস্বামী চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। ঘরের বাঁদিকের কোণে ছোটো টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম আছে। পোর্সিলেনের সুদৃশ্য কাপে গরম জল ঢাললেন ফ্লাস্ক থেকে। তারপর টি-ব্যাগ ডুবিয়ে চা বানালেন তিন কাপ। নিজেই ওদের চা সার্ভ করতে যাচ্ছেন দেখে শৌনক আর পেখম উঠে গেল সাহায্য করতে। 'নো, নো, ইটস ওকে, ইউ আর মাই গেস্টস,' বলে নিজেই চা ঢেলে দিতে লাগলেন ওদের পেয়ালায়।

অন্য জায়গায় এসব ক্ষেত্রে গৃহস্বামী কলিং বেল বাজান। পরিচারক চা দিয়ে যায়। কিন্তু আতিথেয়তার এই সৌজন্য উচ্চ পারিবারিক সংস্কৃতির নিদর্শন, সন্দেহ নেই।

চা সিপ করে রামস্বামী প্রশ্ন করলেন পেখমের দিকে তাকিয়ে নিয়ে, 'ইয়োর ডটার?'

'ইয়েস, স্যার!'

'হোয়ার আর ইউ স্টেয়িং?'

'ইন আ হোটেল। রয়াপেটা।'

'দ্যাটস ফাইন,' চায়ের কাপটা সামান্য সামনের দিকে ঠেলে জিজ্ঞাসা করলেন রামস্বামী, 'টেল মি, স্যার। হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'আই অ্যাম ডুয়িং আ রিসার্চ অন ওয়ান অফ মাই ডিসিজড রিলেটিভ। ফর দ্যাট,

আই হ্যাভ টু গ্যাদার ডিটেইলড ইনফরমেশন অন ইয়োর ফাদার লেট টি রামমূর্তি। ইয়োর ফাদার ওয়াজ মাই রিলেটিভস মেন্টর।'

কী যেন একটু ভাবলেন রামস্বামী। তারপর ইন্টারকম তুলে কাকে যেন তাঁর ঘরে আসতে বললেন। একটু পরে ঘরের সুরেলা কলিং বেল বেজে উঠল। রামস্বামী টেবিলের নীচে সুইচ টিপলেন। আগের মতোই যান্ত্রিক স্বরে ভেতরে আসার নির্দেশ বেজে উঠল দরজায়।

এবার দরজা ঠেলে ভেতরে এলেন ফরসা, দীর্ঘদেহী, বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন বয়স্ক মানুষ। মাথায় কাঁধ-ঝাঁপানো পলিত কেশের ভার। বেশ কেয়ারি করা পাকা গোঁফ। ঢোলা পাজামার ওপর হাঁটু অবধি ঝোলানো খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি পরা। গলায় একটা হলুদ রঙের উড়নি।

রামস্বামী আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তাঁকে আরেকটা চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর শৌনকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিট মিস্টার পিল্লাই। মিস্টার পিল্লাই ইজ রাইটিং আ বায়োগ্রাফি অফ মাই ফাদার। অ্যাট প্রেজেন্ট, হি অলসো লুকস আফটার আওয়ার ফ্যামিলি লাইব্রেরি। হি ক্যান গিভ অল নেসেসারি ইনফরমেশন অন মাই ফাদার টু ইউ। প্লিজ গো উইথ হিম।'

শৌনক কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, 'সো কাইন্ড অফ ইউ, স্যার!'

এই বলেই সে আর পেখম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। রামস্বামী লম্বা-চুলো বয়স্ক লোকটিকে বললেন, 'মিস্টার পিল্লাই, দিস জেন্টলম্যান প্রোফেসর শাওনক মিত্রো কেম অল দ্য ওয়ে ফ্রম কোলকাতা টু নো অফ মাই ফাদার। প্লিজ এক্সটেন্ড অল নেসেসারি হেল্প টু হিম।'

মিস্টার পিল্লাই সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওরা রামস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিস্টার পিল্লাইয়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিল্লাই প্রশ্ন করলেন শৌনককে, 'বাঙ্গালি?' বেশ গমগমে পুরুষালি কণ্ঠস্বর।

শৌনক হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

'এটি আপনার মেইয়ে?'

'হ্যাঁ। ওর নাম পেখম। আপনি বাংলা বলতে পারেন?'

'সারা জীবন নানা জায়গায় চাকরিসূত্রে থেকেছি...কিছু কিছু পারি বিভিন্ন স্টেটের ভাষা... পেখম... আ বিউটিফুল নেম। আ সুইট গার্ল টু।'

'থ্যাংকিউ, স্যার। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'গ্রন্থাগারে,' খুব সুন্দর করে শব্দটি উচ্চারণ করে হাসলেন মিস্টার পিল্লাই। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আবার ডানদিকে মোড় নিয়ে সরু গলি বেয়ে ভিতর-মহলে

এসে ওঠা গেল। এখানে মাঝে একটা আয়তাকার চত্বর। চত্বরের কেন্দ্রে ছোটো একটা ফোয়ারা। ফোয়ারার মুখটা মকরের মুখের মতো। চারিপাশে তিনতলা বিল্ডিং। টানা বারান্দা। সারি সারি ঘর। বারান্দার ছাদ এখানে কিছুটা নেমে এসেছে।

অনেকটা হাঁটার পর কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওপরে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা দরজা। দরজার মাথায় একটা ছোটো কাঠের ফলকের ওপর সুন্দর ইংরেজি হরফে লেখা: রামমূর্তি লাইব্রেরি।

দরজা তালাবন্ধ ছিল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে এনে তালা খুললেন পিল্লাই। দরজা খুলে বললেন, 'ভিতরে আসুন।'

পট পট করে সুইচ টিপে লাইব্রেরির আলোগুলো জ্বেলে এসি চালিয়ে বুক- লেন্ডিং সেকশনের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মিস্টার পিল্লাই বললেন, 'আসুন।'

ঘরটা বেশ বড়ো। ছড়ানো। প্রায় হলঘর বললেই চলে। দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে প্লাইউড-কাচ দিয়ে ঘেরা কাউন্টার ও বুক-লেন্ডিং সেকশন। হলঘরের মাঝখানটায় সারি সারি চেয়ার টেবিল সাজানো রিডিং রুম। চারিপাশে অগণ্য বুকসেলফ, বইপত্রে বোঝাই। একদিকে কাঠের ক্যাবিনেট-ওয়ালা সাবেক আমলের বই খোঁজার ব্যবস্থা। হলঘরের পেছনদিকে একটা সিঁড়ি ওপরের তালায় চলে গেছে। সেখানে মনে হয়, লাইব্রেরির বুকস্টোর রুম। শৌনক, পেখম মিস্টার পিল্লাইয়ের পেছন পেছন বুক-লেন্ডিং সেকশনে এসে ঢুকল।

একটা কাচে মোড়া বড়ো টেবিল। টেবিলের ওপারে বেতের চেয়ারে গিয়ে বসলেন পিল্লাই। শৌনক আর পেখম বসল এদিকের গদি-আঁটা চেয়ারে। টেবিলের ওপর মোটা মোটা অনেক বই। কিছু ইংরেজি, কিছু তমিড়। কয়েকটা বই মাঝখান থেকে খোলা। একপাশে একটা ইন্টারকম। কিছু কাগজপত্র। একটা খাতা। খাতার ওপর একটা মুখখোলা জেলপেন। মনে হল, মিস্টার পিল্লাই কিছু লিখতে লিখতে রামস্বামীর ডাকে উঠে গেছিলেন।

জেলপেনের মুখ আর খাতাটা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রাখলেন পিল্লাই। বললেন, 'রিডিং-রুম বিকেলের দিকে খুলে দেওয়া হয় পাবলিকের জন্য। আগে খুব পপুলার চিলো। এখোন তো সোবি অন্তর্জালে পাওয়া যায়। রিডিং-হ্যাবিটও কমে গেচে মানুষের।'

পেখম প্রশ্ন করল, 'কত বই আছে?'

'হোবে হাজার চলিশেক।'

'আপনারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন না? কী ক্লাসিফিকেশন?' পেখম লাইব্রেরিটা দেখে খুব উৎসাহিত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

'ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন। এখোন তো কম্পিউটারেই বইয়ের অনুসন্ধান করা হয়।

কাঠের ক্যাবিনেট বক্সগুলো আচে আগেকার মোতোই। পিচনের দিকে কম্পিউটার আচে,' পেখম পিল্লাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, ঘরের পেছনের দিকে পাশাপাশি অনেকগুলো কম্পিউটার।

শৌনক প্রশ্ন করল, 'আপনি এখানে কতদিন হল এসেছেন?'

'বেশিদিন না। রামমূর্তিজীর বায়োগ্রাফি লিকব বোলে এসেচিলাম। লাইব্রেরিয়ান ছুটিতে গেলো। গেলো তো গেলোই আর আসে না। রামস্বামী স্যার বোললেন, লাইব্রেরিটা দেখাশোনা কোরতে।'

'আমিও এসেছিলাম টি রামমূর্তি সম্পর্কে জানব বলে। এত বড়ো একজন ফিলানথ্রপিস্ট। কলকাতাতে কিছুই পাচ্ছি না।'

'না পাওয়ারই কথা। কোলকাতায় উনি খুব পরিচিতো নাম নন... আপনি এক কাজ করুন,' এই বলে একটা ফাইল বাড়িয়ে দিলেন পিল্লাই শৌনকের দিকে। বললেন, 'এতে কিচু পেপার-কাটিং আচে। এগুলো দেকতে পারেন।'

ফাইলটা হাতে নিল শৌনক। বাপ-বেটি দুজনেই ঝুঁকে পড়ল পেপার-কাটিংগুলোর ওপর। নানা দাতব্য কাজকর্মের বিবরণ। কোনো কোনোটাতে রামমূর্তির ছবিও রয়েছে।

'আমি আসলে খুঁজছিলাম ছাত্রছাত্রীদের জন্য রামমূর্তির সহায়তার খবর। এই ধরুন যারা অরফ্যান, ডিপ্রাইভড বা অসুস্থ, তাদের জন্য রামমূর্তি তো অনেক কাজ করেছেন। অনেকে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিতও তো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেই...' শৌনক বলল।

'হাঁ, তা আচেন সেরকম ওনেকেই। কয়েকজনকে রামমূর্তি তো এই বাড়িতেই রেকে পড়াশুনার বেওস্থা করেচিলেন। তবে সেই সব তথ্য প্রায় পাওয়া যায় না। সে ওনেক দিন আগেকার বেপার। হবে তা উনিশো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সাল। রামমূর্তিজীর ছেলে রামস্বামী স্যারও তকন খুব চোটো চিলেন। প্রশ্ন করেচিলাম এ বেপারে, কিন্তু কিচু মনে করতে পারলেন না।'

'আচ্ছা, এমন কি কোনো তথ্য পাচ্ছেন কোনো-না-কোনো সূত্রে, এখানে কোনো বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন টি রামমূর্তি স্যারের কাছে ওই সময়? ছেলেটি অসুস্থ ছিল, মানে মেমরি-লসের অসুখ। বাঙালি ভদ্রলোক খুবই উপকৃত হয়েছিলেন রামমূর্তির দ্বারা... এমন কোনো তথ্য...?' শৌনক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিল্লাইয়ের দিকে তাকাল।

কথাটা শুনেই মিস্টার পিল্লাই কেন যেন হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনি কি বিশেষ কারও সোম্বন্দে একানে খোঁজখবর কোরতে এসেচেন, প্রোফেসর মিতরো? কিন্তু আপনি তো বোললেন, ইউ আর সোললি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট রামমূর্তিজী। সেক্ষেত্রে আমি তো আপনাকে সাহাজজো কোরতে পারবো না।'

যে-রিভলভারটা দিয়ে বিমল পেডিকে মার্ডার করেছিল সন্দেহ করা হচ্ছে, যেটা দিয়ে সে ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করে, সেই ৩৮০ বোরের ওয়েব্‌লি রিভলভারটি শরতের চাই। পুলিশ কাস্টডি থেকে সেটা বের করে আনতে হবে। ওটা নাকি দীনেশ গুপ্তের রিভলভার। ওটি বিপ্লবীদের অ্যাসেট। বোঝো কাণ্ড!

এ জিনিস করা খুব বিপজ্জনক। চাকরি তো যাবেই, প্রাণটাও যাবে। অনেক ভেবেছিলেন এ নিয়ে নগেন্দ্রনারায়ণ।

শেষে এক পুরোনো পাপীর সঙ্গে তাঁর দেখা। তাঁরই মতন ব্রিটিশের চাকরি করার অনুতাপের জ্বালা মফিজের। মফিজুদ্দিন আহমেদ। পুলিশের ওপরমহলেই আছে সে। সব শুনে বলল, 'করা যাবে সরকারসাব! আপনি যত অসম্ভব ভাবছেন, তত অসম্ভব পুলিশের পক্ষে কিছুই নয়!'

কোত্থেকে আরেকটা ৩৮০ বোরের ওয়েব্‌লি রিভলভার জুটিয়েছে মফিজ। সেটা দিয়ে বিমলের বা দীনেশ গুপ্তের রিভলভারটা রিপ্লেস করেছে পুলিশের রেকর্ড-রুমে। দীনেশের রিভলভারটার সঙ্গে আরও একটা কালো রঙের বাক্সও দিয়ে গেছে মফিজুদ্দিন। সেই বাক্সটার ভেতর কী আছে, শুনেই আঁতকে উঠেছেন নগেন্দ্রনারায়ণ। অনেক অনেক দিন আগে শরৎ চেয়েছিল ওটাও। বলেছিল, 'কত বড়ো জাতীয়-অসম্মান একবার ভেবে দেখুন, স্যার, এ জিনিসটি পুলিশের রেকর্ড রুমে পড়ে থাকলে।' জিনিসটার কথা নগেন্দ্রনারায়ণ বহু বছর আগে বলেছিলেন মফিজকে। ভুলেই গিয়েছিলেন এতদিনে তিনি। মফিজ ঠিক মনে রেখেছে।

রিভলভার আর সেই কালো কাগজে মোড়া বাক্সটা একটা অ্যাটাচির মধ্যে ভরে দেওয়াল আলমারির পেছন দিকের লুকোনো চেম্বারে রেখেছেন নগেন্দ্রনারায়ণ। শরতের কথা অনুযায়ী, আজ শেষ রাত্রেই কেউ আসবে তাঁর কাছে অ্যাটাচিটা নিতে।

সন্ধে থেকে ওই জন্যেই আজ ভৃত্যদের মায় দারোয়ানকেও ছুটি দিয়ে দিয়েছেন নগেন্দ্রনারায়ণ। সবাই যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছে। গেটের চাবি তাঁর ড্রেসিং গাউনের ঢোলা পকেটে। রাত জেগে বসে আছেন তাঁর এই একতলার চেম্বারে। সে অবশ্য প্রায় প্রতিদিনই থাকেন।

কিন্তু সেই লোক আসছে কই? গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে শীতের রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে ঢং ঢং করে রাত্রি দুটো বাজল। কারও কোত্থাও দেখা নেই। কেমন একটা বেশি বেশি শীত-শীত করছে আজ নগেন্দ্রনারায়ণের। তাঁর ঘরের কাচের জানালা দিয়ে বাড়ির সামনের স্বল্পালোকিত বাগানটা দেখা যায়। বাগান পেরিয়ে বড়ো গেট। গেটের ওপারে রাস্তা। স্ট্রিট লাইটের আলোতে গেটের মাথাটা হালকা আভায় আভায়িত হয়ে আছে। শরৎ কিছু বলেনি, কীভাবে তার লোক আসবে বাড়ির সামনে। শুধু বলেছিল, 'চোখ-কান খোলা রাখবেন।'

কিন্তু কোথায় কে? ধীরে ধীরে রাত্রি আড়াইটে বাজল, এরপর তো ভোর হয়ে যাবে। গেটের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে তন্দ্রা নেমে আসছিল নগেন্দ্রনারায়ণের। টেবিলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নেবেন?

টিন-ঠিন্, টিন-ঠিন্। হঠাৎ কী একটা আওয়াজে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। তীক্ষ্ণ চোখে জানালা দিয়ে গেটের দিকে তাকালেন। যেন ধাতব কোনো শব্দ। ঠিক যেন লোহার কোনো কিছুর ওপর আরেকটা লোহার দণ্ড দিয়ে কেউ মৃদু আঘাত করছে...

আলমারি খুলে লুকোনো চেম্বার থেকে অ্যাটাচিটা বের করে ঘরের দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন নগেন্দ্রনারায়ণ। চুপিসাড়ে পায়ে পায়ে বাগানের ভেতরের শান-বাঁধানো রাস্তাটা অতিক্রম করলেন। গেটের পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, একটা কালো রঙের টাঙা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই বাড়ির সামনে।

তালা খুললেন গেটের। সন্তর্পণে পাল্লা সরালেন, যাতে শব্দ না হয়। তাঁকে গেট খুলতে দেখেই টাঙার দরজাও খুলে গেল। টাঙা থেকে ঝুপ করে নামল একটা লোক। স্ট্রিট লাইটের অল্প আলোয় সেই লোকটাকে দেখে সত্যিই এবার রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন নগেন্দ্রনারায়ণ।

পুরুষ নয়, পা থেকে মাথা অবধি কালো বোরখা পরা একজন মুসলমান রমণী। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে সোজা নগেন্দ্রনারায়ণের সামনে এসে সে দাঁড়াল। বোরখা পরে থাকায় আগন্তুকের মুখচোখ কিছুই নগেন্দ্রনারায়ণ দেখতে পাচ্ছেন না।

চাপা, সতর্ক অথচ কঠোর স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাসওয়ার্ড?'

সেই রহস্যময়ী মুসলমান রমণী অকম্পিত স্বরে উত্তর দিল, 'রত্নরক্ষক!'

হ্যাঁ, এই সংকেতশব্দই আগন্তুক বলবে বলে জানিয়েছিল বটে শরৎ! হাতের অ্যাটাচিটা মহিলার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন নগেন্দ্রনারায়ণ।

কবজি অবধি বোরখার হাতায় ঢাকা হাতখানা বাড়িয়ে দিল আগন্তুক অ্যাটাচিটার দিকে। পথবাতির আলোয় নগেন্দ্রনারায়ণ দেখলেন, বোরখার আবরণ থেকে বেরিয়ে আসা সে হাত নারীর হতেই পারে না। সেই হাত রুক্ষ, অমার্জিত, কোমলতাবর্জিত কোনো পুরুষের।

২১

ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল শৌনক। পুরোনো আমলের একটা বিশাল বাড়ি। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ওই প্রাচীরটাই বাড়ির বাইরের দিকের দেওয়াল। প্রাচীরের গায়ে অলংকৃত ফটক। বাড়িটা যে খুব উঁচু, তা কিন্তু নয়। তাহলে? আসলে বাড়িটার চারপাশে একবার ঘুরে এসেছে শৌনক। ঘুরে এসে ধারণা হয়েছে, বাড়িটার বিপুল বিস্তার সম্পর্কে। সেই বিস্তারের অর্থেই বাড়িটি বিশাল। ফটকের সামনে ওপরে তমিড়, নীচে ইংরেজি অক্ষরে লেখা:রামমূর্তি ভবন। টি রামমূর্তি। তার নীচে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা: আর রামস্বামী।

বোঝাই যাচ্ছে, হাল আমলের বাড়ি নয়। বনেদি দক্ষিণি পরিবার। অতএব, কঠোরভাবে রক্ষণশীল। সুতরাং, এ বাড়িতে ঢোকার পর যতক্ষণ না ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ স্মোক করা অসম্ভব। সে কাজটা বাড়িতে ঢোকার আগেই সেরে নেওয়া ভালো।

শৌনক সিগারেট ধরালেই পেখম দশ হাত দূরে সরে যায়। তা ভালোই। প্যাসিভ স্মোকিং না করাই উচিত। কিন্তু দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে নাক-মুখ কুঁচকে পেখম বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে তিরস্কার।

ও আর কী বুঝবে? এই বাড়িটার ভেতর আরেকটু পরেই হয়তো শ্রীনিবাসের খাতার রহস্য সলভ হয়ে যাবে, এমনকি হয়তো ট্রেজার প্রোটেকটার মিস্ট্রিও আরেকটু পরেই টেস্ট-টিউবের নীচে ফুরন্ত তলানির মতো ল্যাকপ্যাকে সিং হয়ে পড়ে থাকবে, এ অবস্থায় যে-উত্তেজনা শৌনকের নার্ভগুলোকে দপদপাচ্ছে, তাকে ঠান্ডা করতে হলে নিকোটিন ছাড়া অন্য উপায় শৌনকের জানা নেই।

সামনে একটা চওড়া রাস্তা। রামকৃষ্ণ মঠ রোড। রাস্তার উলটোদিকে পাথর দিয়ে পাড়-বাঁধানো একটা পুকুর। পুকুরের ওই পাড়ে কপালীশ্বর মন্দিরের গোপুরমের চুড়া দেখা যাচ্ছে। সামনের রাস্তা দিয়ে অগুনতি বাস, ফোর হুইলার, বাইক, মানুষজনের যাতায়াত। সেদিকে চোখ রেখে রামমূর্তি-ভবনের গেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দ্রুত সিগারেট টানছে শৌনক। নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে।

দু-এক মুহূর্ত শুধু। তারপর সিগারেটের নিভন্ত বাট-টা জুতোর নীচে পিষে ফটক

দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল শৌনক পেখমকে নিয়ে। গলিমতো একটা এন্ট্রি। এত মোটা দেওয়াল যে, ভেতরে ঢোকামাত্রই বাইরের গাড়িঘোড়ার শব্দ ক্ষীণ হয়ে এল। বাইরের উষ্ণতাও আর তত নেই। মাদ্রাজ শহরের পুরোনো দিনের বাড়িগুলো এভাবেই তৈরি। কেমন একটা ঠান্ডা ঠান্ডা শীতলপাটি শীতলপাটি ঘুম ঘুম পরিবেশ। বাইরের হাওয়ার প্রচণ্ড গরম রুখতে মানুষের এই আদ্যিকালের ইনভেনশন সত্যিই তুলনারহিত। একজন সেন্ট্রি কাছে এসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো বাপ-বেটির দিকে। শৌনক তাকে বলল, রামামূর্তি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে রামস্বামী স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে গতকাল। রামস্বামী স্যার সকাল এগারোটায় সময় দিয়েছেন।

ইন্টারকমে ডায়াল করে সেন্ট্রি লোকটি কার সঙ্গে যেন কীসব কথা বলল খানিক দুর্বোধ্য তমিড় ভাষায়। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে ডানদিকের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল। বারান্দার শেষ প্রান্তে অফিসঘরে রামস্বামী স্যার নিজেই নাকি অপেক্ষা করছেন ওদের জন্যে।

সেই মোটা দেওয়ালটা পেরিয়ে একটা চৌঘরা মতো জায়গা। তার চারিপাশে চারটে বারান্দা। বারান্দাগুলো বাইরের দিক থেকে সব খসখস দিয়ে ঢাকা। ডানদিকের বারান্দায় উঠে এল শৌনক আর পেখম। ভেতরে এসির মৃদু গুঞ্জন। বারান্দার ছাদ থেকে মোজেইক-করা মেঝের ওপর সাদা আলোর ফোকাস। ভেতরে এলে দিন না রাত, বোঝা যাবে না।

বারান্দার শেষে অফিস। পেল্লায় কাঠের দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ। দরজায় কলিং বেল দেখে সুইচ টিপল শৌনক। ভেতরে মৃদু একটা সুরময় শব্দ উঠল। একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল: 'ওয়েলকাম! রামস্বামী ইজ ইন হিজ রুম। প্লিজ কাম ইন!'

দরজার পাল্লা ঠেলে অফিসঘরের ভেতরে গেল ওরা। সবুজ কার্পেটে মোড়া বড়ো ঘরটির এক প্রান্তে বিস্তীর্ণ মেহগনির টেবিলের ওদিকে বন্ধ জানালার নীচে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। টেবিলের ওপর স্তূপাকৃতি খাতাপত্র, মোটা মোটা ফাইল। ভদ্রলোকের বামদিকে ছোটো একটা টেবিলে কম্পিউটার। ডানদিকে অনেক ক-টা ট্রেতে টেলিফোন। নানা রঙের রিসিভার। এখনও এই দুহাজার পনেরোতেও এত রকমের টেলিফোনের বাহার? একেই বোধহয় বলে বনেদিয়ানা!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তারই একটা ফোনে নিরতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। রিসিভার কানে চেপে কথা বলার ফাঁকেই শৌনকদের দিকে তাকিয়ে আধোচাঁদের মতো হেসে ইঙ্গিতে উলটোদিকের চেয়ারে বসতে বললেন।

বাইরের গরম থেকে হঠাৎ এসিতে আসায় একটু শীত-শীত করছিল পেখমের। এতক্ষণে গদিমোড়া চেয়ারে আসীন হয়ে একটু স্বস্তি পেল। সে রামস্বামী স্যারকে খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে দেখছিল। গায়ের রং শ্যামলা, চকচকে চৌকোনো মুখ, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা, কপালে বিভূতির রেখা টানা, চোখে একটা মোটা ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। পরনে সাদা ধুতি মাদ্রাজি কায়দায় পরা, গায়ে একটা সাদা রঙের কনুই-হাতা ফতুয়া। ফতুয়ার বোতামগুলো ঝিনুকের।

রামস্বামীর পেছনের দেওয়ালে ওপরের দিকে একটা খুব পুরোনো অয়েল-পেইন্টিং। শৌনকও তাকিয়েছিল সেই দিকে। ছবিতে একজন বিশাল পাগড়িপরা মাঝবয়সি স্বাস্থ্যবান পুরুষ। পাগড়িটা অনেকটা সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণানের পাগড়ির মতো। চওড়া চোয়াল। মুখেচোখে আত্মবিশ্বাস ও কোমলতার মিশেল। সন্দেহাতীতভাবে টি রামমূর্তি। ঠিক যেমনটি এঁকেছিলেন শ্রীনিবাস তাঁর খাতায় 'কার্ড প্লেয়ারস'-এর অনুকৃতির মধ্যে। শৌনক একবার ছবির দিকে, আর-একবার রামস্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। রামস্বামী একেবারেই তাঁর পিতার অবয়ব পেয়েছেন। সেই একই প্রায় চোখমুখ, চওড়া চোয়াল। তফাৎ শুধু এই, রামস্বামীর পাগড়ি নেই আর চোখে একটা অতিরিক্ত চশমা আছে।

ফোনে বাক্যালাপ সেরে রামস্বামী বললেন, 'নমস্কারম্! টি অর কফি?'

দুটোর কোনোটাই এখন খাওয়া সুবিধের হবে না, ভাবল শৌনক। কেননা গরম কিছু এখন পেটে গেলেই আবার মন ধোঁয়ার জন্য উশখুস করতে থাকবে। কিন্তু রামস্বামীকে রিফিউজ করাটাও অভদ্রতা হবে। তাই একটু ইতস্তত করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলল সে, 'ওয়েল... টি...'

রামস্বামী চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। ঘরের বাঁদিকের কোণে ছোটো টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম আছে। পোর্সিলেনের সুদৃশ্য কাপে গরম জল ঢাললেন ফ্লাস্ক থেকে। তারপর টি-ব্যাগ ডুবিয়ে চা বানালেন তিন কাপ। নিজেই ওদের চা সার্ভ করতে যাচ্ছেন দেখে শৌনক আর পেখম উঠে গেল সাহায্য করতে। 'নো, নো, ইটস ওকে, ইউ আর মাই গেস্টস,' বলে নিজেই চা ঢেলে দিতে লাগলেন ওদের পেয়ালায়।

অন্য জায়গায় এসব ক্ষেত্রে গৃহস্বামী কলিং বেল বাজান। পরিচারক চা দিয়ে যায়। কিন্তু আতিথেয়তার এই সৌজন্য উচ্চ পারিবারিক সংস্কৃতির নিদর্শন, সন্দেহ নেই।

চা সিপ করে রামস্বামী প্রশ্ন করলেন পেখমের দিকে তাকিয়ে নিয়ে, 'ইয়োর ডটার?'

'ইয়েস, স্যার!'

'হোয়ার আর ইউ স্টেয়িং?'

'ইন আ হোটেল। রয়াপেটা।'

'দ্যাটস ফাইন,' চায়ের কাপটা সামান্য সামনের দিকে ঠেলে জিজ্ঞাসা করলেন রামস্বামী, 'টেল মি, স্যার। হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'আই অ্যাম ডুয়িং আ রিসার্চ অন ওয়ান অফ মাই ডিসিজড রিলেটিভ। ফর দ্যাট,

আই হ্যাভ টু গ্যাদার ডিটেইলড ইনফরমেশন অন ইয়োর ফাদার লেট টি রামমূর্তি। ইয়োর ফাদার ওয়াজ মাই রিলেটিভস মেন্টর।'

কী যেন একটু ভাবলেন রামস্বামী। তারপর ইন্টারকম তুলে কাকে যেন তাঁর ঘরে আসতে বললেন। একটু পরে ঘরের সুরেলা কলিং বেল বেজে উঠল। রামস্বামী টেবিলের নীচে সুইচ টিপলেন। আগের মতোই যান্ত্রিক স্বরে ভেতরে আসার নির্দেশ বেজে উঠল দরজায়।

এবার দরজা ঠেলে ভেতরে এলেন ফরসা, দীর্ঘদেহী, বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন বয়স্ক মানুষ। মাথায় কাঁধ-ঝাঁপানো পলিত কেশের ভার। বেশ কেয়ারি করা পাকা গোঁফ। ঢোলা পাজামার ওপর হাঁটু অবধি ঝোলানো খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি পরা। গলায় একটা হলুদ রঙের উড়নি।

রামস্বামী আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তাঁকে আরেকটা চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর শৌনকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিট মিস্টার পিল্লাই। মিস্টার পিল্লাই ইজ রাইটিং আ বায়োগ্রাফি অফ মাই ফাদার। অ্যাট প্রেজেন্ট, হি অলসো লুকস আফটার আওয়ার ফ্যামিলি লাইব্রেরি। হি ক্যান গিভ অল নেসেসারি ইনফরমেশন অন মাই ফাদার টু ইউ। প্লিজ গো উইথ হিম।'

শৌনক কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, 'সো কাইন্ড অফ ইউ, স্যার।'

এই বলেই সে আর পেখম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। রামস্বামী লম্বা-চুলো বয়স্ক লোকটিকে বললেন, 'মিস্টার পিল্লাই, দিস জেন্টলম্যান প্রোফেসর শাওনক মিত্রো কেম অল দ্য ওয়ে ফ্রম কোলকাতা টু নো অফ মাই ফাদার। প্লিজ এক্সটেন্ড অল নেসেসারি হেল্প টু হিম।'

মিস্টার পিল্লাই সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওরা রামস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিস্টার পিল্লাইয়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিল্লাই প্রশ্ন করলেন শৌনককে, 'বাঙ্গালি?' বেশ গমগমে পুরুষালি কণ্ঠস্বর।

শৌনক হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

'এটি আপনার মেইয়ে?'

'হ্যাঁ। ওর নাম পেখম। আপনি বাংলা বলতে পারেন?'

'সারা জীবন নানা জায়গায় চাকরিসূত্রে থেকেছি...কিছু কিছু পারি বিভিন্ন স্টেটের ভাষা... পেখম... আ বিউটিফুল নেম। আ সুইট গার্ল টু।'

'থ্যাংকিউ, স্যার। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'গ্রন্থাগারে,' খুব সুন্দর করে শব্দটি উচ্চারণ করে হাসলেন মিস্টার পিল্লাই।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আবার ডানদিকে মোড় নিয়ে সরু গলি বেয়ে ভিতর-মহলে

এসে ওঠা গেল। এখানে মাঝে একটা আয়তাকার চত্বর। চত্বরের কোণে ছোটো একটা ফোয়ারা। ফোয়ারার মুখটা মকরের মুখের মতো। চারিপাশে তিনতলা বিল্ডিং। টানা বারান্দা। সারি সারি ঘর। বারান্দার ছাদ এখানে কিছুটা নেমে এসেছে।

অনেকটা হাঁটার পর কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওপরে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা দরজা। দরজার মাথায় একটা ছোটো কাঠের ফলকের ওপর সুন্দর ইংরেজি হরফে লেখা: রামমূর্তি লাইব্রেরি।

দরজা তালাবন্ধ ছিল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে এনে তালা খুললেন পিল্লাই। দরজা খুলে বললেন, 'ভিতরে আসুন।'

পট পট করে সুইচ টিপে লাইব্রেরির আলোগুলো জ্বেলে এসি চালিয়ে বুক-লেন্ডিং সেকশনের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মিস্টার পিল্লাই বললেন, 'আসুন।'

ঘরটা বেশ বড়ো। ছড়ানো। প্রায় হলঘর বললেই চলে। দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে প্লাইউড-কাচ দিয়ে ঘেরা কাউন্টার ও বুক-লেন্ডিং সেকশন। হলঘরের মাঝখানটায় সারি সারি চেয়ার টেবিল সাজানো রিডিং রুম। চারিপাশে অগণ্য বুকসেলফ, বইপত্রে বোঝাই। একদিকে কাঠের ক্যাবিনেট-ওয়ালা সাবেক আমলের বই খোঁজার ব্যবস্থা। হলঘরের পেছনদিকে একটা সিঁড়ি ওপরের তালায় চলে গেছে। সেখানে মনে হয়, লাইব্রেরির বুকস্টোর রুম। শৌনক, পেখম মিস্টার পিল্লাইয়ের পেছন পেছন বুক-লেন্ডিং সেকশনে এসে ঢুকল।

একটা কাচে মোড়া বড়ো টেবিল। টেবিলের ওপারে বেতের চেয়ারে গিয়ে বসলেন পিল্লাই। শৌনক আর পেখম বসল এদিকের গদি-আঁটা চেয়ারে। টেবিলের ওপর মোটা মোটা অনেক বই। কিছু ইংরেজি, কিছু তমিড়। কয়েকটা বই মাঝখান থেকে খোলা। একপাশে একটা ইন্টারকম। কিছু কাগজপত্র। একটা খাতা। খাতার ওপর একটা মুখখোলা জেলপেন। মনে হল, মিস্টার পিল্লাই কিছু লিখতে লিখতে রামস্বামীর ডাকে উঠে গেছিলেন।

জেলপেনের মুখ আর খাতাটা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রাখলেন পিল্লাই। বললেন, 'রিডিং-রুম বিকেলের দিকে খুলে দেওয়া হয় পাবলিকের জন্য। আগে খুব পপুলার চিলো। এখোন তো সোবি অন্তর্জালে পাওয়া যায়। রিডিং-হ্যাবিটও কমে গেচে মানুষের।'

পেখম প্রশ্ন করল, 'কত বই আছে?'

'হোবে হাজার চলিশেক।'

'আপনারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন না? কী ক্লাসিফিকেশন?' পেখম লাইব্রেরিটা দেখে খুব উৎসাহিত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

'ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন। এখোন তো কম্পিউটারেই বইয়ের অনুসন্ধান করা হয়।

কাঠের ক্যাবিনেট বক্সগুলো আছে আগেকার মোতোই। পিচনের দিকে কম্পিউটার আছে,' পেখম পিল্লাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, ঘরের পেছনের দিকে পাশাপাশি অনেকগুলো কম্পিউটার।

শৌনক প্রশ্ন করল, 'আপনি এখানে কতদিন হল এসেছেন?'

'বেশিদিন না। রামমূর্তিজীর বায়োগ্রাফি লিকব বোলে এসেচিলাম। লাইব্রেরিয়ান ছুটিতে গেলো। গেলো তো গেলোই আর আসে না। রামস্বামী স্যার বোললেন, লাইব্রেরিটা দেখাশোনা কোরতে।'

'আমিও এসেছিলাম টি রামমূর্তি সম্পর্কে জানব বলে। এত বড়ো একজন ফিলানথ্রপিস্ট। কলকাতাতে কিছুই পাচ্ছি না।'

'না পাওয়ারই কথা। কোলকাতায় উনি খুব পরিচিতো নাম নন... আপনি এক কাজ করুন,' এই বলে একটা ফাইল বাড়িয়ে দিলেন পিল্লাই শৌনকের দিকে। বললেন, 'এতে কিচু পেপার-কাটিং আচে। এগুলো দেকতে পারেন।'

ফাইলটা হাতে নিল শৌনক। বাপ-বেটি দুজনেই ঝুঁকে পড়ল পেপার-কাটিংগুলোর ওপর। নানা দাতব্য কাজকর্মের বিবরণ। কোনো কোনোটাতে রামমূর্তির ছবিও রয়েছে।

'আমি আসলে খুঁজছিলাম ছাত্রছাত্রীদের জন্য রামমূর্তির সহায়তার খবর। এই ধরুন যারা অরফ্যান, ডিপ্রাইভড বা অসুস্থ, তাদের জন্য রামমূর্তি তো অনেক কাজ করেছেন। অনেকে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিতও তো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেই...' শৌনক বলল।

'হাঁ, তা আচেন সেরকম ওনেকেই। কয়েকজনকে রামমূর্তি তো এই বাড়িতেই রেকে পড়াশুনার বেওস্থা করেচিলেন। তবে সেই সব তথ্য প্রায় পাওয়া যায় না। সে ওনেক দিন আগেকার বেপার। হবে তা উনিশো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সাল। রামমূর্তিজীর ছেলে রামস্বামী স্যারও তকন খুব চোটো চিলেন। প্রশ্ন করেচিলাম এ বেপারে, কিন্তু কিচু মনে করতে পারলেন না।'

'আচ্ছা, এমন কি কোনো তথ্য পাচ্ছেন কোনো-না-কোনো সূত্রে, এখানে কোনো বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন টি রামমূর্তি স্যারের কাছে ওই সময়? ছেলেটি অসুস্থ ছিল, মানে মেমরি-লসের অসুখ। বাঙালি ভদ্রলোক খুবই উপকৃত হয়েছিলেন রামমূর্তির দ্বারা... এমন কোনো তথ্য...?' শৌনক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিল্লাইয়ের দিকে তাকাল।

কথাটা শুনেই মিস্টার পিল্লাই কেন যেন হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনি কি বিশেষ কারও সোম্বন্দে একানে খোঁজখবর কোরতে এসেচেন, প্রোফেসর মিতরো? কিন্তু আপনি তো বোললেন, ইউ আর সোললি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট রামমূর্তিজী। সেক্ষেত্রে আমি তো আপনাকে সাহাজজো কোরতে পারবো না।'

'কী মুশকিল! আমার প্রশ্নটা কি রামমূর্তি-রিলেটেড নয়? এটা তো তাঁরও জীবনের অংশ। নয় কি?'

'তা হোলেও আপনার এনকোয়ারিটা যেন একটা স্পেশাল ফিল্ডের মধ্যে ঘুরাফিরা কোরচে মোনে হোচ্চে আমার,' পিল্লাইয়ের কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর হয়ে উঠল।

শৌনক আর বেশি ধানাই-পানাইয়ের মধ্যে না গিয়ে বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, মিস্টার পিল্লাই। আমি আমার এক নিখোঁজ আত্মীয়ের ব্যাপারেই খোঁজ করতে এসেছি। তাঁর লেখা থেকে এটা জানা যায় যে, তিনি ও তাঁর বাবা বহু বছর আগে রামমূর্তির দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। এমনকি মিস্টার রামমূর্তি ওয়াজ হিজ মেন্টর।'

'আপনি কি পুলিশের লোক?' পিল্লাইয়ের কণ্ঠস্বরে সন্দেহ ফুটে উঠল।

'আরে! আপনি আমার আইডি চেক করতে পারেন। আমার অন্য কোনো মতলব নেই। শুধু আমার আত্মীয় সম্পর্কে আমি কিছু রামমূর্তি-রিলেটেড তথ্য জানতে চাই।'

শৌনকের বেপরোয়া কথাবার্তায় পেখম একটু অবাক হচ্ছিল। এত খোলাখুলি কথা বলছে কেন বাবা? পিল্লাই চটে গেলে পুরো চেষ্টাটা মাটি হয়ে যাবে যে!

পিল্লাই জবাব দিলেন, 'ইন দ্যাট কেস, আমি আপনাকে কোনোভাবে হেল্প কোরতে পারবো না। ওরকম কোনো ইনফরমেশন আমি পাইনি। ব্যস!'

বড়ো হতাশ দেখাল শৌনককে। সে পেখমের হাতে চাপ দিয়ে বিষাদখিন্ন স্বরে বলল, 'চল। ওঠা যাক।'

চেয়ার ছেড়ে লেন্ডিং সেকশন পেরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল ওরা। প্রায় দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক ভেসে এল, 'লিস্‌ন, প্রোফেসর মিতরো! একটু দাঁড়িয়ে যান। ওয়েট!'

দাঁড়িয়ে পড়ল শৌনক, পেখম। পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, মিস্টার পিল্লাই ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে।

গুটি গুটি পায়ে পায়ে ফিরে আবার পিল্লাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। শৌনক গম্ভীর গলায় বলল, 'বলুন।'

'দেখুন, এই বেপারে খুব অল্পো রেফারেন্স আচে রামমূর্তিজীর ডায়েরিতে। একজন বাঙালি ভদ্রলোক, সম্ভবত পোলিটিকালি ইনভলভড, পুলিশের তাড়া খেয়ে ফেরারি হয়ে একানে এসে রামমূর্তিজীর কাচে আশ্রয় চান। তাঁর সোঙ্গে তাঁর ছেলেও চিলো। ছেলেটির মেমরি লস হোয়েচিল চোটোবেলায় ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে। রামমূর্তিজী ছেলেটিকে কর্ণাটকের এক মন্দিরে পাঠান পুজো দিতে। বাপ-ছেলে দুজনেরই একানে নূতন নাম হোয়। তাঁরা বাঙালি, কিন্তু একানে তাঁরা তমিড় নাম নিয়ে একানকার লোক হোয়ে যান। এর বেশি কিছু আমি জানি না। বোলতে পারব না। ছেলেটার বা তার বাবার নাম কিছু লিখা নাই ডায়েরিতে।'

'থ্যাঙ্কিউ, মিস্টার পিল্লাই। কিন্তু একটা ব্যাপার ভালো বুঝতে পারছি না।'

'কী বেপার?'

'রামমূর্তিজীর ক-টা ডায়েরি পেয়েছেন আপনি?'

'সোব মিলে বারোটা। সোব সময় লিখেননি।'

'ক-টা আপনি পড়েছেন?'

'পাঁচটা। প্রথম দিককার। কেনো বোলুন তো?'

'পাঁচটা ডায়েরিও তো কম নয়, মিস্টার পিল্লাই। অতগুলো এন্ট্রি। তার মধ্যে এই অল্প তথ্যটুকু এই মুহূর্তে আপনার মনে পড়ল কীভাবে?'

'এতোটুকুও মোনে পোড়ত না, যোদি আপনার কেসের সোঙ্গে বেপারটা না মিলত। তা ছাড়া, ছেলেটিকে তার বাবা একটা ছড়া শিখিয়েছিলেন। সেই ছড়াটা রামমূর্তিজী ডায়েরিতে লিখে রেখে গেছেন বোলেই মোনে পড়ল। সেইকানেই ছেলেটার বেপারে এই দু-একটা ইনফরমেশন লিখা আছে।'

'ছড়া? কী ছড়া, মিস্টার পিল্লাই?' পেখম উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল।

পিল্লাই বললেন, 'ছড়াটার মানে কী, আমি জানি না। তা বেশিরভাগ ছড়ারই তো কোনো মানে তাকে না। ওরকমই কিছু আরকি!'

'তবু শুনি, শুনি,' পেখম হাসি-হাসিমুখে বলল।

পিল্লাই বললেন,

'ছড়াটা এইরোকম:

তথাগতর পট খুলে যায় ফিবু নাচে শর্টে,
হদিস পাবেই, যদি তোমার বুদ্ধি থাকে ঘটে।
নাগলোকের পেটের ভিতর বিষাক্ত নীল হাওয়া,
মরণজয়ী চিরচেতন প্রাণের আসাযাওয়া।'

খুব মন দিয়ে ছড়াটা শুনল শৌনক। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। তবু সবটা শুনে হাসতে হাসতে বলল, 'বাঃ, বাঃ, চমৎকার! দিব্বি মুখস্থ হয়ে গেছে তো আপনার ছড়াটা। ডায়েরি না দেখেই বলতে পারছেন!'

মিস্টার পিল্লাই বিরক্ত স্বরে বললেন, 'ক্লাসে পড়ানোর জন্নো এরকম ওনেক কিছু তো আপনাকেও মুখস্থ কোরতে হোয়। হোয় না? তা হোলে একজন গবেষক, যিনি রামমূর্তিজীর জীবনী লিখবেন, তাঁর জীবনের সোঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটা ছড়া মোনে রাকতে পারবেন না? আর তা ছাড়া মেমরি আমার বেশ ভালোই।'

'আপনার মেমরি যে এখন একদম ভালো হয়ে গেছে, সেকথা জেনে বড়ো সুখী হলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, চেন্নাইতে এত গরম। এই রামমূর্তি-ভবনের সবটুকুই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলেও এই বাড়ির বাইরেও তো আপনাকে মাঝেমধ্যে যেতে হয়।

এই উইগ পরে থাকেন, গরম লাগে না?'

'কী বলছেন কী যা-তা আবোলতাবোল?' পিল্লাই ক্ষিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করল। পেখমও অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেসবে শৌনক একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে উত্তর দিল, 'আমি কিছুই বলছি না। বলছে আপনার টেবিলে যে খাতাটা আপনি আধখোলা রেখে উঠে গেছিলেন, আমরা আসতেই ঝট করে বন্ধ করে দিলেন, সেই খাতাটার পাতায় জেলপেনের কালো কালিতে আপনার অভ্রান্ত হস্তাক্ষর। বলছে আপনার স্ত্রী দেবলীনার মোবাইলে সেভ করা আপনার ছবি। আর বলছে আপনার নাকের দুপাশের চশমার দাগ। আমি কিছুই বলছি না। আপনি শিল্পী মানুষ, ছদ্মবেশটা নিখুঁতই হয়েছে। কিন্তু বাইরে বড্ড গরম। কখনও যদি বাইরে যেতে হয় আপনাকে... আমরা আপনার খোঁজেই এসেছি, মিস্টার এস রাজু শ্রীনিবাসন! এবার উইগটা খুলে রেখে বলুন দেখি আমাদের, এইমাত্র যে ছড়াটা বললেন, তার অর্থ আপনি কি জানেন?'

২২

নাহ্, ছড়াটার অর্থ জানেন না শ্রীনি। অর্থভেদ করার চেষ্টাও যে করেননি তিনি সারা জীবন, তাও নয়। কিন্তু পারেননি। তাঁর বাবা শ্রীসুবিমল শাসমল ওরফে তুইমইয়ানাদু পেরুমল ছড়াটা তাঁকে ছোটোবেলায় মুখস্থ করিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এর অর্থ যে কী, তা তিনি বলে দেননি।

আচ্ছা, সুবিমলবাবু নিজে কি জানতেন এর অর্থ? উত্তর এল : শুধু জানতেন না, এ ছড়ার ছড়াকার সুবিমলবাবুই স্বয়ং। বোঝো!

এসব কথা হচ্ছে রামমূর্তি ভবনের দোতলার একটা কোণের দিকের ঘরে বসে। অনেক বলেও শ্রীনি-কে উইগ খোলাতে পারেনি শৌনক এ ঘরের বাইরে কোত্থাও। শ্রীনিবাসন বলেছেন, প্রত্যেকটা ঘরে, প্রত্যেকটা বারান্দায় সিসি-ক্যামেরা আছে। লুকোনো। শুধু নাকি থাকার ঘরগুলোই সেফ!

পেখম অত সহজে মেনে নেওয়ার মেয়ে নয়। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কীভাবে শিওর হচ্ছেন যে, এই ঘরেও সিসি ক্যামেরার চোখ লুকোনো নেই কোথাও?'

শ্রীনিবাস বললেন, 'একটা সফটওয়ার আছে, গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যায় স্মার্টফোনে। সেটাই দেখাচ্ছে, এ ঘরে কোথাও কোনো সিসি-ক্যামেরা নেই। এই দ্যাখো!'

শ্রীনিবাসন তাঁর মোবাইল ফোনে সফটওয়ারটা কীভাবে কাজ করে, পেখমকে বোঝাতে লাগলেন। একদম শেষে একটা ডায়লগ বক্স খুলল: 'ইউ আর আউট অফ সিসি-টিভি জোন!'

পেখমের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন শ্রীনিবাস। তারপর শৌনককে বললেন, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'বলুন!'

'আপনি যে আমাকে চিনতে পারলেন, সেটা কি কেবল খাতায় আমার হাতের লেখা, দেবলীনার ফোনে আমার ছবি আর নাকের পাশে এই চশমার দাগ দেখেই? নাকি, আর কিছু থেকে সন্দেহ হল? আসলে কী জানেন? আমি যে কতটা সেফ এখানে, সেটাই তো ঠিক বুঝতে পারছি না!'

শৌনক ভেবে বলল, 'না, আরও একটা জিনিস আছে। একজন দক্ষিণ ভারতীয় বাংলা শিখে যেভাবে বাংলা বলেন, যেভাবে বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেন, আপনার বাংলা বলার ধরনটা তার থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। আপনার বাংলায় মিশে আছে সুন্দর সুন্দর বাংলা শব্দ—যথাযথ বাংলা উচ্চারণে। গ্রন্থাগার। অনুসন্ধান। তথ্য। অন্তর্জাল। সম্ভবত। পুজো। একজন দক্ষিণি বাংলা শিখে বাংলা বলার সময় এসব শব্দের জায়গায় প্রায়ই তাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়েই কাজ চালান। পুজো বলেন না। বলেন পূজা। তারপর আপনি বললেন—লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা 'হাজার চল্লিশেক'। এই 'হাজার চল্লিশেক'-শব্দবন্ধটি একেবারেই বাংলাভাষার নিজস্ব নির্মাণ। বাংলা-শেখা-অবাঙালি কেউ এক্ষেত্রে কিন্তু 'হাজার চল্লিশেক' না বলে বলবে 'চাল্লিশ হাজার'। তারপর একবার বললেন, 'চল্লিশ'। পরে বললেন, 'উনিশো চল্লিশ'। দুজায়গায় চল্লিশ-শব্দের উচ্চারণ এক নয়। তার মানে, কী বলবেন, আপনি শিওর হতে পারছেন না। তাছাড়া ছড়াটা বলবার সময় সেটা একদম পরিষ্কার টানটান বাংলা উচ্চারণে একবারও হোঁচট না খেয়ে গড়গড় করে বলে ফেললেন। ছোটোবেলার স্মৃতি তো, উপায় নেই! আর সবার ওপরে বাংলাভাষার নিজস্ব সুর, যার নকল করা কোনো অবাঙালির পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। সেই স্বাভাবিক সুর আপনি লুকোতে পারেননি। আপনার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, বাংলা আপনি কখনই কষ্ট করে পরে শেখেননি। হয়তো মেমরিটা মাঝে একটু ঘেঁটে গেছিল, এই যা। আসলে বাংলা আপনার মায়ের ভাষা।'

বিস্মিত শ্রীনিবাসন বললেন, 'বাব্বা! আপনি গোয়েন্দা না হয়ে অধ্যাপক হলেন কেন?'

পেখম খুব মজা পেয়ে হাসছিল। শৌনক সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, 'চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করা কি কেবল ফেলু মিত্তির আর ব্যোমকেশ বক্সির জন্যই ভ্যালিড? একজন শিক্ষক বা অধ্যাপককে কি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ওপর অতন্দ্র অনুপুঙ্খ দৃষ্টি মেলে থাকতে হয় না সারা বছর? তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, শ্রীনিবাসন! আমি ছাড়া খুব বেশি লোক আপনাকে সন্দেহ করতে পারবে না এখানে। এখন বলুন দেখি, আপনি এখানে এলেন কীভাবে? কেন এলেন? আর ফিরছেন না-ই বা কেন? ওদিকে আপনার স্ত্রী দেবলীনা তো আমাদের মেদিনীপুরের বাড়িতে তার বন্ধু লিলির কাছে এসে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছে! এমন খামখেয়ালিপনা করছেন কেন?'

কথাটা শুনে শ্রীনিবাসন স্থির হয়ে চেয়ে রইলেন শৌনকের দিকে। তাঁর চোখে অভিমান আর বেদনার ভার। একটু পরে সহজ হয়ে বললেন, 'বলছি, শুনুন। সেটা একটা লম্বা গল্প। বেশ ভয়ানকও। কিন্তু তার আগে একটু চা বানাই। চা খেতে খেতে

শুনুন। এসি অফ করে জানালা খুলে দিচ্ছি। সিগারেট খেতে পারেন এখন স্বচ্ছন্দে। আপনার ডান হাতটা যে বারবার বুকপকেটের দিকে যাচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই তা সরিয়ে নিচ্ছেন, আমিও কিন্তু সেটা লক্ষ করেছি। কীন অবজারভেশন শুধু ডিকেটটিভ আর প্রোফেসরের কাজই নয়, শৌনকবাবু, শিল্পীরও কাজ। অনেক বেশি কাজ। তবে আর্টিস্ট একটু আনমনা খামখেয়ালি হন তো কখনও কখনও। বিপদটা তখনই ঘটে যায়। আমার গল্পটাও সেই রকম অন্যমনস্কতারই ফল, বলতে পারেন।'

উঠে গেলেন শ্রীনি। ঘরের একপাশে একটা ইনডাকশন আর চা-বানানোর সরঞ্জাম কিছু আছে। পেখম তাঁকে সাহায্য করছিল। ছোটো ঘরটায় একটা খাট-বিছানা, টেবিল, কয়েকটা কাঠের চেয়ার, বুকশেলফ। টেবিলের ওপর কয়েকটা বই। ছবি আঁকার অতি অল্প সাজসরঞ্জাম। মানে যা যতটুকু শ্রীনিবাস মাদ্রাজে এসে এই প্রচ্ছন্ন দশায় সংগ্রহ করতে পেরেছেন। টেবিলের ওপর মোবাইল ফোনটা কমদামি হলেও ঝাঁ-চকচকে নতুন। সামান্য কিছু টাকা পেয়েছেন হয়তো কোথাও থেকে। শ্রীনি-র গল্পটা শোনার জন্য শৌনক ভেতরে ভেতরে অধীর হয়ে উঠছিল।

চা-স্ন্যাকস এসব এনে রাখল পেখম টেবিলের ওপর। শৌনক আর পেখম শ্রীনিবাসনের মুখোমুখি চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিল। শ্রীনি এসে বসেছেন বিছানায়, হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। শৌনক শ্রীনি-কে সিগারেট অফার করল। শ্রীনি আগে খেতেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন। সিগারেট যে আবার কেমন করে ছাড়ে মানুষ, ভাবতে ভাবতে শৌনক একটা সিগারেট ধরাল। পেখম জিভ কেটে তির্যক চোখে একবার তাকাল শৌনকের দিকে। নিজের ও অন্যের কত বড়ো ক্ষতি করছে এই ধূমদাস অধ্যাপক, নিজেই জানে না—পেখমের চোখের ভাষাটা এ মুহূর্তে কিছুটা এরকম ইমলি-টক।

দুবার চায়ে চুমুক দিয়ে শ্রীনি বললেন, 'কোত্থেকে শুরু করব বলুন দেখি? আপনি আমার সম্পর্কে কতটুকু কী জানেন, তাই তো জানি না।'

'বলছি, ভুল হলে শুধরে দেবেন,' চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল শৌনক, 'এক, আপনি একজন আর্টিস্ট। আপনার স্ত্রী দেবলীনা আমার স্ত্রী লিলির বান্ধবী। আপনার সঙ্গে দেবলীনার বয়সের ফারাকটা একটু বেশিই। এই ফারাকটাই আপনাদের সম্পর্ক-বয়নের একটা ভাইটাল ফ্যাকটার। কালানুক্রমিকভাবে দেবলীনা প্রথমে আপনার মিউজ-কাম-মডেল, পরে প্রেমিকা এবং শেষে সর্বার্থেই সঙ্গিনী। প্রায় তিন মাস আগে আপনি নিখোঁজ হয়েছেন। শিলিগুড়িতে একটা এগজিবিশন ছিল। সেটাই আপনার শেষ খবর। কারেক্ট?'

'কারেক্ট। তারপর?' কৌতূহলী চোখে শুধোলেন শ্রীনিবাসন।

'দুই, এটা কিছুটা আমার গেস-ওয়ার্ক বলতে পারেন... বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের

সহযোগী গোপন সংগঠন ট্রেজার প্রোটেকটারের চিফ ছিলেন আপনার বাবা এবং তারপর আপনি।'

'আপনার অনুমান নির্ভুল।'

'এই টিপি-সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানার আছে আপনার কাছ থেকে। সবটাই ধোঁয়া-ধোঁয়া।'

'বলব। অনেকটাই যখন এক্সপোজড হয়ে গেছে, বাকীটা আমি বলব আপনাকে। কিন্তু তার আগে আপনার পয়েন্টগুলো শুনে নিই।'

'বেশ। তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, আপনার ডাকনাম সম্ভবত রাজু। মেমারি লসের পরে এই নামই আপ কে দিয়েছিলেন ডক্টর নগেন্দ্র খামবাঁইয়ের ঠাকুমা। মেমারি লসের আগে আপনার নাম ছিল সুশীতল। ঠিক বলছি কি?'

"একদম ঠিক। আমার বাবা আমাকে ট্রেজার প্রোটেকটারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এই 'সুশীতল' নামেই আমাকে এনরোল করিয়েছিলেন। টিপিতে সবারই একটা অন্য নাম থাকে। আমিও তাই ভেবেছিলাম, এটা হয়তো আমার ছদ্মনাম। কিন্তু এখন বুঝি, বাবা আসলে চেয়েছিলেন, নামটা ব্যবহার করতে করতে যদি কোনোমতে আমার ছোটোবেলার মেমরি ফিরে আসে। কিন্তু সেই স্মৃতি ফিরে এল অন্যভাবে।"

'সেটা বোধহয় আমি জানি। আপনার সম্পর্কে আমার জানা চার নম্বর ইনফরমেশন সেটাই। আপনার জাবেদা-খাতাটা আমি পড়েছি। পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া দেবলীনা আমাকে কিছু কথা বলেছে। আপনার স্মৃতি ফিরে এসেছিল দেবলীনার সঙ্গে প্রথম সাহচর্যে,' শৌনক ওই ব্যাপারটাকে ত্বরিতে সংক্ষেপিত করল। পেখমের সামনে ও নিয়ে আলোচনা সামান্য অস্বস্তিকর।

শ্রীনি নিজের ভেতর তলিয়ে গিয়ে একটু মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, তারপর?'

"পাঁচ নম্বর, আপনি 'চারুকেশবতী' সিরিজটা করেছিলেন দেবলীনাকে মডেল করে। সেসব ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে বারবার করে এঁকেছিলেন বেঙ্গালুরুর 'মারি তিরুপতি' মন্দির। সেই মন্দিরেরই প্রধান দেবতার নাম শ্রীশ্রীনিবাসন।"

'ব্রিলিয়ান্ট!' মুগ্ধ হয়ে বলে উঠলেন শ্রীনি, 'ওই মন্দিরেই আমাকে নিয়ে যান আমার বাবা। মন্দিরে শিরোমুণ্ডন হয় আমার। মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁর উপাস্য দেবতার নামে আমার নতুন নাম রাখেন—শ্রীনিবাসন। বাবাও নিজের নাম পালটে নতুন নাম নেন তুইমইয়ানাদু পেরুমল। তুইমইয়ানাদু মানে নির্মল বা সুবিমল। বাবা তাঁর পুরোনো নাম আর আমার ডাকনাম—দুটোই লুকিয়ে রাখেন আমার বর্তমান নামের প্রথম দুই আদ্যক্ষরে। এস আর শ্রীনিবাসন—সুবিমল রাজু শ্রীনিবাসন।

দক্ষিণিদের নামের গোড়ার দিকে যে অক্ষরগুলো থাকে, সেগুলো অনেক সময় পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহ, গ্রামের নাম বা নদীর নাম—যেকোনো কিছুই ইন্ডিকেট করতে পারে, জানেন তো?'

'জানি। আচ্ছা, ছবি আঁকাটা কীভাবে এল আপনার জীবনে?' শৌনক প্রায় ইন্টারভিউ নেওয়ার ঢঙে প্রশ্ন করল।

হাসলেন শ্রীনিবাসন। বললেন, 'ছবি তো ছিল আমার রক্তে। আমার বাবা ছিলেন আর্টিস্ট। আঁকা শেখাতেনও। তাঁর এই প্রতিভা টিপি-তে বিশেষ ভূমিকাও নিয়েছিল।'

'কীরকম?'

"বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের শাখা সংগঠনটি তৈরি করেন বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত। যেকোনো অ্যাকশনের আগে আমার বাবা সুবিমল শাসমলের ওপর ভার পড়ত অ্যাকশনের স্পটটা একবার দেখে আসার। তাঁকে দেখে সন্দেহ করার উপায় ছিল না। দেখলে মনে হবে এলেবেলে লোক কোনো। জায়গাটা দেখে নিয়ে বাড়িতে ফিরে ওই জায়গার একটা অনুপুঙ্খ ছবি আঁকতেন বাবা। ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্তকে নিখুঁতভাবে অ্যাকশনের ম্যাপ আঁকতেও বাবাই সাহায্য করতেন। ক্ষিতিপ্রসন্ন ছিলেন দীনেশ গুপ্তের বৌদির ভাই। ক্ষিতিকেই 'বেন্টুভাই' সম্বোধনে দীনেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন ফাঁসির আগে। যাই হোক, বাবার কাছ থেকেই আঁকার ধাতটা আমি পাই। তার পরেও মারি তিরুপতি মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতও বলেছিলেন আমাকে আঁকা শেখাতে। আঁকার মধ্য দিয়েই নাকি আমার হারানো স্মৃতি ফিরে আসবে। তারপর তো বড়ো হয়ে কলকাতা— গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ।"

'বুঝলাম। কিন্তু আপনার বাবাকে মাদ্রাজে চলে আসতে হয়েছিল কেন? সেটা কি শুধুই ডক্টর খামরুইয়ের বাবার পরামর্শ অনুসারে আপনাকে একটা নতুন জীবন দেওয়ার জন্য? যদি সেটাই একমাত্র কারণ হয়, তাহলে আপনার বাবা নিজের নামটাও পালটালেন কী উদ্দেশ্যে?'

'ঠিকই ধরেছেন। সেটাই একমাত্র কারণ ছিল না।'

'তাহলে?' পেখম সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

শ্রীনিবাসন বললেন, 'আসলে আমার বাবা পুলিশের সাসপেক্ট ছিলেন। সে সময়কার দুঁদে আইনজীবী সরকার-পক্ষের অ্যাডভোকেট জেনারেল নগেন্দ্রনারায়ণ সরকার পুলিশ-কাস্টডি থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বের করে এনে আমার বাবার হাত দিয়ে শরৎ বোসের কাছে পাচার করেন।'

'কী জিনিস?' প্রশ্ন করল শৌনক।

'তা আমিও ঠিক জানি না। তবে যে টাঙায় করে ভোররাতে আমার বাবা মুসলমান রমণী সেজে নগেন্দ্রনারায়ণ সরকারের বাড়িতে যান, সেই টাঙার

টাঙাওয়ালা বিশ্বাসঘাতকতা করে। পুলিশের সন্দেহ বাবার ওপর এসে পড়ে, যদিও জোরালো প্রমাণ ছিল না। এমনকি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমার বাবার ওপরে চাপ আসছিল। পুলিশ-কাস্টডির জিনিস বাইরে নিয়ে যাওয়া বে-আইনি। আমি ঠিক জানি না, সেই জিনিসগুলো ঠিক কী ছিল, যার জন্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পুলিশের এত মাথাব্যথা। যাই হোক, চাপে পড়ে বাবা মেদিনীপুর ছেড়ে আমাকে নিয়ে চলে আসতে বাধ্য হন মাদ্রাজে। নতুন নাম নেন—তুইমইয়ানাদু পেরুমল।'

"বুঝলাম। এবার মূল দুটো প্রশ্ন। আপনার জাবেদা-খাতার দুটো এন্ট্রি-সংক্রান্ত। এই দুটো আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। একটা হচ্ছে, আপনি লিখেছেন:'আ স্ট্রেঞ্জার কেম টু মি টুডে। কনভার্সিং উইথ হিম আই রিয়ালাইজড, আই নো নাথিং অফ দ্য স্নেক্স। আই মাস্ট গো টু নাগালোকা!' তার একটু পরেই লিখেছেন: 'হাউ কুড ইউ হাইড দিস ফ্রম মি সো লং? ইউ ইনডিড নিউ এভরিথিং!' কে এসেছিল আপনার কাছে? সাপের ব্যাপারে সে কী বলেছিল আপনাকে? নাগলোক-টাই বা কী? আর কে সবকিছু জেনেও আপনার কাছে সব কথা গোপন করে গেছে?"

শ্রীনিবাস হাসলেন। বড়ো বেদনাতুর, বড়ো বিষণ্ণ সেই হাসি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'সেইখান থেকেই তো আমার গল্পটা শুরু, শৌনকবাবু। সেটা বলতে হলে আরেক রাউন্ড চা দরকার? হবে নাকি আরেক কাপ?'

বেড়ালের মতো মিনমিন করে বলল পেখম, 'আমি আর নেব না। আপনারা খান। আমি বানিয়ে দিচ্ছি,' এই বলে শৌনকের দিকে একটা অদ্ভুত শ্লেষাত্মক খরদৃষ্টি হেনে সে উঠে গেল। ভাবটা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছি তোমাদের কারবার। একজন ধোঁয়া-খোরের সঙ্গে আরেকজন চা-খোরের দেখা হয়েছে!

চা এল। চা খেতে খেতে ধীরে সুস্থে শুরু করলেন শ্রীনি, 'সল্টলেকে একটা ছোটোখাটো দোতলা বাড়ি কিনেছিলাম। বাবা মারা যাওয়ার পর চেন্নাইয়ের পাট একরকম চুকে গেছিল। সল্টলেকের বাড়িতেই আমি দেবলীনাকে নিয়ে থাকতাম। ওই বাড়িটারই একটা ঘর স্টুডিয়ো বানিয়ে নিয়েছিলাম আমি। ট্রেজার প্রোটেকটারের কাজ নিয়ে বসতাম রাত্রে। লীনা ঘুমিয়ে পড়ার পর। বেশিরভাগ দিন নাটকের গ্রুপের রিহার্সাল, ওয়ার্কশপ—এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় রাত্রে খুবই ক্লান্ত থাকত লীনা।'

'টিপি-র ব্যাপারে দেবলীনাকে কখনও কিছু জানাননি?'

'নাহ্। টিপি-র ওথ-অনুযায়ী আমি তা জানাতে পারি না। আপনাকে এত কথা বলছি শুধু এই কারণে যে, এখন টিপি-র অনেকটাই আপনার কাছে এক্সপোজড হয়ে গেছে বলে।'

'বেশ। প্লিজ কন্টিনিউ...' শৌনক বলল।

'হ্যাঁ, তা যা বলছিলাম। ট্রেজার প্রোটেকটারের কাজ চিরকালই গোপন ছিল।

কেউ কাউকে সাক্ষাৎ দেখেনি। নিজেদের পরিচয় দিত চিঠিপত্রে ছদ্মনামে। সম্পূর্ণ নিরীহ লোককে দিয়ে বার্তা পাঠানো হত। হয়তো নিরামিষ সামান্য কয়েকটা শব্দ। সেই শব্দের আড়ালে লুকোনো থাকত একটা ভয়ংকর বার্তা। টিপি-র যে মেম্বারের উদ্দেশে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে, সেই-ই একমাত্র বুঝবে কী অর্থ সেই আপাত-নিরীহ শব্দগুলোর, অর্থাৎ কী কাজের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হচ্ছে। সেই মেম্বরটি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। বার্তাটা যে নিয়ে যাচ্ছে, এমনকি সেও নয়।'

পেখম উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'ইন্টারেস্টিং তো! যেমন...?'

"যেমন ধরো, নিরাপদ জেলেকে বলা হল, কী যে মাছ নিয়ে যাচ্ছ তুমি, নিরাপদ? কেউ শুনতেই পায় না। হেঁকেডেকে বলতে হয় মাছ নিয়ে যেতে যেতে। তবে তো রান্নাঘর থেকে কাজ করতে করতে গিন্নিমা-রা শুনতে পাবেন। নিরীহ জেলে নিরাপদ জিজ্ঞেস করল, কী বলতে বলতে যাব, বাবু? তখন তাকে শিখিয়ে দেওয়া হল, তুমি বলবে 'পেটে ডিমভরা রুই, দাম সস্তা। খলসে, তপসে, মাগুর, কই রাখুন।' কী নিরাপদ, ঠিক পারবে তো? মনে থাকবে? সে ঘাড় কাত করে বলল, পারব। তারপর বক্সিবাজারের গলি দিয়ে সুর করে টেনে টেনে চেঁচাতে চেঁচাতে গেল: 'পে-টে-এ ডিমভরা-আ রুই-ই। দাম্ সসতা-আ। খল্-সে, তপ্-সে, মা-গু-র, কই-ই। রা-খু-উ-ন।' —কিছু বুঝলে?"

পেখম ভাবতে ভাবতে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না তো!' শ্রীনি শৌনকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন।

শৌনক গম্ভীর হয়ে একবার দুবার তিনবার বিড়বিড় করে কথাগুলো আওড়াতে লাগল, 'পেটে ডিমভরা রুই, দাম সস্তা। খলসে তপসে মাগুর কই রাখুন।' তারপর তার মুখে ফুটে উঠল হাসি। বলল, 'বোধহয় বুঝেছি।'

'কী বুঝেছেন?'

'ওই বাক্যটার প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষর নিলে দাঁড়াচ্ছে—'

পেখম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'পেটে ডিমভরা রুই, দাম সস্তা। খলসে তপসে মাগুর কই রাখুন। তাহলে প্রথম অক্ষরগুলো নিলে হচ্ছে—পেডির দাস, খতম কর?'

শ্রীনিবাস বললেন, 'এগজ্যাক্টলি। যে বোঝার সে ঠিকই বুঝবে। পেডির দাস মানে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের খোচর নকুল দাস। ব্যাটা ভয়ানক জ্বালিয়েছিল আমাদের। তাকে সরাতে হয়েছিল দুনিয়া থেকে। এসব আমি আমার বাবার মুখ থেকে শুনেছি।'

পেখম বলল, 'দারুণ ব্যাপার তো!'

'দারুণ। শুধু দারুণ নয়, নিদারুণ। ব্রিটিশের পক্ষে। ভাবতে পারো? একটা সামান্য বাংলা কথা। সুর করে টেনে টেনে বলতে বলতে চলে যাচ্ছে একটা নিরীহ মাছওলা দুপুরবেলায় শহরের গলি দিয়ে। কী সর্বনাশ করে দিয়ে যাচ্ছে ওদের, ওরা জানতেও

পারবে না। কিন্তু এ ব্যবস্থায় অনেক রিস্ক ছিল।'

'কী রিস্ক?'

'রিস্ক হচ্ছে, যে লোকটাকে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমন এক্ষেত্রে নিরাপদ জেলে; ধরো, সে যদি একটু চালাক-চতুর হয় বা সন্দেহ করতে শুরু করে, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাজ ভেস্তে যাবে, দলেরও বিপদ হবে। তাছাড়া এভাবে দলের সলিডারিটিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হচ্ছিলও। আর বার্তাপ্রেরণের জন্য প্রতিবার নতুন নতুন প্ল্যান ইনভেন্ট করাও বেশ ভজকট ব্যাপার। তবু এভাবেই কাজ চালাতে হচ্ছিল। এমনকি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও, এমনকি নয়ের দশকের শেষ অবধি এই পদ্ধতিতেই—'

'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনাদের দলের আর কী কাজ থাকতে পারে? তখন তো ইংরেজ চলে গেছে,' শ্রীনিবাসনকে মাঝপথেই থামিয়ে প্রশ্ন করল শৌনক।

'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের লড়াইটা ছিল প্রধানত পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। আমাদের দলের প্রধান কাজ তো ট্রেজার প্রোটেক্ট করা। তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ট্রেজারটা কী?'

'সেটা আমরাও জানি না। তবে অনুমান করতে পারি, মেদিনীপুর শহরেই কোথাও সেটা রাখা আছে। আমাদের ওপর বিপ্লবীরা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, শহরের কতগুলো জায়গা—যেমন মল্লিকচক, দত্তগলি, মীরবাজার, কর্নেলগোলা— এসব জায়গায় যেন বেশি খোঁড়াখুঁড়ি না করা হয় বা কোনো বড়ো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন না হয়, সেটা দেখতে। সেই করতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ঝামেলা বেঁধেছে প্রোমোটারদের, কখনও লোকাল গুন্ডাদের। তাতে অনেক সময় কাউকে কাউকে দুনিয়া থেকে গোপনে সরিয়ে দেওয়ার চরম সিদ্ধান্তও নিতে হয়েছে।'

শেষ কথাটা বলার পর শ্রীনি চুপ করে গেলেন। শৌনক ও পেখমও চুপ করে রইল খানিক। তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙে শৌনক বলল, 'দত্তগলির মুখেই তো অত উঁচু তিনতলা পার্টি অফিসটা হল। তো তখন আপনারা...?'

শৌনককে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে শ্রীনিবাস বললেন, 'ওখানে কিছু নেই। ঠিক ওখানটায় নয়। আমাদের ওপর নির্দেশ দেওয়া আছে ঠিক কোন স্পটটার আশেপাশে নজর রাখতে হবে।'

'দত্তগলিতে তাহলে কোথায়?'

'দুর্গাপুজো হয় যেখানটায়, ওখানটায় হয়তো কোথাও হবে। কিন্তু এগজ্যাক্টলি কোথায়, তা জানি না।'

'আচ্ছা, বছরের পর বছর এই করে যাচ্ছেন আপনারা, একবারও কৌতূহল হয়নি মাটি খুঁড়ে দেখার?'

'না, হয়নি,' কঠিন স্বরে বললেন শ্রীনি, 'আওয়ারস ইজ নট টু রিজন হোয়াই। আওয়ারস ইজ টু ডু অর ডাই। কিন্তু দলের সেই সলিডারিটি, সেই নীতিবোধ এখন আর বোধহয় রইল না।'

'একথা কেন বলছেন?'

'আগেই তো বলেছি আপনাকে, লোক-মারফৎ খবর পাঠানোর পদ্ধতি ক্রমশই গোলমেলে ঠেকছিল। এদিকে দেশে ইন্টারনেট রেভোলিউশন এসে গেছে। অন্তর্জাল বিপ্লব। আমরা ঠিক করলাম, টিপি-র যোগাযোগের কাজে এবার থেকে নেটের সাহায্য নেব। দলের কম্পিউটার-ইন্টারনেট জানা কয়েকজন নেতা ভিপিএন ইন্ট্রোডিউস করলেন।'

'ভিপিএন?' পেখমের সোৎসাহ জিজ্ঞাসা।

শৌনক পেখমের প্রশ্নের উত্তর দিল, 'ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক। এটা এমন একটা ব্যাপার, যার সাহায্যে ইউজার খুব সুরক্ষিতভাবে নেট ব্যবহার করতে পারে। এটা ইউজারের আইপি অ্যাড্রেস লুকিয়ে রাখে। আইপি অ্যাড্রেস লুকিয়ে রাখায় ইউজারের লোকেশন ট্র্যাক করা যায় না। ভিপিএন ব্যবহারকারীদের কারও ব্যক্তিগত তথ্য তৃতীয় ব্যক্তি পড়তে পারে না। এবং ইউজারের সার্চ হিস্ট্রির তথ্যও চুরি করা যায় না। সব রকমের চ্যাট সুরক্ষিত; এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড। এটা ঠিক যেন একটা ভারচুয়াল লুকোনো সুড়ঙ্গের মতো, যাদের সেই সুড়ঙ্গে নামতে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র তারাই ছদ্মপরিচয়ের মুখোশের আড়ালে পরস্পর বার্তাবিনিময় করতে পারে। টিপি-র পক্ষে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা আর হতেই পারে না। তাই না, শ্রীনিবাসন স্যার?'

'তাই। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, শৌনকবাবু? আমাদের প্রজন্মের অধিকাংশ লোকই এই যান্ত্রিক ব্যাপারগুলোয় সড়গড় নয়। আমি তো নই-ই। একেবারেই টেক-স্যাভি নই আমি। আমার তো এমনকি মেকানোফোবিয়া আছে, বলতে পারেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি, কলকব্জা দেখলে ভয়ই লাগে। আর তাতেই হল মুশকিল।'

'কী মুশকিল হল?'

'রিসেন্টলি যোগা মিস্টিসিজম, কুণ্ডলিনী তন্ত্র, সারপেন্ট-পাওয়ার এসব নিয়ে আমার একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। সরীসৃপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা দারুণ ইন্টারেস্ট। দিনের পর দিন সাপের ছবি এঁকে চলেছিলাম আমি। আর এই ব্যাপারটা লীনা একদম পছন্দ করত না। রাগ করত। সাপের ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে বলত। ওই যে মেয়েদের মধ্যে একটা অতিরিক্ত সেনসিটিভিটি বা স্পর্শকাতরতার ব্যাপার থাকে না? ওটাই। ওর বারণ না শুনলে ও অভিমান করত। এই থেকেই একদিন একটু কথা-কাটাকাটি হয়। একটু উন্মনা হয়ে ছিলাম। সামান্য পানও করেছিলাম।

আর সেই অন্যমনস্কতার ফলেই সেদিন রাত্রে ভিপিএন-এ ঢুকে পা পিছলাল।'

'মানে?'

'আমি ভিপিএন-এ লগ্ ইন করে টিপি-র একজন মেম্বারকে একটা জিনিস আমাদের একটা গোপন আস্তানায় পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিলাম চ্যাট-বক্সে। কিন্তু সেই গোপন আড্ডার অ্যাড্রেস টাইপ করতে গিয়ে ভুল করে আমার সল্টলেকের বাড়ির ঠিকানা টাইপ করে ফেলি। এক মুহূর্তের ভুল শুধু। পরমুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে আসে। এ কী করছি? আমার আসল লোকেশন লিক আউট হয়ে গেল তো! সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্রেসটা ডিলিট করে দিই। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার, হয়ে গিয়েছে।'

'ও হো! সেই মেম্বারটি গদ্দারি করল?'

'না। সে নয়। অন্য একজন লোক। সেই লোক ভিপিএন-এ ঢুকে বসে ছিল আগে থেকেই। সাইলেন্টলি সব ওয়াচ করছিল।'

'বলেন কী? সে কীভাবে সম্ভব?'

'সম্ভব, যদি সেই লোক একজন এক্সট্রা-অর্ডিনারিলি ব্রিলিয়ান্ট হ্যাকার হয়। সাধারণ হ্যাকারের কম্মো নয় সেটা। এইভাবেই সেই মেঘনাদ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থেকে লক্ষ্মণের ডেরার ঠিকানা পেয়ে গেছিল। কিন্তু তখন তো আমি সেটা বুঝিনি...'

'সর্বনাশ!' আচমকা বলে উঠল পেখম।

শ্রীনিবাসন ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ। একদিন দুপুরে আমাদের সল্টলেকের বাড়িতে একজন অচেনা লোক আসে। নাম বলল, বিরহিত সেন। বাড়িতে তখন আমি একাই ছিলাম। লীনা শপিং করতে গেছিল।'

'বিরহিত সেন!' নামটা আপন মনে উচ্চারণ করতেই শৌনকের মনে আরেকটা নাম ঝিকিয়ে উঠল। মেদিনীপুর স্টেশনে তাদের সি-অফ করতে এসে এরকমই একটা নাম বলেছিল না সেদিন দেবলীনা? কিন্তু দেবলীনা নামটা বলেছিল—বিরূঢ়ক সেন। দেবলীনার পূর্বপ্রেমিক। বিরহিত? বিরহী? দেবলীনা-রহিত? আচ্ছা, শোনা যাক!

শ্রীনিবাসন বলে চলেন, 'খুব সুপুরুষ, বলিষ্ঠ, স্মার্ট মানুষটি। আমি দরজা খোলামাত্র আমাকে দেখেই সেই ভদ্রলোক কেমন যেন চমকে ওঠেন। তখন অবশ্য আমি চমকের কারণটা বুঝতে পারিনি। ঘরে এনে বসালাম। বললেন, তিনি একজন শিল্পরসিক। কথা বলে দেখলাম, সত্যিই আর্টের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান। ছবি বোঝেন। আমার পেইন্টিং নিয়েও তাঁর গভীর আগ্রহ। এখন এসেছেন শিলিগুড়িতে আমার ছবির একটা এগজিবিশন করার ব্যাপারে কথা বলতে। শিলিগুড়িতে তাঁর কিছু পরিচিত বন্ধুবান্ধব আছেন। তাঁদের হেল্প নিয়েই এগজিবিশন অ্যারেঞ্জ করবেন বললেন।'

'আপনি রাজি হলেন?'

'হলাম। আমার তাঁর কথাবার্তা ভালো লাগল। ওঁদের টার্মস এন্ড কন্ডিশনসও ভালো। নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে সব করবেন। তবে তখনই কথা দিইনি আমি। ভাবলাম, নতুন স্নেক-সিরিজটা নিয়েই প্রদর্শনী করা যেতে পারে। আরেকটু ভাবি। বিরহিতকে সেকথা আমি বললাম। উনি ছবিগুলো দেখতে চাইলেন। ছবি তো আমার স্টুডিয়োতেই ছিল। দেখালাম। উনি মুগ্ধ হলেন। বললেন, পরে আবার আসবেন।'

'পরে এসেছিল সেই লোক? দেবলীনাকে বলেননি আপনি কিছু এর ব্যাপারে?'

'এসেছিলেন। লীনাকে বলিনি, এমন তো কত লোকই আসে আমার কাছে। তাছাড়া স্নেক-সিরিজটা নিয়ে লীনার প্রগাঢ় আপত্তির কথা ভেবে আর...'

'বুঝলাম। তারপর?'

'দ্বিতীয় দিনে ছবি দেখতে দেখতে সাপের ব্যাপারে এমন আশ্চর্য সব কথা বিরহিত বলতে লাগলেন, যা আমি কখনও শুনিনি। আমি বললাম, সাপ সম্বন্ধে আপনার তো আশ্চর্য জ্ঞান! কীভাবে এত কিছু জানলেন?'

'কী উত্তর দিল লোকটা?'

'বললেন, কিছু মনে করবেন না, শ্রীনিবাসন! আমাদের দেশে সাপ সম্পর্কে প্রায় কিছুই গবেষণা হয়নি। যদিও এটা সাপেরই দেশ। সাপ নিয়ে যদি স্টাডি করতে চান, তাহলে আপনাকে নাগলোকে নিয়ে যেতে পারি।'

'নাগলোক!?'

"হ্যাঁ, তাই তো তিনি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল ছোটোবেলায় শেখা ছড়াটার আশ্চর্য সেই লাইন—'নাগলোকের পেটের ভিতর বিষাক্ত নীল হাওয়া!' সেই নাগলোকের কথা বলছেন নাকি বিরহিত সেন? আমার খুব কৌতূহল হল। তখন বুঝিনি, ওটা একটা সমাপতন ছাড়া কিছুই নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় আপনার সেই নাগলোক? বিরহিত বললেন, ভারতেই। শিলিগুড়ির এগজিবিশন শেষ হলে আমিই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। তবে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন গোপন থাকে। এমনকি বাড়িতেও বলবেন না এব্যাপারে কিছু।"

'আপনি রাজি হলেন? একটা অচেনা লোকের কথায় রাজি হলেন আপনি?' পেখম জিজ্ঞেস করল।

'রাজি হলাম। সেটাই হয়তো আমার নির্বুদ্ধিতা। আমি তো চিরকালই এমনই। খামখেয়ালি। কল্পনাপ্রবণ। আমার মনে হল, ছবির এমন আশ্চর্য উপাদান পাব, এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হল না। ওইদিনই বিরহিত সেন আমার আরও কিছু ছবি দেখছিলেন। ওঁকে আমার আঁকা পুরোনো কিছু ছবিও দেখাচ্ছিলাম। হঠাৎ

একটা ছবি দেখতে দেখতে ওঁর কেমন যেন একটা ভাবান্তর হল, কেমন যেন সচকিত হয়ে উঠলেন বিরহিত সেন ভেতরে ভেতরে।'

'কী ব্যাপার?' শৌনক নড়েচড়ে বসল।

'সেটা একটা ন্যুড ছবি। লীনা রিক্লাইনিং অন আ সোফা। ছবিটা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বিরহিত বললেন, এ ছবি কি আপনার কল্পনা থেকে আঁকা? নাকি মডেল সামনে বসে ছিল? আমি বললাম, মডেল ছিল। ন্যুড ফিগারটার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, এই-ই আপনার মডেল? আমি বললাম, হ্যাঁ। এর বেশি আর কিছু আমি তাঁকে বললাম না। যে একদিন মডেল ছিল, তাকেই যে পরে আমি বিয়ে করেছি, সেসব কথা সঙ্গত কারণেই আমি বিরহিতকে বলিনি। খুঁটিয়ে দেখে বিরহিত বললেন, সাপের ব্যাপার এই মেয়েটিই তো আপনাকে অনেক বেশি ভালো করে বলতে পারত আমার চেয়ে।'

'অদ্ভুত তো!'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন একথা বলছেন, বলুন তো? তিনি বললেন, এই মেয়েটি আসলে সর্পিণী চরিত্রের! দেখছেন না, কীভাবে লতিয়ে বসেছে সোফার ওপর? কেমন এক পা মুড়ে, অন্য পা সামনে প্রসারিত করে, কোমরে বক্ষে শ্রোণিদেশে কেমন পাকে পাকে সর্পিল বিভঙ্গ তুলে? চিবুক আর মুখ ফণার মতো কেমন উপরদিকে তুলে রেখেছে দেখছেন? ঠিক সাপের মতন তো! এরা খুব সুন্দরী হয়। কিন্তু মারাত্মক বিষ! একবার কামড়ালে মানুষের সমস্ত অতীত, যুগযুগান্তের স্মৃতি মন্থন করে নিয়ে যায়...'

'এটা শুনে সত্যিই খুব অবাক লাগছে,' বলল শৌনক।

'আমারও খুবই অবাক লেগেছিল। মনে হয়েছিল, সত্যিই তো, লীনার সঙ্গে প্রথমবার ইন্টিমেট হওয়া মাত্রই তো আমার ছোটোবেলার সমস্ত পাস্ট মেমরি, যা যা আমি ভুলে গেছিলাম, সব ফিরে এসেছিল আমার কাছে। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কীভাবে জানেন এইসব, বিরহিত? মেয়েটিকে চেনেন নাকি?'

'কী বলল সে?'

'বললেন, না, না, পার্টিকুলারলি এই মেয়েটিকে আমি চিনি না। তবে এদের টাইপটা চিনি। নাগপঞ্চাধ্যায়ী বলে একটি রেয়ার স্যাংস্ক্রিট টেক্সট আছে। তাতে এই ধরনের মেয়েদের শারীর-লক্ষণ লেখা আছে। তার সঙ্গে আপনার এই মেয়েটির অঙ্গলক্ষণ সব মিলে যাচ্ছে যে! এরা ছোটোবেলা থেকে সাপ নিয়ে খেলে। সাপের সঙ্গে ঘুমোয়। এই বলেই ছবিটা আবার খুব সন্তর্পণে দেখে মাথা নেড়ে বিরহিত বললেন, এখানে খুব ডিটেইলে বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, দেখুন দেখি মনে করে, এই মেয়েটির বাম হাঁটুর ইঞ্চিখানেক ওপরে একটা ছোটো অথচ গভীর কাটা দাগ

দেখেছেন কিনা আপনি? অনেকটা ঠিক সাপের কামড়ের মতো দেখতে।'

'আচ্ছা! এমন বলল?' খসখসে স্বরে প্রশ্ন করল শৌনক।

'হ্যাঁ, এই কথাটা শুনেই আমি ক্লিন বোল্ড হয়ে গেলাম। সত্যিই তো লীনার বাঁ-পায়ে ওরকম একটা কাটা দাগ দেখেছি। হাঁটুর একটু ওপরে। সেটা তো অন্য কারও জানার কথা নয়। কীভাবে হয়েছিল দাগটা, জিজ্ঞাসা করা হয়নি কখনও লীনাকে। আমি বিরহিতকে বললাম, হ্যাঁ, তা একটা কাটা দাগ দেখেছি বটে। ছোটো অথচ স্পষ্ট। বিরহিত বললেন, ওটাই। অনেকদিন আগে একটা সাপ মেয়েটির হাঁটুর ওপরে দংশন করে। সে সাপটা বিষাক্ত ছিল না তখন। কিন্তু মেয়েটিকে দংশন করার পর সে তীব্র বিষে ভরে যায়। যাই হোক, এসব কথা থাক। কথা হচ্ছে, এই মেয়েটিই তো সাপের সব রহস্য আপনাকে বলতে পারে। যোগাযোগ নেই এখন? সাপ খুব ভালোবাসে তো এই ধরনের মেয়ে!'

শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী বললেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, যোগাযোগ আছে বই-কি! সে আমার এই সাপের ছবিগুলোও দেখেছে। কিন্তু একদমই পছন্দ করে না সে সাপ। ঘৃণায় কুঁচকে যায়। বিরহিত বললেন, হেট্রেড ইজ আ নেগেটিভ অ্যাটাচমেন্ট, ইজন'ট ইট? ঘৃণাও এক বিপরীতমুখী আসক্তি। নয় কি? আর কিছু তিনি বললেন না। উঠে পড়লেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, যদি শিলিগুড়ি যেতে চাই, তাহলে আমি যেন এর পর ফোনে যোগাযোগ করি। বিরহিত চলে যাওয়ার পর কয়েকদিন আচ্ছন্নের মতো ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা নিয়ে। এত কথা কীভাবে জানে লোকটা লীনার সম্বন্ধে? আর আজ এত বছর আমার দাম্পত্য-সম্পর্ক লীনার সঙ্গে, অথচ আমিই কিছু জানি না! লীনা কিছু বলল না কেন আমাকে? আচ্ছা, লোকটার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে লীনাও তো জেনে গেছে আমার সম্পর্কে সব কিছু আমার অতীত-মন্থন করে! অথচ নিজের কথা একবারও ঘুণাক্ষরেও বলল না সে আমাকে? খুব অভিমান হল লীনার ওপর।'

"বুঝলাম। ওই জন্যেই জাবেদা-খাতায় লিখেছিলেন, 'হাউ কুড ইউ হাইড দিস ফ্রম মি সো লং? ইউ ইনডিড নিউ এভরিথিং!' তাই কি?"

'তাই,' কথাটা বলতে বলতে জলে ভরে উঠল শ্রীনিবাসনের চোখ। তারপর চোখ মুছে নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে বললেন, 'যাই হোক। আমি ঠিক করলাম, এই রহস্যময় লোকটা বিরহিত সেন—একে আরও ভালোভাবে জানতে হবে। এর জ্ঞানের আলোকে লীনাকেও তো জানতে হবে আমাকে আরও গভীরভাবে। আর সেই নাগলোক... সেখানেও যেতে হবে ছোটোবেলার ছড়াটার মর্মোদ্ধার করতে। তখন আমার একবারও মনে হল না, উনিশশো তিরিশের একটা ছড়ায় উল্লিখিত

একটা শব্দ—নাগলোক। সেটা এখনকার কোনো জায়গা নাও হতে পারে। ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ সমাপতনিক হতে পারে, সেটা ভাবতেই ইচ্ছে করল না তখন। আসলে আমি যেন বিরহিত সেনের রহস্যময় ব্যক্তিত্বে একেবারে সম্মোহিত হয়ে গেছিলাম। ঠিক করলাম, যাব। ফোনে কথা বললাম বিরহিতর সঙ্গে। সমস্ত পাকাপাকি ব্যবস্থা... সব ফাইনাল হয়ে গেল...' অনেকটা কথা একসঙ্গে বলে এক মুহূর্ত থামলেন শ্রীনিবাসন। টেবিল থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে জল খেলেন এক ঢোক।

তাঁর জল খাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই শৌনক আর পেখম রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে একসঙ্গে বলে উঠল, 'তারপর?'

২৩

সেই পুরোনো অস্বস্তিকর অনুভূতিটা কয়েকদিন থেকে আবার হচ্ছে সাহিলের। মাঝখানে মাসখানেকের ওপর সে দিব্যি ছিল। ট্রেজার প্রোটেক্টারের দিক থেকে তাকে আর খোঁচায়নি কেউ। সে বলে দিয়েছিল, শৌনক তার মেয়ে আর ভাগ্নেকে নিয়ে কাকাতুয়া-বাড়ির একটা ঘর কোচিং-ক্লাসের জন্য ভাড়া নিতে গেছিল, কিন্তু সেই ঘর সে পায়নি। অতএব, শৌনকের ও-বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল নিতান্তই নিরীহ। আর ট্রেজারের লোকেশন সাহিল খুঁজে পায়নি, সেরকম কোনো কিছুর হদিস কোনো পুরোনো কাগজপত্রে বা অন্য কোনোভাবে পেলে, সে নিজেই টিপি-র চিফকে জানাবে। এই সব কথা চিফকে মেসেজ করার পর থেকে কেন জানি, ওদিক থেকে ওরা চুপ মেরে গেছে।

ভালোই হয়েছে। স্বস্তি! কিন্তু আবার অন্যদিক থেকে অন্যরকম একটা অস্বস্তিও যে উঠে আসেনি সাহিলের মনে, তা নয়। কেনই বা ট্রেজার প্রোটেক্টার চিফ হঠাৎ এতটাই চুপচাপ, সে নিয়েও মনটা খচখচ করে চলে বই-কি! তবে সেই খচখচানিকে ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টাই করে গেছে সাহিল এই একমাসে। অনেকটা রিলিফও পেয়েছে। তবু এখনকার অস্বস্তিটা কিন্তু আবার সেই পুরোনো ধরনেরই। মনে হচ্ছে, সবসময় কে যেন তাকে আড়াল থেকে ওয়াচ করছে। এ মুহূর্তে কামালগাজির মোড়ে দাঁড়িয়ে ওই 'কে যেন দেখছে, কে যেন দেখছে' ভাবটা জেগে উঠছে আবার। মনের ভুল? তাই-ই হবে নিশ্চয়ই।

আসলে কোনো খারাপ কিছুরও অনেক ভালো দিক থাকে। মা-কে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে এক পক্ষকাল, মায়ের হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা আজ বহুদিন। মেদিনীপুরে ডাক্তাররা বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। তাঁরা বলছেন আর্থারাইটিস। আয়েশা বেগম নমাজি মানুষ; পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ে তবে জল খান। সেই ব্যাপার সাহিল তার ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছে। এখন নমাজ পড়ার সময় ওঠবোস, হাঁটুর ওপর বসা, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা এগুলো ডাক্তাররা বারণ করলেও মা কিছুতেই বারণ শুনছেন না। সাহিলের মামা আমিরুদ্দিনের বাল্যবন্ধু জনাব মুফতি মহম্মদ সিরাজি খুব বড়ো হাড়ের ডাক্তার, অ্যাপোলোতে বসেন। আমিরুদ্দিন সাহিলকে ফোনে

বললেন, 'আপাকে নিয়ে আয়, মুফতি ডাক্তারকে দেখাব। সোনারপুরেও দেখেন মুফতি ডাক্তার। আমাদের কামালগাজির বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ারও সুবিধা হবে আপাকে।'

এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মনের মধ্যে টিপি-সংক্রান্ত উৎকণ্ঠা চাপা পড়ে গেছে সাহিলের। গত পরশু কলকাতা এসেছে। দ্বিপ্রহরবেলায় পৌঁছাল এসে কামালগাজি। অনেকদিন পর নানি, মামা, মামি আর নানাবাড়ির সবাই সাহিল আর তার মা আয়েশাকে পেয়ে তো আনন্দে অস্থির। নানার এন্তেকাল হয়েছে। নানিরও বয়েস পেরিয়েছে নব্বই। নানাবাড়ির এই হৈচৈ-মাতন সাহিলকে উদ্‌বেগ ভুলিয়ে দিয়েছিল একদম। গতকাল মা-কে নিয়ে যাওয়া হল সোনারপুরে মুফতি সাহেবের ডিসপেনসারিতে। মাকে দেখলেন তিনি, কিছু টেস্ট লিখে দিলেন, অ্যাপোলোতেই পরীক্ষা করালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন। সাহিল আর আমিরুদ্দিন আগামীকাল যাবে অ্যাপোলোতে আয়েশাকে নিয়ে।

আজকের দিনটা ফ্রি; নাস্তা সেরে আটটার দিকে সাহিল বেরিয়েছিল যাদবপুরে এক বন্ধুর ডেরায় ঢুঁ মারবে বলে। কামালগাজির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন, গড়িয়া যাবে অটো ধরে। এই মোড়টায় তিনদিক থেকে তিনটে রাস্তা এসে মিট করেছে, একটা আসছে সোনারপুর স্টেশনের দিক থেকে, আরেকটা আসছে বারুইপুর থেকে হরিনাভি, নরেন্দ্রপুর হয়ে। আর এই দুই রাস্তার সংযোগস্থল থেকে তৃতীয় রাস্তাটি চলে গেছে গড়িয়ার দিকে। কী জন্যে কে জানে আজ প্রচণ্ড ভিড় রাস্তায়, বোধহয় ময়দানে কোনো সমাবেশ আছে, ছোটো ছোটো ট্রাক ভরতি লোক পতাকা-ফেস্টুন নিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। লোকের ভিড়ে থিকথিক করছে বাসগুলো, ট্রাক ছুটে আসছে ধোঁয়া আর ধুলো ওড়াতে ওড়াতে, মায় অটোগুলো পর্যন্ত পেছনে তিনজন সামনে তিনজন তুলে ভোম্বলের মতো চলে যাচ্ছে। গোটা পাঁচেক অটো গেল, আল্লা রে, কী ভিড়, সিট ফাঁকা নেই! এমন জানলে যাদবপুর যাওয়ার প্ল্যান সকালেই বাতিল করত সাহিল।

এই যে সে এখন একা ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এই একা হয়ে গেলেই ওই অনুভূতিটা কেন জানি ফিরে আসে। কে যেন দেখছে তাকে। আরে ধুর, কে দেখবে আর কেনই বা দেখবে? ভয় আর চাপের মধ্যে থাকতে থাকতে এইসব মানসিক রোগ বেধেছে। কাল মাকে অ্যাপোলোতে নিয়ে গিয়ে দেখানোর সময়, ওখানে কোনো ভালো সাইকায়াট্রিস্ট বসেন কিনা, খোঁজ করে দেখতে হবে। শরীরের থরো চেক-আপ করায় মানুষ মধ্যে মধ্যে, মনেরও যে রেগুলার রিপেয়ারিং দরকার, সেকথা এদেশে এমনকি শিক্ষিত মানুষেরাও বোঝেন না।

একটা অটো আসছে, দেখতে পেল সাহিল। ভরতি দেখে ঘাড় ঘুরিয়েই নিচ্ছিল, কিন্তু কামালগাজির মোড় আসতেই পেছনের দিকের সিট থেকে একটা লোক ব্যাগসহ নামল। ঘাড় নীচু করে সাহিল জিজ্ঞেস করল ড্রাইভারকে, 'গড়িয়া?'

চোখের ইঙ্গিতে ড্রাইভার পেছনের খালি সিটটা দখল করতে বলল সাহিলকে। চেপেচুপে কোনোমতে উঠে বসল সাহিল ধারের দিকে। সে লম্বা মানুষ; অটোতে পা ভাঁজ করে ঘাড় বেঁকিয়ে বসা কষ্টকর, কিন্তু এছাড়া এখন আর অন্য কোনো উপায় নেই গড়িয়া যাওয়ার।

মসজিদ পেরিয়ে ফ্লাইওভারের নীচে এসে অটো আটকে গেল ট্রাফিক জ্যামে। দাঁড়িয়েই আছে, দাঁড়িয়েই আছে, গাড়িগুলো আর নড়ে না চড়ে না। মুখ, ঘাড়, গলা দরদর করে ভেসে যাচ্ছে পসিনায়, রুমাল বের করে মুখ মুছতে লাগল সাহিল। কী সুখে যে মানুষ কলকাতায় থাকে? যেমন ভিড়, তেমনই গরম। ধুৎ!

মিনিট কুড়ি জ্যামের মধ্যে অটো আটকে থাকায় পাশ থেকে একজন প্যাসেঞ্জার অধৈর্য হয়ে বলল, 'ভেতরের রাস্তা ধরে যাবেন? এ জ্যাম ছাড়তে তো দুপুর হয়ে যাবে!' সঙ্গে সঙ্গে বাকিরাও লোকটার কথায় সায় দিল। সাহিল কিছু বলল না। সে এদিককার রাস্তা ভালো চেনে না। যাক নিয়ে যেদিক দিয়ে খুশি, গড়িয়া পৌঁছুলেই তার হল। ফ্লাইওভারের মোড় থেকে বাঁদিক দিয়ে নেমে মহামায়াতলার ভেতরদিককার গলির সারিসারি ঘিঞ্জি বাড়িগুলোর মধ্যবর্তী সরু রাস্তা দিয়ে অটোটাকে ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ভিড় এড়ানোর জন্য।

সকাল ন-টা, সোয়া ন-টা হবে, ঠেলায় করে সবজি নিয়ে যাচ্ছে একটা লোক, একটা প্রচার-গাড়ি নানারকম গেরস্থালির জিনিস নিয়ে মাইকে করে চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে, 'হরেক মাল তিরিশ টাকা। দামাদামি করবেন না।' স্কুল-ইউনিফর্ম পরা ছেলেমেয়ের দল স্কুলব্যাগ কাঁধে ঠুমক ঠুমক করে হেঁটে যাচ্ছে বাসস্টপের দিকে। একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে একজন থ্যাবড়া নাক আধবুড়ো লোক তেলচিটচিটে শালপাতার ঠোঙায় ডালবড়া খাচ্ছে, মাটির ভাঁড়ে চা থেকে ধোঁয়া উঠছে পাশেই। চুলে লাল রং করা একটা বছর পঞ্চাশেক বয়সের মানুষ দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'এ বুবলা! ছোটো সিগারেটের প্যাকেটের দাম আরও পাঁচ টাকা বাড়ল কবে থেকে রে?' ছাইয়ের গাদার ওপর দু-তিনটে জিরজিরে কুকুর রেসলিং প্র্যাকটিস করছে ঘেউ ঘেউ। এইসব ছিন্নভিন্ন ছবি আপন মনে অটোর পেছনের বাঁদিকের দরজায় বসে সাহিল দেখে চলছিল।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ নাকে এসে লাগল। বেশ ঝিম-ধরানো ঘুম-ঘুম একটা ঘ্রাণ। অটোর আরোহীরা কেউ পারফিউম মেখেছে নাকি? অথবা এটা আফটার শেভ লোশনের গন্ধ? এতক্ষণ তো গন্ধটা ছিল না। কোত্থেকে এল? রুকশানা একটা বডি-লোশন মাখত, ঠিক যেন অবিকল সেই গন্ধটা। ভাবতে ভাবতে চোখ ঘুমে ঢুলে আসতে লাগল সাহিলের। সে বুঝতে পারছে না, কী হচ্ছে তার। গভীর, নির্ভার একটা ঘুমের ভেতর কেমন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে অটোর সিটে বসে ডুবে যেতে লাগল সাহিল।

কোথা থেকে একটা সাইলেন্সারবিহীন বাইক ঘটঘট্ ঘটঘট্ ঘটররর্ প্রচণ্ড শব্দ করে অটোর পাশ দিয়ে, নাকি তার মাথার খুলির অনিরূপিত অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চক্কর খেতে খেতে চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে কোথায়...

তারপর সে আর কিচ্ছু জানে না। ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। হালকা একটা সাড় তবু মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে তন্দ্রার ভেতর। তাকে যেন উঁচু থেকে নীচুতে নামানো হচ্ছে স্ট্রেচারে করে। আবার উঁচু কোনো তাকে তার শরীরটাকে কাপড় দিয়ে যত্ন করে মুড়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি একটা কাফন? ঘুম, ঘুম...। দুলুনি। দুলতে দুলতে কোথায় যে যাচ্ছে সাহিল! কাদের যেন চাপা স্বরের ফিসফিসানি। দুলুনি ভাবটা আর যেন এখন নেই। আবার নামা, আবার ওঠা। ঘটাং করে কীসের একটা শব্দ! নরম তুলতুলে ভেজা ভেজা কীসের ওপর সে যেন শুয়ে আছে এবার। আহ্, আরাম! আবার ঘুমের মধ্যে নির্বিকল্প ডুবে যাওয়া...

সেই ঘুম ভাঙল জানালা দিয়ে মুখের ওপর রোদ এসে পড়ায়। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসতে গেল সাহিল। পারল না। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। চিত হয়ে শুয়ে বাঁদিকে ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে গেল। এ কোথায় শুয়ে আছে সে? মেদিনীপুরের বাড়ি তো নয়; এ অন্য কোথাও। মাথার ওপর প্লাইউডের ফলস্ সিলিং জায়গায় জায়গায় ঝুলে আছে। সেসব জায়গা দিয়ে নোংরা মাকড়সার জাল আর সিলিঙের ওপরের অন্ধকার ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। পুরোনো দিনের রংচটা সিমেন্টের দেওয়াল, অনেক ওপরে দেওয়ালের গায়ে বৃত্তাকার জানালায় কাচের আবরণ বসানো, ঘরটার দরজা বন্ধ। ভালো করে হুঁশ আসতে সে দেখল, সে একটা তক্তপোষের ওপর বিছানো অপরিষ্কার শতরঞ্জিতে ততোধিক অপরিষ্কার একটা ছেঁড়া বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে। এ কোথায় এসেছে? কে আনল? ধীরে ধীরে গায়ে ব্যথা নিয়েই কষ্ট করে উঠে বসল সাহিল। কিছু মনে পড়ছে না... ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল... মাকে ডাক্তার দেখাতে নানাবাড়ি কামালগাজিতে এসেছিল... নানি, মামি, আমিরুদ্দিন মামা, মুফতি ডাক্তার... ওহ্! তারপর কী যে হল... যাদবপুর যাচ্ছিল সুরজের সঙ্গে দেখা করবে বলে... একটা অটো গড়িয়ার রাস্তায়... তারপর ঘুরপথ দিয়ে যেতে যেতে... ওফ্! সেই গন্ধটা... ঘুম, ঘুম...

একটু ধাতস্থ হতে সময় লাগল সাহিলের। যুক্তিবোধ সময় নিল একটু কাজ করতে। আচ্ছা! তার মানে, কে বা কারা তাকে বেহুঁশ করে এখানে নিয়ে এসেছে। কী তাদের উদ্দেশ্য? ট্রেজার প্রোটেকটারের লোকজন, নাকি অন্য লোক?

এসব ভাবনার মধ্যে হঠাৎ পেচ্ছাপের ঝাঁজালো গন্ধ নাকে এসে লাগল তার। গন্ধটাকে অনুসরণ করে চোখ তুলে দেখল, ঘরের একদিকে একটা বাথরুম; দরজায় ছেঁড়া ত্রিপল ঝুলছে। দুর্গন্ধটা আসছে ওখান থেকেই। আস্তে আস্তে খাট থেকে উঠে

বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সাহিল। কী নোংরা বাথরুম। দোজখ বোধহয় একেই বলে। কোনোমতে শরীরটাকে হালকা করে বেরিয়ে এল সে। দেখল, তক্তপোষের নীচে মেঝেতে একটা বিসলেরির বোতলে জল আর তার পাশে একটা স্টিলের থালা—রেকাবি দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে কেউ। দরজায় ধাক্কা মারল, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ফিরে এসে বোতলটা তুলে জল খেল। রেকাবি উলটে দেখল, কড়কড়ে তিনটে বাসি রুটি আর শালগমের বিস্বাদ তরকারি। মুখে দিতেই গা গুলিয়ে ওয়াক এল। বাথরুমে ঢুকে নোংরা বেসিনের ওপর হড়হড় করে বমি করতে লাগল সাহিল। বমি করে একটু হালকা হওয়ার পর ঘরে ফিরে এসে আবার ঢকঢক করে জল। জলে কেমন যেন একটা তেলতেলে ভাব। নিরুপায় হয়ে তক্তপোষের ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল এবার সে সটান।

জানালাগুলো এত ওপরে যে, বাইরেটা দেখা যায় না, কোথায় আছে কী করে বুঝবে? বাইরে থেকে কোনো আওয়াজটাওয়াজও এই ঘরে আসছে না। এটা শিওর যে, কিছু লোক তাকে কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে এসেছে। টিপি-র লোক হতে পারে, যেহেতু সে ওথ ভেঙেছে দলের সব কথা শৌনককে বলে দিয়ে। অথবা, টিপি-র লোক নয় এরা, এরা সেই জাল-সুশীতলবাবুর লোক। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। চোখ বুজে বারবার আল্লাপাকের দরবারে প্রার্থনা করছে। তার বন্ধ চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছে অসহায়তা ও অনিশ্চয়তাজনিত উদ্‌বেগের যন্ত্রণায়।

কিছুক্ষণ পর দরজার বাইরে একটা অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ পেল সাহিল। ভারী জুতোর শব্দ। ঘটাং আওয়াজ করে দরজা খুলে ঢুকল তিনজন লোক। এদের গায়ে জলপাই রঙের পোশাক। মিলিটারি ড্রেস। মুখ কালো রুমাল দিয়ে ঢাকা। একজনের হাতে একটা ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র। বাকি দুজন মুশকো জোয়ান ঘরে ঢুকেই কোনো ভূমিকা ছাড়াই সাহিলের দুই বাহু চেপে ধরে খাট থেকে টেনে নামাল। তারপর ওর চোখমুখ বেঁধে দুজন লোক হিড়হিড় করে সাহিলকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল ঘরের বাইরের টানা বারান্দা দিয়ে। কালাশনিকভ-ফিফটি-সিক্স হাতে তৃতীয় লোকটা যে ওদের পেছন পেছনেই আসছে, চোখ বাঁধা থাকলেও ভারী বুটের শব্দে তা ঠিকই টের পাচ্ছিল সাহিল।

টানতে টানতে লোক দুটো সাহিলকে একটা আধা-অন্ধকার ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে ঢোকালো। একটা ফাঁকা কাঠের চেয়ারের মাথার ওপর সিলিং থেকে একটা তীব্র আলোকদায়ী বালব ঝুলছে। সাহিলকে ওই ফাঁকা চেয়ারে বসিয়ে চোখমুখের বাঁধন খুলে হাত দুটো চেয়ারের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ওরা দুপাশে সরে দাঁড়াল। কালাশনিকভধারী তৃতীয় লোকটা সাহিলের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের কোণে সামান্য দূরে।

আলো-আঁধারির মধ্যে চোখ সয়ে এলে সাহিল দেখল, তার উলটোদিকে সোফার ওপর কে যেন আরাম করে বসে তার দিকেই নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। ভালো করে সেই লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েই সে চমকে উঠল। নিস্তব্ধতা ভেঙে হিসহিসে গলায় সাহিলকে প্রশ্ন করল সোফায় বসা লোকটা, 'চিনতে পারছ, ইব্রাহিম? অবশ্য তোমার আসল নামটা এখন আমি জানি। সাহিল আল্ ফারাজি। তাই না?'

সাহিলের আতঙ্কপাণ্ডুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'সুশীতলবাবু!'

'হ্যাঁ, ধরে নাও আমিই সুশীতল। না ধরলেও কোনো অসুবিধে নেই। আমার চাই এক্সাইটমেন্ট—উত্তেজনা। ভয় নেই, সাপের খেলা দেখাব না আজ। কয়েকটা জিনিস ক্রস-চেক করে নেওয়ার জন্যেই তোমাকে এখানে নিয়ে আসা। প্রশ্নগুলোর উত্তর লোকখি ছেলের মতো যত জলদি দেবে, তত জলদি বাড়ি ফিরে যাবে।'

'বলো, শৌনক মিত্রর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?'

—আমার স্কুল-লাইফের বন্ধু লিলির হাজব্যান্ড শৌনক।

'লিলিকে তুমি ভালোবাসতে?'

—না, সেই ভালোবাসা নয়। লিলি শুধু আমার বন্ধু।

'বলো, লিলির সঙ্গে তোমার অন্য সম্পর্ক ছিল কিনা?'

—না, না, না!

'লিলির সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল; শৌনক তোমার কাছ থেকে লিলিকে কেড়ে নেয়?'

—না, না, না। একেবারেই না।

'শৌনককে তুমি ঈর্ষা করো? তাকে মেরে ফেলতে চাও?'

—না। কেন ঈর্ষা করব তাকে? সে আমার কী ক্ষতি করেছে?

'তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে লিলিকে শৌনক। তাই না?'

—ককখনো না। আমি লিলিকে ক্লাসমেট ছাড়া আর কোনোদিন কিচ্ছু ভাবিনি।

'তোমার কাছে টিপি-র কী কী কাগজপত্র তোমাকে তোমার বাবা দিয়ে গেছিলেন?'

—যা যা দিয়ে গেছিলেন আব্বা, সব আমি টিপি-র কাছে সাবমিট করেছি।

'তা ছাড়াও আর কী কী কাগজ তোমার কাছে আছে, বলো!'

—আর কিচ্ছু নেই। বিশ্বাস করুন, আর কিচ্ছু নেই।

'ট্রেজার আসলে কী বস্তু? বলো, ট্রেজার কী?'

—জানি না। কোনোদিন জানতেও চাইনি।

'সব জানো তুমি। স-অ-ব আছে তোমার পেটে। বলো, সুড়ঙ্গের লুকোনো মুখ কোথায়? বলো!'

—খুঁজে পাইনি আমি। বিশ্বাস করুন।

'কাকাতুয়া-বাড়িতে কেন গিয়েছিল শৌনক?'

—কোচিং সেন্টারের জন্য ঘর ভাড়া নেবে বলে।

'মিথ্যে কথা! বলো, কেন গিয়েছিল শৌনক?'

—আমি জানি না। আমাকে বলেনি কিচ্ছু।

চোখের একটা অদ্ভুত ইঙ্গিত করল 'সুশীতল' মুশকো জোয়ান দুটোর দিকে। লোক দুটো এগিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে মাথায় মারল সাহিলের। সেই আঘাতে চোখে অন্ধকার দেখল সাহিল। কোত্থেকে একটা জলের মগ থেকে এক ঝটকা জল ছুঁড়ে মারল ওরা সাহিলের মুখে।

দুদিক থেকে প্রচণ্ড ঘুসির আঘাতে কষের কাছটা কেটে গেছে। মুখের ভেতরেও দাঁত বসে কোথাও কেটে গেছে যেন। জিভে রক্তের লবণাক্ত স্বাদ।

'বলো, কাকাতুয়া-বাড়িতে গিয়ে কীসের কাগজপত্র পেয়েছে শৌনক মিত্র?'

—আমাকে কোনো কাগজের কথাই বলেনি সে। আমি জানি না।

পেছন থেকে কী একটা ভারী জিনিস দিয়ে কাঁধের ওপর মারল। চেয়ার সহ মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সাহিল। কপাল-নাক-ঠোঁট থুবড়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। হাঁটুর মালাইচাকিতে বীভৎস যন্ত্রণা হচ্ছে।

চেয়ারশুদ্ধ বাঁধা অবস্থায় তাকে আবার সোজা করে দেওয়া হল।

'তোমার পূর্বতন প্রেমিকা লিলির হাজব্যান্ড শৌনক কাকাতুয়া-বাড়িতে কী পেয়েছে?'

—লিলি আমার প্রেমিকা নয়। বন্ধু। শৌনক ওই বাড়িতে কিছু পায়নি।

'কী খুঁজতে গেছিল?'

—ঘরভাড়া।

'মিথ্যে কথা! বলো, কী পেয়েছে শৌনক?'

—পেলেও আমাকে কিচ্ছু বলেনি।

'সে কিছু বলেনি, অথচ তুমি তাকে টিপি-র সব গোপন কথা বলে এলে?'

—আমি আর চাপ নিতে পারছিলাম না। তাই বলেছি।

'সুড়ঙ্গের মুখ কোথায়?'

—খুঁজে পাইনি।

আবার চোখের ইঙ্গিত করল লোকটা। এবার হাতের বাঁধন খুলে তাকে উঠে যেতে বলল ভয়ালদর্শন রক্ষী। চেয়ারটা সরিয়ে নিল। তারপর সিলিঙের কাছে একটা লোহার রডের দুই প্রান্তে শক্ত করে কাছি বাঁধতে লাগল ওরা। কী করতে চায়? কাছি বাঁধা শেষ হলে সাহিলের জামাকাপড় সমস্ত খুলে উলঙ্গ করে দিল। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে সাহিলের। দড়ির দুটো প্রান্ত ওরা বাঁধতে লাগল সাহিলের দুই পায়ে। তারপর

কপিকল দিয়ে টেনে হেঁটমুণ্ড করে সাহিলকে তারা ঝুলিয়ে দিল রড থেকে। মাথার নীচে একটা মলভরতি টব এনে রাখল কোত্থেকে। মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে সাহিলের। দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ওপর থেকে নীচের দিকে ঝুলতে ঝুলতে রক্তাভ চোখ মেলে সাহিল দেখল, তার চারিদিকে চারটে কয়লার আঁচ দাউদাউ করে জ্বলছে।

সোফার ওপর থেকে এবার উঠে এল প্রশ্নকর্তা। হাতে একটা চাবুক।

'যা জানো, তা সাফসাফ বলবে, সাহিল?'

—যা জানি, সবই বলেছি আপনাকে।

শরীরের ওপর সপাং করে আছড়ে পড়ল চাবুক। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচবার। প্রশ্ন ভেসে এল, 'কাকাতুয়া-বাড়ি থেকে শৌনক মিত্র কী পেয়েছে নথিপত্র?'

—জানি না। জানি না। জানি না।

'আই, ট্রেজার-প্রোটেকটর চিফ সুশীতল, অর্ডার ইউ টু কনফেস। বলো।'

—আপনি আমাদের চিফ নন, আপনি সুশীতলবাবুকে লোপাট করে সুশীতলবাবু সেজে বসেছেন।

কোমরে প্রচণ্ড জোরে একটা লোহার রড দিয়ে যেন মারল লোকটা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সাহিল। কোমরের হাড় ভেঙে গেল মনে হয়। মিলিটারি উর্দি-পরা রক্ষী দুজন দুটো বড় ছুঁচ সাহিলের দুই হাতের নখে ঢুকিয়ে দিল সজোরে। একটা রক্তাপ্লুত জন্তুর মতো সাহিল ভয়ানকভাবে গোঙাতে লাগল।

'লিলিকে ভালো লাগে না তোমার, সাহিল? শি ইজ সো ভলাপচুয়াস! ইজন্ট শি?'

—না। লিলি—বন্ধু।

'শৌনকের কাছ থেকে লিলিকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় না?'

—ন্-ন্না! না!

'আমি তোমাকে হেল্প করব লিলিকে ছিনিয়ে নিতে, কথা দিচ্ছি। শৌনক লাশ হয়ে যাবে। শুধু বলো, কাকাতুয়া-বাড়িতে শৌনক কী খুঁজে পেয়েছে?'

—বলেনি। জানি না।

নাক দিয়ে এবার টপ-টপ করে গরম রক্ত পড়ছে সাহিলের। প্রশ্নকর্তা বলল, 'নামা।'

তখন সেই তিনজন রক্ষী বিশেষ কায়দায় সাহিলকে নামিয়ে সোজা করল। সাহিল মেঝের ওপর দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটু ভেঙে গেছে। পা অসাড়। একটা দানবীয় মুষ্ট্যাঘাত সাহিলের মুখের ওপর এসে আছড়ে পড়ল। চারিদিকে অন্ধকার দেখল সে। শুধু জ্ঞান হারানোর মুহূর্তে শুনতে পেল প্রশ্নকর্তা বলছে, 'এটাকে ঘরে নিয়ে যা। ঢোঁড়া সাপ। এর কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। কিছুই জানে না। ক্রস চেক করার উপায় নেই। ফালতু!'

অনেক রাত্রে সেই নোংরা বিছানার ওপর অপরিসীম যন্ত্রণা নিয়ে সাহিলের জ্ঞান

ফিরল। সে ভাবল, সে মরেই গেছে। এটা কি পরলোক? কিন্তু, না। বাথরুম থেকে ধেয়ে আসা পেচ্ছাপের দুর্গন্ধে তার মনে পড়ে গেল সবকিছু। এরা তাকে ধরে এনেছে কেন? ক্রস চেক করার জন্য? কী ক্রস চেক করবে? কী ইনফরমেশন এরা পেয়েছে শৌনক সম্পর্কে যে, সাহিলকে জেরা করে সেই ইনফরমেশনগুলো মেলাতে চাইছে? কে জানে!

যে লোকটা জেরা করছিল, সেই জাল-সুশীতলবাবুকে নিয়ে ভাবছিল সাহিল। তার জেরার ধরন নিয়ে। আব্বার কাছে শুনেছিল, বিভি-র বিপ্লবীদের এর থেকেও ভয়ংকরভাবে ক্রস-এগজামিনেশন করত পুলিশ। কিন্তু আশ্চর্য এই, এই লোকটার প্রশ্ন করার মধ্যে একটাও স্ল্যাং ওয়ার্ড নেই। না বাংলা, না ইংরেজি। তাহলে কি এ ধরনের কাজ লোকটা নতুন করছে?

বারবার লিলিকে জড়িয়ে প্রশ্ন করছিল কেন লোকটা? যতবার জিজ্ঞেস করছে, লিলির সঙ্গে সাহিলের সম্পর্ক কী, শৌনককে সে ঈর্ষা করে কিনা, ততবার লোকটা ভয়ানকভাবে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। লিলির সঙ্গে কী সম্পর্ক? লিলি তার স্কুলের বন্ধু। খুব ভালো বন্ধু। আর কিছুই না। কী উত্তর লোকটা আশা করছিল তার কাছ থেকে?

কাকাতুয়া-বাড়িতে শৌনক কী পেয়েছে, সেকথা সাহিল কী করে জানবে? শৌনক এমন কিছুই বলেনি তো তাকে! টিপি-র সমস্ত ইনফরমেশন বুদ্ধি করে বের করে নিয়েছিল শৌনক, কিন্তু শৌনক নিজে কেন গিয়েছিল কাকাতুয়া-বাড়ি, কী পেল সেখানে, কিচ্ছুটি বলেনি। ভালোই করেছে শৌনক। সেকথা জানলে সাহিল এই টর্চারের মুখে বলে ফেলতে পারত। একবার টিপি-র ইনফরমেশন শৌনককে বলে দিয়ে গদ্দারি করেছে সে, এখন শৌনকের কথা টর্চারের মুখে এদের বলে ফেললে দ্বিতীয়বার গদ্দারি করা হত। সেই গুনাহ্ থেকে সে অন্তত বেঁচেছে। আল্লাহ্ মেহেরবান!

এই শেষ কথাটা মনে আসতেই সুগভীর শান্তির ভেতর, নীরন্ধ্র ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতে লাগল সাহিল।

২৪

কিন্তু অত সহজে ঘুম আসছিল না এ বাড়ির অন্য একটি ঘরে অন্য একটি লোকের। সেই লোক বিরূঢ়ক।

সন্ধে থেকেই সে মদ খাচ্ছে। অথচ, মস্তিষ্কের একটি কোশেও আচ্ছন্নতা তৈরি হচ্ছে না। এই শেষ রাতেও ঠায় জেগে বসে আছে সে জানালার নিকষ অন্ধকার চোখে নিয়ে। সাহিলকে ধরে আনা বেকার হল। সাহিল আসলে কিছুই জানে না। সত্যসাধন প্রতিহারকে চাপ দিয়ে বিরূঢ়কের লোকজন শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছিল, মেদিনীপুর কলেজের প্রোফেসর শৌনক মিত্র কাকাতুয়া-বাড়িতে গিয়েছিলেন পুরোনো বাড়ি-সংক্রান্ত রিসার্চের কাজে। ও বাড়ির দেওয়াল-আলমারির লকার থেকে তিনি অত্যন্ত পুরোনো কতগুলো চিঠিপত্র নিয়ে গেছেন। ব্যস, আর কিছুই না। এখন সত্যসাধনবাবু সত্যি কথা বলছেন কিনা, সেটা পরীক্ষা করার জন্যেই সাহিলকে তুলে আনা। কিন্তু সব বেকার।

খটকা লাগছে সেখানেই। কে এই শৌনক মিত্র? কোত্থেকে উদয় হল? কেন গেল ওই বাড়িতে? ট্রেজার প্রোটেক্টারের ম্যাপে হাইলি সেনসিটিভ জোন হিসেবে যে ক-টি জায়গা চিহ্নিত, কাকাতুয়া-বাড়ি তার একটা। তার মানে, বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই বাড়ি। এর দেওয়াল আলমারি থেকে পাওয়া একতাড়া জীর্ণ চিঠি হতেই পারে উনিশশো পঁচিশ, উনিশশো তিরিশের। সেসব চিঠিতে থাকতেই পারে লুকোনো সম্পদের সংকেতসূত্র। চিঠি নিয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরেই সাহিলকে শৌনকরা ওদের বাড়িতে ইনভাইট করল। তারই কিছুদিন পর আবার ওদেরই বাড়িতে হাজির হয়েছে দেবলীনা। এবং তারও কয়েকদিন পর শৌনক গিয়েছে মাদ্রাজ। সঙ্গে তার মেয়ে পেখম। মাদ্রাজে ওরা কোথায় কোথায় ঘুরছে—সে খবরও এসে গেছে। সেন্ট থমাস চার্চ, লাজ চার্চ, আইস হাউস, স্নেক পার্ক, কপালীশ্বর মন্দির, মেরিনা বিচ, থিয়োজফিকাল সোসাইটি, পার্থসারথি মন্দির, রামামূর্তি ফাউন্ডেশন, রামমূর্তি ভবন। শেষ দু-জায়গা অড ম্যান আউটের লিস্টে পড়ছে। অন্য জায়গাগুলো ধর্মস্থান কিংবা বেড়ানোর জায়গা। এই শেষ দুটো জায়গা তেমন নয়। হয়তো মেয়ের পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপের খোঁজে ওখানে গিয়েছে শৌনক। হতেই পারে। কিন্তু সেজন্য তো নেটেই

অ্যাপ্লাই করা যায়। তার জন্য ওখানে সশরীরে কেন যেতে হল ওদের? নাকি মাদ্রাজ যাওয়াটা 'রথ-দেখাও হল, কলা-বেচাও হল' টাইপের? বেড়ানোও হল, স্কলারশিপের খোঁজখবর নেওয়াও হল?

শৌনক চিঠিপত্রগুলোতে কী পেয়েছে যদি সাহিলকে বলত, তাহলে এতটা অত্যাচারের পর সাহিল নিশ্চয়ই মুখ খুলতে বাধ্য হত। কিন্তু সাহিল যে কিছুই জানে না, এ ব্যাপারে একরকম নিশ্চিত হয়েছে বিরূঢ়ক। ও-বাড়িতে শৌনক কেন গিয়েছিল, সেটা আড়াল করতে চেয়েছিল সাহিল, ফলস মেসেজ করেছিল, সেটা নির্ঘাত শৌনকেরই পরামর্শে। আর তার থেকে দুটো জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যায়। এক, শৌনক টিপি ও টিপি-র জাল চিফের কথা জেনে গেছে সাহিলের কাছ থেকে। দুই, শৌনক এমন কিছু পেয়েছে ওই বিবর্ণ চিঠিগুলিতে, যা সে হাইড করতে চাইছে। তাই চিঠির কথার কিছুই শৌনক সাহিলকেও বলেনি।

সাহিলকে জেরা করার সময় বারবার সাহিল-লিলি-শৌনকের সম্পর্কটা বুঝতে চাইছিল বিরূঢ়ক। সাহিল যদি লিলিকে ভালোবাসত আর পরে যেহেতু লিলির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে শৌনকের, তাহলে সাহিলের মনে শৌনকের প্রতি একটা প্রতিহিংসার বীজ বুনে দিলে সাহিলের সাহায্যেই শৌনককে সাবাড় করার উত্তেজনা পাওয়া যেত। কিন্তু সাহিল-লিলি-শৌনক আর বিরূঢ়ক-দেবলীনা-শ্রীনিবাসন—এই দুটি ত্রিভুজ সর্বসম নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রথম ত্রিভুজটি আঁকা জরুরিই নয়। লিলি আর শৌনক একটি সরলরেখাংশের দুটি সুস্থির প্রান্তবিন্দু। সাহিল সেখানে ওই সরলরেখার বাইরে পড়ে থাকা একটা স্ক্যাটারড পয়েন্ট মাত্র। ধুৎ!

কথাটা বুঝেও আরও খানিকক্ষণ সাহিলকে রগড়ালো বিরূঢ়ক। কিন্তু কেন? সে কি অবিমিশ্র সুখ পাচ্ছিল ওই প্রশ্নটা করে সাহিলকে: 'লিলির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী, সাহিল?' নাকি, সাহিল উপলক্ষ্য মাত্র? সে আসলে জেরা করছিল নিজেকেই? নিজেকে রক্তাক্ত করে, নিজের হৃদয়ের ক্ষতস্থান খুঁচিয়ে রক্ত বের করে সুখের একটা বিকল্প অনুভব পেতে চাইছিল সে?

সে যাই হোক, এখন তো আর সাহিলকে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এ মুহূর্ত থেকে আর একটিও আলগা পদক্ষেপ নেওয়া চলবে না। ছবির মধ্যে শৌনক এসে ঢুকেছে। এবং শৌনকের মেদিনীপুরের বাড়িতে দেবলীনা। দেবলীনা নিশ্চয়ই ওখানে গেছে শ্রীনি-র শোকে পাগল হয়ে গিয়ে। তারপর? শৌনক কতটা আগ্রহী দেবলীনার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ব্যাপারে? আহ্, কেন যে সে তখন শ্রীনিবাসনের ডেডবডিটা জলের মধ্যে ফেলল? লাশটা পুঁতে ফেলা যেত বা অন্যভাবে গুম করাও যেত তো! সত্যিই লাশ হয়ে গেছিল তো শ্রীনি?

এগুলো বড্ড বোরিং কাজ। পাতি খুন। নিরামিষ অত্যাচার। এগুলোতে কোনো

এক্সাইটমেন্ট নেই। সেরকম ভয়ের দপদপানি নেই বুকের মধ্যে। অ্যাড্রিনালিনের ক্ষরণ নেই সেই মাত্রার। মধ্যে থেকে একগাদা লোক পুষতে হচ্ছে তাকে, টাকা খরচ করতে হচ্ছে জলের মতন। টেররিস্ট গ্যাং-এর সঙ্গে বিরক্তিকর আঁতাতে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। টেররিস্টদের সুকৌশলে টিপি-র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ক্লান্তিকর গেম-প্ল্যান আঁটতে হচ্ছে। এগুলোতে সত্যিকারের উত্তেজনা নেই কোনো। লটস অফ ম্যানেজমেন্ট। সে চেয়েছিল, অত্যাচারের বিশুদ্ধ উত্তেজনা। তার ভাগ্যে কি কোনো বিশুদ্ধ অত্যাচারের সুখও নেই তবে? সবই ভেজাল?

সত্যিকারের উত্তেজনা সে পেয়েছিল বটে সেই শেষবার শ্রীনিবাসনের সল্টলেকের বাড়ির দরজায়। সেই শেষবার। ওহ্! সেও তো মাস চারেক হয়ে গেল।

ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কের অন্ধকার দুনিয়ায় শ্রীনিবাসনের আসল ঠিকানাটা বাই চান্স পেয়ে গেছিল বিরূঢ়ক। শ্রীনিবাসনের একটি মাত্র অসতর্ক পদক্ষেপে। সেই ঠিকানায় রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর সবই ছিল, কিন্তু বাড়ির মালিকের নাম ছিল না। না থাক, তবু ঠিকানা তো পাওয়া গেছেই। হানা দিতে আর অসুবিধে নেই। সেখানে গিয়েই না হয় বোঝা যাবে, 'সুশীতল' নামের আড়ালে প্রকৃতই বিরাজ করছেন কে।

উদ্দেশ্য ছিল, তার এই নিস্তরঙ্গ স্যাঁতস্যাঁতে জীবনটাকে বাঁচিয়ে তোলা, ভয় পাওয়ার আর ভয় দেখানোর উত্তেজনার আঁচে শরীরটাকে মনটাকে সেঁকে নেওয়া, বেঁচে থাকাটাকেই কোনোমতে উপভোগ্য করে তুলে টিপি-র অন্ধকার জগতে নতুনতর উত্তেজনার সন্ধানে পাকাপাকি জাঁকিয়ে বসা। তার জন্য যদি বর্তমান চিফকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সুশীতলবাবু হয়ে বসা যায়, মন্দ কী?

মালিকের নামটা পাওয়া গেল বাড়ির নেমপ্লেটে। এস আর শ্রীনিবাসন। এই নামটা থেকে তখনও কিছুই মনে পড়েনি বিরূঢ়কের। পুরোনো একটা নাম স্মৃতির কোন অতলে তলিয়ে ছিল কে জানে!

দরজা খুলতেই সুপুরুষ হলেও সামান্য জরা-আক্রান্ত একজন বয়স্ক মানুষের দেখা মিলেছিল। মানুষটির কপালে, গালে বলিরেখার ভাঁজ থাকলেও অনেক বছর আগেকার সেই চেহারা এখনও লুকিয়ে যায়নি পুরোপুরি। স্মৃতির হাটে বিষণ্ণ চড়ুইগুলো ছড়ানো ধান খুঁটে খেতে শুরু করেছিল তখনই। মনে হয়েছিল, কী বিচিত্র বিন্যাস-সমবায়ের অঙ্ক এই জীবন। অথবা, একটা ইনফিনিট র‍্যানডম নাম্বার সিরিজের ভেতর একই সংখ্যা বারবার এভাবেই কেন ফিরে আসে?

কিন্তু নিশ্চিত হতে তখনও বাকি ছিল বিরূঢ়কের। দেওয়ালে ঝোলানো নানাবিধ পেইন্টিং আর ড্রয়িং রুমের চেহারা-চরিত্র থেকে লোকটা যে আর্টিস্ট, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে লোকটাকে মাপছিল সে। খামখেয়ালি লোক। ঘটনাচক্রে এই লোক-ই যে টিপি-র চিফ, তা তো ভিপিএন থেকেই জেনে এসেছে সে।

অর্থাৎ, সামাজিক পরিচয়ে দিনের আলোকে যিনি পেশাদার চিত্রশিল্পী এস আর শ্রীনিবাসন, রাতের অন্ধকারে তিনিই ট্রেজার প্রোটেকটর চিফ সুশীতলবাবু। ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড!

তা লোকটি কি বিপত্নীক? না। তাহলে গিন্নিমা-টি কোথায়? জানা গেল, তিনি শপিং-এ বেরিয়েছেন। চমৎকার!

ড্রয়িংরুমে দুজনের জয়েন্ট ফোটোগ্রাফ নেই অবশ্য কোথাও। তবুও মনের অস্পষ্ট ঘুলঘুলি দিয়ে স্মৃতির পেঁচারা বেরিয়ে এসে বৃত্তাকারে তাদের মাথা ঘোরানো, চোখ পালটানো শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। চিনতে পারছে বিরূঢ়ক শ্রীনিবাসনকে, আর তার থেকে অনুমান করে নিতে পারছে, শ্রীনিবাসনের সেই মহিমান্বিতা সুন্দরী সাধ্বী সহধর্মিণীটি ঠিক কে হতে পারেন!

যাই হোক, আপাতত, একটা এগজিবিশনের টোপই ফেলা যাক। ধরা যাক, শিলিগুড়িতে হবে সেই এগজিবিশন। শ্রীনিবাসন রাজি?

রাজি করাতে হলে একটু অভিনয় জানতে হয়, বাবা! একটু আর্টের ফান্ডা ঝাড়তে হয়। একটু খেলিয়ে খেলিয়ে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস লোভনীয় করে তুলতে হয়। তা সেগুলো বিরূঢ়ক পারে।

ভদ্রলোক টোপ খেলেন বলেই মনে হল। নিজের পেইন্টিং-এর কথা বলতে লাগলেন। স্নেক-সিরিজ! দেখি, কেমন ছবি? ছবি হিসেবে বেশ ভালই, কিন্তু সাপের আর কী জানবে এসব লোক?

বিরূঢ়ক বুঝল, সেদিনই এর বেশি আর কিছু হবে না। আরেকটু হোম-ওয়ার্ক করে আরেকবার আসতে হবে।

ফিরে এসে খোঁজখবর নিল বিরূঢ়ক। এস আর শ্রীনিবাসন শিল্পী। মোটামুটি পরিচিতি আছে। এবং এবং এবং তাঁর স্ত্রীর নাম অব্যর্থভাবে দেবলীনা। নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। দেবলীনার ফেসবুক প্রোফাইলও দেখল বিরূঢ়ক। চিনতে অণুমাত্র অসুবিধে হল না। ডিপি-টা বলছে, বসন্ত এখনও তুঙ্গে।

প্রেম বটে! চার বছরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছেড়ে, সমবয়স্ক যুবকটিকে নির্বিচারে পরিত্যাগ করে মাঝবয়েসি এক শিল্পীর প্রেমে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল দেবলীনা। দুজনের বয়েসের ফারাক অনেক। তার পরেও। বইমেলার ভিড়ের মধ্যে একবার বিরূঢ়ক দেখাও পেয়েছিল ওদের এক ঝলক। পাশাপাশি হাঁটছিল। তখনই একবার দেখেছিল সে শ্রীনিবাসনকে। নামটাও শুনেছিল তখনই।

'আমি কেবল একটি দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নীচে; অপূর্ব সে আলো!
স্বীকার করি, দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো

জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিলো চোখ...'

নাহ্‌, বাড়িতে এসে 'ওদের ভালো হোক' বলেনি বিরূঢ়ক মনে মনেও। শুধু স্মৃতিগুলো জালালি কবুতরের মতো মনের আকাশে পাক খেয়েছিল। দেবলীনার সমস্ত অন্তরঙ্গ স্মৃতি উঠে এসেছিল। উঠে এসেছিল তন্নিষ্ঠ দুপুর, শরীরী মুহূর্তের আপাতমধুর কিছু ক্ষতফুল। সেসব স্মৃতি কি নিষ্কৃতি দিয়েছিল বিরূঢ়ককে শ্রীনিবাসনের বাড়ির দরজাতেও এত বছর পর?

আরেকদিন আবার গেছিল বিরূঢ়ক শ্রীনিবাসনের বাড়িতে। দেবলীনা সেদিনও বাড়িতে যে নেই, সেটা জেনেই গেছিল। সেদিনও শ্রীনিবাসনের আঁকা আরও কিছু ছবি দেখছিল। এগুলো পুরোনো ছবি। কয়েকটা ন্যুড হঠাৎ করেই এসে পড়ল। এবার আরও ভালো করে মনে পড়ল সব। ন্যুড মডেলটি অবশ্যই দেবলীনা। দেবলীনা যে এখন শ্রীনির শুধু মডেলই নয়, সে যে স্ত্রীও—সেকথা বেমালুম চেপে গেলেন শ্রীনি। এই ন্যুড ছবিগুলো পাবলিকলি প্রদর্শিতও হয়নি কোথাও। এখনও শ্রীনি ছবিগুলো দেখানোর সময় বেশ তাড়াহুড়ো করছিলেন। যেন এগুলো তিনি বিরূঢ়ককে দেখাতে চাইছিলেন না। ছবি দেখাতে দেখাতে হঠাৎ এসে পড়েছে যেন এগুলো। অর্থাৎ, শ্রীনি দেবলীনার প্রতি একান্তই পজেসিভ।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে উত্তেজনা নয়, মনের অতল থেকে প্রতিহিংসার একটা উদগ্র ইচ্ছা বেরিয়ে আসতে লাগল। একটা সাপ নীচ থেকে ওপরে উঠে এসে বুকের মধ্যে আড়াআড়ি মহা আক্রোশে কামড় দিচ্ছে।

এখন একটা ভয়ংকর মিথ তৈরি করতে হবে। সর্পিণীর মিথ। কেননা, শ্রীনিবাসনের মন প্রাচীনতর প্রজ্ঞায় নিবিষ্ট। আগের দিন তন্ত্র, কুণ্ডলিনী শক্তি অনেক কিছু নিয়েই কথা বলছিলেন শ্রীনিবাসন। তারপর 'চারুকেশবতী' সিরিজের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে মন্দির আর মন্দির। অর্থাৎ শ্রীনিবাস ঐতিহ্যপন্থী। এমন ঐতিহ্যবাদী লোককে ঢপ দিতে হলে দরকার পড়ে একটা কোনো সংস্কৃত টেক্সটের রেডি-রেফারেন্স। নেম ড্রপিং। অতএব, 'নাগপঞ্চাধ্যায়ী'। ওই নামে কোনো বই আছে কিনা, তা থোড়াই দেখতে যাবেন শ্রীনিবাস? বিরূঢ়ক দেখল, বইয়ের রেফারেন্সটা বেশ কাজেই লেগে গেল।

সারা পৃথিবী জুড়ে পুরুষ-আধিপত্যবাদেরই চরম রমরমা বাজার। মেয়েদের সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি—কোনো মেয়ের সঙ্গে সাপের তুলনা, কোনো মেয়ের সঙ্গে পিশাচীর তুলনা—এইসব আজব জিনিস খাড়া করতে করতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনও ক্লান্ত তো হয়নি! অতএব, সেই কল্পিত 'সর্পিণী টাইপ' দাঁড় করিয়ে তার সঙ্গে দেবলীনার নগ্ন প্রতিকৃতিতে উপস্থাপিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তুলনা টেনে শ্রীনিবাসের মনে বেশ একটা ভয়ের আবহ সংরচনা করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না বিরূঢ়ককে।

কিন্তু মিথ রচনায় একটা মুশকিল আছে। কল্পনাশক্তি প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলে

অবচেতনার গহ্বর থেকে বহু বিস্মৃত স্মৃতিকণা উঠে আসতে থাকে। বিরূঢ়কেরও এল। ন্যুড ছবিগুলো দেখতে দেখতে আর মিথ বানাতে বানাতে কখন যেন দেবলীনার বাঁ হাঁটুর ওপর একটা কাটা দাগ দগদগ করে জ্বলে উঠল তার ঘা-খাওয়া মনের ভেতর। সে একটা ভুলে যাওয়া দুপুরের স্মৃতি।

'এখানটায় এমন একটা কাটা দাগ কীভাবে হল তোমার, দেবলীনা?'

'আহা, ন্যাকা! জানে না যেন! হায়ার সেকেন্ডারির শেষ দিন পরীক্ষার পর কে আমাকে সুখসায়র নিয়ে গেছিল সাইকেলে চাপিয়ে? হ্যান্ডেল সোজা হয়নি বাবুর, এদিকে প্রেমিকাকে সাইকেলের সামনের সিটে বসিয়ে চরতে বেরোনোর শখ ষোলো আনা! ল্যাগব্যাগ ল্যাগব্যাগ করতে করতে সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে না পেরে শক্ত পিচ রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলে আমাকে। হাঁটুর ওপর অনেকটা কেটে রক্তারক্তি। অনেকগুলো স্টিচ লেগেছিল। দাগটা রয়ে গেছে।... ভুলে গেছ সব?'

ভুলে কিছুই যাইনি আমি, দেবলীনা! তাই এই শেষ সুযোগটাও হাতছাড়া করব না। হাঁটুর কিছুটা ওপরে। এ এমন একটা স্থান তোমার দেহের যে, অন্তরঙ্গ পুরুষ ছাড়া কেউ হদিস পাবে না। এ জিনিস জানব শুধু, মনে রাখব শুধু আমি আর শ্রীনিবাসন। তোমার এই সংগোপন ক্ষতফুল—এ এখন তোমার শ্রীনি-র দ্বৈপায়ন হ্রদ। যাতে সে ভগ্নজানু দুর্যোধনের মতন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ডুবে থাকবে।

কথাটা উল্লেখ করা মাত্রই কাজে লেগে গেল। ভয়ংকর এক সন্দেহে ধকধক করে উঠল শ্রীনিবাসনের আমন্ড চোখ দুটো।

নিজেকে একটা দুর্বোধ্য রহস্যের চাদরে মুড়ে ফেলতে পেরেছে এবার বিরূঢ়ক। এর আগেই 'নাগলোক' নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়েছে। রহস্যময়তা, লোভ, ভয় আর সন্দেহ এখন শ্রীনিকে রাজি করাবেই।

রাজি হয়েছিলেন শ্রীনিবাসন। শিলিগুড়ির এক পুরোনো বন্ধুকে সামনে খাড়া করে পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে শ্রীনিবাসনের ছবির এগজিবিশন দাঁড়িয়ে গেল। তারপর শিলিগুড়ি থেকে শ্রীনিবাসনকে নিয়ে এল বিরূঢ়ক এখানে। নাগলোকের নিমন্ত্রণে।

নিয়ে এসেছিল রাত্রে গাড়িতে করে। অন্ধকার পাহাড়ি পথ এঁকেবেঁকে চলেছে। উইনডো স্ক্রিনের স্মোকড গ্লাস রাস্তার সমস্ত ডিটেইলস ঢেকে দিয়েছিল। তাছাড়া কফির পাত্রে সামান্য ঘুমের ওষুধ। সেই ওষুধের আবেশে আর সারা পথের ক্লান্তিতে বারবার ঘুমে ঢুলে পড়ছিল শ্রীনিবাসনের মাথা। পথের দিশা দেখে রাখবার অবসর ছিল না।

এখানে এসে রাত্রে ডিনার করার পর থেকেই শ্রীনিবাস তো অস্থির! নাগলোক দেখবার জন্য। এত রাতে তা সম্ভব নয়, কাল দুপুর অবধি অপেক্ষা করতেই হবে—এই বলে শ্রীনিকে কথঞ্চিৎ শান্ত করতে পেরেছিল বিরূঢ়ক। গেস্টরুমে শ্রীনির শোওয়ার ব্যবস্থা করেই নিজের ঘরে চলে এসেছিল সে। সরলতা, অধীরতা—এসব সে এখন

আর নিতে পারে না।
মেরে তো সে এখনই ফেলতে পারে শ্রীনি-কে। কিন্তু তাতে চরম প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। এক ভয়ংকর দৃশ্যের সামনে দাঁড় করাতে হবে শ্রীনিবাসনকে। আতঙ্কে বিস্ফারিত চক্ষু শ্রীনিবাসনকে দেখে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হবে। তারপর মৃত্যুদণ্ড-দান। দেবলীনার হৃদয়ের অবৈধ দখলদারের মর্মান্তিক সমাপন।
পরের দিন দুপুর বারোটার দিকে কটেজের পেছনের ইউক্যালিপটাস আর পাইনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সেই পাথুরে কুয়োটার সিমেন্ট-বাঁধানো পাড়ের কাছে শ্রীনিবাসকে নিয়ে গিয়েছিল বিরূঢ়ক। ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে শ্রীনি-কে নীচে নামতে বলেছিল। বিস্ময়াহত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে শ্রীনিবাসন সন্তর্পণে নামছিলেন সিঁড়ির হাতল ধরে ধরে। তার পেছনে পেছনে নেমে আসছিল বিরূঢ়কও। ভাবছিল, এখন শুধু পেছন থেকে একটি সামান্য ধাক্কা। শ্রীনি-র ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কুয়োর তলদেশে লাশ হয়ে পড়ে থাকবেন শ্রীনি। কিন্তু, না! তাতে সেই কাঙ্ক্ষিত তৃপ্তিটা তো উপভোগ করা যাবে না।
দুজনেই নেমে এসেছিল কুয়োর তলদেশে। অন্যদিন এ জায়গাটা শুকনো খটখটেই থাকে, আজ কিন্তু সামান্য আর্দ্র। পা দেবে যাচ্ছে ভেজা বালুর ভেতর। কুয়োর একদিকের দেওয়ালে খোদিত লোহার দরজাটার গায়ের কম্বিনেশন লক ঘোরাতেই সশব্দে পাল্লাটা বাঁদিকে সরে গেল। বিরূঢ়ক ভেবেছিল, ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ভ্যাপসা গন্ধটাতেই শ্রীনিবাসনের হয়ে যাবে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না দেখে বিরূঢ়ক সামান্য হতাশ হয়েছিল। শ্রীনিবাসন শুধু ভুরু সামান্য কুঁচকে মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'এ যে নাগরাজ বাসুকির গাত্রসৌরভ! চলুন, চলুন। ভেতরে যাই!'
মুখে তাচ্ছিল্যসূচক একটা শব্দ করে ঘরে ঢুকেই সুইচ টিপে একসঙ্গে গোটা তিরিশেক সিয়েফেলের ঝলমলে আলোয় বিরূঢ়ক তার সর্পসাম্রাজ্যকে দৃষ্টিগোচর করে তুলল। সারি সারি ছোটোবড়ো অজস্র কাচের চেম্বারের ভেতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে কালকেউটে, দুধরাজ, কালনাগিনী, গোখরো, শঙ্খচূড়, ব্ল্যাক মাম্বা, গ্রিন মাম্বা, ভাইপারস, ঝুমঝুমি সাপেরা আগন্তুকদের অভিবাদন জানাতে লাগল তাদের ক্ষুধার্ত আক্রোশের ভাষায়।
অবাক হয়ে গেছিলেন শ্রীনিবাসন। মুখেচোখে তাঁর সামান্য ভয়মিশ্রিত মুগ্ধতার অভিব্যক্তি। এই সেই নাগলোক? বিড়বিড় করে কেন জানি বলছিলেন, 'কিন্তু এখানকার হাওয়া তো বিষাক্ত নীল নয়!'
এ কী উলটো বিপত্তি হল রে বাবা, ভাবছিল বিরূঢ়ক! এই বৃদ্ধ সেরকম ভয় পাচ্ছে কোথায়? বিরক্তি সহকারে সে এগিয়ে গেছিল সিমেন্টের চৌবাচ্চার দিকে। পাথরের

স্ল্যাবটা সরাতেই ইঁদুর, ব্যাঙ, বাদুড় ও চামচিকের ঝটপটানি শুরু হয়েছিল। লম্বা চিমটে দিয়ে সেসব খাবার তুলে এনে চেম্বারের মাথার ধাতব ঢাকনি খুলে এক এক করে সাপেদের খাওয়াতেও লাগল বিরূঢ়ক।

কাচের চেম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে শিকারের ওপর শিকারীদের ঝাঁপিয়ে পড়া, আস্ত ইঁদুর এক ছোবলে গিলে ফেলার ভয়াবহ দৃশ্যগুলি সযত্ন অভিনিবেশে বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখ মেলে দেখছিলেন শ্রীনিবাসন। সাপেদের খাওয়াতে খাওয়াতেও সেইদিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল বিরূঢ়কের। সে হতাশ হচ্ছিল। যে ভয় সে দেখতে চেয়েছিল শ্রীনিবাসের মুখে, যা সে উপভোগ করবে ভেবেছিল, সেই প্রত্যাশিত আতঙ্কের লেশমাত্রও দেখতে না পেয়ে একটা সুগভীর বিষাদ, নিখাদ বিমর্ষতা ও তজ্জনিত ক্রোধ জেগে উঠছিল তার মনে।

মিনিট কুড়ি কেটে গেল। শ্রীনিবাসনের মুখে, হাবেভাবে সেই মুগ্ধ বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। অন্য কেউ হলে পাঁচ মিনিটেই অক্কা পেত হার্ট ফেইল করে। পাঁচ মিনিটও লাগত না। কিন্তু এই বুড়ো লোকটা কী আজব! এর কি ব্রেন নেই, নাকি নার্ভই নেই শরীরে?

ভয়ংকর ভাইপার্সের চেম্বারের সামনে চোখ গোল গোল করে শ্রীনিবাসন দাঁড়িয়ে আছেন দেখে অসহ্য বিরক্তিতে বিরূঢ়ক তাঁর কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে উগ্র স্বরে বলল, 'আহ্! কী দেখছেন কী এতক্ষণ হাঁ করে এখানে?'

এমন আকস্মিক উগ্রতার কারণ কী, এক পলক ভাবল বুঝি লোকটা। তারপর মৃদু হেসে নিজের ঘাড় থেকে বিরূঢ়কের হাতখানা আলগোছে সরিয়ে দিয়ে আবেগাপ্লুত স্বরে বলতে লাগলেন, 'দেখছি রং, রং, রং... শুধু রং। আলোর রং। অন্ধকারের রং। সাপেদের গায়ের উজ্জ্বল রং। চকচকে মসৃণ। কালো, খয়েরি, ধূসর, হলদে, সবুজ, নীলাভ সাদা—কতরকমের শেড। ট্রান্সপারেন্ট কালার, ওপেক কালার, সেমি-ট্রান্সপারেন্ট কালার! আর কী ফ্লুইডিটি এদের মুভমেন্টে! এদের আশ্চর্য স্ট্রাকচার, অদ্ভুত ইলাস্টিসিটি। কতরকমের কার্ভ! সার্কল, প্যারাবোলা, এলিপস! আরও কত অসংজ্ঞায়িত সঞ্চারপথ! কী দারুণ গতি! ওহ্, আমি তো এর কিছুই জানতাম না এখানে আসার আগে। আমি আপনার কাছে যে কী ভীষণ ঋণী হয়ে রইলাম, বিরহিতবাবু, আজ দুপুরে, বলে বোঝাতে পারব না,' বলতে বলতে বিরূঢ়কের হাত দুটো শ্রীনিবাসন চেপে ধরলেন অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়।

ব্যাপারটা এবার ভালো করে বুঝতে চাইল বিরূঢ়ক। সাপেদের ভয়ংকর শিকার ধরার দৃশ্য দেখে এ লোকটা ভয় পাচ্ছে না। ছবির উপাদান খুঁজে পাচ্ছে। ঈষৎ তিক্ত স্বরে সে বলল, 'আর সাপের ছোবল মারাটা কেমন দেখলেন?'

'ওই ছোবলটাই তো সব। সারাটা দুনিয়া... আমরা সবাই তো এই ছোবলটাই খেয়ে

বসে আছি। ছোবল খেয়ে আছি বলেই তো আমাদের চোখে এত রূপ, এত রং। ছোবল না মারলে আমাদের মন সাদা ক্যানভাস হয়ে যেত যে। কিন্তু ক্যানভাস আর তার ওপর চাপানো এই সব রং আলাদা তো করা যায় না। যেমন এই সাপ আর তার আঁকাবাঁকা চলন, কেউ আলাদা করতে পারবে? তবে কী জানেন, সাপেরই এই আঁক-বাঁক। আঁক-বাঁকের সাপ নয়। ক্যানভাসেরই ছবি। ছবির ক্যানভাস নয়। অদ্ভুত।'

লোকটার কথা শুনে তক্ষুনি ওকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছিল বিরূঢ়কের। অথবা, পকেট থেকে স্প্রে-টা বের করে এনে ওর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে ব্ল্যাক মাম্বার খাঁচাটা খুলে দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে খতম। কিন্তু সেটা সে করতে পারছে না শুধু একটাই কারণে। মনের ভেতর কী একটা প্রবল খটকা লেগেছে তার। উত্তেজনা তাহলে শুধু ভয় থেকেই আসে না। আনন্দ থেকেও আসতে পারে। এই লোকটার আনন্দ-উজ্জ্বল জগৎ-টা ঠিক কেমন, জানবার উদগ্র আগ্রহ হচ্ছিল।

আনন্দ থেকে যে উত্তেজনা আসে, তা কি একেবারেই জানত না বিরূঢ়ক? জানত তো। সেকথা সেও জানত একদিন। কিন্তু সেসব যেন পূর্বজন্মের ম্লান হয়ে আসা স্মৃতি। সেসব স্মৃতি তাকে উপহার দিয়ে দেবলীনা চলে গেছে তার জীবন থেকে অনেক বছর আগে। এখন সেসব বিবর্ণ হয়ে আসা অ্যালবাম খুলতেও ইচ্ছে করে না।

তাই শ্রীনিবাসনের অত্যুজ্জ্বল ভাবভুবনকে জানবার আগ্রহটুকুও তার নিভে এল শ্রীনিবাসকে নিয়ে কুয়ো থেকে উঠে আসবার কিছু পরেই। দুপুর ধীরে ধীরে বিকেল হল। অপরাহ্নের নিভে আসা রোদের মধ্যে বসে বসে বিরূঢ়কের মনে হচ্ছিল, এবারও বোধহয় সে হেরে গেল। হেরে গেল শ্রীনিবাসের রূপদর্শী চোখের কাছে। অথচ এই পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না সে। কেন বারবার তাকেই শুধু হেরে যেতে হবে? কেন?

বিকেলে চা খেতে খেতে শ্রীনিবাসন বললেন, 'দেখা তো হল নাগলোক! আশ্চর্য আপনার কালেকশন। অপূর্ব, অদ্ভুত। এবার তাহলে বাড়ি ফিরে যাই। এ জায়গাটা শিলিগুড়ি থেকে কতদূরে? আসার সময় গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বেমালুম।'

বাড়ি যাওয়াচ্ছি তোমাকে। দাঁতে দাঁত চেপে রাগ চাপতে চাপতে বিরূঢ়ক ভাবছিল, ওসব মুগ্ধতা, আনন্দ, বিস্ময়, আর্ট-ফার্ট—ওসব তার মতো পরাস্ত মানুষের জন্য নয়। ওসব রংমহলের দরজা আজ বহুদিন হল তার চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেছে। ওসবের নাগাল পাবে না সে আর। শ্রীনি-ই কি পেতেন দেবলীনাকে সব ভাবে সব রকমে আস্বাদ না করলে? মানুষ অথবা মৃত্যু—এ দুয়ের মধ্যে যে কেউ দেবলীনাকে বুক থেকে উপড়ে নিয়ে চলে গেলে শ্রীনি-ই কি বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন তাঁর এই দেখার চোখ? পারতেন না। রং-রেখা সব নিভে গিয়ে থিব্‌সের অন্ধ প্রফেট টিরেসিয়াসের মতো, তৃষ্ণার্ত ট্যান্টালাসের মতো জীবন্মৃত হয়ে দিন কাটাতেন শ্রীনিবাসন। তখন শ্রীনিবাসনই

হয়ে উঠতেন আরেকজন বিরূঢ়ক—অন্ধকার জগতের মধ্যে একটু ভয়, একটু আতঙ্কের জন্য স্পৃহাশীল।

তাহলে শ্রীনিবাসনের মধ্যেই তো বিরূঢ়ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। আর বিরূঢ়কের মধ্যে ছিল শ্রীনিবাস হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। ছিল? এখন নেই? এখনও তা আছেই তো! যদি এই মুহূর্তেই বিরূঢ়ক শ্রীনি-র কাছ থেকে দেবলীনাকে ছিনিয়ে নিতে পারে, তাহলে এখনই তো ভূমিকা বদল হয়ে যেতে পারে। দেবলীনাহীন শ্রীনি-ই তখন বিরূঢ়ক হয়ে বাঁচবেন, দেবলীনা-অন্বিত বিরূঢ়ক হয়ে উঠবে শ্রীনিবাসন। অর্থাৎ বিরূঢ়কের দেহের ভেতর তখন দেবলীনার উত্তাপে জন্ম নেবে শ্রীনিবাসের আলোকিত সত্তা। আর শ্রীনিবাসের শরীরের ভেতরটা দেবলীনাকে হারিয়ে হয়ে যাবে আজকের বিরূঢ়কেরই মতো অন্ধকার। কিন্তু তাহলেও তো একভাবে বিরূঢ়কই বেঁচে থাকল। বেঁচে থাকল শ্রীনি-র শরীরের ভেতর। কিন্তু বিরূঢ়ককে তো বাঁচতে দেওয়া যাবে না আর। বিরূঢ়ককে মারতে হবে। মারতে হলে শ্রীনিবাসনের শরীরটাকেই একেবারে নিঃশেষ করে দিতে হবে। এবং তা আজই।

'কাল চলে যাবেন। আজ রাতটা এখানে থেকে যান,' চায়ের কাপটা টিপয়ে রাখতে রাখতে যোগ করল বিরূঢ়ক, 'কটেজের পেছনে একটা দুর্দান্ত পাগলা-ঝোরা আছে। গরমকালে শুকিয়ে যায়, আবার প্রবল বর্ষায় ভরা নদী হয়ে যায় সেটা। এখন ওখানে হবে পাঁচ-ছয় মানুষ জল। গভীর খাদের মধ্য দিয়ে সেই ধারাস্রোত কোথায় যে গিয়েছে! যাবেন নাকি ওদিকে একবার বেড়াতে?'

আনন্দিত শিশুর মতো তখনই রাজি হয়ে গেছিলেন শ্রীনিবাসন।

চারিদিকটা সবুজ হয়ে আছে। সত্যিই নদীর মতন ক্ষিপ্র কলনাদী হয়ে উঠেছে ঝোরাটা। স্রোতের ধারে অস্তায়মান সূর্যের আভায় আলোকিত দুটো পাথরের ওপর মুখোমুখি ওরা বসেছে। আরেকটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। পাখিদের অবিশ্রান্ত কলতান।

'এটা একটা ফরাসি পারফিউম। ভালো লাগবে গন্ধটা আপনার। দিই?' বিরূঢ়ক বলল।

হাসি-হাসি মুখে শ্রীনিবাসন বললেন, 'দিন!'

শ্রীনিবাসনের গায়ে একটু ভালো করেই স্প্রে করে দিল বিরূঢ়ক। এখন অপেক্ষা শুধু।

এই জায়গাটায় মাটির নীচ দিয়ে একটা পাইপ গিয়েছে। পাইপটার অপর প্রান্ত চলে গেছে সেই পাতালঘরে। ওই প্রান্তের মুখটা ঠিক ভাইপারের খাঁচার ওপরে লাগানো। এমনিতে পাইপের ওইদিকের মুখ বন্ধই থাকে। আজ ওটা এখানে আসার আগে এক ফাঁকে খুলে দিয়ে এসেছে বিরূঢ়ক।

তা পাইপ উন্মুক্ত থাকলেই যে সাপ সেই পাইপের মধ্য দিয়ে এখানে উঠে আসবে, তেমন নয়। এমনিতে সাপ খুব অলস প্রাণী। সেই জন্যেই শ্রীনিবাসের গায়ে আলফা ও

বেটা-পারভালবুমিনস-সমৃদ্ধ স্প্রে-টা ছড়িয়ে দিতে হয়েছে। এর আকুল করা গন্ধ পাইপ বেয়ে নেমে গিয়ে ভাইপার-টাকে পাগল করে দেবে। শিকারের লোভে কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে আসবে সে গন্ধ অনুসরণ করে।

বিরূঢ়ক অপেক্ষা করছিল। পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট। কিন্তু কই কিছুই তো হচ্ছে না? বর্ষার জলের সঙ্গে কাদামাটি ঢুকে বন্ধ হয়ে গেছে নাকি পাইপটা? কোথাও আটকে রয়েছে মাটির ভেতর? কান খাড়া করে বিরূঢ়ক শুনতে চাইল মাটির নীচে কোনো ভয়াল পাতালনাগের ক্রুদ্ধ গর্জন।

কিন্তু, না। কোনো শব্দ নেই। একটুও নড়ন-চড়ন নেই। সময় চলে যাচ্ছে। কিচ্ছু হচ্ছে না। ধুর, এ লোকটা মনে হয় সাপেরও অখাদ্য! শ্রীনিবাস মরছে না। ফলত বিরূঢ়ক বেঁচে থাকছে।

'কিছু কি ভাবছেন?' শ্রীনিবাস হেসে প্রশ্ন করলেন।

'ভাবছি একটা কথা। এমন সন্ধ্যায় সেসব ভাবনারা আসে...' দূরের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে উদাসীন স্বরে উত্তর দিল বিরূঢ়ক।

'কী ভাবছেন?'

'কতগুলো কথা জমে আছে। কাউকে বলা যায় না,' বিরূঢ়কের কণ্ঠস্বর তলিয়ে যাচ্ছে আলো অন্ধকারের ভেতর।

'বলুন না আমাকে। নিঃসঙ্কোচে বলুন। যদি বলতে পারেন... যদি হালকা হতে পারেন...'

'আপনাকে বলা তো আরোই কঠিন,' বিরূঢ়কের গলা কাঁপছে।

'কঠিন? আমাকে বলা? কেন? কী হল হঠাৎ আপনার?'

'কারণ সেসব ঘটনার সঙ্গে, আমার সঙ্গে আপনিও জড়িয়ে আছেন যে!'

ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন শ্রীনিবাসন কথাটা শুনে। বললেন, 'আমি? কীভাবে? আপনার সঙ্গে তো আমার কয়েকদিন মাত্র হল পরিচয়!'

'পরিচয় কয়েকদিনের হলেও, সম্পর্কটা অনেকদিনের। ছায়া আর কায়ার মতো।' বিরূঢ়কের কথা ক্রমশই আরও রহস্যময় হয়ে উঠছে।

ব্যাকুল হয়ে বললেন শ্রীনি, 'কী বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। সহজ করে বলুন না।'

'বলতে পারি, তবে এক শর্তে।'

'কী শর্ত?'

প্রশ্নটা শুনতে পেয়েও একটুক্ষণ ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকল বিরূঢ়ক। তারপর পাগলা-ঝোরার হাওয়ায় শব্দগুলো ভাসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কথাগুলো শোনার পর আজ রাত্রির মধ্যেই সেসব কথা আপনাকে ভুলে যেতে হবে। কাল সকালে সূর্য উঠলে রাতের অন্ধকারের সঙ্গে এসব সংগোপন লজ্জার কথা ধুয়ে মুছে ফেলে আপনাকে ফিরে যেতে হবে কলকাতা। আর কখনও আমাদের দেখা হবে না। কোনোদিনও না।

বাড়ি ফিরেও কাউকে কোনোদিন এসব কথা বলতে পারবেন না আপনি। এমনকি দেবলীনাকেও নয়।'

চমকে উঠলেন শ্রীনিবাসন। বললেন, 'দেবলীনা? তার নাম আপনি জানলেন কী করে?'

'দেবলীনা—আপনার স্ত্রী?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাকে আপনি কীভাবে...?'

'বর্ধমানের মেয়ে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাকে আপনি...?'

'কলকাতায় মাস্টার্স করতে এসে দেবলীনার আপনার সঙ্গে পরিচয়?'

'হ্যাঁ তো! ঠিকই। কিন্তু তাকে...?'

প্রশ্নটা লুফে নিয়ে উত্তর দিল এবার বিরূঢ়ক, 'আমি কীভাবে চিনলাম? তাই তো? কারণ, আমিও বর্ধমানেরই ছেলে। সেখানে পড়াশোনা শেষ করে আমিও কলকাতায় আসি হায়ার স্টাডিজের জন্য।... কতদিনের বিবাহিত জীবন আপনাদের?'

'হবে তা পঁচিশ বছরের কম-বেশি। কেন বলুন তো?' গলায় একটা দ্বিধা ফুটে উঠল কোথাও।

'আমি দেবলীনাকে জানতাম। অনেকদিন আগে...' বিরূঢ়ক শান্ত স্বরে কথাটা বলে নিস্পন্দ বসে রইল।

'কতদিন আগে?'—গলাটা কি একটু কেঁপে গেল শ্রীনিবাসের?

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার বছর চারেক আগে থেকে। আমি দেবলীনাকে অনেকটাই জানি। জেনেছিলাম। আই মিন, অ্যাকচুয়ালি আই নিউ হার!'

বিরূঢ়কের উচ্চারণের ভেতর কী যেন ছিল। শ্রীনিবাসন সহজ হতে চাইলেন, 'ও আচ্ছা! একই স্কুলে পড়তেন, নাকি?'

'তা পড়তাম। তবে এক ক্লাসে নয়। আমি এক বছরের সিনিয়র। দেবলীনাকে টিউশনও পড়িয়েছি। তারপর আমি কলকাতা এলাম পড়তে। দেবলীনাও এল এক বছর পর। প্রায় রোজই দেখা হত।'

'ও,' শ্রীনি সংক্ষেপে এটুকু বলেই চুপ করে রইলেন। বিরূঢ়কও চুপ করে আছে। শ্রীনিকে ভাববার সময় দিচ্ছে।

খানিক পরে নীরবতা ভেঙে ধীরে ধীরে নীচু স্বরে বিরূঢ়ক বলল, 'আপনি এই মুহূর্তে যা ভাবছেন, তা একান্ত অসত্য নয়। হ্যাঁ, আমাদের দুজনের দুজনকে ভালো লাগত।'

শ্রীনিবাসন নিস্পৃহ স্বরে বললেন, 'তা হতেই পারে। ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ ধরনের ভালো-লাগা তো তৈরি হতেই পারে।' কথাটা বলেই শ্রীনিবাসন মুখটা নামিয়ে নিলেন। মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন অন্যমনস্কভাবে।

'শুধু ভালোলাগাই নয়, শ্রীনিবাসন। আরও কিছু। ওর ঠোঁটের ওপরের কাটা দাগটার ব্যাপারে আমি আপনাকে মিথ্যেমিথ্যিই একটা মিথ বানিয়ে বলেছিলাম। ওই দাগটা... দাগটার ভূগোল... দাগটার ইতিহাস আমার খুব চেনা যে।' আবিষ্ট স্বরে বলে উঠল বিরূঢ়ক।

এবার উত্তেজিত হয়ে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন শ্রীনি, 'কী বলছেন কী আবোল-তাবোল এসব আপনি তখন থেকে? এসব হতেই পারে না... যদি হত, আমি ঠিক জানতাম। আমাকে দেবলীনাই সব বলত। কিন্তু কই, দেবলীনা তো কখনও আমাকে তার পূর্বজীবনের...?'

মৃদু হেসে বাকি কথা পূরণ করে দিল বিরূঢ়ক, '...প্রেমের কথা বলেনি। তাই তো? সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

'স্বাভাবিক হত, যদি আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো লুকোছাপা থাকত। বাট উই আর অ্যাবসোলুইটলি ওপন টু ইচ আদার!' কণ্ঠস্বরে এবার প্রচণ্ড রাগের ঝাঁজ বেরিয়ে এল।

'আপনি যতটা উন্মুক্ত, দেবলীনাও কি ততটাই উন্মুক্ত আপনার কাছে? আপনি কি জানেন, দেবলীনাকে একবার অ্যাবরশন করাতে হয়েছিল। সে অবশ্য আপনাদের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার আগে।'

'না, না, এ হতেই পারে না। আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাব', ক্রুদ্ধ শ্রীনিবাস এবার জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো উঠে দাঁড়াতে গেলেন।

মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করে বিরূঢ়ক বলল, 'বসুন, বসুন। এখনও কিছুই তো বলা হল না। আমাকেই তো তার আগুন নেভাতে হত তখন। রেগুলারলি। তাতেই তো দুর্ঘটনাটা ঘটে। বললামই তো, আগুনটার ঝাঁজ আমি জানি। আই নিউ হার বিফোর ইউ নিউ!'

শ্রীনিবাসন মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন, 'হোক। সেটা লীনার পাস্ট। সেকথা সে আমাকে বলুক আর না বলুক। আমি আর কোনো কথা...'

'এখনও নেভাতে হয় আমাকেই তার আগুন। নিয়মিত,' নিরুত্তাপ গলায় নিষ্পলক চোখে শ্রীনিবাসনের দিকে তাকিয়ে বলল বিরূঢ়ক।

চেঁচিয়ে উঠে বললেন শ্রীনি, 'আপনি কিন্তু এবার বাড়াবাড়ি করছেন। সব কিছুর একটা লিমিট আছে। তাছাড়া আমার স্ত্রীর সম্পর্কে আপনি এরকম...' কথা আটকে যাচ্ছে শ্রীনি-র। কোনোমতে শেষ করলেন কথাটা, 'না, না, আমি বিশ্বাস করি না। একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি আপনার। তাহলে... তাহলে আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতাম, জানতে পারতাম।'

'ক-টা কথা আপনি জানেন, শ্রীনিবাসন? আপনি বেখেয়ালি মানুষ। কখন বলতে কখন হুট করে নিরুদ্দেশে চলে যান। দিনের পর দিন। আর তখন...'

'কী বলতে চান আপনি?' এবার গলায় যেন আর সেই জোর নেই।

'যা বলতে চাই, তা খুব স্পষ্ট। এটা একটা স্বীকারোক্তি। আপনার মতো সরল মানুষের কাছে। কনফেস করে পাপস্খালন। আজকের পর থেকে দেবলীনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখব না আমি।... কেন বুঝছেন না, আপনার পক্ষে ওই আগুন নেভানো সম্ভব ছিল না? ওর আর আপনার বয়সের তফাতটা নিয়েও তো একটু ভাববেন?'

'আমি ভাবতে পারছি না...' শ্রীনি-র গলা বিকৃত শোনাল, তিনি প্রবলভাবে কাশতে কাশতে বললেন, 'আমাকে... লীনা আমাকে কিছু বলল না কেন? হ্যাঁ, ওর তো সেই প্রয়োজন হতেই পারে। কাঁচা বয়েস। কিন্তু আমাকে... আমাকে সেকথা একবার বলার প্রয়োজন বোধ করল না লীনা? সব খুলে বললে আমি কি ওকে বারণ করতাম? খারাপ ভাবতাম? আমি তো কখনও ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিনি। ওহ্!' বলতে বলতে যেন হাত-পা অবশ হয়ে এল শ্রীনিবাসনের।

"আপনি বাড়ির বাইরে গেলেই আমাকে আপনাদের বাড়িতে আসতে হয়। এখনও। দেবলীনাই ফোন করে ডেকে নেয়। এখনও। সহজে সে নেভে না, শ্রীনি। একদম গনগনে। সেটা আপনিও যেমন জানেন, আমিও জানি। আপনার আগে থেকেই আমি জানি। কিন্তু কতদিন, কতদিন এভাবে চলতে পারে, বলতে পারেন শ্রীনিবাসন? আমাকেই যদি সব দায়িত্ব নিতে হয় ওর, তাহলে আমার সঙ্গেই ঘর বাঁধল না কেন দেবলীনা? আমিই বা কেন 'আপনি' হলাম না? আপনাকেই বা এতদিন আপনার সতীসাধ্বী স্ত্রী সেজে দেবলীনা ঠকিয়ে গেল কেন? আপনি বাড়িতে কিছুদিন না থাকলেই আমাকে ডেকে নিয়ে আজ বিশ বছরের ওপর সে তার শরীরের খিদে মিটিয়ে চলল, আর আপনি বাড়িতে ফিরলেই আপনার দেওয়া শাঁখা-সিঁদুর আর গরদের শাড়ি পরে ঠাকরুনটি সেজে মন্দিরে আপনার নামে পুজো দিয়ে এল। এই লুকোনো নাটক এবার শেষ হোক। এটুকুই শুধু আমার বলার ছিল আপনাকে। বলে দিলাম। আজ থেকেই আমার আর দেবলীনার সম্পর্কের ইতি। আপনারা ভালো থাকুন।"

'আমি শুধু ভাবছি...' কথা জড়িয়ে এল শ্রীনি-র, 'আ-আমিই বোকা। আমিই ক্-কিছু জানতাম না এতদিন...' নিজের বুকের কাছে শার্টটা খামচে ধরলেন শ্রীনিবাসন।

'অথচ দেবলীনা সব জানত আপনার সম্পর্কে। আপনাকে মন্থন করে, আপনার শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে, আপনাকে শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে সে জেনে নিল আপনার সমস্ত অতীত। অথচ তাকে মন্থন করে আপনি কিছুই জানতে পারেননি এতদিনেও। হাঃ! রিডিকিউলাস!'

'আমার অতীত? আমার কী অতীত জেনে গেছে লীনা?' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীনিবাসন।

'বসুন, বসুন, সুশীতলবাবু! উত্তেজিত হবেন না। কী? নামটা ঠিক বললাম তো?' ক্রূর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল বিরূঢ়ক।

আতঙ্কে শিউরে উঠলেন শ্রীনিবাসন, 'কিন্তু আপনি কেমন করে...?'

'দেবলীনাই বলেছিল আমাকে, আপনার সম্পর্কে সব খবর নিতে। কোথায় কোথায় চলে যান হঠাৎ হঠাৎ? আপনাদের ভিপিএন আমিই হ্যাক করি। সাপের পেইন্টিং নিয়ে দেবলীনার সঙ্গে আপনার মতান্তর আমিই বাধাই। অনুমান করতে পারি, তার থেকেই আপনার অন্যমনস্কতা এবং তারপর...। আপনিই তো ট্রেজার প্রোটেকটার চিফ, তাই না? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আপনারা তলে তলে অনেক কিছুই তো করেছেন। প্রোমোটার-রাজ ঠান্ডা করেছেন মেদিনীপুর শহরে। আর তার জন্য বেশ ক-টা খুন হয়েছে। সেগুলো লোকে পোলিটিকাল মার্ডার বলেই জানে। সেই খুনগুলোর নির্দেশও তো আপনি ছাড়া অন্য কেউ দেননি, নয় কি? যাকগে, সেসব আমি চেপে যাব। আপনি ভাববেন না। কেউ জানবে না। যেমন আমার কথাও আপনি জানাবেন না কাউকে...'

খুব দ্রুত শ্বাস নিতে নিতে শ্রীনিবাসন বললেন, 'আমাদের সেই অ্যাকশনের কথা কেউ জানলে, জানুক। কী আর হবে? আমার বিরুদ্ধে মামলা হবে, আমার ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হবে। আর কী? কিন্তু আমার কনসায়েন্স ক্লিয়ার। পুঁজিপতিদের সরিয়ে দিয়ে কোনো ভুলই আমি করিনি... কিন্তু লীনা? লীনা আমাকে এভাবে ঠকাল? সারা জীবনভর তাকে ভালোবাসলাম, আর সে...?' শেষ শব্দগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে তাঁর গলা চেপে এল।

যে-মানুষ কয়েক ঘণ্টা আগে ভয়ংকর নাগদানবদের লীলানর্তন দেখেও একবারের জন্যও ভয় পাননি, তিনিই এ মুহূর্তে ভালোবাসা আর বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেছে দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না আর। প্রবল কষ্টে আর অভিমানে ভেঙে পড়ছিল তাঁর মন তাসের ঘরের মতো। বুকপকেটের কাছটা বারবার চেপে ধরছিলেন শ্রীনিবাসন। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে বাঁদিকে। তিনি আর নিতে পারছেন না। হঠাৎ-ই দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে ঘাসের ওপর কর্তিত বনস্পতির মতো ধপ্ করে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীনি।

বিরূঢ়ক একটু হেসে উঠে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল। নাহ্, শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে না। দিস মাস্ট বি আ শিয়ার কেস অফ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। বড্ড সময় নিল লোকটা!

শ্রীনিবাসের নিথর দেহটা পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল স্রোতের কাছে। তারপর দুই হাত দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিল বিরূঢ়ক। লাশটা জলের মধ্যে ঝপাৎ করে গিয়ে পড়ল। অনেক জল ওখানে। হবে পাঁচ-ছয় মানুষ গভীর। আর স্রোতের বেগও সাংঘাতিক। কোথায় যে হারিয়ে যাবে লাশটা দুরন্ত স্রোতে কেউ জানতেও পারবে না। গুড বাই, শ্রীনিবাসন!

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই সেদিন নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল বিরূঢ়ক। মনে হচ্ছিল, এবার কি তবে দেবলীনা? যাবে সেখানে? গিয়ে বলবে, দ্যাখো, দ্যাখো, দেবলীনা, আমিই তোমার শ্রীনিবাসন, বিরূঢ়ককে মেরে জলে তার লাশ ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি? কুড়ি বছরেরও আগে যাকে তুমি ছেড়ে চলে গিয়েছিলে, কুড়ি বছরেরও বেশি সময় দেখা করেনি যে তোমার সঙ্গে, সে আর ফিরবে না। যে ফিরে এসেছে, সে তোমারই শ্রীনিবাস, বিরূঢ়কের মতো দেখতে শুধু। বিরূঢ়কের খোলসের মধ্যে তুমি তোমার শ্রীনিকেই পাবে। শ্রীনিকেই আস্বাদ করো। ভোগ করো। ভালোবাসো। বিরূঢ়ক ফিরবে না আর। বিরূঢ়ক মরে গেছে। বিরূঢ়করা কিছু পায় না। বিরূঢ়করা মরে যায়। বিরূঢ়ক...

সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে।

২৫

শূন্য একটা মাঠ যেন পার হয়ে যাচ্ছে দালি। অথবা একে কি মাঠ বলা সঙ্গত হয়? শস্যরিক্ত শূন্য মাঠেও থাকে শুষ্ক আলপথ, খররৌদ্রে শুকিয়ে আসা রুক্ষ নাড়া, কাঁটাঝোপ, শিশির কিংবা মাকড়সার জাল। কিন্তু এখানে এসব কিছুই নেই। তাহলে মাঠ না বলে মরুক্ষেত্রই না-হয় বলা হোক। কিন্তু মরুভূমিতে তো বালিয়াড়ি থাকে, এখানে বালিয়াড়ি কই? মরুভূমিতেও মরূদ্যান থাকে, কোথাও কোথাও একহারা খেজুরের গাছ মরুভূমির দুরন্ত বাতাসে আন্দোলিত হয়, পথের পাশে পড়ে থাকে মৃত পশুদের অস্থিসার কঙ্কাল; সেসব এখানে কই? এই দিগন্তবিস্তৃত বুকফাটা হাহাকারে ভরা ভূম্যায়তনটি ছাড়া আর কিছুই দালির এ মুহূর্তে চোখে পড়ছে না। আর একটিও জীব না, আর একটিও প্রাণী নয়। সে মনে মনে ভাবছে, এ কোন দিকচিহ্নহীন ভুবনডাঙা পার হয়ে একা একা কোথায় যে সে চলেছে!

আসলে যা সে পেরিয়ে চলেছে, তা মাঠও নয়, মরুভূমিও নয়। বিপ্লব-আন্দোলনের একটা বই—সম্বিতের লেখা 'আগুনপাখির ডানা' পড়তে পড়তে আচম্বিতে নিজের অজান্তেই সে ঢুকে পড়েছিল বইয়ের ভেতর; দুই লাইনের মাঝখানের ব্যবধানের মধ্য দিয়ে, কমা-কোলন-সেমিকোলনে ঠেকতে ঠেকতে, পূর্ণচ্ছেদ-প্রশ্নচিহ্ন-বিস্ময়চিহ্নে থমকাতে থমকাতে এক প্যারা থেকে অন্য প্যারা পার হয়ে হয়ে যাচ্ছিল সে। আর সেই সাধুভাষায় লিখিত গদ্যনগরীর প্রাসাদে, অলিন্দে, সোপানে, প্রান্তরে, পথে ও পথিপার্শ্বে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছিল আকাশে ঝড় তোলা সেইসব আখ্যান ও আখ্যাতদের। এইভাবে চলতে চলতে পেডি-সংহার ও ভিলিয়ার্স-আক্রমণের অপ্রতিম নায়ক বিমল দাশগুপ্তর অধ্যায়টা সেই জীর্ণ পুস্তিকার হলুদ হয়ে আসা একটি পাতার মাঝখানে এসে হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। সে পাতায় আর কোনো লেখা নেই। ফলত দালি অক্ষরনগরীর পরিখা পার হয়ে এসে উঠল আধপাতাজোড়া ওই ফাঁকা স্পেসের মধ্যে, একা বেদুইনের মতো সেই ফাঁকা জায়গাটা পেরোতে পেরোতে তাই তার অবধারিতভাবে মনে হচ্ছিল, বুঝি-বা সে এক রিক্ত মাঠ বা চিহ্নহীন মরুস্থলী পার হয়ে চলেছে।

কী জানি কীভাবে একসময় এই মাঠ ফুরোলো, পাতা উলটে গেল, পরের পাতা

এসে পড়তেই দালি দেখতে পেল দূর থেকে কালো কালো শব্দের সমুদ্রজল দিগন্তবিস্তারী ঢেউ তুলে আবার তাকে গ্রাস করবার জন্য ভীমবেগে ধেয়ে আসছে। কোনো কিছু বুঝবার আগেই সেই শুভ্রফেনশীর্ষ বর্ণমালার ঢেউ 'হা-রে-রে-রে' শব্দ তুলে অকস্মাৎ তাকে সাদা পাতার বেলাভূমি থেকে চাগিয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল উদ্যত-বল্লম একদল দুরন্ত ডাকাতের মতো।

"আইনজীবী বি সি চ্যাটার্জি, শরৎচন্দ্র বসু ও এন এন সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং সুভাষচন্দ্রের নেপথ্য প্রয়াসে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তর মৃত্যুদণ্ড রহিত হইল। আন্দামানে দ্বীপান্তর ও সশ্রম কারাদণ্ড আদেশ হইল। অ্যাকশনে বিমলের দ্বারা ব্যবহৃত ৩৮০-বোরের ওয়েব্‌লে রিভলভারটি পুলিশ কাস্টডি হইতে সুকৌশলে বাহির করিয়া আনা হইয়াছিল। পুলিশবিভাগের মফিজুদ্দিন আহমেদ, তাঁহার হাত হইতে নগেন্দ্রনারায়ণ সরকার, সেখান হইতে শরৎচন্দ্র বসুর হাত ফিরিয়া সুপতি রায়চৌধুরী এবং সুপতির দ্বারা প্রেরিত হইয়া যতীশ গুহের হস্তে রিভলভারটি আসিয়া পৌঁছাইল। উহা বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের লাকি রিভলভার, উহা কখনও ব্যর্থ হয় নাই।

ওই রিভলভারের সঙ্গে কালো বাক্সে ভরা আরও একটি কী জিনিস মেদিনীপুরে আসিয়াছিল, তাহার কথা এস্থলে বলিব না। যথাকালে বলিব। ধৈর্য মুনির ধর্ম। হে মননশীল পাঠক! সামান্য ধৈর্য ধরিতে পারিতেছ না কেন? তোমার কি মুনি হইতে সাধ হয় না?

উনিশশো একত্রিশ সালের হিজলি-ক্যাম্পে অন্তরীণ ডেটিনিউদের নির্মম হত্যার প্রতিবাদস্বরূপ ডিস্ট্রিক্ট সেশন-জজ টি জে ওয়াই রক্সবার্গের ভবলীলা সাঙ্গ করিবার ভার পড়িল বিপ্লবী ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্তর উপর। দুর্ভাগ্যক্রমে ক্ষিতি ব্যর্থ হইলেন, রক্সবার্গের পরমায়ু তখনও বোধহয় অবশিষ্ট ছিল। রায় লিখিতে লিখিতে চরম মুহূর্তে রক্সবার্গ ক্ষিতির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন। ক্ষিতির রিভলভার পকেটের ভিতরেই মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল। রক্সবার্গ শিয়রে শমন লইয়াও রক্ষা পাইলেন। কোর্টের ভিতর অজ্ঞাতনামা যুবকটির অবাঞ্ছিত উপস্থিতি কৌতূহল উদ্রিক্ত করিল বটে, কিন্তু ক্ষিতি তাঁহার জ্যাঠামহাশয় উকিল অম্বিকাপ্রসন্ন সেনগুপ্তর সহিত কোর্টে দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিবার পর আর সন্দেহ উত্থাপিত হইবার অবকাশ পাইল না।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। উনিশশো বত্রিশের তিরিশে এপ্রিল মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের মিটিং চলাকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস দুই বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পালের হস্তে নিহত হইলেন। অ্যাকশনের পর প্রদ্যোৎ ধৃত হইলেন, কিন্তু পলায়মান প্রভাংশু পুলিশকে বোকা বানাইয়া অমর লজের পাশ দিয়া কোথায় যে নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, কেহ তাঁহার হদিস পাইল না। প্রভাংশুর হস্তে ছিল

দীনেশ গুপ্তের সেই লাকি রিভলভার ৩৮০-বোরের ওয়েব্‌লে। ডগলাস-হত্যার অন্যতম নায়ক প্রভাংশুকে পুলিশ ধরিতে পারিল না। ফলত দীনেশ গুপ্তের রিভলভার পুনরায় সফলকাম হইয়া যতীশ গুহের গুহায় ফিরিয়া আসিল।

ভাবিয়াছিলাম, সেই ধীরোদাত্ত বীরকথা এস্থলে কিছু কিছু লিখিব। কিন্তু আমারই এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু, অবিকল আমারই ন্যায় দেখিতে এক প্রায়োন্মাদ লেখক 'দীনেশ গুপ্তের রিভলভার'-নামক একটি বৃহৎ উপন্যাস ভাবীকালে রচনা করিবেন। সেই উপন্যাসের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভাবীকালের সেই লেখক ডগলাস-হত্যার অনুপুঙ্খ বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করিবেন। তাহাতে ইতিহাস থাকিবে, বাতুলের কিছু কল্পনাও আসিয়া মিশিবে। তাই, এস্থলে আমি আর সে প্রসঙ্গে কিছু লিখিলাম না।

শুধু এইটুকু লিখি যে, পুলিশের হস্তে ধৃত প্রদ্যোতের বিচারের পর ফাঁসি সাব্যস্ত হয়। ফাঁসির দিন ১৯৩৩-এর ১২ই জানুয়ারি স্থির হয়। বিধাতার অচিন্তনীয় বিচিত্র লীলাই বটে! তাহা না হইলে বিপ্লব-আন্দোলনের জ্বলন্ত অনুপ্রেরণা, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের আদি মন্ত্রদাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসের পুণ্য প্রভাতে বিপ্লবী তরুণ প্রদ্যোতের আত্মোৎসর্গ দিবস কীরূপেই বা স্থিরীকৃত হইতে পারে? উহা কি মামুলি সমাপতন? হইবেও বা। উহা মাস্টারদা সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির দিনও যে! তাহাও সমাপতন? বহুবার সমাপতন ঘটিলে তাহাকে আর সমাপতন বলে না, উহা নিয়মের কোঠায় উঠিয়া যায়। বিবেকানন্দের আবির্ভাব-দিবস তাই বিবেকানন্দ-আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর ও বীরাঙ্গনাদিগের আত্মোৎসর্গ-দিবসরূপেই চিরকাল নিরূপিত হইবে। উহা উপভোগের দিন নহে, উহা সানন্দ আত্মদানের দিন, কেননা ত্যাগের জন্ম আত্মদানার্থেই হইয়া থাকে।

ফাঁসির প্রাক্‌মুহূর্তে সদ্যোভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক বার্নার্ড এডওয়ার্ড জন বার্জ ফাঁসির আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রদ্যোৎ ফাঁসির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত আছেন কিনা। তাহাতে প্রদ্যোৎ এক মিনিট সময় চাহিয়া লইয়াছিলেন। ফাঁসির পূর্বে বার্জকে তাঁহার কী একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়া যাইবার আছে, জানাইলেন। বার্জ সেকথা বলিবার জন্য প্রদ্যোতকে অনুমতি দিলেন। তখন সেই মৃত্যুঞ্জয় তরুণ ফাঁসিমঞ্চ হইতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জ্বলন্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

'We are determined, Mr Burge. We shall not allow any British ruler to remain in Midnapore. You are our next target. Get ready. .. And I am not afraid of death, from each droplet of my blood will rise hundreds of Pradyots in homes of Bengal—now do your work!'

প্রদ্যোতের ফাঁসি হইয়া গেল। কিন্তু ফাঁসির দড়ি গলায় জড়াইবার পূর্বে তিনি যে মারাত্মক কথা বলিয়া গেলেন, তাহাতে আতঙ্কিত হইয়া মেদিনীপুরের য়ুরোপীয় শাসকদের হৃৎকম্প ভয়ানক বাড়িয়া গেল। সাহেবদের সিকিউরিটির মাত্রা দশগুণ বাড়িল। পুলিশে পুলিশে মেদিনীপুর শহর ছাইয়া গেল। গুর্খা ও পাঠান প্রহরীতেও ব্রিটিশ অফিসারদের ভয় আর যাইতেছিল না। ব্রিটিশ গার্ড নামাইতে হইল। মেদিনীপুর শহরে রাত্রিকালে সহজ চলাচলও নিষিদ্ধ হইল। সশস্ত্র রক্ষীর দ্বারা পরিবৃত বাংলোতে বসিয়াও ব্রিটিশ প্রশাসকরা প্রাণভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন আর মেমসাহেবেরা সদ্যোজাত সন্তানদিগকে বুকে চাপিয়া কম্পিত কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন, 'Sleep, Baby, sleep! Another April is coming.'

আট বৎসর পূর্বে সাগরপারে পৃথিবীর নবীনতম মহাদেশ হইতে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এক কবির একখানি কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ বাহির হইয়াছিল। 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড'-শীর্ষক সেই কাব্যে যুবক টমাস স্টার্নস এলিয়ট লিখিয়াছিলেন, 'April is the cruelest month– breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain.' আট বৎসর পরে সে কবিবচন যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুষঙ্গে ভারতবর্ষের য়ুরোপীয় শাসকদের জীবনে এমন মর্মন্তুদভাবে ফলিয়া যাইবে, কে জানিত! তিরিশ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে আগুন জ্বলিল। পরবৎসর এপ্রিলে জেমস পেডি নিহত হইলেন। তাহার পরের বৎসর সেই কালান্তক এপ্রিল মাসেই রবার্ট ডগলাস বিপ্লবীদের গুলি খাইয়া যমসদনে গেলেন। নিষ্ঠুরতম মাসই বটে! মৃত উপমহাদেশের স্মৃতিবাসনার পঞ্জরাস্থি হইতে বিপ্লবের যে লাইলাক ফুল এই এপ্রিল মাসেই বাহির হইয়া আসিতেছিল, তাহা অত্যাচারীর উৎপাটিত হৃৎপিণ্ডের শোণিতধারায় আরক্তভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। পেডি গেলেন, ডগলাস গেলেন, এবার কি তবে বার্জের পালা আসিল? গোটা এপ্রিল মাসটা বার্জ সাহেব বাংলোর ভিতর লুকাইয়া রহিলেন।

কিন্তু বিশ্বকর্মা-নির্মিত বেহুলা-লখিন্দরের লোহার বাসরঘরেও ছিদ্র ছিল। বার্জের বাসরকক্ষে সেই ছিদ্র হইল ফুটবল। বার্জের অতিশয় ফুটবল-ক্রিকেটপ্রীতি ছিল। এপ্রিল মাসটা কোনোমতে মেমসাহেবের গাউনের আড়ালে লুকাইয়া রহিয়া মে-জুন মাসে কড়া রৌদ্র উঠিলে ধীরে ধীরে বার্জ রক্ষীপরিবৃত হইয়া বাংলোর কোটর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। জুন গেল, জুলাই আসিল। বার্জ স্থানীয় যুবকদের খেলাধুলায় আগ্রহী করিয়া তুলিতে চাহিলেন, যাহাতে বিপ্লব আন্দোলন ভুলিয়া ছেলেরা মাঠে ফুটবল লইয়া লাথালাথি করে। তবে বার্জ যাহা করিতেছিলেন, সকলই দূর হইতে। প্রথম দিকে শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনই কাটাইতেছিলেন। কিন্তু রক্তচোষা হায়েনার জাত, রক্তের ঘ্রাণ না পাইলে তাঁহাদের জীবন বিস্বাদ হইয়া যায় যে! তাঁহার

পূর্বসূরীদের ন্যায় তিনিও এক মারাত্মক অনুদ্ধারণীয় ভুল করিয়া বসিলেন।

মেদিনীপুর জেলার কেশপুর অঞ্চল চিরকাল স্পর্শকাতর স্থান। এসব অঞ্চলের মানুষজনের শরীরের রক্ত স্বাভাবিকের তুলনায় অধিকতর উত্তপ্ত। কেহ কোনোদিন অত্যাচার করিয়া কেশপুরবাসীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। এই কেশপুরেরই কুঁয়াই গ্রামে বার্জ অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া ফেলিলেন। সত্যাগ্রহীদের আন্দোলন দমন করিতে গিয়া অমানুষিক বেত্রাঘাত, নারীদিগের উপর পাশব নির্যাতন, ধর্ষণ—কিছুই বাকি রহিল না। সকলই বার্জের নির্দেশে হইল। ইহার তো হিসাব মিটাইতেই হইবে। বার্জের বাঁচিয়া থাকিবার আর তো উপায় রহিল না!

আটত্রিশ বৎসরের ফুটবলপ্রেমী সুদর্শন যুবক ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ—ডাকনাম তাঁহার ববি। সাহেবসুবা লোক—সাহেব-বন্ধু ও বন্ধুপত্নীদের সাহচর্যে আনন্দ করিয়া আর সিঙ্গল মল্ট হুইস্কি গলায় ঢালিয়া জীবন কাটে। সুন্দরী প্রেমময়ী পত্নী প্রমদা মিসেস বার্জ তো আছেনই, তদ্ব্যতীত সাহেব-মহলে বার্জের বান্ধবী সংখ্যাও কিন্তু কম নহে। ভালোই চলিতেছিল, বাধ সাধিল ফুটবল! হায়, বাঙালির সেই চিরপ্রিয় ফুটবল!

এপ্রিলে কিছু হইল না দেখিয়া বার্জ প্রমোদে মন ঢালিলেন। বিলাসে ডুবিয়া গিয়া ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত হইতেছিলেন। ফাঁসির পূর্বে মানুষ অমন কত কথা বলে! সব কি সত্য হয়?

বার্জ জানিতেন না, দিনে-রাত্রে, আলোতে-অন্ধকারে মৃত্যু ধীর অথচ নিশ্চিত পদবিক্ষেপে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে।

এপ্রিলেই বার্জকে খতম করিবার কথা হইয়াছিল। হয় নাই। মে, জুন, জুলাই গলিয়া গেল। আসিল আগস্ট। বার্জ খেলার মাঠে নামিলেন। ৮ই আগস্ট, ১২ই আগস্ট, ১৯শে আগস্ট, ৩১শে আগস্ট। প্রতিদিন খেলা ছিল। ফুটবল-ম্যাচ। হয় বার্জ খেলোয়াড় হিসাবে মাঠে নামিয়াছিলেন, নয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিটি দিন তিনি বিপ্লবীদের রিভলভারের রেঞ্জের মধ্যে ছিলেন। যেকোনো দিনই তাঁহার জীবনের শেষ দিন হইতে পারিত। কিন্তু হয় নাই। হয় সান্ত্রী-পরিবেষ্টিত, নয় অন্য কিছু। অবশেষে ২রা সেপ্টেম্বর আসিয়া পড়িল। পুলিশ গ্রাউন্ডে টাউন ক্লাব ভার্সাস মহামেডান স্পোর্টিং-এর ফুটবল খেলা। টাউন ক্লাব ব্রিটিশদিগের ফুটবল ক্লাব ছিল। পক্ষান্তরে, মহামেডান স্পোর্টিং ছিল দেশীয়দের দল। ববি যে স্বয়ং এইদিন টাউন ক্লাবের হইয়া খেলিবেন, ববির বিপ্লবী বন্ধুদের তাহা জানিতে বিলম্ব হইল না। যদিও এসকল সংবাদ পূর্ব হইতে পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল, তথাপি ববির সংবাদ তাজা অবস্থাতেই বিপ্লবীদের নিকট আসিয়া পৌঁছাইতেছিল। আসিতেছিল এক অকল্পনীয় গোপন সূত্রে। সেই সূত্রটি হইল সত্য।

সত্যর ভালো নাম প্রমথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা পুলিশ ইন্সপেকটার। পিতা

জানিতেন না, পুত্র কোথায় যায়, কী করে। সত্য বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য ছিলেন। পুলিশসূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য তিনি বিভি-র নেতাদের হস্তে তুলিয়া দিতেন। ডগলাস হত্যা-পরিকল্পনার প্রথম পর্বে প্রভাংশু ও প্রমথ অর্থাৎ সত্যকে ডগলাস মারিবার জন্য কংসাবতীর ঘাটে পাঠানো হইয়াছিল। ডগলাস সেদিন গাড়িতে চাপিয়া খড়গপুর যাইতেছিলেন। কংসাবতীর ঘাটে ডগলাসের গাড়ি হইতে নামিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ওই যে, ডগলাসের পরমায়ু আরও ছয় মাস অবশিষ্ট ছিল। ডগলাস সেদিন গাড়ি হইতে নামেন নাই। নামিলেই প্রভাংশু ও প্রমথর গুলি খাইয়া মরিতে হইত। গাড়ি হইতে না নামায় ডগলাস বাঁচিয়া গেলেন। বিফল মনোরথ সত্য আর প্রভাংশু সেইবার শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ছয় মাস পর আর অসুবিধা হইল না—প্রভাংশু আর প্রদ্যোৎ ডগলাসের আয়ুনিষ্পত্তির নিমিত্ত হইয়াছিলেন। সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি।

সেই সত্য! তাঁহার পিতা, পিতার ঊর্ধ্বতন পদাধিকারী, সরকার বাহাদুর—কেহই স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, দৈত্যকুলে কোন প্রহ্লাদের জন্ম হইয়াছে। সত্য এইবার পাক্কা খবর আনিলেন, ২রা সেপ্টেম্বর আবার বার্জ খেলিবেন। খেলা হইবে মেদিনীপুর পুলিশ গ্রাউন্ডে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মৃগেন দত্ত ও অনাথবন্ধু পাঁজাকে বার্জের দায়িত্ব দেওয়া হইল।

প্রভাংশু পাল অনাথবন্ধুকে ইভার জনসন রিভলভার একটি দিলেন। ইহার পাঁচটি চেম্বারে পাঁচটি গুলি থাকে। অনাথবন্ধুর নিশানা কখনও ব্যর্থ হয় না।

মৃগেনকে দেওয়া হইল ৩২০-বোরের পিস্তল আর কার্তুজ। যদি পিস্তল কাজ না করে, তবে অতিরিক্ত সহায়ক হিসাবে মৃগেনের হস্তে এবারও তুলিয়া দেওয়া হইল সেই ৩৮০-বোরের ওয়েব্‌লি রিভলভারটি। যাহা প্রভাংশু পাল ডগলাস হত্যার পর যতীশ গুহকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার যতীশ গুহের নির্দেশেই সেই লাকি রিভলভার প্রভাংশু পাল একটি কাপড়ে মুড়িয়া সযতনে কপালে ঠেকাইয়া সশ্রদ্ধায় মৃগেন দত্তের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'যদি পালাতে পারিস, গোরা, তবে এ বস্তুটি যতীশ গুহ-দার কাছে পৌঁছে দিস, ভাই। আর যদি না পারিস, অন্য ব্যবস্থা রইল।'

বিস্মিত মৃগেন প্রভাংশুর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কী জিনিস, প্রভাংশুদা?'

প্রভাংশু উত্তর দিলেন, 'দীনেশ গুপ্তের রিভলভার!' "

এই অবধি পড়ামাত্রই হঠাৎ দালি সেই অক্ষরের প্রাচীরের ওপর থেকে কীসের যেন একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে শক্ত মাটির ওপর কোথায় যেন এসে আছড়ে পড়ল। কী যে হল, প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারল না। শক্ত জমির ওপর এসে পড়েছে

অথচ গায়ে পায়ে কোনো আঘাত লাগল না তো। সহসা কান-ফাটানো চিৎকারে চারিদিক ভরে উঠল। ভয় পেয়ে চমকে উঠে সে চারপাশে চেয়ে দেখল; সে যেন একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা খেলার মাঠের ওপর এসে পড়েছে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে জনতার সহর্ষ চিৎকার। সে লক্ষ করল, মাঠের একদিকে একটা উঁচু গ্যালারি; সেই গ্যালারিতে অজস্র মানুষ বসে আছে আর প্রচণ্ড জোরে চেঁচাচ্ছে।

এটা একটা ফুটবল মাঠই বটে। মাঠের দুপাশে গোলপোস্ট। দুই গোলপোস্টের কাছে দুই দলের জার্সি-পরা প্লেয়াররা ফুটবল প্র্যাকটিস করছে। তার মানে খেলা এখনও শুরুই হয়নি। হবো হবো করছে। এদিকে একদলের প্লেয়ারদের গায়ে লাল রঙের জার্সি, তারা সব সাদা চামড়ার সাহেব। অন্যদিকে আরেকদলের প্লেয়ারদের পরনে কালো রঙের জার্সি। এরা প্রায় সকলেই ভারতীয়। দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে অতি উৎসাহী যারা, তারা দুদিকের গোলপোস্টের পাশে এসে ঘুরঘুর করছে।

গ্যালারির মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল দালি। গ্যালারিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। খেলা শুরুই হয়নি এখনও, তবু এখনই গ্যালারিতে হইচই, হাসির হররা, চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। দালি দেখল, গ্যালারির একদিকে কংক্রিটের ছাউনির নীচে শ্বেতাঙ্গ সাহেব-মেমেরা ছোটো ছোটো চেয়ারে বসে আছে। লালমুখো সাহেবগুলো কোর্ট-প্যান্ট-শোলার হ্যাট পরা। তাদের মধ্যে একজনের সোনালি রঙের চাড়া গোঁফ দেখে দালির হাসি পাচ্ছিল। সেই সাহেবটা মৌজ করে চুরুট ফুঁকছিল।

মেমসাহেবদের গায়ের রং ফিট ফরসা, গালে হালকা গোলাপি আভা। বেশিরভাগই লং ফ্লোয়িং গাউন পরা। গলায় এবং কব্জির কাছে সাদা রঙের লেসের কাজ করা। প্রায়শই মাথায় নৌকোর মতো দেখতে চওড়া বাহারের টুপি নানা রঙের—নীল, খয়েরি, মেরুন, কমলা। কোনো কোনো মেমসাহেবের মাথায় টুপি নেই। তাদের চুলের রং সোনালি, চোখের রং কটা অথবা নীল। কারও হাতে জাপানি হাতপাখা, দ্রুতবেগে হাতপাখা নাড়ছে।

গ্যালারির আরেকধারে কোনো ছাউনি নেই। সেপ্টেম্বর মাসের কাঁচামিঠে রোদ। এখানেই ভারতীয়রা গাদাগাদি করে বসেছে। সকলেই পুরুষ, একজনও মেয়ে নেই। ধুতির ওপর ফতুয়া, শার্ট, চাপকান বা পাঞ্জাবি পরা। কারও কারও কাঁধের ওপর সুতির চাদর পরিপাটি ভাঁজ করা। কারও দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। কারও গোঁফ আছে, দাড়ি নেই। কারও দাড়ি আছে, গোঁফ নেই। কারও কারও দুই-ই আছে, কারও-বা সাদা দাড়ির ভার বুকের ওপর এসে নেমেছে। চুল বেশিরভাগই সিঁথিকাটা নয়। কারও কারও চোখে গোল ফ্রেমের চশমা। কোনো কোনো শৌখিন লোকের

আবার চোখে কেবল এক কাচের মোনোক্ল। কেউ কেউ ধুতিতে কোঁচা দিয়ে কোঁচাটি এক হাতে ফুলের মতো ধরে আছে, অন্য হাতে শৌখিন বেড়ানোর লাঠি।

গ্যালারি থেকে নেমে এল দালি। মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। যথারীতি এখানেও তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অথচ সে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। খেলা চলাকালীনও সে যদি মাঠে ঢুকে এদিক-সেদিক ছোটাছুটিও করে, তাহলেও তাকে কেউ বারণ করবে না। আরে, বারণ করবে কী করে? দেখতে পেলে তো!

মাঠটার একদিকে এই উঁচু একটা প্রাচীর। বিল্ডিং- টার সামনে বিশাল একখানা তালাবন্ধ গেট। গেটের মাথায় লেখা: MIDNAPORE CENTRAL JAIL। মাঠের অন্যদিকে তেমনই উঁচু আর-একখানা বাড়ি। বাড়িটার দেওয়ালে লাল রঙে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা: A-R-M-O-R-Y

এখন এসব গা সওয়া হয়ে এসেছে দালির; সে বুঝতে পারছে, সে এসে পড়েছে উনিশশো তেত্রিশের সেই দোসরা সেপ্টেম্বরের হারিয়ে যাওয়া বিকেলবেলায়। গ্যালারিতে, মাঠের মধ্যে, মাঠের চারপাশে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে কাদের যেন খুঁজতে লাগল। কিন্তু যাদের খুঁজছিল, তাদের কাউকেই সে খুঁজে পেল না। শেষে সেই বেকার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কালো রঙের জার্সি পরা মহামেডান স্পোর্টিঙের ছেলেরা যেখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করছিল, সেইখানে এসে দাঁড়াল। বেশ কটা বল নিয়ে মহামেডান স্পোর্টিঙের ছেলেরা লাথালাথি করছে।

গোলপোস্টের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে দালি। মাঠে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেদের প্র্যাকটিস চলছে। হঠাৎ পেনাল্টি বক্সের ডানদিকের কোণ দিয়ে ঢুকে গোলপোস্টের প্রায় পনেরো গজ দূরত্ব থেকে শ্যামলা রঙের একটা বছর আঠারোর ছেলে ফুটবলটাতে লাথি হাঁকড়ে বাতাসে যেন ভাসিয়ে দিল। অবিশ্বাস্য গতিতে বলটা চলে যাচ্ছে গোলপোস্টের ওপরের বারের দিকে। আর-একটা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে হেড দিয়ে বলটাকে গোলে ঢুকিয়ে দিল। সেই দিকে তাকিয়ে দালি হাততালি দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তার নজর চলে গেল একটু আগে দেখা শ্যামলা ছেলেটার দিকে। দালি অবাক হয়ে দেখছিল তাকে, কারণ বলে লাথি মেরেই কোনদিকে বলটা গেল সেদিকে না দেখেই ওই ছেলেটা মাঠের ডানদিকের সাইডলাইনের দিকে দৌড়ে গেল।

'সত্য, সত্য, শোন, শোন—এদিকে শুনে যা...' বলতে বলতে ছেলেটি আরেকজন কিশোরকে ডাকতে লাগল।

তার ডাক শুনে সাদা ফুলপ্যান্ট আর সাদা ফুলশার্ট পরা ঝাঁকড়া চুলের আরেকটি একই বয়সের ছেলে মাঠের সাইডলাইনের কাছে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল, 'কী বলবি, বল!'

প্রথম ছেলেটি বলল, 'দ্যাখ না, সত্য! আমি পরে এসেছি বলে এরা আমাকে খেলায় নিচ্ছে না। তোর কথা তো এরা সবাই শুনবে। দ্যাখ না একটু বলেকয়ে যদি আমাকে এনরোল করা যায়।'

সাদা শার্টপ্যান্ট-পরা ছেলেটি উত্তর দিল, 'তুই কী যে বলিস না, মৃগেন! এরা কলকাতার দল। আগে থেকে নাম এনরোল না করা থাকলে এরা তোকে নেবে কেন? কালো জার্সি পরে চলে এলেই হবে?'

মৃগেন তাও কাকুতিমিনতি করতে লাগল, 'দ্যাখ না একটু বলে কয়ে, প্লিজ! প্লিজ, সত্য!'

কথাটা বলতে বলতে মৃগেন সত্যর একেবারে গায়ের কাছে এসে পড়ল মিনতির ভঙ্গিতে। সত্য বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোদের যা কারবার না! আমি পারব না, যা। পারবে না বাঁশ কাটতে, উঠে পড়েছে রাত থাকতে... যা-আ!'

কথাটা চেঁচিয়ে বলেই থমকে গিয়ে সত্য মৃগেনের একদম কাছে সরে এসে সন্তর্পণে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সব রেডি?'

একইভাবে উত্তর দিল মৃগেন, 'রেডি!'

সত্য আবার প্রশ্ন করল, 'কী করবি ভেবেছিস? পালাতে পারবি?'

মৃগেন বলল, 'নাহ্। পালানো এখানে কীভাবে সম্ভব, বল। একদিকে জেলের প্রাচীর, অন্যদিকে আর্মারির উঁচু দেওয়াল। সারা মাঠ থিকথিক করছে পুলিশে।'

সত্য চারিদিকে একবার তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বলল, 'শুধু তাই-ই নয় রে, মৃগেন। পুলিশ ছাড়াও সাদা পোশাকে প্রচুর স্পাই মাঠটায় ছড়িয়ে আছে। ওই যে দ্যাখ, ওই যে লোকটা, ওই, ওই—'

'যেটা সেন্টারের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে আছে সাইডলাইনের ওপর? দাড়িওলা বুড়োটা? দেখতে কবি-কবি টাইপের?'

'হ্যাঁ। ওটা আমার বাবার পেয়ারের স্পাই। নজর রাখছে। এরকম গোটা তিরিশেক দেখলাম এখানে ওখানে। হারামজাদার দল!'

'সেই জন্যেই তো বলছি, সত্য, পালানো সম্ভব নয়। অ্যাকশনটা শেষ হয়ে গেলেই তুই মাঠে ঢুকে যা করার করে ফেলিস। আমি তখন বোধহয় লাশ হয়ে পড়ে থাকব। তাড়াতাড়ি করিস। হয় হাতে থাকবে, নয় কোমরে চামড়ার বেল্টে আটকানো থাকবে জিনিসটা,' মৃগেন তাড়াতাড়ি বলল।

'ঠিক আছে। আমি যা করার, করব। কিন্তু তুই কী করবি? সায়ানাইড?'

'সায়ানাইড নিইনি।'

'বলিস কী রে?'

'ঠিকই বলছি। আমি আগেই বুঝেছি, এখান থেকে পালানো যাবে না।

সায়ানাইডের থেকে পুলিশের গুলি খাওয়াটাই আরামদায়ক। সে দেখা যাবে এখন। আগে তো কাজ। তারপর...'

মৃগেনের কথা শুনতে শুনতে সত্যর চোখ জলে ভরে এল। মৃগেন অমনি সত্যর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিস কেন? মরতে একদিন হবেই। দেশের জন্যে মরতে পারলে সেটাই মরার মতো মরা। আমার জন্যে দুঃখ করিস না, সত্য।'

সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতের তালুর উলটোপিঠে চোখের জল মুছে নিয়ে সত্য ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'তোর জন্য দুঃখ করতে আমার বয়েই গেছে।'

মৃগেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কাঁদছিস কেন?'

ডান হাতের তর্জনীর ডগা দিয়ে চোখের কোণটা মুছতে মুছতে সত্য বলল, 'কাঁদছি কি আর সাধে? কাঁদছি ঈর্ষায়।'

'ঈর্ষা? কার ওপর?' আরও অবাক হয়ে গেল মৃগেন।

'কার ওপর আবার? তোর ওপর। অনাথের ওপর। তোরা কেমন সুন্দর অ্যাকশন সফল করে পুলিশের গুলি খেয়ে মাঠে মরে পড়ে থাকবি, আর আমি? আমি বাড়িতে ফিরে বাপের হোটেলে রাজভোগ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকব। তারপর দিনের পর দিন একটা ঘৃণিত জীবন কাটাব। এমনিতেই দাদারা আমাকে কোনো সিরিয়াস কাজ দেন না। ট্রাস্ট করেন না বোধহয়। বাপ পুলিশ তো, তাই। তাও যে একটা কাজ দিলেন, কংসাবতীর চরের অ্যাকশন ফেল করল। ডগলাস ব্যাটা গাড়ি থেকে নামলই না। ধুর! আমার দুঃখ তুই আর কী বুঝবি, মৃগেন?'

মৃগেন সত্যকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দুঃখ করিস না, সত্য। একদিন ঠিক সত্যিকারের কাজ তোর হাতে আসবে। গুড বাই!'

সত্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, গোরা। এখন আর এখানে সময় নষ্ট করিস না। গোলপোস্টের বাঁদিকে চলে যা। ওখানে অনাথ আছে। ওদিক দিয়েই মাঠের গেট, ওইদিক দিয়েই শিকার ঢুকবে। গুড বাই! বন্দে মাতরম্!'

অস্ফুটে উচ্চারণ করল মৃগেন, 'বন্দে মাতরম্!' তারপর সত্যকে ছেড়ে গোলপোস্টের বাঁদিকে চলে গেল। সত্য মিশে গেল সাইডলাইনের ওপাশে মানুষের ভিড়ের মধ্যে।

মৃগেনকে অনুসরণ করে দালিও হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকে এল। সে ভাবছিল। এরা কী অদ্ভুত! দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার প্রতিযোগিতা! তাই নিয়েই এদের সাফল্য-ব্যর্থতা। তাই নিয়েই ঈর্ষা-সান্ত্বনা। এ জিনিস বোঝা শক্তই বটে!

বছর বাইশেকের রোগা ছিপছিপে একটা ছেলে, শ্যামলা মুখে একটা কেমন কাঁচুমাচু ভাব, কপালের ওপর এক গোছা চুল এসে পড়ছে বারবার। কপাল থেকে

চুলের গোছা সরাতে সরাতে সে এক মনে ফুটবল প্র্যাকটিস করছিল আরও দু-তিন জনের সঙ্গে গোলপোস্টের বাঁদিক ঘেঁষে। মৃগেন কাছে এসে দাঁড়াতেই খেলতে খেলতে মুখ তুলে সতর্ক চোখে সে মৃগেনের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বল পাস দিয়ে নিজেকে অন্যদের থেকে আলগাভাবে সরিয়ে নিয়ে ছেলেটি মৃগেনের সামনে এসে দাঁড়াল।

'সত্যর সঙ্গে কথা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ছেলেটি।

মৃগেন বলল, 'হ্যাঁ, অনাথদা। তুমি তৈরি?'

'একদম,' উত্তর দিল অনাথ। তারপর হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল সে, 'পোস্টমর্টেম করতে পারবে সত্য? কী বলছে?'

'পোস্টমর্টেম? হা হা হা! ভালো নাম দিয়েছ। তা পারবে!'

'এখানে কিন্তু নো ওয়ে টু এসকেপ, মৃগেন।'

'জানি,' শান্ত স্বরে বলল মৃগেন।

'মোটামুটি সবাই তো এসে গেছে রে! শুধু আসল পাখিই কিন্তু এখনও দাঁড়ে বসেনি। চিন্তা হচ্ছে,' অনাথ চিন্তিত স্বরে বলল।

'তা ঠিক। তবে সেও এসে যাবে। চিন্তা কোরো না। এখনও অবধি দেখলাম ফিলিপ নর্টন জোন্সের গাড়ি ঢুকেছে। ওই যে ওদিকে বসেছে,' মৃগেন গ্যালারির একটা জায়গার দিকে অস্পষ্টভাবে তাকাল।

অনাথ বলল, 'আরও এসেছে রে! তুই নজর করিসনি। ওই যে মিস্টার লিন্টন, ওইদিকে মিস্টার স্মিথ। টাউন ক্লাবের গোলপোস্টের দিকে জার্সি পরে নামার তোড়জোড় করছে মনে হয়। তবে ফিলিপ জোন্স খেলবে না। খেলা দেখবে।'

মৃগেন বলল, 'হ্যাঁ, খেলা দেখাব।'

এইসব কথা চাপা পড়ে গেল জনতার আচম্বিত সহর্ষ সোল্লাসে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ধীর গতিতে ঢুকছে মাঠে। গাড়ির দুপাশে সশস্ত্র মিলিটারি কয়েকজন ছুটছে। গাড়ি থামল অনাথ আর মৃগেন যেখানে কথা বলছিল, তার থেকে সামান্য দূরে। গাড়ির পাদানিতে পা রেখে ঝট করে গাড়ি থেকে নামলেন বার্নার্ড এডওয়ার্ড জন বার্জ।

সমস্ত মাঠ ফেটে পড়ছে মানুষের চিৎকারে। সাহেব-মেমসাহেবদের গ্যালারি থেকে সমস্বরিত আওয়াজ উঠছে, 'ব-বি! ব-বি! ব-বি!'

অনাথ আর মৃগেন চোখ তুলে দেখল গ্যালারি থেকে একজন সুন্দরী সুবেশা তরুণী মেমসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর রুমাল নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বললেন, 'কাম অন, ব-বি—দিস ইজ ইয়োর ডে!'

সেই মহিলার দিকে সকৌতুকে চোখ তুলে তাকালেন বার্জ। একটু হাসলেন।

অনাথ সেই দিকে চেয়ে মৃগেনকে বলল, 'মিসেস বার্জ!'

দালি দেখল, মেমসাহেবের সহর্ষ সুকুমার মুখখানার পানে তাকিয়ে রয়েছে মৃগেন। তার চোখের আগুন যেন নিভে আসতে চাইছে। যদিও সে চোয়াল শক্ত করে রেখেছে, তবু কিশোরটির গালের ওপর কখন যেন এসে নেমেছে লবণাক্ত অশ্রুর স্রোত।

মৃগেনের এই ভাবান্তর অনাথবন্ধুর নজর এড়াল না। সে একটু অপেক্ষা করল। তারপর কঠিন হেসে মৃগেনের দিকে সরে এসে মুখ নামিয়ে বলল, 'অতসীদিদির কথা মনে পড়ে, মৃগেন? বার্জের পুলিশ অতসীদিদিকে ধর্ষণ করে তার মৃত নগ্ন শরীরটাকে কেশপুরের রাস্তার পাশে বাবলা গাছ থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল। মনে পড়ে সেই অতসীদিদিকে? কুসুমলতাকে? সীতাকে? কালিনীকে? যাদের বাঁশ-ডলাই দিয়েছিল ওরা। কুঁয়াই গাঁয়ের বুড়োমদ্দ লোকগুলোকে ভুলে গেছিস? যাদের বেত মারতে মারতে মুগবসান নিয়ে গেছিল বার্জের পুলিশ লাইন করে?'

মৃগেন কিছু বলল না। শুধু গাল মুছে নিয়ে শক্ত হয়ে বলল, 'সব মনে আছে। বাট আই হ্যাভ নো ভেনজেন্স পার্টিকুলারলি অন এনি ইউরোপিয়ান লেডি। হাউএভার, জাস্টিস ইজ জাস্টিস। বার্জ মাস্ট ডাই। চলো, স্টেডি।'

বার্নাড বার্জ তখন মাঠ পেরিয়ে টাউন ক্লাবের ছাউনির দিকে যাচ্ছেন। ওখানেই চেঞ্জ করবেন। সঙ্গে তাঁর দুজন দেহরক্ষী।

দূরত্ব কমছে। জীবন ও মৃত্যুর। অত্যাচার ও প্রতিকারের। আর মাত্র কয়েক গজ। অনাথ আর মৃগেন ইতোমধ্যেই দুদিকে সরে গেছে, দেখল দালি। ওদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মাত্র হাত পাঁচেকের দূরত্বে এসে পড়েছেন বার্জ।

অনাথ চাপাস্বরে হুংকার দিয়ে উঠল, 'চার্জ!'

এক সেকেন্ডও দেরি হল না। দুপাশ থেকে গর্জে উঠল দুটি আগ্নেয়াস্ত্র। উপর্যুপরি বহুবার। কিছু বুঝবার আগেই গুলি খেয়ে উলটে পড়লেন বার্জ। কিন্তু মাটিতে উলটে পড়েও তাঁর নিস্তার নেই। ভূপাতিত বার্জের বুকের ওপর এবার দুরন্ত বেগে লাফিয়ে উঠে চেপে বসল অনাথ। বুকের ওপর উঠে সে উজাড় করে দিল তার রিভলভারের সব ক-টা গুলি। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। ইভার জনসন রিভলভারের অন্তিম কার্তুজটা শেষ হয়ে যাওয়া মাত্রই দেহরক্ষীর আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নির্ভুল নিশানায় একটা গুলি ছুটে এসে বিঁধল অনাথের বুকে। তখনই সে বার্জের মৃত শরীরের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

এদিকে গ্যালারির দিক থেকে বিদ্যুতের বেগে ছুটে আসছেন নর্টন জোন্স। তাঁর লক্ষ্য মৃগেন। কাছে এসেই মৃগেনের হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন জোন্স। একটি মুষ্ট্যাঘাত। ঘুসি খেয়ে ঘুরে ছিটকে পড়ছিলেন জোন্স। সেই

অবস্থায় ৩৮০-বোরের ওয়েব্‌লে রিভলভার গর্জন করে উঠল। জোন্সের দিকে লক্ষ্য করে আগুন ছড়িয়ে দিল মৃগেন। একটা গুলি জোন্সের পায়ে গিয়ে বিঁধল। ততক্ষণে মাঠের দুপাশ থেকে প্রহরীরা মাঠে ঢুকে পড়ে গুলি চালাতে শুরু করল। মৃগেনের গায়ে পর পর কয়েকটা গুলি এসে লাগল। আহত মৃগেন মাটির ওপর আছড়ে পড়ল।

গ্যালারিতে, মাঠে প্রচণ্ড কমোশন। সবাই যে যেদিকে পারছে ছুটছে। মাঠ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে খেলোয়াড়রা। স্মিথ আর লিন্টন প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাচ্ছেন। তাঁদেরই সঙ্গে দৌড়োচ্ছে টাউন ক্লাবের শ্বেতাঙ্গ ক্যাপটেন। দালি দেখল, মিসেস বার্জ 'ও যীশাস! ববি! মাই ববি-ই!'—বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অন্যান্য মেমসাহেবরা কর্ডন করে তাঁকে ক্লাব হাউসের দিকে নিয়ে গেল।

মাঠের ভেতর তখন ধেয়ে এসেছে পুলিশ আর মিলিটারি। তারা ছুটে যাচ্ছে ঘটনাস্থলের দিকে। পুলিশ, মিলিটারির সঙ্গে কতগুলো সাদা কাপড়ের পুলিশের লোকও রয়েছে। সেই এক ঝাঁক লোক ওই জায়গাটায় পৌঁছে দেখল, নর্টন জোন্স পায়ে গুলি লেগে খোঁড়াচ্ছেন। তাঁর পা থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাটিতে পড়ে আছে বার্জের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ। তাঁর বুকের ওপর অনাথবন্ধুর প্রাণহীন নিথর শরীর। দুজনেরই রক্তধারা মিশে গিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাটির ওপর। মেদিনীপুরের মাটি সমানভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে পীড়ক ও দ্রোহক উভয়েরই রক্তস্রোতকে।

অদূরে মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে আহত মৃগেন। সাদা কাপড়ের পুলিশগুলো প্রথমেই মৃগেনকে স্ট্রেচারে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। দালি দেখল, এদের মধ্যে সত্যও কখন যেন এসে গেছে। সে মৃগেনের আলগা হয়ে যাওয়া মুঠি থেকে ৩৮০-বোরের ওয়েব্‌লে রিভলভারটি সকলের অজ্ঞাতে খুলে নিয়ে এক লহমায় ভিড়ের ভেতর চিহ্নহীনভাবে মিশে গেল। ৩২০-বোরের পিস্তলটি ছিটকে পড়ে রইল মাটিতে। একজন পুলিশের লোক সেটিকেই সংগ্রহ করল আততায়ীর দ্বারা ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে।

স্ট্রেচারে করে যখন মৃগেনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে 'জল, জল' করে চিৎকার করতে লাগল। দালি শুনতে পেল একবার জোরে বলে উঠল মৃগেন, 'আমাকে মেরে ফেলো। আমাকে মেরে ফেলো কেউ তোমরা।'

আরও তিনটি স্ট্রেচারে বার্জ ও অনাথবন্ধুর মৃতদেহ এবং নর্টন জোন্সকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

দেখতে দেখতে মাথাটা একবার ঘুরে উঠল দালির। দুহাত বাড়িয়ে সে কোনো একটা অবলম্বন খুঁজছিল। কিন্তু কোথাও কোনো অবলম্বন না পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাঠের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আবার সবই ঠিক হয়ে গেছে। কোথাও যেন আর মাঠের সেই হৈচৈ, চিৎকার-চেঁচামেচি কিছুই নেই। সেই মাঠটাই যেন আর নেই। সব মিলিয়ে গেছে ভোজবাজির মতো। সমস্ত কেমন চুপচাপ। নিঃশব্দ।

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কোথা থেকে যেন গম্ভীর স্বরে ধীর লয়ে গির্জার ঘণ্টা বেজে চলেছে। ঢং, ঢং, ঢং...।

কী শান্ত। কী নীরব।

উঠে বসে চারিদিকে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল দালি। এটা একটা চার্চ প্রাঙ্গণ। চার্চ-বিল্ডিং-এর সামনে মোটা মোটা বিশাল গথিক থামগুলো ওপরে উঠে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে সে একবার চার্চটার চারপাশে ঘুরে এল। নীল নির্মেঘ আকাশের মধ্যে গির্জার সু-উচ্চ কনিকাল চূড়া ভেসে রয়েছে। দেখতে দেখতে তার মনে পড়ল, খুব ছোটোবেলায় মা তাকে একবার এই চার্চটা দেখাতে নিয়ে এসেছিল। মেদিনীপুর স্টেশনের কাছেই চার্চটা। সেন্ট জন'স চার্চ।

চার্চ পরিক্রমা করে সেই আগের জায়গাটাতেই ফিরে এল দালি। সামনে একটা গ্রেভ-ইয়ার্ড। ক্রিশ্চান ধর্মানুসারীদের সারি সারি অজস্র কবর। কী শান্ত জায়গাটা! কোনো কোনো কবর পাথর দিয়ে বাঁধানো। কোথাও একটা সিমেন্টের স্ল্যাব বা প্লাক। তাতে মৃত ব্যক্তির নাম, ধাম, পরিচয়, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এসব লেখা।

গোরস্থানের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে সব থেকে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল পাশাপাশি তিনটে কবর। কবরগুলো অন্য কবরের তুলনায় আকারে বড়ো আর বেশ কারুকার্য করা।

পেডি। ডগলাস। বার্জ। শেষ চিহ্ন।

পেডি সাহেবের কবরটাতে লেখাগুলো হলুদ হয়ে এসেছে। একটা কারুকার্য করা বিশালাকার ক্রশের নীচে পাথরের ওপর লেখাগুলো খোদাই করা। কোনোমতে নামটা পড়া যাচ্ছে—জেমস পেডি। বাকি কথা অস্পষ্ট আখরে।

তারপর রবার্ট ডগলাস। সেও তথৈবচ। হলুদ বিবর্ণ। এখানেও বিশাল একটি ক্রশের নীচে শ্বেতপাথরের ফলক। কোনোমতে পড়া যায়—রবার্ট ডগলাস, ই এস কিউ, আই সি এস। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তারপর? নাহ্, আর কিছুই পড়া যাচ্ছে না। দশকের পর দশক ধরে রোদ, জল, বৃষ্টিতে সবই ধুয়ে মুছে এসেছে।

বার্জ-এর কবরটাতেই লেখাগুলো এখনও স্পষ্ট অনেকটা। যদিও সব পড়া যায় না। যদিও কবরটার অবস্থা খুবই খারাপ। কবরের সিমেন্টের ঢাকনা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তার নীচ থেকে উঁকি দিচ্ছে ঘাস মাটি। কবরের মাথার দিকে চার ধাপ বেদী। সেই বেদীর ওপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর রিলিফ মূর্তি। যীশুর হাঁটু থেকে নীচের অংশ ভেঙে সাফ হয়ে গেছে। যীশুর পায়ের নীচে প্লাকের ওপর লেখা :

ইন প্রাউড অ্যান্ড লাভিং মেমরি অফ
বার্নার্ড ই জে বার্জ
(ববি)
ইন্ডিয়ান সিভিল সারভিস
হ ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড অ্যাট মিডনাপুর
... নাইন্টিন থার্টি থ্রি
এজেড থার্টি এইট ইয়ারস
'দ্য প্রাইস অফ এম্পায়ার'

একটা কালো রঙের লেজঝোলা দোয়েল বার্জের কবরের ওপর এসে বসে আছে। একটু পরেই সুর করে টেনে টেনে ডাকতে ডাকতে কোথায় যেন উড়ে চলে গেল দোয়েলটা...

সেই কবরস্থানের মধ্য দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল দালি। মনে হচ্ছিল, কী লাভ মানুষের এই বেঁচে থাকায়? কী লাভ অহংকার করে? কী লাভ অন্যকে কষ্ট দিয়ে, যন্ত্রণা দিয়ে, অপমান করে? এভাবেই তো সব শেষ হয়ে যায়। পেডি, ডগলাস, বার্জ। এত অত্যাচার করেছে, এত নিপীড়ন করেছে, এত দম্ভ ছিল ওদের। কী হল? মরে মাটি হয়ে গেছে। পোকায় খেয়ে গেছে শরীর। তাহলে? কী লাভ? কী লাভ? কী লাভ?

হাঁটতে হাঁটতে গ্রেভ-ইয়ার্ডটার একপাশে চলে এসেছে সে। হঠাৎ দেখল, একটা চৌবাচ্চার মতো জায়গা। পাড়টা বাঁধানো। এটাও কি একটা কবর? কিন্তু ক্রশ কই? প্লাক কই? কার কবর?

ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে ভেতরে কী আছে দেখতে চাইল দালি। কিন্তু ভেতরে কিছু নেই। শুধু একটা বোবা অন্ধকার। যেন একটা তলহীন গর্ত। কত নীচে চলে গেছে গর্তটা কে জানে!

কত নীচে? কী আছে নীচে? ঝুঁকে দেখতে গেল সে। আর অমনই প্রচণ্ড জোরে পেছন থেকে কে যেন ধাক্কা মারল তাকে। চিৎকার করে উঠল দালি সেই অন্ধকারের মধ্যে। গর্তটার মধ্য দিয়ে সে পড়ছে...পড়ছে...পড়ছে...

সেই ইতিহাসের অন্ধকারের ভেতর পড়তে পড়তে দালি দুটি মানুষের কথা শুনতে পেল। একজন আরেকজনকে গমগমে গলায় বলছে, "আপনি একদল লোককে পোলিটিকালি ডিথ্রোন করতে পারেন, যতীশদা। তাদের মেরে তাড়াতে পারেন দেশ থেকে। কিন্তু তাদের কালচারালি ডিথ্রোন করতে পারলেন কি? তারা চলে গেল, অথচ আমরা 'তারা' হয়ে গেলাম। কী লাভ হল বলুন তো সাহেবগুলোকে মেরে?"

সেই প্রশ্নের উত্তরে একজন বয়স্ক মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "আর তোমার ট্রেজার প্রোটেকটারেরই বা কী অবস্থা হল, দীনেশ? মাটির নীচে সম্মান জমিয়ে রাখলে। আর মাটির ওপর আদর্শের এত বড়ো অসম্মান?"

আর কিছু শুনতে পেল না দালি। আবার জ্ঞান হারিয়ে নিতল নিশ্চেতনায় ডুবে গেল।

২৬

'সত্যি, মিথ্যে আর সত্যি-মিথ্যে—এই তিনের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে পীড়াদায়ক বল তো, পেখম!'

"তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। কিন্তু তার আগে তুমি বলো, 'সত্যি-মিথ্যে' বলতে তুমি আসলে কী বোঝাতে চাইছ?" পেখম বলল।

এসি ফার্স্ট ক্লাস কুপের লোয়ার বার্থের গদির ওপর পা-দুটো ছড়িয়ে আরাম করে বসে শৌনক বলল, "কিছুটা সত্যির সঙ্গে যখন অনেকটা মিথ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাকেই বলে 'সত্যি-মিথ্যে'। নে, এবার আসল প্রশ্নটার উত্তর দে।"

'আমার তো মনে হয়, মিথ্যে কথাই সবচেয়ে পীড়াদায়ক। তাই না?'

'হল না, পেখম, হল না। দ্যাখ, মিথ্যে দুরকম। প্রিয় মিথ্যে আর অপ্রিয় মিথ্যে। প্লেজান্ট লাই আর আনপ্লেজান্ট লাই। তার মধ্যে মিথ্যে কথা যদি প্রিয় হয়, তবে তা পীড়াদায়ক হবে কেন?'

'যেমন?' গাড়ির দুলুনিতে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে শুধাল পেখম।

'যেমন ধর, মিথ্যা প্রশংসা। সে তো শুনতে ভালোই লাগে লোকের সাধারণত। প্রশংসা—সে সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক—সে জিনিস শুনে গাল লাল হয়ে যায় না, এমন লোক দেখতে আমি নর্থ পোল অবধি যেতে পারি। এই যেমন ধর, তুই। আমি যদি বলি, তুই তোর প্রিয় অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তের থেকেও সুন্দরী, তাহলে—'

'ওহ্ বাঁবা—!'

"ওই দ্যাখ, যদিও বাইরে একটা কপট-রাগের অভিনয় করছিস, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব আহ্লাদ হচ্ছে তোর। সেই আহ্লাদের চোটেই অস্থির হয়ে 'বাবা' হয়ে যাচ্ছে 'বাঁবা'! এখন এটা হচ্ছে প্রিয় মিথ্যে কথার উদাহরণ। যদিও তুই জানিস, প্রত্যেকেই যে যার মতো করে সুন্দর, তবু রাধিকার সঙ্গে তোর চেহারার তুলনাটা যত মিথ্যেই হোক, তবু তা তোর কানে মধু ঢালল। ঢালল তো?"

পেখম হিস হিস করে বলে উঠল, 'আর তোমার লিলি, তোমার লিলি? তোমার লিলি কি জুহি চাওলা নাকি?'

চশমার ওপর দিয়ে অধ্যাপকসুলভ চাহনি বিস্তার করে ছদ্মগাম্ভীর্যে বলল শৌনক,

'মাকে নাম ধরে ডাকছ পেখম, এটা কি ঠিক হচ্ছে? মায়ের প্রতি তোমার এত ঈর্ষার কোনো সঙ্গত কারণ আছে কি, ইলেক্ট্রা?'

'ইশ্, ইলেক্ট্রা! সেই বাজে মেয়েটা!'

'বাজেই কী? আর ভালোই বা কী? যাগগে যাক, দেখা গেল, মিথ্যে কথা সব সময় পীড়াদায়ক হয় না। কিন্তু সত্যি?'

'সত্যিও তো দু-রকমের। প্রিয় সত্য আর অপ্রিয় সত্য।'

'হ্যাঁ। প্রিয় সত্য পীড়াদায়ক নয়। ধর, কেউ যদি আমাকে বলে, শৌনক, আপনার মেয়ে পেখম বড়ো ভালো মেয়ে। সেটা তো সত্যি কথাই। সেটা শুনতে আমার ভালোই লাগবে। তাই না?' চওড়া করে হেসে প্রশ্ন করল শৌনক।

'হ্যাঁ, তা তো ভালো লাগবেই। কিন্তু ধরো, যদি কেউ তোমাকে বলে, শৌনকবাবু! আপনি এন্তার সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে হার্ট আর লাং-এর বারোটা বাজাচ্ছেন, তখন সেই অপ্রিয় সত্য তোমার তেতোই তো লাগবে, বাবা! তাই না?'

'উফ্, চাক্কু! চাক্কু!' নিজের বুকে ঘুসি মেরে ছুরি চালানোর অভিনয় করে শৌনক বলল, 'ওহ্! বেটি এক্কেরে চাক্কু মাইরা দিল রে! একে এই করোমন্ডল এক্সপ্রেসের বন্ধ কামরা। ফ্লাইট পেলাম না। সাতাশ ঘণ্টা সিগারেট না খেয়ে টিকে থাকতে হবে। তারপর তোর এই চেতাবনি-মার্কা কথা। আমি যাই কোথায় বল দেখি? টয়লেটে গিয়ে খেলে টিটিই ধরে ফাইন করে দেবে...'

"সে যাই হোক," কথাটা ওদিকে আর গড়াতে না দিয়ে পেখম বলল, "এতক্ষণ তাহলে আমরা দেখলাম, সত্যি আর মিথ্যে দুটোই ক্ষেত্রবিশেষে প্লেজান্ট বা আনপ্লেজান্ট হতে পারে। এখন তোমার 'সত্যি-মিথ্যে' জিনিসটি কেমন, তা বলো! সবচেয়ে পীড়াদায়ক? সব সময় পীড়াদায়ক?"

'পীড়াদায়ক না হলেও, আমি বলব, অস্বস্তিকর। যেমন ধর, তুই জানিস, অনেক সত্যি কথার সঙ্গে কিছুটা মিথ্যে মিশিয়ে কেউ তোর প্রশংসা করছে। তোর একটা অস্বস্তি হবে। তোর মনে হবে মিথ্যেমিথ্যি অনেকটাই বাড়িয়ে তোকে প্রেজেন্ট করছে লোকটা। অ্যাপ্রিসিয়েশন-টা খোলা মনে উপভোগ করতে পারবি না। ভাববি, লোকটার অন্য কোনো ধান্দা নেই তো? ঠিক তেমনই, ধর, অনেকটা মিথ্যের ঘোলের সঙ্গে এক চিমটে সত্যির নুন মিশিয়ে কেউ কাউকে নিয়ে একটা স্ক্যান্ডাল রটিয়ে দিল...'

শৌনককে থামিয়ে দিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে পেখম বলে উঠল, 'যেমন দেবলীনামাসির ব্যাপারটা? ওই যে বিরূঢ়ক না বিরহিত কী নাম যেন লোকটার, সে লীনামাসির নামে যে গল্পটা ফেঁদেছে শ্রীনিবাসনের কাছে, তুমি কি সেটার কথাই বলছ?'

'এগজ্যাক্টলি। ঠিক এটাই আমি বলতে চাইছিলাম। বিরূঢ়কের গল্পের অনেকটাই বানানো। আবার খুব অল্প সত্যিও আছে ওর মধ্যে।'

'কতটা সত্যি?'

'বলা কঠিন, পেখম। তবে আমি যতটুকু জানি, যতটুকু আমি ভাবতে পারি, তাতে বিয়ের আগে দেবলীনার আর বিরূঢ়কের মধ্যে যে একটা প্রেমের ব্যাপার ছিল, সেটা সত্যি। ওরা বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল, সেটাও। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার পর থেকেই বাকি অংশটার অনেকটাই যে বানানো, তা আমি অনুমান করতে পারি। তবে কতটা বানানো, কীভাবে বলব, বল। আমার ধারণা, বিরূঢ়কের সঙ্গে দেবলীনার গত বিশ-বাইশ বছর কোনো যোগাযোগ নেই।'

'কীভাবে তুমি তা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারো, বাবা?'

'দ্যাখ, এত বছর ধরে রিলেশনটাকে জিইয়ে রেখে এখন সেটা শ্রীনি-র কাছে ডিসক্লোজ করার মানেটা কী? যদি না কোনো আলটিরিয়র মোটিভ থাকে? লক্ষ কর, ভিপিএন হ্যাক করে শ্রীনি-র সঙ্গে যোগাযোগ করার পরেই বিরূঢ়ক—তার আর দেবলীনার গল্পটা শ্রীনি-র কাছে করেছে। তার আগে কিন্তু নয়। এর আগে একটা বেনামী চিঠি দিয়েও তো অন্তত শ্রীনি-কে এসব ব্যাপারে জানাতে পারত বিরূঢ়ক। তা কিন্তু করেনি। এটা করল ভিপিএন হ্যাক করে শ্রীনি-র সঙ্গে যোগাযোগ করার পরেই। তার মানে, টিপি-র চিফ হতে চাইছে বিরূঢ়ক। আর সেটা হওয়ার পথের বাধা শ্রীনিবাসন। তাকে সরিয়ে দিতেই এই মারাত্মক ন্যারেটিভটি বানাতে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আমার।'

পেখম একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে হাঁটুর ওপর ওই কাটা দাগটা? ওটার কথা বিরূঢ়ক জানল কী করে?'

'এটা কি একটা তেমন কোনো ব্যাপার? বিরূঢ়ক আর দেবলীনা একই স্কুলে ছোট্টোবেলা থেকে পড়েছে। বিরূঢ়ক এক বছরের সিনিয়র। আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি, দাঁড়া। প্রান্তনীলকে মনে আছে তোর?'

'প্রান্তনীল? মানে টিটো? যে আমাদের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত?'

'একদম। ক্লাস এইটে টিটোকে একবার কুকুরে কামড়েছিল, খেয়াল আছে?'

'আছেই তো। আমি, আত্রেয়ী আর সুমন টিটোকে ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে গেছিলাম।'

'কুকুরটা কোথায় কামড়েছিল টিটোকে? মানে শরীরের কোন জায়গায়?'

'হিহিহি! হিপের কাছে। পেছন থেকে।'

'তাহলে কী দাঁড়াল?'

পেখম দাঁত দিয়ে হাতের নখ খেতে খেতে খানিক ভেবে নিয়ে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ, বাবা, বুঝতে পারছি। ছোটোবেলার বন্ধুরা এসব হাত বা পায়ের কাটা দাগফাগের কথা মনে রাখতে পারে, যদি মনে রাখতে চায় এবং মনে রাখার মতো

কোনো দুর্ঘটনার ফলে যদি ওই মার্কটা এসে থাকে। দেবলীনামাসির হাঁটুর ওপর কাটা দাগটাও হয়তো এভাবেই এসেছে ওরকম কোনো দুর্ঘটনা থেকে, বিরূঢ়ক যার সাক্ষী ছিল। তাই তো?'

'একদম, একদম। তাছাড়া কলেজ-লাইফে বিরূঢ়কের সঙ্গে দেবলীনার ঘনিষ্ঠতাও দাগটাকে মনে রাখতে হেল্প করেছে, ভুলে যাস না।'

'বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বলো। এই সত্যি-মিথ্যে ন্যারেটিভটা থেকে কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে শ্রীনিবাসন এখন বুঝবেন কীভাবে? ফিল্টার করবেন কীভাবে? ছাঁকনি কোথায়? সন্দেহটা তো থেকেই যাবে!'

কুপের বন্ধ দরজাটা কেউ নক করছে। পেখম উঠে গিয়ে দরজা খুলল। একটা ট্রে-তে দুকাপ কফি আর স্ন্যাকস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্যান্ট্রি-কারের লোক। দু-কাপ কফি সার্ভ করে লোকটা চলে গেল। কফিতে সিপ করে চিন্তামগ্ন স্বরে বলল শৌনক, 'এটা খুব কঠিন সমস্যা, পেখম। দেবলীনা আর শ্রীনিবাসন—ওদের একসঙ্গে বসতে হবে। খোলাখুলি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তারপরেও আসছে বিশ্বাসের প্রশ্ন। ট্রাস্ট। ভালোবাসার প্রশ্ন। এই বিশ্বাস, ভালোবাসা, নির্ভরতা—এগুলোর ওপরেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলো দাঁড়িয়ে আছে, পেখম!... কফিটা খাচ্ছিস?'

'খাচ্ছি। খুব বাজে খেতে। আরশোলা-আরশোলা গন্ধ।'

'ঠিক বলেছিস। মরতে কেন যে অর্ডার দিলাম? ধ্যাৎ!'

'এই ট্রেনে কিছু খেয়ো না। হোটেল থেকে লাঞ্চ, ডিনার সব প্যাক করে এনেছি। ওগুলোই খাও।'

'আচ্ছা, তাই সই। তুই যখন বাইরের খাবার খেতেই দিবি না আমাকে, তখন আর উপায় কী?' কফিতে আর-একটা কষ্টচুমুক দিয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল শৌনক, 'এই, কানে এটা তুই কী পরেছিস রে? আগে দেখিনি তো!'

'বাব্বা! হোটেল থেকে পরে বেরিয়েছি, এতক্ষণে দেখলে? ভেতরে ভেতরে কিছু একটা নিয়ে কীসব চিন্তা করছ এত যে, অন্যমনস্ক হয়ে আছ? আগে দ্যাখোনি মানে কী? দুবছর আগে আমার জন্মদিনে বুলিপিসি এটা দিয়েছিল মনে নেই?' পেখম বলল।

'বুলি? মানে দালির মা প্রতিমা? বেশ সুন্দর তো মুক্তো বসানো দুলটা!'

'হ্যাঁ, বুলিপিসি আবার কজন? জানো তো, এই পার্ল ইয়াররিং-টা বুলিপিসিই পরত আগে। এখন আর পরে না। তাই আমাকে দিয়ে দিয়েছে।'

'বুলি পরত?'

'হ্যাঁ। বুলিপিসিকে রিং-টা উপহার দিয়েছিল একজন ছোটোবেলায়। সেও একটা গল্প। গল্পটা বুলিপিসি আমাকে বলেছে।'

'কী গল্প?'

'আচ্ছা, সে তোমাকে পরে বলব কখনও, এখন থাক। যাকগে, এখন একটা ব্যাপার একটু ক্লিয়ার করো দেখি, বাবা। এই যে দেবলীনামাসি আর শ্রীনিবাসন স্যার—ওদের যদি সত্যি-মিথ্যের কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে, সেটা যাচাই করার জন্য একসঙ্গে বসতেই হয়, তাহলে এবারেই আমাদের সঙ্গে ফিরলেন না কেন শ্রীনিবাসন?'

'চেয়েছিলেন তো ফিরতে। আমিই বারণ করলাম। প্রথমত, টিপি-র চিফ হিসেবে শ্রীনি যেসব পুঁজিপতিদের মার্ডার অর্গানাইজ করেছিলেন, সেগুলো পুলিশের কাছে ডিসক্লোজ করে দিতে পারে বিরূঢ়ক। যে কায়দায় ও ভিপিএনের পাসওয়ার্ড ভেঙেছে, ওইরকমই বা ওর থেকেও ভয়ংকর কোনো উপায়ে নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে বিরূঢ়ক এটা করতেই পারে। তখন শ্রীনি সাংঘাতিক বিপদে পড়বেন। অন্যদিকে শ্রীনি যদি বেরিয়ে এসে পুলিশের কাছে যান, পুলিশকে বিরূঢ়কের ব্যাপারস্যাপার বলেন—'

শৌনকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল পেখম, 'পুলিশ একটা কথাও বিশ্বাস করবে না শ্রীনিবাসনের। উলটোদিকে বরং মিডিয়ার কাছে টিপি-র সমস্ত খবর চাউর হয়ে যাবে। পুঁজিপতিদের মার্ডারগুলোও।'

'সেই তো। তাছাড়া শ্রীনিবাসনের শারীরিক অবস্থাটাও তো একবার ভাববি...'

'হ্যাঁ। তা সত্যি। এত বয়স্ক লোক যে সারভাইভ করতে পেরেছেন...'

'সেটাই। স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে অনেক দূরে একটা সেগুন গাছের পড়ন্ত ডালে আটকে গেছিল ভদ্রলোকের জ্ঞানহীন শরীর। তারপর কোনোমতে জ্ঞান ফিরেছিল। অবশেষে লোকাল লোকেদের হেল্প নিয়ে মানুষটা সভ্য জগতে ফিরে এসেছেন। ফিরেছেন সেই মাদ্রাজেই। কারণ, এখানেই নিজেকে লুকিয়ে রাখার সুবিধে। রামস্বামী শ্রীনিবাসনের আগের কথা কিছুই জানেন না। চিকিৎসা এখনও চলছে। শুনলাম, হার্ট এখনও বেশ দুর্বল। আরও অনেক কিছু। এ অবস্থায় আর এখনই বাড়ি ফেরা...'

'আচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু শ্রীনিবাস এত সহজে রামমূর্তি ভবনের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারলেন কীভাবে, কিছু জানো?'

'জানি। রামস্বামী শ্রীনি-কে চিনতে পারেননি। চেনার কথাও না। শ্রীনি মাদ্রাজ ছেড়েছেন বহু বছর আগে। রামস্বামী তখন কিশোর মাত্র। কিন্তু এবার চেন্নাইতে আসার পর উইগ থাকা সত্ত্বেও ওকে চিনে ফেলেন কপালীশ্বর মন্দিরের পূজারী।'

'আচ্ছা! তাই?'

'হ্যাঁ। কপালীশ্বর মন্দিরের পুরোহিত চন্দ্রশেখরণ শ্রীনি-কে চিনতে পারেন। শ্রীনিবাস তাঁকে সব কথা খুলে বলেন। চন্দ্রশেখরণ তখন রামস্বামীর কাছে শ্রীনি-র হয়ে সুপারিশ করেন। বলেন, রামমূর্তির জীবনী লিখবার জন্য শ্রীনিবাসনই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, সে-ই দৈবপ্রেরিত লেখক। সেটাই নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছা। রামস্বামী ধর্মভাবুক লোক আর এখানে পুরোহিতদের প্রভাব সাংঘাতিক, জানিস তো? এর ফলেই রামমূর্তির

বাজেপ্রকার হিসেবে রামমূর্তি ভবনে শ্রীনিবাসনের বহাল হতে কোনো অসুবিধেই হয়নি। এসব কথা আমি শ্রীনি-র কাছেই শুনলাম।'

'আচ্ছা, জলে ফেলে দেওয়ার আগে বিরূঢ়ক কেন বুঝতে পারল না, শ্রীনিবাসন স্যার বেঁচে ছিলেন?'

'বিরূঢ়ক তাড়াহুড়ো করেছিল, আমি শিওর। ওভার-কনফিডেন্স! প্রচণ্ড নার্ভাস শক পেয়ে শ্রীনিবাসন কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন মাত্র। ঝট করে দেখে মনে হয়েছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, আর অমনি জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। জলে ফেলাটাই তো ভুল। আমার তো মনে হয়...'

'কী?' শৌনক ব্যগ্র স্বরে প্রশ্ন করল।

'যে পারফিউমটা বিরূঢ়ক লোকের গায়ে স্প্রে করে দিয়ে সাপ ডেকে আনে, সেটা কোনো না কোনোভাবে ওয়াটার-সলিউবল। স্রোতে ফেলে দেওয়ার পর শ্রীনি-র গা থেকে ওই পারফিউম ধীরে ধীরে জলে গুলে যায়। তাই মনে হয়, সাপে খায়নি। তাছাড়া, এ অবস্থায় বেঁচে ফেরাটা শ্রীনি-র ভাগ্যই বলতে পারিস। কপালে মরণ না থাকলে, যা হয়।'

'ভাগ্য? তুমি বলছ, ভাগ্য? তুমি? তুমি যে বলো, তুমি ভাগ্য মানো না?'

'বেশ, মানছি না। শ্রীনি-র আগের আগের সুকৃতির ফল হিসেবেই ধরে নে। অথবা, কিছুই ধরতে হবে না। ওঁর বেঁচে থাকাটা জাস্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট। এমন অ্যাক্সিডেন্ট যে হয় না একেবারে, তা তো নয়। এই আর কি!'

'সত্যিই, যা চক্করে গিয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক! আর ওই সাপের ঘরটা! ম্যাগ্‌গো! বর্ণনা শুনেই আমার হয়ে গেছে। কী ভয়ানক ব্যাপার! ওই দেখেই যে শ্রীনিবাসনের হার্ট ফেইল করেনি...'

'সে তো বটেই। তবে শ্রীনি মনেপ্রাণে শিল্পী। সাপের গতিময়তা, রং, ভয়ংকরের সৌন্দর্য তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছে তাঁর শিল্পী মন। ঘৃণা আসেনি, ভয় আসেনি, মুগ্ধতা জেগেছে...'

'তবে যাই বলো, বাবা, বিরূঢ়ক লোকটা কিন্তু ভয়ানক!'

'ভয়ানক যে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয়ানকের থেকেও বেশি জটিল লোকটা। এবং বেশ ইন্টারেস্টিং!' শৌনক বলল।

'ইন্টারেস্টিং? ইন্টারেস্টিং মনে হল তোমার লোকটাকে?'

'ইন্টারেস্টিং নয়? স্রেফ পাতি খুন করার ইচ্ছে থাকলে তো অনেক আগেই বহুবার সুযোগ এসেছিল। খুন করেনি তো! শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার পথেই বিরূঢ়ক শ্রীনি-কে মেরে ফেলতে পারত। কিংবা শিলিগুড়ি থেকে ওর আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার পথে পাহাড়ি রাস্তার ধারে। কে দেখছে? কুয়োতে ঠেলে ফেলে মারতে পারত

শ্রীনিবাসনকে। সাপের সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেল কেন? মনে রাখিস, বিরূঢ়ক সাহিলকেও কাঁসাই নদীর ধারে ভয়ংকর সাপের খেলা দেখিয়েছিল। তারপর দ্যাখ, ওই নির্জন জায়গায় পাগলা ঝোরার ধারে গলা টিপেও মেরে ফেলতে পারত শ্রীনিবাসনকে বিরূঢ়ক। কেউ জানত না। এসব কিছুই না করে সে একটা গল্প বলল। ফ্যান্টাসি। তার থেকে যা মনে হয়...' শৌনক কথা বলতে বলতে ভাবছে।

'ওই গল্পটা বলতে বলতে বিরূঢ়ক আসলে ভেতরে ভেতরে নিজেই এনজয় করছিল?'

উজ্জ্বল চোখ মেলে মেয়ের দিকে তাকাল শৌনক। বলল, 'এই তো দারুণভাবে ভাবতে শিখেছিস। ওই গল্পটা আসলে একটা ফ্যান্টাসি। দেবলীনাকে নিয়ে বিরূঢ়কের মনের মধ্যে যেসব বাসনা-কামনা জমেছিল এতদিন ধরে, ওই গল্পটা তারই আউটোয়ার্ড এক্সপ্রেশন। একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, সে প্রোফেশনাল কিলার নয়। শ্রীনি-র পেছনে প্রোফেশনাল কিলার লাগানোর পয়সা থাকলেও, সেরকম কিছুই সে করেনি। তাহলে এই ভয় দেখানোটাও কি সে এনজয় করছে? ভয় দেখাতে চায়? ভয় পেতে চায়? সেজন্যেই টিপি-র ভিপিএন ক্র্যাক করেছিল? এতটা নীচু রাস্তায় উত্তেজনা পেতে চাইছে কেন লোকটা? অন্য সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে? নাকি অন্যান্য এনজয়মেন্টগুলো বিস্বাদ হয়ে গেছে ওর কাছে? কী জানি, বুঝতে পারছি না রে এখনও আমি এই লোকটাকে।'

দরজায় আবার নক করছে কেউ। এবার শৌনক উঠে গিয়ে দেখল, কালো কোট-পরা মাঝবয়সি একজন টিটিই দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে এলেন। টিকিট চেক করে চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিল শৌনক।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে শৌনক বলল, 'ওংগোল স্টেশনটা আসবে সাড়ে বারোটার দিকে। আর আধঘণ্টাটাক পর। তুই এবার হোটেল থেকে কী কী লাঞ্চ নিয়ে এসেছিস বের কর তো! পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে।'

লাঞ্চ-প্যাকেট দুটো বের করতে করতে পেখম বলল, 'সবই তো হল। কিন্তু আসল জিনিসই ফাঁক!'

'কীরকম?'

'ট্রেজার প্রোটেকটারের ট্রেজার! তার কী হবে? আর ওই ছড়াটা? ছড়াটার সঙ্গে ট্রেজারের শিওর যোগ আছে। কিন্তু কী যে অর্থ ওটার?'

আপনমনে বিড়বিড় করে বলল শৌনক, 'উদ্ভুট্টি ছড়াই বটে! কিছুতেই জট ছাড়াতে পারছি না—

> তথাগতর পট খুলে যায় ফিবু নাচে শর্টে,
> হদিস পাবেই, যদি তোমার বুদ্ধি থাকে ঘটে।
> নাগলোকের পেটের ভিতর বিষাক্ত নীল হাওয়া,
> মরণজয়ী চিরচেতন প্রাণের আসাযাওয়া।'

পেখম বলল, 'কোথাও একটা তথাগতর পট, মানে বুদ্ধের ছবি আছে, নাকি? সেই ছবিটা চাপ দিলেই খুলে যাবে? খুলে গেলেই দেখা যাবে একটা সুড়ঙ্গ? ধাপে ধাপে সিঁড়ি পাতালে চলে গেছে?'

শৌনক বলল, 'কে জানে! ফিবু-টাই বা কে? সেই বা খামোখা নাচছে কেন?' 'নাচছিস তো নাচছিস? আবার শর্টে নাচছিস কেন? বেশ খেলিয়ে খেলিয়ে নাচলে কী ক্ষতি হত?'

শৌনক বলল, "সেই তো! তবে দ্যাখ, সেকেন্ড লাইনটায় মনে হয়, কোনো ইনফরমেশন নেই। একটু খোঁচা মারা আছে, এই যা। 'হদিস পাবেই যদি তোমার বুদ্ধি থাকে ঘটে!' মানে যদি হদিস না পাও, বোঝা যাবে, তুমি একটি নিটোল গবেট!"

পেখম উত্তর দিল, "হ্যাঁ। তারপর 'নাগলোক'! সে যে কোথায় কে জানে! বিরূঢ়ক ডিয়ারের সাপের খাঁচার মতোই কিছু একটা মাটির নীচে আছে, নাকি? সেখানকার হাওয়া আবার 'বিষাক্ত নীল!' বাপ রে!"

"তারপর দ্যাখ না, ছড়ার শেষ লাইনটি তো একেবারে মিস্টিক কবিতা। 'মরণজয়ী চিরচেতন প্রাণের আসা যাওয়া!' একেবারে ঋষি অরবিন্দের 'সাবিত্রী'! বাদ দে, বাদ দে তো এসব! ছাড়, ছাড়! খেতে দে। যত্তসব! ভাবা যাবে এখন মেদিনীপুরে ফিরে...'

লাঞ্চ সেরে নেওয়ার পর পেখম ম্যাগনেটিক চেস বের করল। প্রথমবার শৌনক হেরে গেল মেয়ের কাছে। দ্বিতীয়বার সামান্য অন্যমনস্কতায় গজ হারাল পেখম। একটু পরে পরে দুখানাই। তারপরই ওর কনফিডেন্স এমনভাবে ভাঙল, পথ করে নিতে শৌনকের আর অসুবিধে হল না। চেক-মেট!

বিজয়ওয়াড়া পেরিয়ে গেল। বিকেল হয়ে আসছে। কুপের জানালার স্মোকড গ্লাসের ওদিকে মিলিয়ে আসা কতগুলো গ্রাম। আলো কমে আসছে এবার। শূন্য শস্যহীন মাঠ। মাঝে মাঝে আঁধার আঁধার জলাভূমি। রাজামুন্ড্রি এল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

পেখম ফেসবুক খুলে খুটখুট করছিল। শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'নেট পাচ্ছিস তুই ট্রেনে?'

'খুব স্লো। টাওয়ারের বাজে অবস্থা।'

'যা বলেছিস! আমি তোর মা-কে হোয়াটস্যাপে একবার পেলাম দুপুরবেলায়। তারপর আর...'

'বিরহ?'

'বড়ো পাকা হয়েছিস, পেখম, এই ক-দিনে!'

'এই শোনো না, বলছি, তুমি লীনামাসীকে বলেছ, শ্রীনি-কে খুঁজে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। অ্যাঁ? না। কালকেই কথা বলেছি দেবলীনার সঙ্গে। এইটুকু শুধু বললাম, মিশন সাকসেসফুল। চিন্তা করবেন না।'

'বুঝলাম,' বলেই আবার পেখম মোবাইলে খুটখুট করতে লাগল।

সন্ধে আটটার দিকে ডিনার সেরে নিল ওরা। ভাইজাগ আসতে আরও ঘণ্টা দু-এক। কীসব চ্যাট করছে পেখম। শৌনক একটা বই পড়ছিল। অ্যানি বারিং আর জুলে ক্যাশফোর্ডের 'দ্য মিথ অফ দ্য গডেস'। গবেষণা যে এত চিত্তাকর্ষক করে লেখা যেতে পারে, না পড়লে বিশ্বাস হয় না।

ভাইজাগ পেরোনোর পর বারবার হাই উঠতে লাগল পেখমের। শৌনক বলল, 'ঘুমোবি? তাহলে ওপরের বাঙ্কে উঠে যা।'

পেখম তাই করল। কুপের ডিম আলোটা জ্বেলে দিল শৌনক। নীচের বাঙ্কে মাথার কাছে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বেলে একপাশে কাত হয়ে শুল।

পড়তে পড়তে বারবার এই ক-দিনের ঘটনাগুলো ছবির মতো মাথার মধ্যে আসছে। বই মুড়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে মগ্ন হয়ে ভাবছিল শৌনক। চেন্নাই আসা, রামমূর্তি ভবন, শ্রীনিবাসন... বিরূঢ়কের অদ্ভুত ভয়ংকর গল্প... শ্রীনি-র খোঁজ পাওয়াটা সত্যিই একটা সাকসেস! কিন্তু ট্রেজারের হদিস কিছুই পায়নি এখনও। সেদিকটা অন্ধকার একেবারে। আর ওই ছড়াটা...কী যে অদ্ভুত!

ফিবু নাচে শর্টে! বাব্বা! শিবু শুনেছি, দেবু শুনেছি, নেবুও হতে পারে কারও নাম... কিন্তু ফিবু? আচ্ছা, নেবুচাটনেজারের ডাকনাম যদি নেবু হত, তাহলে ফিবু কার ডাকনাম হতে পারে? সে নাচেই বা কেন? ফিবু নাচে শর্টে...ফিবু নাচে শর্টে...

ভাবতে ভাবতে কখন যে দুচোখের পাতা জড়িয়ে এসেছে, জানে না শৌনক। ট্রেনের একটা অদ্ভুত দুলুনি আছে, নেশা ধরে যায়... এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি দিল পাড়ি—কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম, রজনী নিঝুম... যেন কতটা পথ পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা অন্ধকারে অন্ধকারে দুলতে দুলতে কোন একটা অজানা নদীর ওপর রেলব্রিজ দিয়ে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ... ঘুম ঘুম ঘুম...

...কোথাও যেন জ্যোৎস্না উঠেছে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। পাতা দিয়ে ছাওয়া ছোট্টো একটা মাটির ঘর। ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে কে এক রূপসী মেয়ে যেন। দেবলীনার মতো দেখতে যেন অনেকটা। অথচ দেবলীনা নয় সে। আকাশের চাঁদের দিকে মুখখানি তোলা তার। দুটি গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। চাঁদের আলো পড়ে রুপালি অশ্রুধারা চিকচিক করছে।

ঘরের ভেতর কেউ যেন আছে। ঘরের ভেতর থেকে প্রদীপের আলোর স্তিমিত আভা এসে পড়েছে দাওয়াতেও। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে একবার বলল, 'এমন চাঁদের শোভা... তুমি একবারও দেখলে না, বিরহাঙ্ক?'

ঘরের দিক থেকে কোনো উত্তর নেই। আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করে মেয়েটি বলল, 'বিরহাঙ্ক! আমার কথা কানে যাচ্ছে না তোমার, বিরহাঙ্ক? পুঁথির নিষ্প্রাণ পাতায়

চোখ জ্বেলে বসে আছ... অথচ একটু আগেই বললে, আমার সঙ্গে বসে চাঁদ দেখবে...'

ঘরের ভেতর থেকে এবার উত্তর এল। বেশ সুন্দর মন্দ্র পুরুষালি স্বরে কেউ যেন ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'চাঁদের শোভার থেকেও সংখ্যার সৌন্দর্য আমাকে যে একেবারে বিমোহিত করে রেখেছে, প্রিয়ে! আহা! অপূর্ব! তুমিও এসো, দ্যাখো এদিকে... দ্বৌ দ্বৌ পূর্ববিকল্পৌ মিলয়িত্বা জায়তে সংখ্যা। সা উত্তরমাত্রাণাং সংখ্যায়া এষ নির্দেশঃ। তার মানে, পরের সংখ্যাটি সর্বদাই পূর্ব পূর্ব দুটি পদের যোগফল। এইরূপেই প্রতিটি পদ আসছে। অনন্তগামী অনুক্রম। এ কী বিচিত্র! অভূতপূর্ব!'...

...হঠাৎ কোথাও একটা ঝাঁকুনি লেগে ঘুম ভেঙে গেল শৌনকের। সে ধড়মড় করে উঠে বসল। রিডিং ল্যাম্পটা একইরকম জ্বলছে। ঘুমোনোর আগে নেভাতে ভুলে গিয়েছিল।

জানালার কাচের কালো পর্দা সরিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল শৌনক। আলো-আঁধারিভরা নিঝুম একটা অচেনা স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মাথার ওপর বাংকে পেখমের নিঃশ্বাসের শব্দ। নিথর হয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়ে।

কী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল সে এতক্ষণ! চাঁদের রাতে একটা পুরোনো দিনের পাতার কুটির। দাওয়ায় বসে আছে একজন অভিমানিনী মেয়ে। ঘরের ভেতর থেকে অন্য কে একজন কথা বলে উঠল। বিরহাঙ্ক না কী যেন নাম সেই অন্তরালবর্তী পুরুষের। বিরহাঙ্ক...বিরহাঙ্ক? নামটা কোথায় যেন সে শুনেছে...

মনে পড়ছে না। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই, কেন জানি তার মনে হচ্ছে এই স্বপ্নটার সঙ্গে ওই ছড়াটার কী একটা যোগাযোগ আছে! অথচ অন্তর্লীন যোগাযোগটা যে ঠিক কীসের, বুদ্ধি দিয়ে বুঝে উঠতে পারছে না। হাতঘড়িতে সময় দেখল। রাত্রি একটা তেরো।

বিরহাঙ্ক!? বিরহাঙ্ক কে?

হঠাৎ অনুসন্ধাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির করিডোরে হাজার ওয়াটের ফ্লুওরোসেন্ট ল্যাম্প জ্বলে উঠল। নামটা সে শুনেছিল বটে একটা সেমিনারে! আইআইটি খড়গপুরে। পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় বলছিলেন। যদ্দূর মনে পড়ছে সেমিনারের টপিক ছিল— পিঙ্গল ছন্দসূত্রের গণিত। সেই প্রসঙ্গেই উঠে এসেছিল যে নামটা!

আইআইটি সেমিনারটা অ্যারেঞ্জ করেছিল। বছর দুই আগে। পার্থদা তাঁর চেনা। নরেন্দ্রপুর কলেজের ম্যাথসের প্রোফেসর। মাঝে মাঝেই কথা হয় ফোনে। ভারতীয় গণিতের ইতিহাস পার্থদার ফেবরিট টপিক। পার্থদাই লেকচারের মধ্যে বলেছিলেন বিরহাঙ্ক নামের এক ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ানের কথা। মনে পড়েছে! কিন্তু কী বলেছিলেন, কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

পার্থদাকে ফোন করবে? এখন এই এত রাত্রে? পার্থদা অবশ্য অনেক রাত অবধি জেগে থাকেন। এর আগে রাতের বেলাই কথা হয়েছে। ফোন করাই যায়।

কিন্তু বিরহাঙ্ক কে, এ নিয়ে সে এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন? এখন না জেনে পরে জানলেই বা ক্ষতি কী?

আসলে কেন জানি মনে হচ্ছে, এই বিরহাঙ্ক মানুষটিকে না জানতে পারলে এই অদ্ভুত ছড়ার ধাঁধা সে ভাঙতে পারবে না। সে দেখেছে, এমন হয় কখনও কখনও, যখন তার মন দুটো আপাত-বিচ্ছিন্ন সমস্যা একসঙ্গে সমাধান করতে চায়। সমাধান হয়ে গেলে দেখা যায়, দুটো প্রবলেমই আসলে ইন্টার-রিলেটেড ছিল। একটা না সলভ্ করতে পারলে আরেকটাও আনসল্ভড হয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু প্রথমে সেটা বোঝা যায়নি।

নাহ্, বিরহাঙ্ক কে, সেটা তাকে জানতেই হবে। এখনই।

টাওয়ার পাবে? বোধহয় না। ফোনে কথা বললে পেখমের ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে দরজা খুলে করিডোরে এসে দাঁড়াল শৌনক। 'পার্থসারথি এনডিপি'-নামটা সেভড নাম্বারের লিস্ট থেকে বের করে ডায়াল করার চেষ্টা করল। নাহ্, পাচ্ছে না। আউট অব নেটওয়ার্ক সারভিস বলছে। একবার... দুবার... তৃতীয়বারে গিয়ে একটা গান বাজতে লাগল... 'এসেছিলে, তবু আসো নাই, জানায়ে গেলে'... তার মানে পার্থদার এন্ডে রিং হচ্ছে। কেটে দেবে? কী জানি, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি ভদ্রলোক!

ফোনটা কেটে দিতেই যাচ্ছিল শৌনক। কিন্তু ঠিক তখনই ফোন ধরলেন পার্থদা। বেশ সজাগ গলায় বললেন, 'বল! তুই কোত্থেকে ফোন...?'

কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। পার্থদা তার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি না, কে জানে! 'আমি একটা ট্রেনে, পার্থদা। চেন্নাই থেকে ফিরছি। ঘুম ভাঙালাম নাকি?'

'না, না, জেগেই...।'

'একটা রেফারেন্সের জন্য ফোন করছিলাম, পার্থদা। তুমি আইআইটি-র সেমিনারটায় বলেছিলে...'

'মিনার? কীসের মিনার? কী বলছিস? ... ওহ্, সেমিনার! কথা কেটে কেটে... কোন সেমিনার...'

'ওই যে আইআইটিতে বলেছিলে ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিকসের ওপর...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বল!'

'ওই লেকচারের মধ্যে বিরহাঙ্ক বলে একজন ম্যাথমেটিশিয়ানের ওপর বলেছিলে...'

'মানসাঙ্ক? মেন্টাল ম্যাথমেটিক্স?'

'আরে না! বিরহাঙ্ক... বিরহাঙ্ক...'

'ও, বিরহাঙ্ক! ইশ্ এই লাইনটা...! বিরহাঙ্ক—কী হয়েছে?'

'বলছি, বিরহাঙ্কের কন্ট্রিবিউশনটা কী?'

'ডিস্ট্রিবিউশন? না? তবে?... ও আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা! বিরহাঙ্কের কন্ট্রিবিউশন? মানে অবদান?'

'হ্যাঁ।'

'সে বিরাট...। বিরহাঙ্ক একটা ইনফাইনাইট সিকোয়েন্স আবিষ্কার করেছিলেন। সেটার কথা পরে হেমচন্দ্র বলে একজন গণিতবিদ তাঁর বইতে...। বিরহাঙ্কের প্রায় পাঁচশো বছর পরে... ওই একই সিকোয়েন্স ইতালিতে... লিওনার্দো পিসানো... উল্লেখ করেছিলেন।'

'লিওনার্দো পিসানো?'

'হ্যাঁ, পিসানো। যার ডাকনাম ফিবোনাচ্চি...'

'ও, ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স?' শৌনক প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

'হ্যাঁ, ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স রে! ওটা আসলে তার পাঁচশো বছর আগে ভারতে... বিরহাঙ্ক নামে একজন গণিতবিদের আবিষ্কার... কিন্তু লোকে ওটাকে ফিবোনাচ্চি...'

ফোনটা কেটে গেল পার্থদার দুম করে। পরপর দুবার চেষ্টা করল শৌনক তার পরেও। নাহ্, আউট অফ রিচ।

তা হোক। কিন্তু কাজ হয়ে গেছে। কেন তার মন এই মাঝরাতে তাকে ঠেলে তুলে পার্থদাকে ফোন করাল, ধরতে পেরেছে শৌনক। কী অদ্ভুত! মনের এসব অদ্ভুত ক্রিয়াকর্ম নিয়ে কতটুকু আর গবেষণা হয়েছে এতদিনে!

ভারতীয় গণিতবিদ বিরহাঙ্ক একটা ইনফাইনাইট সিকোয়েন্স আবিষ্কার করেছিলেন। যেটা তার পাঁচশো বছর পর ইতালিতে ফিবোনাচ্চি উল্লেখ করেন। এবং যথারীতি সেটা ফিবোনাচ্চি-র নামেই চলে আসছে।

ফিবোনাচ্চি! 'ফিবু নাচে শর্টে'!! 'ফিবু নাচে' হচ্ছে তাহলে 'ফিবোনাচ্চি'। এই ধাঁধাটার ভেতর তাহলে ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু কী সেই ব্যাপারটা?

০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫...

এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স। প্রত্যেকটা পদ তার আগের দুটো পদের যোগফল।

০

১

০+১=১

১+১=২

১+২=৩

২+৩=৫

৩+৫=৮

৫+৮=১৩...

মজার ব্যাপার প্রথম দুটো পদ বাদ দিয়ে বাকি প্রত্যেকটা পদকে তার আগের পদ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলটা ১.৬১৮০৩৩৯৮৮৭৫... এর দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যায়। যাকে ম্যাথমেটিকসে 'গোল্ডেন রেশিও' বলা হয়।

১/১=১, ২/১=২, ৩/২=১.৫, ৫/৩=১.৬৬..., ৮/৫=১.৬, ১৩/৮=১.৬২৫, ২১/১৩=১.৬১৫৩..., ৩৪/২১=১.৬১৯০৪৭..., ৫৫/৩৪=১.৬১৭৬৪৭...

ওহ্, এই গোল্ডেন রেশিও কোথায় নেই? সে যে একটা মস্ত ইতিহাস, প্রবল অ্যাডভেঞ্চারময়। না, সে কথা থাক এখন।

কিন্তু ফিবু নাচে 'শর্টে' কেন? শর্ট ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স বলে তো কিছু নেই। তাহলে?

তথাগতর পট খুলে যায়, ফিবু নাচে শর্টে...

নাহ্, কিচ্ছু খুলছে না। ইশ্, এখন যদি একবার একটু বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া যেত!

হায় রে! এই বন্ধ কামরায় না আছে একটু সত্যিকারের বাতাস, না একটু স্মোক করার রাস্তা। চা, কফি দুটোই বিস্বাদ। ফ্লাইটের টিকিট না পেয়ে বাধ্য হয়ে একগাদা টাকা দিয়ে এই ফার্স্টক্লাস কুপে বুক করতে হল। ওহ্! অন্তত যদি একবারটি এই বন্ধ কামরা থেকে বেরিয়ে ফাঁকা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া যেত!

কুপের মধ্যে ফিরে গিয়ে দেখল শৌনক, পেখম অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা সরে গেছে। প্যান্ট-টপ, যা পরেছিল, তাই পরেই ঘুমিয়েছে। চেঞ্জও করেনি। মেয়ের ঘুমন্ত মুখ দেখে কেমন মায়া হল শৌনকের! ওকে কম্বল দিয়ে ভালো করে ঢেকেঢুকে সে আবার করিডোরে বেরিয়ে এল। ট্রেনটা একটা অজানা স্টেশনে ঢুকছে। একটু দাঁড়াবে হয়তো।

হাঁটছে। লম্বা করিডোরের শেষ প্রান্তে গ্লাসডোর। ওটা ঠেলে খুলতেই দেখল, সেই টিটিই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

'ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং, স্যার?'

'নাথিং। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গেট ডাউন ফর আ হোয়াইল।'

'ইয়োর রিজার্ভেশন আপটু...?'

'খড়গপুর। বাট আই ওয়ান্ট টু স্ট্রেটেন মাই লেগস। ইটস হিয়ার সো স্টাফি...'

নীচের চোয়ালটা দুদিকে নেড়ে টিটিই লোকটি বললেন, 'আয়াম আফ্রেড, দ্যাটস নট পসিবল, স্যার! অ্যাট লিস্ট অ্যাট দিস আনার্থলি আওয়ার। দ্য ডোর অফ দ্য কম্পার্টমেন্ট ইজ লকড। ইউ মে গেট ইয়োর চান্স অ্যাট ভুবনেশ্বর।'

ভুবনেশ্বর? সে তো আসবে প্রায় পাঁচটার দিকে। এখনও প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা? ওফ!

বিফলমনোরথ হয়ে শৌনক আবার ফিরে এল কুপেতেই। গেখম সেই একইভাবে ঘুমোচ্ছে। শুধু সাইড চেঞ্জ করেছে দেখা যাচ্ছে। শৌনক ভাবল, সেও একবার ঘুমোনোর চেষ্টা করে দেখবে এবার।

রিডিং ল্যাম্প অফ করে মুখ-মাথা কম্বলে ঢেকে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। বৃথা চেষ্টা! ঘুম যে আজ রাত্রে তার চোখ ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে! পার্থকে ফোনটা না করলেই হত। এখন শুধু উদ্ভট ছড়াটাই নয়, তার সঙ্গে যোগ দিল ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স। চিন্তার দুটো দৈত্য যেন তার মাথার দুপাশের দুটো রগ পিষে দিয়ে যাচ্ছে।

নাঃ, ঘুম হল না একেবারেই। ভুবনেশ্বর এল পাঁচটা পনেরোতে। কিছুটা লেটে চলছে ট্রেন। এখানে মিনিট কুড়ি দাঁড়াবে। শৌনক উঠে দাঁড়িয়ে আপার বার্থের কাছে মুখ এনে ডাকল, 'গেখম! গেখম!'

গেখম পাশ ফিরে সাড়া দিল ঘুম জড়ানো গলায়, 'উঁ—'

'বলছি, চা-কফি কিছু খাবি? কী ঘুম রে বাবা!'

'না। তুমি খাও,' বলে আবার দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে কম্বলে মুড়িঝুড়ি দিয়ে শুল গেখম।

অগত্যা। কুপে থেকে বেরিয়ে শৌনক দেখল, করিডোর সামান্য চঞ্চল। দু-তিনটে ফ্যামিলি লটবহর নিয়ে গেটের দিকে যাচ্ছে। নামবে।

তাদের অনুসরণ করে গ্লাসডোর ঠেলে বেরিয়ে এসে শৌনক দেখল, কামরার দরজা খোলা। ভুবনেশ্বর অবধি যাদের রিজার্ভেশন ছিল, নামছে। তাদের বাক্সটাক্স সমেত নামা শেষ হলে শৌনক ভাবল, এই সুযোগ। প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নেওয়া যাক।

নামবার সময় কালো কোট পরা সেই টিটিই ভদ্রলোককে সে দেখতে পেল আবার। হাতের ক্লিপবোর্ড-এ আটকানো প্যাসেঞ্জার-লিস্ট মিলিয়ে দেখছেন। শৌনককে দেখে ভদ্রলোক ভুরু নাচিয়ে হাসলেন এক চিলতে। বললেন, 'গুড লাক!'

স্টেশনে তখন সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। ঠান্ডা-ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে একটু। প্ল্যাটফর্মে কয়েক পা হাঁটতেই শৌনক একজন চা-ওলাকে দেখতে পেল। হাতে গরম কেটলি আর মাটির ভাড় নিয়ে দ্রুত তালে আসতে আসতে হাঁকছে, 'চা-এ, চা-এ!'

খাবে নাকি? খেলে মন্দ হয় না। প্ল্যাটফর্মেও সে সিগারেট খেতে পারবে না, বলাই বাহুল্য। স্টেশনের চা-টা অন্তত প্যান্ট্রির বিস্বাদ কফির থেকে বেটার হবে। তাই সই।

চা নিল শৌনক। চায়ের ভাঁড় হাতে ধরিয়ে দিয়ে লোকটা হনহন করে চলে গেল। 'চা-এ, চা-এ!'

সিমেন্টের বেঞ্চটায় আরাম করে বসে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিল শৌনক। আহা, খাসা! এতক্ষণ পর একটা চা পাওয়া গেল।

ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স। গোল্ডেন রেশিও। ভাবা যায়।

তা গোল্ডেন রেশিও যে ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স আবিষ্কারের আগে জানা ছিল না, তা তো নয় মোটেই। দুহাজার তিনশো বছর আগে ইউক্লিড তাঁর লেখাপত্তরের মধ্যেই এর কথা বলেছিলেন। যেটা মজার, সেটা হচ্ছে, ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সে পরের পর আসা পদগুলোর অনুপাতের সঙ্গে ব্যাপারটা পরে মিলে যায়। কোন স্মরণাতীত কাল থেকে যে সৌন্দর্যের নিদর্শন হয়ে আছে এই গোল্ডেন রেশিও!

চায়ে চুমুক দিল শৌনক। শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ লাগছে তার এই ভোরবেলায়!

কে ভাবেননি কে এই গোল্ডেন রেশিও নিয়ে? অ্যারিস্টটল, পিথাগোরাস, মিকেল্যাঞ্জেলো, দা-ভিঞ্চি, আরও কত জন! ভিট্রুভিয়ান ম্যান, মোনালিসা, দ্য লাস্ট সাপার—সব, স-অ-ব ছবিতে দা ভিঞ্চি একে ব্যবহার করে গেছেন। আর্টিস্ট, ডিজাইনার, বাস্তুবিদ, চিন্তক সকলে মাথা ঘামিয়েছেন এই নিয়ে।

মায়াসভ্যতায় ছিল, গ্রিসে ছিল, মিশরে ছিল। গ্রিস দেশের পার্থেনন, মিশরের পিরামিড—সব এই গোল্ডেন রেশিও মেনে বানানো। শুধু কি তাই?

চায়ে আবার চুমুক দিল শৌনক। জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীরটা। মাথার ব্যথাটা আর নেই।

...শুধু কি তাই? সমস্ত প্রকৃতি, সারা ব্রহ্মাণ্ডেই এই গোল্ডেন রেশিওর আধিপত্য। পাইনের কোন, সূর্যমুখী ফুলের বীজের পারমুটেশন, কত সব গাছের পাতা, ফুলের পাপড়িও ফোটে ঠিক এই গোল্ডেন রেশিও মেনে।

আহ্, চা-টা খাসা বানিয়েছে! পেখম খেতে পারত। নার্ভগুলো যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে।

আজকের দিনেও কম্পিউটার ডেটা স্ট্রাকচার, অ্যালগরিদম, অডিয়ো কমপ্রেশন, আরকিটেচচারাল এঞ্জিনিয়ারিং, হাই এনার্জি ফিজিক্স, কোয়ান্টাম মেকানিকস, ক্রিপ্টোগ্রাফি... সমস্ত জায়গায় এই গোল্ডেন রেশিওর প্রয়োগ।

খুব কড়াও নয়, আবার একদম হালকাও নয় চা-টা। চিনিটাও একদম যথাযথ। কী দিয়ে বানিয়েছে চা-টা? আরামে ঘুমে চোখ দুটো যেন বুজে আসছে। কেমন একটা এলাচ-দারুচিনির সুগন্ধ চা-টাতে।

মানুষের সারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাপজোখ... কনুই থেকে কব্জির দূরত্ব আর কব্জি থেকে আঙুলের ডগার দূরত্ব যদি মাপি, তাহলে দেখব ও দুটোরও অনুপাত এই গোল্ডেন রেশিওর সমান হবে। শুধু হাতই নয়, সারা শরীরটা, সারা শরীরটা...

আরে গোটা ইউনিভার্সটাই এই গোল্ডেন রেশিওতে চলছে। এই পুরো নেবুলাটাই ফিবোনাচ্চি সিরিজে... ফিবু নাচে শর্টে... ফিবু নাচে শর্টে...

বিশাল বিশাল সংখ্যা, তাদের অনুপাত, অজস্র ছবি, মূর্তি, স্থাপত্য, রং, রূপ, ফুলের বাহার, পাতার বাহার সমস্ত কিছু যেন দুলে দুলে উঠতে লাগল শৌনকের তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনায়...

চায়ে কী ছিল? কী ছিল চায়ে? চায়ে কি কিছু মেশানো ছিল? কিছু ছিল চায়ে? চা-এ, চা-এ!

কেমন একটা আশ্চর্য ঘোর ঘোর অন্ধকার যেন...

শৌনক ভুলে গেল, সে ট্রেন থেকে নেমেছে। বসে আছে প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে। ভুলে গেল, মিনিট পনেরো পরে ট্রেনটা ছেড়ে দেবে। ভুলে গেল, তার মেয়ে পেখম এসি ফার্স্টক্লাস কুপের টু-টায়ারের আপার বার্থে অসহায় শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে এখনও।

হাত থেকে আধখাওয়া চায়ের ভাঁড়টা আলগা হয়ে ঠিন্-ঠকাস্ শব্দ তুলে প্লাটফর্মে আছড়ে পড়ল। কিন্তু সেই শব্দে শৌনকের ঘুম ভাঙল না। সে গণিতের সেই গন্ধমধুর অন্ধকারের ভেতর অনুদ্ধারণীয়ভাবে ডুবে যেতে লাগল...

২৭

ট্রেনের সেই ঘুম পেখমের ভাঙল খুব অদ্ভুত অবস্থায়, খুবই অদ্ভুত পরিবেশে।

তার মনে হল, সে যেন বসে আছে কোথাও। 'মনে হল'-বলাটাই ঠিক, যেহেতু সে দেখতে পেল না কিছুই। চোখের সামনে নিকষ কালো অন্ধকারের একটা পর্দা ঝুলছে। চোখ বুজলেও যা, চোখ খুললেও তাই। তবে কি সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে হঠাৎ? ব্যাপারখানা কী, ধরতে না পেরে অবস্থাটা মাথা খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল পেখম। টের পেল, সে যেন একটা শক্ত কেঠো চেয়ার-জাতীয় কিছুতে বসে আছে। পা নাড়তে গিয়ে দেখল, পারছে না; পা দুটো শক্ত করে বাঁধা সেই চেয়ারের মতো জিনিসটার পায়ার সঙ্গে। হাত? হাতদুটোও সামনের দিকে বাঁধা। তাহলে কেউ কি তাকে এখানে ধরে এনেছে?

ট্রেনে বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। সেখান থেকে... এখানে? কে আনল? কীভাবে আনল? বাবা কোথায়?

অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে মাথায় ভিড় করলে এখন মুশকিল, পেখম নিজেকে ধমকালো। সমস্ত প্রশ্নের মিছিল থামিয়ে দিয়ে সে শুধু একটি সঙ্গত প্রশ্নকে উঠতে দিল মনে। এই ট্রেনিং সে মার্শাল আর্টের ক্লাসে পেয়েছে। অনেক প্রশ্ন নয়, একটি প্রশ্ন শুধু। সব থেকে দরকারি প্রশ্নটা কী হতে পারে এ বিষম মুহূর্তে?

সেই প্রশ্নটি হচ্ছে : তার হাত যে বা যারাই বেঁধে থাকুক, কী দিয়ে বেঁধেছে? স্পর্শের সমস্ত অনুভবকে হাতের বাঁধনের জায়গায় নিয়ে গিয়ে জড়ো করল সে। বাঁধনের মেটিরিয়াল কী? ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নিতে ছাড়তে ছাড়তে বাঁধনের জায়গার চামড়ায় যে স্পর্শটা সে পাচ্ছিল, সেটা যে ধাতব নয়, নাইলনও নয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে সেকথা বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পেখম।

নাইলন হলে মুশকিল ছিল। ছাড়া পাওয়া খুবই সমস্যার হয়ে যেত তখন। যাকগে, দেখা যাক কী করা যায়।

দড়ি দিয়ে বাঁধা হাতজোড়া মাথার ওপর তুলে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, তার মাথা-মুখ একটা টুপির মতো কিছু দিয়ে ঢাকা। সম্ভবত মোটা কালো কাপড়ের টুপিই হবে একটা। ওইজন্যেই সে কিচ্ছুটি দেখতে পাচ্ছে না।

ওই বাঁধা হাতজোড়া দিয়েই টুপিটা সরাল সে। চোখদুটো পিটপিট করে দৃষ্টি স্বাভাবিক করে সামনে তাকাতেই সে হতবাক হয়ে ব্যোমকে গেল।

কী আশ্চর্য! তার একেবারে সামনে বুলিপিসি ঘাড় কাত করে তারই দিকে অপলক চেয়ে আছে যে! দালির মা বুলিপিসি এখানে এল কীভাবে? কী অদ্ভুত একটা পোশাক যে পরেছে বুলিপিসি! একটা নস্যি রঙের কোট, সাদা কলার উঁকি দিচ্ছে গলার কাছে। মাথায় একটা হালকা নীল রঙের স্কার্ফ জড়ানো। স্কার্ফটার চূড়ো থেকে নস্যি রঙের একটা কাপড়ের টুকরো পাগড়ির প্রান্তের মতো নেমে এসে লুটিয়ে পড়েছে বুলিপিসির সুন্দর পিঠের ওপর। লাল রঙের লিপস্টিকে রাঙানো ঠোঁটদুটো খোলা, কী যেন বলতে চাইছে বুলিপিসি! কী অসহায়, কী সরল আহা বুলিপিসির মুখ! আর বুলিপিসির কান থেকে সেই মুক্তো বসানো ইয়াররিং-টা ঝুলছে কেমন দ্যাখো!

ইয়াররিং-টা চোখে পড়ামাত্রই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবর্তক্রিয়ায় পেখমের ডান হাত নিজের কান ছুঁতে চাইল। কিন্তু হাত বাঁধা থাকায় পারল না। তবু সে টের পেল, কানে দুলজোড়া তার আছে ঠিকই, কেউ নিয়ে নেয়নি। কিন্তু এই করতে গিয়ে এক লহমায় চটক ভাঙল তার। সে বুঝতে পারল, ওটা বুলিপিসি নয়। চোখের সামনে যেটা ঝুলছে, সেটা নির্ঘাত একটা পেইন্টিং!

চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখল সে। একটা আবছা আলোমাখানো শূন্য ঘর। তার মেঝেতে একটা কাঠের চেয়ারে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় সে বসে আছে। দরজা লাগানো। দুটো জানালার একটা বন্ধ, একটা হাট করে খোলা। ঘরের দেওয়াল ওয়াল-পেপার দিয়ে মোড়া। কোথাও কোথাও ওয়ালপেপার ছিঁড়ে সিমেন্টের অসুন্দর দেওয়াল বেরিয়ে এসেছে। আর সেই দেওয়ালের ঠিক মধ্যিখানে একটাই শুধু ছবি টাঙানো। মুক্তো-বসানো দুল পরা একটি সরলা যুবতীর পেইন্টিং।

ছবিটা সে এর আগে কোথায় দেখেছে খানিক ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল। হ্যাঁ, এটা একটা বিখ্যাত অয়েলপেইন্টিং বটে! ডাচ শিল্পীর আঁকা। 'গার্ল উইথ আ পার্ল ইয়াররিং'! শিল্পীর নাম সম্ভবত জোহানস্ ভারমির বা এরকম কিছু হবে। এই ছবিটা নিশ্চয়ই সেই ছবিটারই একটা কপি।

কিন্তু ছবি নিয়ে ভাবনা করার মতো সময় এখন নেই তার। যত শীঘ্র সম্ভব এই বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। হাতের দুই কব্জি আড়াআড়িভাবে ট্যুইস্ট করতে করতে দড়ি সামান্য আলগা করার চেষ্টা করতে লাগল পেখম। ভাবছিল, ভাগ্যিস বেশিরভাগ লোক নট কীভাবে বাঁধতে হয় জানে না! খুব আঁট করে বেঁধেছে সত্যিই, কিন্তু এটাই যদি ঠিকঠাক একটা হ্যান্ডকাফ-নট হত বা হাতদুটো যদি পিছমোড়া করে বাঁধত, তাহলেই হয়েছিল আর কি।

কব্জি নাড়তে নাড়তে বাঁধন সামান্য আলগা হয়ে এল। এবার দাঁত দিয়ে দড়িটাকে

সে কামড়াতে লাগল প্রাণপণে। কামড়ে কামড়ে দড়ির একটা পাক কোনোমতে একদিকের আঙুল পার করে ফেলল। ব্যস, হাত-ছাড়ানো এখন আর কোনো ব্যাপার নয়।

হাতদুটো মুক্ত হতে হাতের আঙুলগুলো সামনে পেছনে সঙ্কুচিত প্রসারিত করে কব্জি দুটোকে দুপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে হাতের সাড় ফিরিয়ে আনল পেখম। বাম হাতের কব্জির কাছটা ঘষা লেগে কেটে গেছে। যাকগে, সে তেমন কোনো ব্যাপার না। দুলজোড়া ঠিকঠাক আছে তো? আঙুল দিয়ে সে একবার রিং দুটো কানের লতিতে ঠিক করে বসিয়ে নিল।

হাত গেল, এবার পা। পা দুটো চেয়ারটার পায়ার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। হুম্! পা তো একইভাবে ছাড়ানো যাবে না। বেশ, চেয়ারটাকেই ছাড়াতে হচ্ছে তাহলে।

পায়ের অ্যাঙ্কল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাঁধন আলগা করতে চাইল। ধুৎ, হচ্ছে না! কোমর ঝুঁকিয়ে দুহাত দিয়ে বাঁধনের গিঁট খসানোর বৃথা চেষ্টা করতে লাগল। এইসব ঘষাঘষিতে একটু যেন আলগা হল বাঁধন। হ্যাঁ, এটুকুই যথেষ্ট। এবার চেয়ারশুদ্ধ উঠে দাঁড়াল পেখম। হাত দিয়ে চেয়ারটাকে ওপরের দিকে টানতে লাগল। চেয়ারের পায়াদুটো বাঁধন থেকে খুলে এল এবার। টান... টান... হ্যাঁচকা টান... আরেকটু... আরেকটু! হ্যাঁ, হয়েছে। চেয়ার খুলে বেরিয়ে আসছে। ব্যস! পা ফ্রি। বাব্বা!

চেয়ারের পায়ার সঙ্গে তার পায়ের গোছ ঘষা লেগে কেটে গেছে এখানে ওখানে। রক্ত পড়ছে। পড়ুক। মুক্ত পা দুটো নাড়াচাড়া করে সাড় ফিরিয়ে এনে ধাড়িস করে একটা লাথি কষাল পেখম চেয়ারটায়। চেয়ারটা উলটোদিকে মুখ থুবড়ে পড়ল সশব্দে।

শরীরের দুপাশে বারবার হাত-পা ছড়িয়ে গুটিয়ে স্ট্রেচ করতে লাগল খানিক স্কুলের মেয়েদের মতো। এক্সারসাইজ নয়, যেন ছন্দোময় নাচ সে নাচছে কোনো। টো-টো-টো টুগেদার, টো-টো-টো টুগেদার! তারপর 'গার্ল উইথ আ পার্ল ইয়াররিং'-কে কেন জানি স্যালুট ঠুকে হাসি-হাসি মুখে বলল, 'গুড মর্নিং, বুলিপিসি!'

তবে 'মর্নিং' কি আর এখন আছে? খোলা জানালাটা দিয়ে দেখল, দুপুরের রোদ বাইরের গাছগাছালির ডালেপাতায় চুঁইয়ে পড়ছে। গাছেদের উচ্চতা থেকে বোঝা যায়, এটা দোতলার কোনো ঘর। অনেকটা দূরে গাছপালার আড়ালে একটা অনেক উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছে।

পকেট হাতড়াল। মোবাইল নেই। ব্যাগট্যাগগুলো কোথায় গেছে কে জানে! এখানে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ট্রেন থেকে নামিয়ে এনে রেখেছে কেউ! কীভাবে সেটা করল, সেটা জানা জরুরি নয় এখনই। কে করল, অনুমান করতে গেলে প্রথমেই বিরূঢ়ক লোকটির কথাই মাথায় আসছে। মুশকিল! ওই বন্ধ দরজা খুলে এখনই এসে ঢুকবে নাকি বিরূঢ়ক আঙ্কল তার ব্ল্যাক মাম্বা আর ভাইপারসদের নিয়ে? মা গো! তাহলেই হয়েছে!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখে বুঝল, সে অক্ষতই আছে। না, ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে শুধু এখানে আনাই হয়েছে, আর কোনো ক্ষতি করা হয়নি। অর্থাৎ, সে এদের কাছে মূল্যবান। কিন্তু কেন?

বাবা গেল কোথায়? কোথায় গেল বাবা? ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার।

আপাতত, দুশ্চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে পায়ের দড়িটা ভাঁজ করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। অনেকটা লম্বা, কাজে লাগতে পারে। কোমর থেকে বেল্টটা খুলল। বেল্ট খুবই ভালো অস্ত্র। বেশিরভাগ লোকে জানে না, তারা সব সময়ই কী ভীষণ একটা ওয়েপন ক্যারি করে ফিরছে সঙ্গে। বেল্ট দিয়ে দূর থেকে ভালোমতো আঘাত করা যায় প্রতিপক্ষকে।

দরজা ঠেলে দেখল, দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া।

এদের ব্যাপারটা কী? চেয়ার পড়ার অতটা শব্দ এদের কানে যায়নি? নাকি, এই বাড়িটায় সে ছাড়া এই মুহূর্তে কেউ নেই? অথবা, যারা আছে, তারা পেখমকে নিরীহ মেয়ে ভেবে দরজায় তালা মেরে অনেকটা দূরে বসে গুলতানি করছে?

কান পেতে শোনার চেষ্টা করল পেখম। কোথাও একটা জল পড়ার টুপ্ টুপ্ শব্দ। কয়েকটা পাখির ওড়াউড়ির তুলোফুড়কি আওয়াজ। একটা গাড়ির ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ শব্দ। হেভি ভেহিকল হবে হয়তো। মনে হচ্ছে, অনেকটা দূরের কোনো হাইওয়ে দিয়ে ট্রাক-জাতীয় কিছু চলে যাচ্ছে।

বেশ। এবার তাহলে ওদের ডেকে আনা যাক। আয় রে, ভাই, তোরা! তোদের ছাড়া ভীষণ একা আর বোর লাগছে আমার! এমন সুন্দর বাড়ি, দেওয়ালে পেইন্টিং, অনেকে না থাকলে পিকনিক করা যায়?

সামান্য পেছনে পিছিয়ে এসে ছুটে গিয়ে বন্ধ দরজায় কাঁধ দিয়ে সশব্দে আঘাত করল পেখম। আঘাত করেই স্যাট্ করে দেওয়ালের একপাশে সরে গেল। হুম্! পায়ের আওয়াজ, কেউ একজন আসছে। চমৎকার!

দরজার তালা খুলে পাল্লা ঠেলে 'ক্যাঁ-চ্' শব্দ তুলে ঘরে ঢুকল একজন মুশকো চেহারার জোয়ান লোক। লোকটা কপাট খুলে ঘরের মধ্যে ফাঁকা চেয়ার দেখে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কী ব্যাপার বোঝার জন্য সোজা চেয়ারের দিকে এগোল। আর তখনই দরজাটা ঝট করে বন্ধ করে দিয়ে পেছন থেকে লোকটার ঘাড়ের ওপর বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পেখম। লোকটা ভাবেনি, এরকম একটা ত্বরিত আক্রমণ পেছন থেকে আসবে। ও কিছু বোঝার আগেই বেল্টের ফাঁস দিয়ে পেছন থেকে ওর গলাটা পেখম আঁট করে বাঁধল। অপ্রস্তুত অবস্থায় গলার ফাঁস ছাড়ানোর জন্য লোকটা হাঁকুপাঁকু করছে। কিন্তু বজ্রমুঠিতে বেল্ট ধরে আছে পেখম। পেছন দিকে লাথি ছুঁড়ে আপদ বিদায় করার চেষ্টা করছিল লোকটা। একবার মনে হল পেখমের, সে পারবে না এর

গায়ের জোরের সঙ্গে। কিন্তু মনকে এতটুকুও দুর্বল হতে না দিয়ে আরো জোরে বেল্টের ফাঁস সেঁটে বসাতে লাগল সে লোকটার গলায়।

খুব বড়ো বীরপুরুষও এ অবস্থায় জ্ঞান ধরে রাখতে পারে না। লোকটাও অচিরেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। ওর জিভ বেরিয়ে এসেছে। বেল্টটা গলা থেকে খুলে নিয়ে লোকটার পেটে পেখম তার শ্রীচরণ দিয়ে সামান্য একটা লাথি মেরে অজ্ঞান অবস্থাটা ওর আরেকটু পার্মানেন্ট করে দিল। তারপর খোলা দরজার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

খুব একটা শব্দ হয়েছে কি? হয়নি মনে হয়। আওয়াজ করবে? আর কেউ নেই? একটাই পাহারা নাকি?

ধুর্, তা হতে পারে না। ওই তো আবার পায়ের শব্দ! তবে এবার বেশ চুপিসাড়ে হাঁটার আওয়াজ।

অনুমান সঠিক। আরেকজন লোক ধূর্ত শিকারীর মতো পা টিপে টিপে ঢুকছে। তবে এ আগেরটার মতো গাম্বাট নয়। টের পেয়েছে মনে হয়, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। হাতে একটা চপার। একে আগের কায়দায় ধোঁকা দেওয়া যাবে না। ঢুকছেই দেওয়াল ঘেঁষে, আগেরটার মতো হনহনিয়ে নয়।

ফ্রন্টাল অ্যাটাকই ভালো। একদম না ঘাবড়ে লোকটার মুখোমুখি হল পেখম। হাতে চপার দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মনকে বোঝালো সে। কিন্তু লোকটা পেখমকে সামনে পেয়ে হিংস্র চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপ দিল। এক হাতে পেখমকে জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে চপার চালাতে গেল।

যে হাতটা দিয়ে ওকে ধরেছে, তাতে বসালো সে এক মোক্ষম কামড়! যন্ত্রণায় চিৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেল লোকটা কয়েক গজ দূরে। অমনি বেল্টটা মাথার ওপর সাঁই করে ঘুরিয়ে ছপাৎ করে মারল পেখম লোকটার হাতে। আর তারই সঙ্গে পেখমের মুখ থেকে একটা গায়ের রক্ত-জল-করা প্রলয়ঙ্করী হুঙ্কার বেরিয়ে এল। বেল্টের আঘাতে মুহূর্তে লোকটার হাত থেকে চপারটা ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর।

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় লোকটা মেঝে থেকে চপারটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছে। নিক। এটাই তো সুযোগ! লোকটা নীচু হওয়া মাত্রই বিষাক্ত কোবরার ছোবলের মতো ডান পায়ের দুটো কিক জমিয়ে দিল পেখম লোকটার শরীরে। একটা থুতনিতে, আরেকটা তলপেটে। লোকটা 'আঁ-ক্' শব্দ করে দুহাতে পেট চেপে বসে পড়তে লাগল।

ওই লাথি হজম করা খুব কঠিন। ভীমা মাতঙ্গীর পদাঘাত! লাথি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে লোকটা দেখেই, কী মনে হতে হঠাৎ লোকটার দুই পায়ের মাঝখানে সজোরে আরেকটা কিক কষাল পেখম।

হুঁ, সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেছে বাছাধন! মোক্ষম জায়গাটি, জ্ঞান ফিরতে অনেক দেরি হবে!

মুচকি হেসে সরে এল পেখম। আর কেউ? আর কেউ নেই?

নাহ্, এত শব্দেও আর কেউ আসেনি মানে, আর কেউ নেইকো!

ধ্যার্, এরা তাকে সাধারণ নিরীহ মেয়ে ভেবেছে। ভালো করে পাহারা রাখেনি। থুঃ!

পকেট থেকে দড়ি বের করে দক্ষ হাতে হ্যান্ডকাফ-নটে দুজনের পা বাঁধল। হাতগুলো বাঁধল পিছমোড়া করে। তৃতীয় ব্যক্তি না আসিলে ইহাদের মুক্তি হইবে না। হা হা হা!

বাঁ হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল পেখম। তারপর আবার 'গার্ল উইথ আ পার্ল-ইয়াররিং'-কে সেলাম ঠুকে কোমরে বেল্টটা বেঁধে মেঝে থেকে চপারটা কুড়িয়ে নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল মেয়েটি। নাহ্, বারান্দাতেও কেউ নেই। সব শুনশান করছে।

চিতাবাঘিনীর মতো পা টিপে-টিপে হাঁটতে লাগল সে বারান্দা দিয়ে। টানা বারান্দা চলে গেছে সারি সারি তালাবন্ধ ঘরগুলোর সামনে। বাড়িটার এদিকটাও পেয়ারা, সফেদা, আশফল, লিচু গাছের সবুজ জঙ্গলে ঢাকা। এবং অনেকটা দূরে সেই একইরকমের উঁচু নীরস একটা পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় পাকানো পাকানো কাঁটাতার বিছানো। কী একটা পাখি 'টি-টি-টি' আওয়াজ তুলে সফেদা গাছের মাথা থেকে পাঁচিলের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল।

সেদিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল পেখম। ভারী ভারী তালা ঝোলানো ঘরগুলোতে দরজায় কান পাতল, কিন্তু কোনো শব্দ শুনতে পেল না সে। ভেতরে কেউ নেই তাহলে এসব ঘরে।

সাত-আটটা ঘর পেরোনোর পর একটা ঘরে যেন একটু নড়াচড়ার আওয়াজ পেল পেখম। তারই সঙ্গে কতগুলো অস্ফুট শব্দ। কে যেন খুব কষ্ট করে টেনে টেনে বলছে, 'ইয়া আল্লাহ্! ইয়া মাবুদ!'

এবং অস্পষ্ট একটা গোঙানির আওয়াজ। শ্বাস টেনে টেনে গোঙাচ্ছে কেউ, তারপর একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে, 'ইয়া আল্লাহ্! ইয়া মাবুদ!'

বারান্দার দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলে রেখে ধীরে ধীরে দরজায় নক করে চাপা স্বরে বলল পেখম, 'ভেতরে কে আছেন?'

অমনি এক লহমায় সমস্ত শব্দ আর কাতরোক্তি থেমে গেল। ভেতরে কেউ যেন খুব সতর্ক হয়ে দরজার কাছ ঘেঁষে সরে এসেছে। তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে পেখম। আবার সে সাবধানে চাপা গলায় উচ্চারণ করল, 'কে আছেন ভেতরে? নাম বলুন!'

আবারও সব চুপচাপ।

কী যেন ভেবে এবার পেখম জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বাই এনি চান্স সাহিল আল ফরাজি? চুপ করে থাকবেন না। আমি আপনার বন্ধু। আপনার নাম কি সাহিল? বলুন।'

এবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেউ যেন মৃদু স্বরে বলল ভেতর থেকে, 'জি হাঁ।'

এরা মায়ের সেই বন্ধু সাহিলমামাকেও ধরে এনেছে? ট্রেজার প্রোটেকটর-এর ভেতরের খবর বলে দেওয়ার জন্য এই শাস্তি? নাকি, আর কিছু? উত্তেজনায় মাথার রগদুটো টিপ্ টিপ্ করে উঠল পেখমের। তার মানে, এসব কাজ সেই বিরূঢ়ক ছাড়া আর কারও নয়।

একটু আগে লোকদুটোর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে মুখের ভেতরে কোনো জায়গা কেটে গেছে। আগে টের পায়নি। এখন মুখে লোনা স্বাদ পাচ্ছে। বারান্দা থেকে বাইরে থুতু ফেললে একতলার কোনো লোকের নজর টানতে পারে ভেবে বারান্দার একপাশে থুতু ফেলে দেখল, রক্ত আসছে লালার সঙ্গে।

একটা কোনো ইঁট-জাতীয় ভারী কিছু এদিক ওদিকে তাকিয়ে খুঁজছিল পেখম। ওরকম ভারী কিছু দিয়ে তালাশুদ্ধ হ্যাশবোল্টটা মেরে ভেঙে দরজার পাল্লা থেকে বের করে আনতে পারলে সাহিলমামাকে মুক্ত করা যেত। কিন্তু কোথাও সেরকম কিছু পেল না।

প্রচণ্ড রাগে পাথরের মতো হয়ে উঠছে তার মুখ। ট্রেনে চুল খুলে ঘুমিয়েছিল পেখম, ওই অবস্থায় ওরা তাকে তুলে এনেছে। এখন সেই খোলা রুক্ষ চুল হিলহিল করছে মুখের দুপাশে। মারপিট করতে গিয়ে কপাল কেটেছে, কপালে আড়াআড়ি একটা কাটা দাগ ফুটে উঠেছে। একটু আগে রক্ত-মেশানো থুতু ফেলেছিল সে, ঠোঁটের কষের কাছে এখনও রক্তবিন্দু লেগে আছে। চোখমুখ লাল হয়ে আছে তার, সেই ঘর্মাক্ত রক্তকুমুদের মতো মুখের দুপাশে সাদা বেলকুঁড়ির মতো জেগে আছে মুক্তোর দুল দুটি। প্যান্টের মধ্যে টপটা ইন করেনি সে ঠিকমতো, গোড়ালির কাছে প্যান্টটা সামান্য ছিঁড়েছে। ওই অবস্থাতেই চপার হাতে সেই ভয়ানক মূর্তিতে এগোতে লাগল পেখম। মাথায় আজ খুন চেপে গেছে তার।

হঠাৎ মধ্যদুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙে দূরের কোনো মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে এল। বায়ুতরঙ্গে আলোড়িত সেই সুর যেন কোন মায়াজগৎ থেকে ব্যাকুল আর্তির মতন নেমে আসছে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল পেখম। কান পেতে আজানের সুরটা শুনতে লাগল। 'আল্লা হু আকবর...আল্লা-আ-আ...!'

আজানের শব্দগুলো যিনি উচ্চারণ করছেন, পেখমের নিশ্চিতভাবে মনে হল, তিনি কোনো বাঙালি মুসলমান। আরবি শব্দের সঙ্গে বাঙালির উচ্চারণ মিশে আছে। যতই হোক, একজন বাঙালি মুসলমান আর একজন জৌনপুরি মুসলমানের আরবি উচ্চারণ এক হতে পারে না।

তার মানে, এ জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে না হওয়াই স্বাভাবিক।

আজানের সুর মিলিয়ে আসতেই আরেকটা প্রচণ্ড গর্জনের শব্দ ধেয়ে এল এবার। এটা একটা এরোপ্লেনের আওয়াজ। এত নীচ দিয়ে উড়ছে? বারান্দার ধারির কাছে সরে এসে পেয়ারা গাছের পাতার আড়ালে এরোপ্লেনের বিরাট চেহারা চোখে পড়ল তার। এক মুহূর্ত পরেই প্লেনটা মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল।

তার মানে, দমদম এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোথাও এ জায়গা? অবশ্য বাগডোগরাও তো হতে পারে! বিরূঢ়ক যখন শ্রীনি-কে শিলিগুড়ি থেকেই তার গোপন আস্তানায় নিয়ে গেছিল, তখন বাগডোগরা হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

আচ্ছা, থাক। পরে দেখা যাবে ভেবে আবার চুপিপায়ে এগোতে লাগল পেখম। আজানের সুর, প্লেনের আওয়াজ এবং তৎসম্বন্ধী বিচার তার একটু আগের ভায়োলেন্ট মনকে কিছুটা হলেও শান্ত করেছে। আরও দু-তিনটে ঘর পেরিয়ে এসে সে দেখল একটা সিঁড়ি। সিঁড়িটা একতলায় চলে গেছে। যাবে নাকি সে একতলায়? না, সেটা ঠিক হবে না।

আর তখনই সে শুনতে পেল, কেউ যেন একতলার বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে আসছে। সেই লোকটার গলা-খাঁকারির আওয়াজ পেল। সিঁড়ির বাঁদিকে ঘাপটি মেরে বসল পেখম চপারটা বাগিয়ে। সে আশা করছিল, যেকোনো মুহূর্তে একতলার লোকটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসবে। উঠে এলেই সে বন্য বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকটার ওপর। আজ এসপার কি ওসপার!

কিন্তু, না। সিঁড়ি দিয়ে না উঠে লোকটা জুতোয় মচ্ মচ্ শব্দ তুলে একতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে গেল বলে মনে হল।

ছায়ামানবীর মতো দ্রুত সিঁড়ির মুখটা ক্ষিপ্র বেগে পেরিয়ে এল পেখম। আবার সেই টানা বারান্দা। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর সে দেখল, একটা ঘর—দরজা বন্ধ, অথচ বাইরে দরজায় তালা দেওয়া নেই। তার মানে, ভেতরে লোক আছে এবং দরজা নিশ্চয়ই ভেতর থেকে বন্ধ করা রয়েছে।

সন্তর্পণে বন্ধ দরজার পাল্লার ওপর হাত বুলিয়ে দেখছে সে, কোনো ফাটল-টাটল আছে কি না! মুক্তোর দুল পরা ছবির সেই বালিকাটির জয় হোক! এই তো রয়েছে দরজার পাটায় একটা ছ্যাঁদা!

সেই উঁকিছিদ্রে চোখ রেখে ঘরের ভেতরটা দেখতে চাইল পেখম। চোখটা সেট হতে একটু দেরি হল। তারপর চোখ সইতে ভেতরে তাকিয়ে সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেল সে!

ঘরের উলটোদিকের দেওয়ালে একটা বড়ো জানালা হাট করে খোলা। জানালা দিয়ে প্রচুর আলো আসছে। মেঝেতে একটাই ক্যাম্পখাট। খাটের বাঁপাশে প্রশস্ত একটা

টেবিল। টেবিলের দুদিকের চেয়ারে দুটো লোক বসে আছে মুখোমুখি। ডানদিকের লোকটা শৌনক, তার বাবা। কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে সে হাসি-হাসি মুখে! আর তার ঠিক বিপরীতে কাঠের মতো মুখ নিয়ে নিষ্প্রাণ চোখ মেলে যে-লোকটা তাকিয়ে আছে তার বাবার দিকে, সে সেই করোমণ্ডল এক্সপ্রেসের টিকিটচেকার টিটিই ছাড়া অন্য কেউ নয়!

২৮

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে চমকে শৌনকের দিকে মুখ তুলে তাকাল বিরূঢ়ক। তার পাথুরে মুখে চোখদুটো হঠাৎ সপ্রশ্ন হয়ে উঠল। দরজায় কে নক করছে এমন অসময়ে? কিন্তু বিরূঢ়কের সেই দৃষ্টি-নিহিত জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর শৌনকের কাছে ছিল না। থাকার কথাও না।

বিরূঢ়ক ভাবছিল। এখন তো তাকে কেউ ডিস্টার্ব করার কথা নয়! এক যদি বড়ো কোনো গোলমাল না হয়ে থাকে। এ ঘরে শৌনকের সঙ্গে কথা বলতে বসার আগেই সে ওদের বলে এসেছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা না দিলে তাকে যেন বিরক্ত না করা হয়। তাহলে কি কিছু ঝামেলা হল?

ভুরু কুঁচকে চিন্তিত মুখে চেয়ার থেকে সে উঠে দাঁড়াল। আত্মমগ্নভাবে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনিটা খোলামাত্রই চমকে পেছনদিকে লাফিয়ে ছিটকে সরে এল বিরূঢ়ক।

চুল খোলা, ঠোঁটের কোণে রক্ত লেগে আছে, উদ্যত চপার হাতে একটা মেয়ে ভয়ংকরী মূর্তিতে জবাফুলের মতো আরক্ত আঘূর্ণিত চক্ষু মেলে তারই দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

পেছনে সে শৌনকের গমগমে গলা শুনতে পেল, 'আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলাম, বিরূঢ়ক, ওই মেয়েকে আপনি কোথাও আটকে রাখতে পারবেন না। ওকে তুলে আনা আপনার পক্ষে বিরাট ভুল হয়েছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে নিস্পৃহ খসখসে স্বরে বলল বিরূঢ়ক, 'মে বি! বাট নাউ টেল দ্যাট লিটল ডেভিল টু কাম ডাউন!'

পেখমের দিকে চোখ তুলে হাসল শৌনক। বলল, 'আয় রে, পেখম! এখানে এসে বোস!'

শৌনকের কথা শুনে চপারটা কোমরে গুঁজে নিয়ে ক্যাম্পখাটের ওপর এসে বসল পেখম। ব্যাপার কী, সে এখনও কিছুই বুঝতে পারছে না। তার মাথার ভেতর এখনও প্রচণ্ড বেগে ঝড় চলছে। ট্রেনের ওই টিটিই-লোকটিই তাহলে ছদ্মবেশী বিরূঢ়ক?

শৌনক হেসে বলল বিরূঢ়ককে, 'ভয় পেয়ে গেলেন? সে তো ভালোই। কারণ, এটাই তো আপনি চান। ভয় পাওয়া। ভয় দেখানো। তাই না?'

মুখে একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ তুলে বিরূঢ়ক বলল, 'এটা তো একটা আকস্মিক ঘটনা। আ সাডেন অকারেন্স। এতে চমকে যাওয়া আর ভয়কে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা কি এক জিনিস নাকি?'

শৌনক উত্তর দিল, 'কেন নয়? আকস্মিকই হোক আর ধীরে ধীরেই হোক, ভয় তো ভয়ই। এই যে অস্ত্র হাতে রুদ্রমূর্তিতে একটি মেয়ের এগিয়ে আসা—এটাই তো আপনাকে সেই আদিম অনুভূতির কাছে নিয়ে গেল। গেল না?'

'ফাইট, অর ফ্লাইট?' কঠিন চোখে শৌনকের মর্মভেদ করতে করতে জিজ্ঞেস করল বিরূঢ়ক।

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। দৃশ্যটা একটা পসিবিলিটি অফ থ্রেট তৈরি করল, তার সিগন্যাল পাঠাল আপনার মস্তিষ্কের থ্যালামাসে। সেখান থেকে বার্তা পৌঁছালো অ্যামিগডালায়। সেই অ্যামিগডালা আপনার সারা শরীরে ছড়িয়ে দিল গ্লুটামেট-এর মতো নিউরো-ট্রানসমিটার...'

শৌনকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিক্ত স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল বিরূঢ়ক, "জানি, জানি। গ্লুটামেট-এর সংকেত পেয়েই পেরিয়াকিউডাকটাল গ্রে থেকে এল একটা রেসিপরকাল রেসপন্স। যার ফলে ভয় পেয়ে ওই লাফিয়ে ওঠা আর ঠান্ডা মেরে যাওয়ার মতো আদিম ব্যবহার করলাম আমি। আরেকটা সংকেত ধেয়ে গেল আমার হাইপোথ্যালামাসে, যার থেকে ওই 'ফাইট অর ফ্লাইট—প্রতিরোধ করো, নয়তো পালাও—হার্ট-রেট বেড়ে গেল, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হল... সিগন্যাল পৌঁছে গেল আমার অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে, কোর্টিসল আর অ্যাড্রিনালিন ক্ষরিত হল... তার থেকেই প্রবল উত্তেজনা—এসব আমি জানি, শৌনক। আজকাল টিন-এজাররাও জানে এসব। কিন্তু তা জেনে কী লাভ হয়, বলতে পারেন?"

শৌনক আহত হয়ে বলল, 'জেনে লাভ হয় না কিছু?'

'নাহ্, কিচ্ছু না,' বিরক্ত স্বরে বলে চলল বিরূঢ়ক, 'কোনো লাভ নেই। বেকার জ্ঞান। ইউজলেস বুকিশ নলেজ। এটা জানবার পর এই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটা কি যখন খুশি ট্রিগার করতে পারবেন আপনি আপনার শরীরে? যখনই ইচ্ছে হবে তখনই ভয় পেতে পারবেন? অন্যকে ভয় দেখাতে পারবেন এই জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে?'

'তা কী করে সম্ভব, বিরূঢ়ক? সেরকম সিচুয়েশন তৈরি না হলে...'

'সিচুয়েশন! সিচুয়েশন! সিচুয়েশন!' উত্তরোত্তর উচ্চ গ্রামে চেঁচিয়ে উঠল বিরূঢ়ক, 'ইফ সিচুয়েশন কন্ট্রোলস এভ্রিথিং... যদি পরিস্থিতিই ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে এটা জেনে লাভ কী হল আমার?'

'আপনি কী চাইছেন?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল শৌনক।

'আমি চাইছি, এটা জানার পর, কোনো যন্ত্রটন্ত্র দিয়ে নয়, এমনি এমনি আমার ইচ্ছেখুশি আমি আমার ব্রেনের থ্যালামাসে বিপদসঙ্কেত পাঠাবো আর সঙ্গে সঙ্গে পুরো প্রসেসটা টার্নড অন হয়ে যাবে। আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠব, বরফের মতো জমে যাব, বুক ধড়পড় করবে, হাঁইফাঁই করে শ্বাস নেব, সাডেন রাশ অফ অ্যাড্রিনালিন... উত্তেজনায় চনমন করে উঠবে মন... আমার ইচ্ছেমতো...যখন খুশি। এ যদি না হল, এত কিছু জানার পরেও ভয় পাওয়ার জন্য যদি সেই বাইরের সিচুয়েশনেরই দাসত্ব করতে হল আমাকে, তখন এই বই-পড়া-জ্ঞানের কী মূল্য রইল আর? থ্রো দিস পিস অফ নলেজ ইনটু দ্য নিয়ারেস্ট ট্র্যাশ ট্রে... ওহ্!' কপালের ওপর এসে পড়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল বিরূঢ়ক যন্ত্রণাকাতর মুখে।

পেখম অবাক হয়ে দেখছিল লোকটাকে। এখন মেয়েটির মুখে আদিম ক্রোধের সঙ্গে এসে মিশেছে বিস্ময়ের বিচিত্র অভিব্যক্তি। একটু আগে যাকে সে একদম মেরে ফেলতে চেয়েছিল, এ মুহূর্তে সেই লোকটারই প্রতি জিঘাংসার ভাব লঘু হয়ে আসছে এবং কোথা থেকে যেন একটা নীলাভ অনুকম্পা জেগে উঠছে। অথচ পেখম চাইছে রাগটাকে ধরে রাখতে, ঘৃণাটাকে বাড়িয়ে তুলতে। কিন্তু তার বিস্ময়বোধ সেই ধরে রাখার কাজটা করতে দিচ্ছে না আর। এই ফিকে হয়ে আসা লসিকার মতো ক্রোধ, বিদ্যুতের মতো অগ্নিবর্ণ বিস্ময় আর ছিটছিটে ঘাসফুলের মতো অনুকম্পাতে আলোড়িত হয়ে সে বলে উঠল, 'আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে?'

মাথা তুলে তীক্ষ্ণ চোখ তুলে পেখমকে যেন জরিপ করে নিল বিরূঢ়ক। তারপর বলল, 'বলো!'

'আপনি কি কোনো বিকল্প উপায় খুঁজে পেয়েছেন?' পেখম প্রশ্ন করল।

'কীসের বিকল্প?'

'সিচুয়েশনের দাসত্ব করার বিকল্প?'

ক্লান্ত চোখে বিড়বিড় করে বিরূঢ়ক বলে চলে, 'সেটা পেলে নিশ্চয়ই আমাকে তড়িঘড়ি ফ্লাইট ধরে চেন্নাই গিয়ে করোমণ্ডল এক্সপ্রেসের টিটিই-কে কব্জা করে তার আইডেন্টিটি নিজের গায়ে চড়িয়ে বাপ-বেটিকে কিডন্যাপ করে আনতে হত না। লোক লাগিয়ে অজ্ঞান করে সংজ্ঞাহীন শৌনককে তুলে আনতে হত না এখানে। কিংবা ঘুমন্ত পেখমকে অসুস্থ পরিচয়ে ট্রেচারে করে নামিয়ে আনতে হত না জাজপুর কেওনঝড় স্টেশনে। গট ইট?'

'সাহিলমামা আপনার উত্তেজনার কোন উপাদান সরবরাহ করেছে?' পেখমের গলা আবার গরম হয়ে উঠছে। লসিকা আবার রক্ত হয়ে ফুটতে শুরু করেছে বোধহয়।

শৌনক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সাহিল? সাহিলকেও আপনি ধরে এনেছেন নাকি? কেন ধরে এনেছেন?'

শেখম চিৎকার করে উঠল, 'শুধু ধরেই আনেনি। সম্ভবত প্রচণ্ড অত্যাচার করেছে এরা। সাহিলমামাকে এই বাড়িরই একটা ঘরে আটকে রেখেছে, আমি জানি।'

বিরূঢ়ক কড়া ধমক দিয়ে বলে উঠল এবার, 'আহ্! চুপ করো। লাউড নয়েজ আমার একদম ভালো লাগে না... চাইলে এক্ষুনি তোমাদের দুজনকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু এ অবস্থায় পড়েছি বলেই...'

'কী অবস্থা, সেটা পরে শুনছি, বিরূঢ়ক,' শৌনক অবিচলিত স্বরে বলল, 'তার আগে আপনি বলুন তো, সাহিল বেচারাকে ধরে এনেছেন কী কারণে?'

'আপনি, আপনিই সেই কারণ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বিরূঢ়ক, 'আমার জানার দরকার ছিল কাকাতুয়া-বাড়িতে আপনি যা উদ্ধার করেছেন, সে ব্যাপারে সাহিলকে আপনি কী কতটা বলেছেন। দেখলাম, কিচ্ছু বলেননি আপনি সাহিলকে। কাকাতুয়া- বাড়িতেও এখন আর কিচ্ছু নেই, আমার লোকজন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। এমনকি সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গও কিচ্ছু নেই। হয় ওরকম কোনো সুড়ঙ্গ ওখানে কোনোকালেই ছিল না; সবটাই গুজব, অথবা, থাকলেও এখন তা বুজিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'আর শ্রীনিবাসন? শ্রীনিবাসনকেও কি তুলে এনেছিলেন শুধু টিপি-র অন্ধকার পাতালে উত্তেজনার ভাপ নেওয়ার জন্য? শুধুই কি শ্রীনি-কে সরিয়ে সুশীতলবাবু সেজে বসার তাগিদ? নাকি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন শ্রীনি-কে সরিয়ে দিয়ে?'

দমকা হাওয়ায় একটা দাউ-দাউ মশাল যেমন হঠাৎ দপ্ করে নিভে যায়, তেমনই এবার এক লহমায় যেন নিভে গেল বিরূঢ়ক। শ্রীনিবাসনকে কেন সে মেরে ফেলেছে, সেটা তার নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। বিরূঢ়ক তো আসলে বিরূঢ়ককেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল সেদিন।

ঘরের মধ্যে এক অতলান্ত নিস্তব্ধতা। জানালা দিয়ে একটা আলগা বাতাস শুধু ছন্নছাড়া ভিক্ষুকের মতো ঘুরে গেল টেবিলের ওপর।

ইস্পাতের মতো কঠিন উচ্চারণে বলল শৌনক, 'কিন্তু আপনার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, বিরূঢ়ক। শ্রীনি মরণাপন্ন হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মারা যাননি। বেঁচে আছেন।'

কথাটা শুনে তৎক্ষণাৎ ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে বসতে যাচ্ছিল বিরূঢ়ক। কিন্তু সে তার মনের ভাব বাইরে প্রকাশ পেতে দিল না। মুখে নিস্পৃহ ভাব ঝুলিয়ে রাখল। শৌনক একটু হাসল। বলল, 'আপনার এ মুহূর্তের আরোপিত শীতলতার কারণ কিন্তু আমি বুঝতে পারছি।'

বিরূঢ়ক নিজের মনে বিড়বিড়ালো, 'যা করতে হবে, তা খুবই তাড়াতাড়ি করতে হবে এবার...'

পেখম অধৈর্য হয়ে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'একটা ব্যাপার আমার কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না কিন্তু।'

শৌনক মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

শ্লেষভরা গলায় জবাব দিল পেখম, 'যদি ভয়ের উত্তেজনা পেতে হলে সেই ভয়ের অনুকূল সিচুয়েশনই তৈরি করতে হয় চারপাশে, যদি এছাড়া অন্য উপায় আর না থাকে, তাহলে আনন্দের অনুভূতি পাওয়ার জন্য তার অনুকূল পরিবেশ চারপাশে তৈরি করে না কেন মানুষ? চারিপাশে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে পারলে শরীরে ডোপেমিন, অক্সিটোসিন, সেরোটোনিন, এন্ডোরফিনস ক্ষরিত হয়ে তো মানুষকে সুখী করতে পারত।'

পেখমের চোখে চোখ রেখে বিরূঢ়ক প্রশ্ন করল, 'অ্যান্ড হু উইল ক্রিয়েট দ্যাট পজিটিভ সিচুয়েশন? হু উইল বেল দ্য ক্যাট?'

বিরূঢ়কের চোখ থেকে চোখ একটুও না সরিয়ে পেখম উত্তর দিল, 'হি হু হ্যাজ ক্রিয়েটেড ফিয়ারসাম সিচুয়েশন ফর হিজ প্লেজার! যে ভয় পাওয়ার উত্তেজনা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার জন্য চারিপাশে সাপ পুষেছে, মানুষ মেরেছে, কিডন্যাপ করেছে, টর্চার করেছে, ভিপিএন হ্যাক করেছে, টিপি-চিফকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই চিফ সেজে বসেছে, ভয় দেখিয়েছে, সেই একই লোক তার নিজের চারপাশে ইতিবাচক আনন্দের পরিবেশ তৈরি করতে পারল না কেন?'

চোখ নামিয়ে নিল বিরূঢ়ক। তারপর টেবিলে ঘুসি মেরে বিরক্ত স্বরে উচ্চারণ করল, 'ওহ্ শিট! শিট!'

পরমুহূর্তেই সশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার সরিয়ে দেওয়ালের দিকে গেল। শৌনক পেখমের দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চাইছিল, এখন উত্তেজনা দেখাস না রে! শৌনক বুঝতে পেরেছে, এ মুহূর্তে বিরূঢ়কের সঙ্গে যথাসম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। এটাই এ মুহূর্তের রণনীতি। সাপকে খোঁচানো যাবে না, খোঁচালে সাপ কামড়াবে—বিষ ঢালবে।

দেওয়াল-আলমারি খুলে সেলার থেকে মদ আর মদের গেলাস নিয়ে টেবলে ফিরে এল বিরূঢ়ক। শৌনককে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাভ আ ড্রিংক?'

'নো থ্যাংকস!' বলল শৌনক। গেলাসে মদ ঢেলে জল মিশিয়ে চুপচাপ একা একা মদ খেতে লাগল বিরূঢ়ক। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, শূন্য ঘরে বসে সে যেন একা একা মদ খাচ্ছে। বাকি দুজনের উপস্থিতিও যেন সে টের পাচ্ছে না এখন।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ঘাড় ঝাঁকিয়ে অসহিষ্ণু গলায় প্রশ্ন করল সে পেখমকে, 'টেল

মি নাউ, প্রিকশাস বেব্! তুমি যদি ছোটোবেলা থেকে পিতৃমাতৃহীন হতে, তোমার কাকার বাড়িতে যদি অনাদরে অত্যাচারে মানুষ হতে, আর একটু বড়ো হলেই তোমার সেই কাকা যদি তোমাকে দিনের পর দিন ক্রমাগত কানের কাছে বলে চলত, তোমার সো-কলড ডিসিজড ফাদার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি নট ইয়োর বায়োলজিকাল ফাদার, যদি বলত তোমার মা অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে তোমাকে পেটে ধরেছে... অ্যাকচুয়ালি ইয়োর ফাদার ওয়াজ আ সোয়াইন অ্যান্ড ইয়োর মাদার ওয়াজ আ হোর...'

আর সহ্য হল না পেখমের। সে গর্জন করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, 'স্টপ ইট! স্টপ ইট অ্যাট ওয়ানস! এনাফ ইজ এনাফ!'

গেলাসে জলতরঙ্গের মতো শব্দ তুলে মদ ঢালতে ঢালতে বিরূঢ়ক নির্বিকার হেসে উঠে বলল, 'রেগে গেলে, পেখম? পজিটিভ ভাইব তৈরি করতে পারলে না? কয়েক মিনিটের মধ্যে এইটুকুতেই সব নেগেটিভ হয়ে গেল তোমার?'

মত্ত, স্খলিত অথচ ভরাট গলায় গেয়ে উঠল বিরূঢ়ক, 'সব যে হয়ে গেল কালো-ও-ও, নিবে গেল দীপের আলো-ও-ও... আকাশ-পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে?...'

চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল পেখম। চোখের কোনাটা তর্জনী দিয়ে পরিষ্কার করে বিরূঢ়ক বলল, 'যার দিকেই তুমি হাত বাড়াবে, সেই-ই তোমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যাবে, পেখম!... যে রাতে দুয়ারগুলি আমার ঝড়ে ভেঙে গেল, সে রাতে, রাতের পর রাতে ঘরভরা সেই অন্ধকারে কেউ আসেনি আমার কাছে। কেউ না, কেউ না! হা হা হা! কেউ না... কেউ না। কেউ আসে না। তোমার কেউ নেই, কিছু নেই, তুমি একটা ভাঙা নৌকো...' বলতে বলতেই আবার স্খলিত কণ্ঠে গেয়ে উঠল সে, 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়... তরী আ-মা-র...'

চশমার কাচটা কেন যে ঝাপসা হয়ে যায় বারবার শৌনকের! রুমালের খুঁটে চশমার কাচ মুছে সে চোখে পরে নিল। গলা খাঁকরে পরিষ্কার করে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে তাকালো বিরূঢ়কের দিকে। কষ্টে, বিকৃতিতে, অবদমনে, প্রত্যাখ্যানে, একাকিত্বে, নেশাতুরতায় চুরমার হয়ে যাওয়া একটা অসম্ভব বুদ্ধিমান লোক শূন্য পানপাত্র থেকে শূন্য জঠরপিঠরীতে তরল শূন্যতা ঢেলে দিচ্ছে যেন নির্বিকারে। বিরূঢ়ক যতখানি সে, ততোধিক সে আমাদেরই শতাব্দীর বিষাদজাতক!

বিরূঢ়ককে ধাতস্থ হতে খানিক সময় দিল শৌনক। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় যেন একটা একান্ত সাংসারিক খবর দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে শৌনক বলল, 'একটা কথা বলি আপনাকে, বিরূঢ়ক। আমরা ট্রেজার সম্পর্কে কী তথ্য পেয়েছি এতদিনে, তার কিছুই আপনাকে বলব না। হ্যাঁ?'

গেলাসটা টেবিলে ঠক্ করে নামিয়ে রেখে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় বিস্ফারিত চোখ তুলে বিরূঢ়ক বলল, 'তার মানে?'

শৌনক ওকে দেখছিল খুঁটিয়ে। এটা লোকটার সত্যিকারের উৎকণ্ঠাই বটে। বানানো নয়। কিন্তু এতটা উৎকণ্ঠিত কেন সে? কপালে বিজবিজ করে ঘাম জমে উঠেছে কেন লোকটার?

শৌনক বলল, 'তার মানে তাই। আপনি আমাদের অত্যাচার করে মেরে ফেলতে পারেন, যা ইচ্ছে তাই-ই করতে পারেন। কিন্তু আমরা মুখ খুলব না। একটা কথাও বলব না আর। দেখুন, আমরা মেদিনীপুরের লোক। পুরুষানুক্রমে অত্যাচারিত হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের রক্তে মিশে আছে। আপনি কী করতে পারেন, বলুন? আমার মেয়েকে আমার চোখের সামনে অত্যাচার করে মেরে ফেলতে পারেন। পৈশাচিক নির্যাতন করে আমাকে খুন করতে পারেন। আর কিছুই করতে পারেন না। আমরা একটি তথ্যও দেব না আপনাকে। ঠিক আছে?'

বিরূক খুব চিন্তায় পড়ে গিয়ে বলল, 'ঠিক নেই...ঠিক নেই...ঠিক নেই। তা হলে তো খুব মুশকিল হয়ে যাবে, শৌনক। আপনাদের ওপর অত্যাচার করায় না আছে এখন আমার কোনো লাভ, না আছে আমার এখন আর সেই অত্যাচারের অধিকার। আপনি মুখ না খুললে খুবই মুশকিল হবে যে আমার! সত্যিই বলবেন না?'

শেখর ভাবছিল, লোকটার হল কী? এতটা টেনশন করছে কেন? তবে কি...? অঙ্কটা কিছুতেই মিলছে না যে আর!

শৌনক উত্তর দিল, 'না, বলব না। একমাত্র যদি...'

বিরূক অমনি ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'একমাত্র যদি... কী? বলুন!'

'যদি সাহিলকে এক্ষুনি ছেড়ে দেন, তাহলেই একমাত্র মুখ খুললেও খুলতে পারি।'

বিরূক শৌনকের মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, শৌনক সত্যি বলছে, নাকি তার সঙ্গে কোনো প্রতারণা করছে। খানিক পর কোনো একভাবে বুঝি আশ্বস্ত হল সে। মনে হল, শৌনক সত্যি কথাই বলছে। তারপরেই মুখ নামিয়ে ভাবতে ভাবতে বলল, 'কিন্তু সাহিলকে ছেড়ে দেবো কী করে? সে তো এখানকার সব কথা জেনে গেছে।'

শৌনক উত্তর দিল, 'যেভাবে সাহিলকে তুলে এনেছেন, সেভাবেই নামিয়ে দিয়ে আসবেন। ওকে নিশ্চয়ই রাস্তাঘাট দেখাতে দেখাতে নিয়ে আসেননি আপনি এখানে।'

'কিন্তু ও তো পুলিশের কাছে যেতে পারে।'

'কে? সাহিল? নাহ্, সে সম্ভাবনা নেই। সাহিল হচ্ছে এমন একটা লোক, ধর্মবিশ্বাসই যার শক্তি এবং ধর্মভীরুতাই যার দুর্বলতা। তাছাড়া একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন আপনি? সাহিল পুলিশকে গিয়ে সব বললে ওদের ট্রেজার প্রোটেক্টারের সমস্ত কথা পুলিশের কাছে ফাঁস হয়ে যাবে যে! সেটা সাহিল প্রাণ থাকতে করবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

ভাবতে লাগল বিরূঢ়ক। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। তারপর সেলফোন বের করে কার সঙ্গে যেন কী প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে লাগল ইংরেজিতে সানুনাসিক মার্কিন উচ্চারণে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে বারান্দায় কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর একটা গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। বিরূঢ়ক তড়াক করে খোলা জানালার কাছে উঠে গিয়ে শৌনককে ডাক দিল, 'আসুন! নিজের চোখেই দেখে নিন। সাহিল চলে যাচ্ছে!'

জানালার কাছে যেতে যেতেই ওদের কানে গেল ভারী কোনো লোহার গেট খোলার আওয়াজ। জানালা দিয়ে পেখম আর শৌনক তাকিয়ে দেখল, প্রাচীরসংলগ্ন বিশাল গেটটার সামনে একটা টাটা সুমো দাঁড়িয়ে আছে। বিরূঢ়ক বলল, 'দেখছেন? ঠিক আছে? সাহিল ওই গাড়িতে চলে যাচ্ছে।'

এক চিলতে বাঁকা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে শৌনক প্রশ্ন করল, 'হুম! তা ওটা সাহিলপূর্ণ গাড়ি, নাকি সাহিলশূন্য গাড়ি, বুঝব কী করে?'

বিরূঢ়ক বলে উঠল, 'ওহ্! আপনি...!' তারপর আবার সেলফোনে কাকে যেন কানেক্ট করে কী বলল।

ওরা দেখল, দূরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটা থেকে দুজন লোক আরেকজনকে ধরে ধরে নামাচ্ছে। হ্যাঁ, তৃতীয় লোকটা সাহিলই বটে! চোখমুখ মাস্ক দিয়ে ঢাকা সাহিল অন্ধের মতো সামনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরূঢ়ক সেদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'এবার ঠিক আছে?'

'না, ঠিক নেই,' শৌনক উত্তর দিল, 'কীভাবে জানব সাহিলকে এখান থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে পথের মধ্যে খুন করে ফেলা হবে কিনা?'

উত্তর দিল বিরূঢ়ক, 'সেটুকু বিশ্বাস আমাদের ওপর আপনাকে তো করতেই হবে, শৌনক! এছাড়া আপনার তো এখন আর গত্যন্তর নেই!'

একটু ভেবে নিয়ে সম্মতিসূচকভাবে শৌনক ঘাড় নাড়ল। বিরূঢ়ক তখনই ফোনে নির্দেশ দিল, 'গো নাউ!'

গাড়িটা সাহিলকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সশব্দে। আবার গেট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। শৌনক আর বিরূঢ়ক তাদের চেয়ারে ফিরে এল। পেখম আবার এসে বসল খাটে।

বিরূঢ়ক জিজ্ঞেস করল, 'এবার তো শান্তি হয়েছে? এবার বলুন তো, কাকাতুয়া-বাড়িতে কী পেলেন? কী জানতে পেরেছেন ট্রেজারের ব্যাপারে?'

শৌনক বলল, 'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন তো আপনার সাপগুলো কি মরে গেছে কোনো কারণে? নাকি ওই পারফিউমটা ফুরিয়ে গেছে আপনার?

আর স্টক নেই? অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে কেউ? যদি তা কেড়েও নেয়, তবু আপনার লোক দিয়ে টর্চার না করে প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে আপ্যায়ন করে কথা বলছেন কেন?'

পাথুরে মুখটা যেন এবার কাচের হয়ে উঠল। কপালে রগের কাছে হাতটা ঘষতে ঘষতে বিরূঢ়ক বলল, 'লোকগুলো আমার নয়, শৌনকবাবু। লোকগুলো স্টিফেনের।'

'স্টিফেন? সে কে?' বিস্ময়াহত পেখম আর শৌনক দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল।

'আপনি ব্লু আইকন-এর নাম শুনেছেন, শৌনক?'

'তা শুনেছি বটে! সে তো একটা আন্তর্জাতিক দুষ্কৃতী চক্র। নয় কি?'

'হ্যাঁ, স্টিফেন সেই চক্রের মাথা। লোকটার সঙ্গে আমার প্রথমবার আলাপ হয় অ্যারিজোনায়। একটা সকার ক্লাবের কোচ ছিল। ওখানে ফুটবল খুবই প্রিয় খেলা। অনেকগুলো ক্লাব। তারই একটা ক্লাবের কোচ ছিল স্টিফেন। তখন ওই আলাপটুকুই হয়েছিল। ওর সম্পর্কে আর কিছুই জানতাম না আমি। তার এত বছর পরে দেখা হল। আর দেখা হল খুবই অদ্ভুতভাবে।'

'কীভাবে?'

'অপারেশন শ্রীনিবাসন সেরে ফেলার পরেই আমার কাজগুলোর জন্য অনেক লোক লাগছিল আমার। অস্ত্রশস্ত্রও।'

'কেন টিপি-র লোক দিয়ে হচ্ছিল না?' পেখম প্রশ্ন করল।

'হচ্ছিল না। টিপি-র অনেক অ্যাকটিভ সদস্য মরে গেছে। যা আছে, তার মধ্যে অনেকেই সাহিলের মতো, কোনো অ্যাকশনের উপযোগী নয়। তারপরেও ওদের ট্রেজার-হান্টের ব্যাপারে কনভিন্স করা বিরাট ঝক্কির কাজ হয়ে যাচ্ছিল আমার পক্ষে। উত্তেজনা চেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু এতটা ঝক্কি আমি চাইনি। তাই...' বিরূঢ়ক বলল।

'বুঝলাম। তারপর বলুন!' শৌনক বলল।

'ব্লু আইকনের অন্ধকার জগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল একটা অন্য লোক। তখন ব্লু আইকনের গ্যাংস্টার কে, আমি জানতাম না। আমি টাকা ঢালি, ওরা কাজ করে দেয়। এসব সংস্থা টাকা পেলে অর্ডার ক্যারি-আউট করে। কোনো প্রশ্ন করার কথা না। কিন্তু কোথাও একটা আমার মনে হচ্ছিল, ওরা আমাকে সন্দেহ করছে।'

'সন্দেহ? কেন?'

'কেননা এরকম কাজের অর্ডার ওরা কোনো না কোনো অর্গানাইজেশনের তরফ থেকেই পেয়ে থাকে। অথচ, আমি একা একটা লোক। কী আমার পরিচয়, কী উদ্দেশ্য, এসব নিয়ে ওদের মনে সংশয় আসছিল। তাছাড়া ওরা সন্দেহ করছিল, আমি পুলিশের অ্যান্টি-টেররিজম-স্কোয়াডের লোক হতে পারি। বারবার এসব নিয়ে

ছোটোখাটো প্রশ্ন করছিল ওরা। তারপর পরের পর এতগুলো লোককে আমি মেদিনীপুর থেকেই কেন কিডন্যাপ করার অর্ডার দিচ্ছি, আমার কাজগুলো কেন মেদিনীপুর শহরের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে, এই প্রশ্নগুলো সেই সন্দেহটাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। শেষে সাহিলের ইন্টারোগেশনের পর ব্যাপারটা ভয়ানক হয়ে দাঁড়াল।'

'কেন? সাহিলের ইন্টারোগেশনে কী সমস্যা হল?' শৌনক প্রশ্ন করল।

'বলছি,' এই বলে এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে খেল বিরূঢ়ক। বাঁ হাতের চেটোতে ওপরের ঠোঁট মুছে শুরু করল, 'সাহিলকে বারবার প্রশ্ন করেছিলাম, ট্রেজারের কোনো খোঁজ সে পেয়েছে কিনা। এই বারবার ট্রেজার নিয়ে প্রশ্ন করার সংবাদ ব্লু আইকনের মেম্বারদের দ্বারা বাহিত হয়ে তাদের গ্যাংস্টারের কাছে গিয়ে পৌঁছোয়। আমাকে কয়েকদিন পরেই তার সঙ্গে দেখা করতে বলা হল। এর আগে লোকটাকে আমি চোখেও দেখিনি। কিন্তু এবার দেখলাম। দেখলাম, ব্লু আইকনের গ্যাংস্টার আসলে আমার পূর্বপরিচিত অ্যারিজোনার সেই গোল্ডেন সকার ক্লাবের প্রাক্তন কোচ স্টিফেন!'

'চিনতে পারল আপনাকে?'

'না, পারেনি। পারার কথাও নয়। আমি তাকে দেখেছিলাম যখন, তখন সে ছিল একটা প্রাণোচ্ছল ফুটবলপ্রেমী যুবক। আর এখন সে মাঝবয়েসি একটা মিটমিটে শয়তান। দেখলাম, ট্রেজারের ব্যাপারে তার উদগ্র আগ্রহ।'

'আপনি সব কথা বলে দিলেন ট্রেজার প্রোটেকটারের ব্যাপারে?'

'না বললে সে আমাকে মেরে ফেলত।'

'সব শুনে কী বলল? প্লিজ ক্যারি অন!'

'বলল, ট্রেজার আমাকেই খুঁজতে হবে। তার জন্য যত টাকা লাগে, যত লোক লাগে সব সে দেবে। কিন্তু ট্রেজারের শেয়ার তার চাই। আদ্ধাআদ্ধি বখরা। এখন আমি তার হাতের পুতুল। যদিও কাউকে তুলে আনা, ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারি, একমাত্র যদি তা ট্রেজার খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। তবুও সেই সিদ্ধান্ত যা আমি নেব, তাকে জানিয়েই নিতে হবে আমাকে। আমিও এখন একরকম এদের নজরবন্দী হয়ে আছি।'

'আপনি চাইছেন, আমরা আপনার সঙ্গে যোগ দিয়ে ট্রেজার খুঁজে বের করি?'

'হ্যাঁ। তা না হলে স্টিফেন আমাকে মেরে ফেলবে।'

পেখম মনে মনে বলল, মৃত্যুকে এখন ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি? ইউ ডিজার্ভ ডেথ! কিন্তু কথাটা সে উচ্চারণ করল না।

বিরূঢ়ক যেন পেখমের মনের কথা পড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মরে যেতে

আপত্তি নেই আমার। সেকথা অনেকবার ভেবেওছি। কী হবে এই অর্থশূন্য বেঁচে থাকায়? মরেই তো গেছি আমি। তবু ভেবেছিলাম... কী জানি কী ভেবেছিলাম... আসলে আমি এসবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। এখন আর ফেরার পথ নেই, শৌনক।'

'এবং আপনার সঙ্গে আমরাও। তাই তো?' শৌনক প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল বিরূঢ়ক।

খানিক পরে শৌনক চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে বলল, 'দেখুন। কাকাতুয়া-বাড়িতে আমি পুরোনো একতাড়া চিঠি পাই। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের লেখা। যতীশ গুহকে লিখছেন। দীনেশই টিপি-র প্রতিষ্ঠাতা। সেই চিঠিগুলো থেকে মনে হচ্ছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের গচ্ছিত সম্পদ তাঁরা গোপন কোনো জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

'সম্পদটা কী ধরনের? টাকাপয়সা, গয়না?' বিরূঢ়ক প্রশ্ন করল।

'হতেই পারে। আবার আরও অনেক কিছু থাকতে পারে তার সঙ্গে। একটা রিভলভার তো থাকতে পারেই। যেটা দীনেশ গুপ্তের লাকি রিভলভার।'

'কোথায় রাখা হয়েছিল সেগুলো, তার কোনো ইঙ্গিত?'

'হ্যাঁ। তাও পেয়েছি। মল্লিকবাড়ির মায়ের পায়ের তলায় রাখা আছে, লিখেছেন যতীশ গুহ। মল্লিকবাড়ির দুর্গাপুজা বহু প্রাচীন। সেই দুর্গামণ্ডপের নীচে লুকোনো থাকতে পারে।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। আরও লিখেছেন যতীশ গুহ—দত্তগলিতে মুক বা মুখ কিছু একটা।'

বিরূঢ়ক ভাবতে ভাবতে বলল, 'সুড়ঙ্গ বলেই মনে হচ্ছে আমার। যে-সুড়ঙ্গের মুখটা দত্তগলিতে কোথাও আছে। সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে হয়তো মল্লিকবাড়ির দুর্গামণ্ডপের ঠিক নীচে। আচ্ছা, আর কিছু?'

'আর একটি ছড়া। এটা শ্রীনিবাসনের সূত্রে প্রাপ্ত। চিঠিতে নেই। কিন্তু ছড়াটা শ্রীনিবাসন ওরফে সুশীতলবাবুর বাবা সুবিমলবাবু শ্রীনিবাসনকে শিখিয়েছিলেন। সুবিমলবাবু ছিলেন টিপি-র ফর্মার চিফ।'

'ছড়াটা কী?'

'ছড়াটা এইরকম—

তথাগতর পট খুলে যায় ফিবু নাচে শর্টে,
হদিস পাবেই, যদি তোমার বুদ্ধি থাকে ঘটে।
নাগলোকের পেটের ভিতর বিষাক্ত নীল হাওয়া,
মরণজয়ী চিরচেতন প্রাণের আসাযাওয়া।'

ছড়াটা শুনে আপনমনে বারবার আওড়াতে লাগল বিরূঢ়ক। 'তথাগতর পটি খুলে যায়, ফিবু নাচে শর্টে... ফিবু নাচে শর্টে।' দু-একবার এমন বিড়বিড়ানোর পরেই চোখ বুজে বলে উঠল বিরূঢ়ক, 'ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স নয় তো?'

চমৎকৃত হয়ে গেল শৌনক। কোনো স্বপ্ন দেখতে হল না, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়কে ফোন করতে হল না, স্রেফ ইন্ট্যুশন দিয়ে শৌনককে মেরে বেরিয়ে গেল বিরূঢ়ক। মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল শৌনক, 'ব্রিলিয়ান্ট! আমিও এটাই ভেবেছিলাম।'

বিরূঢ়ক চোখ খুলে বলল, 'কিন্তু শর্ট ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স বলে তো কিছু পড়িনি, বাবা! আচ্ছা, এই থার্ড লাইনটা... নাগলোকের পেটের ভিতর বিষাক্ত নীল হাওয়া... এটা কী?'

'নিশ্চয়ই আপনার স্নেক-চেম্বার নয়?'

ঘোর বিপদের মধ্যেও হো-হো করে হেসে উঠল বিরূঢ়ক, "তা তো নয়ই। কিন্তু 'নাগলোক' শব্দটার অন্য কোনো অর্থ থাকতে পারে না কি?" বলতে বলতে কী একটা ভাবতে লাগল সে। মনে হল, এইমাত্র কিছু একটা যেন তার মনে পড়েছে। তারপর ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়াল-আলমারি থেকে ল্যাপটপ বের করে এনে চালু করল কেন জানি!

একটা বিশেষ ফাইল ওপন করল বিরূঢ়ক। বলল, 'দেখুন! এই হচ্ছে, আপনাদের পুরোনো মেদিনীপুরের ম্যাপ টিপি-র লোকেরা বানিয়েছিল। এটা কর্ণেলগোলা। রাস্তাটা যাচ্ছে মীরবাজারের দিকে। এই হচ্ছে দত্তগলি। আর এটা হচ্ছে মল্লিকচক। হুম্!'

'জুম ইন করা যাবে?'

'যাবে,' বলেই ছবিটা বড়ো করল বিরূঢ়ক। বলল, 'এই জায়গায় আগে আগে কাদের কাদের বাড়ি ছিল, দেখুন দেখি। এটা দত্তদের বাড়ি। এই বাড়িটা করদের। ম্যাপে লেখা আছে দেখুন। এই দত্তগলিতেও একটা দুর্গাপুজো হয়। এটা তারই মণ্ডপ। এই মণ্ডপের পেছনে একটা ভাঙা বাড়ি। এই বাড়িটা...?'

শৌনক আর পেখম ল্যাপটপের মনিটরের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখল, লেখা আছে 'কুশল নাগ!'

'ও হরি! নাগলোক তাহলে নাগেদের বাড়ি? আচ্ছা! নাগ তাহলে এখানে পদবী? সাপ নয়?' পেখম বলল।

'তা হতেই পারে,' বিরূঢ়ক নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিল, 'আচ্ছা, শৌনক, এই নাগেদের বাড়িটা নিয়ে আপনি কিছু জানেন?'

শৌনক ভাবতে লাগল। যেন সে অনেক দিন আগের ফেলে আসা ছোটোবেলার

স্মৃতির ভেতর হারিয়ে গেল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'হ্যাঁ। একবারই ঢুকেছিলাম এই বাড়িতে। আমি আর আমার বন্ধু প্রতুল ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম। ঘুড়ি কেটে নাগেদের বাড়ির ছাদে পড়েছিল। সেই ঘুড়ি উদ্ধার করতে ঢুকেছিলাম আমরা দুজন এই বাড়িতে।'

'ভেতরটা কেমন কিছু মনে আছে?'

'বিশেষ মনে নেই। তবে পুরোনো জমিদারদের বাড়ি যেমন হয়। একটা ছড়ানো চাতাল ছিল, মনে আছে। যার চারপাশে বারান্দা। আর বারান্দায় কতগুলো ধর্মীয় ছবি। কুশল নাগ রামকৃষ্ণ মিশনের অনুসারী ছিলেন বলে শুনেছি পরে।'

'হুঁ! কী কী ছবি মনে আছে?'

'নাহ্, আর কিছু মনে নেই। বাড়িটা যদ্দুর জানি, এখন তালাবন্ধই পড়ে থাকে। কেউ থাকে না ওখানে। ভাঙা বাড়ি। পলেস্তারা খসে গেছে। জংলায় ভরতি।'

'অথচ প্রোমোটারের হাতে পড়েনি। কেন? টিপি-র লোকেরা বাধা দিয়েছিল? তাই হবে!'

বলতে বলতে ল্যাপটপ শাট ডাউন করল বিরূঢ়ক। বলল, 'তাহলে এখানেই ট্রাই করে দেখা যাক একবার। কী বলেন?'

'হ্যাঁ, গিয়ে তো দেখি। যদি ছড়াটার কোনো মানে খুঁজে পাই এই পোড়ো বাড়িতে ঢুকে। তবে আমি ভাবছি...' শৌনক বলল।

'কী?' উদ্‌বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল বিরূঢ়ক।

'ভাবছি, স্টিফেন এসে ঢুকল আবার এর মধ্যে! এবং তার এতটা লোভ কেন যে ট্রেজারের ওপর? মুশকিল না হয়!'

পেখম বলল, 'এখন বলছে স্টিফেন আধাআধি বখরা। পরে পুরোটাই হয়তো চাইবে। এবং আমাদের তিনজনকেই শেষ করে দেবে। ট্রেজার খুঁজে পেলেও মৃত্যু, না পেলেও মৃত্যু!'

শৌনক বলল, 'ঠিক বলেছিস। কিন্তু ফেরারও পথ নেই তো আর। এগিয়েই দেখা যাক তাহলে... আচ্ছা, এই স্টিফেন লোকটার সঙ্গে একবার মোলাকাত করা যায়? একবার বাজিয়ে দেখা যেত!'

'মিট করবেন? দাঁড়ান, দেখছি,' বলেই একটা নম্বর ডায়াল করল বিরূঢ়ক। ওই প্রান্তে কল কানেক্ট হতেই প্রশ্ন করল, 'আর ইউ ফ্রি, নাউ? ... ওহ, ইয়েস, ইয়েস! উই আর কামিং টু ইউ দেন। নো? ... ওকে, ওকে, স্টিফেন!'

ফোন কেটে বলল বিরূঢ়ক, 'স্টিফেন নিজেই আসছে এঘরে।'

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর দরজায় সন্তর্পণে কে যেন তিনটে টোকা দিল। উঠে গিয়ে দরজা খুলল বিরূঢ়ক। সাথে সাথেই ঘরে এসে ঢুকল প্রায় সাড়ে ছয় ফিটের একটি নির্মেদ চেহারার দৈত্যাকৃতি মানুষ। মাথার চুল কটা। এমনকি

ভুরুজোড়াও কটা রঙের লোকটার। চোখের মণি পিঙ্গল। ধারালো চিবুক। গালের ওপরে একটা কাটা দাগ। চওড়া কাঁধ। খয়েরি জিনসের ওপর গাঢ় নীল টি-শার্টের একটা বোতাম খোলা। মুখেচোখে লোকটার এক ধরনের চোয়াড়ে কর্কশ ভাব। চোখেও কোথাও কোনো বুদ্ধির ছাপ নেই, শুধু একটা বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠছে।

ঘরে ঢুকে শৌনকের দিকে ভুরু নাচিয়ে লোকটা ভারী ধাতব স্বরে উচ্চারণ করল, 'হেই ম্যান...!'

২৯

জানালার ওদিকে অন্ধকারের মধ্যে বিরতিবিহীনভাবে বৃষ্টি পড়ছে। সেই দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে বিরূঢ়ক। মনে হচ্ছে, যেন তার অপূর্ণ বাসনামাখা জীবনের ওপর সারা রাত ধরে ক্লেদ-রক্ত-বিষাদ ঝরে পড়ছে আজ আকাশ থেকে। এমন এক অস্থিরতাময় স্থিতি, যার থেকে তার আর পরিত্রাণ নেই।

এ ঘর তার নয়। তার সেই নির্জন পাহাড়ি উপত্যকার ঘর থেকে তাকে তুলে এনেছে এখানে স্টিফেন। সারা দিনরাতের মোট ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড ধরে তার সমস্ত খবর, যাবতীয় গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখছে স্টিফেনের লোকজন। অণুবীক্ষণের আই-পিসের নীচে সে যেন এখন একটি দুষ্প্রাপ্য জীবের নমুনা, প্রতি মুহূর্তে যার মৃদুতম নড়াচড়াও সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখছে ওইপারে কোনো অদৃশ্য আঙুল।

ট্রেজার খোঁজার উত্তেজনা চেয়েছিল বিরূঢ়ক। তার জন্য ভয় দেখিয়েছিল অন্যদের, ভয় পেতে চেয়েছিল সে নিজেও। অনেকের প্রাণ নিতেও তার অণুমাত্র বাধেনি। সেই সমস্ত আয়োজন সে করে এসেছিল স্বাধীনভাবে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা আজ আর তার নেই। সে এখন স্টিফেনের হাতের পুতুল মাত্র। তবে বড়ো দামি পুতুল।

সন্ধে থেকে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল এদিকে। বিদ্যুতের লেলিহান শিখা চিরে ফেলছিল আকাশ। দুরন্ত বাতাসে বাগানের গাছগুলো এমনভাবে দুলছিল, মনে হচ্ছিল এখনই তারা মাটি থেকে উপড়ে যাবে। সেই ঝড় স্তিমিত হয়ে এল রাত দশটার দিকে। তারপর নামল অঝোর বর্ষণ।

একদিন এরকম ঝড়-বৃষ্টি কী দারুণভাবে উপভোগ করতে পারত বিরূঢ়ক! এই যে প্রকৃতির ভেতর সমস্ত শান্ত, সমস্ত সাজানো-গোছানো, তারপরেই ঝড়ের ভেতর এক প্রচণ্ড নৈরাজ্য—সমস্ত কিছু একেবারে এলোমেলো হয়ে যাওয়ার উৎসব—এসব বড়ো উপভোগ্য ছিল তার কাছে একদিন। আজ সেই ঝড়-বৃষ্টি কেবলই উদ্‌বেগের, কেবলই অপরিমেয় ক্লান্তির। অশান্তির।

কেননা স্বাধীনতা নেই আর। স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু কখনও ধরা পড়েনি তার মনে। সে ভেবেছে, নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশি

করাই স্বাধীনতা। যে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কাকার বাড়িতে সে মানুষ হয়েছিল, যে নিরাপত্তাহীনতার আস্তাকুঁড়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেবলীনা চলে গিয়েছিল একদিন অন্য পুরুষের সঙ্গে, অবশিষ্ট জীবন ধরে সেই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেই বিরূঢ়ক ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল অন্যদের। এতেই তার উত্তেজনা। উল্লাস। অ্যালেক্সকে সে মেরে ফেলেছে স্বাধীনভাবে। ভয়ানক সব সাপ পুষেছে সে স্বাধীনভাবে। খুন করেছে স্বাধীনভাবে। কিডন্যাপ করেছে, অত্যাচার করেছে স্বাধীনভাবে। অন্তত সে সেরকমই ভেবেছিল।

নিজের স্বাধীনতা চেয়েছিল সে; পেয়েছিল। নিজের হাত থেকে স্বাধীনতা চায়নি কখনও। তাই পায়ওনি। ফ্রিডম অফ সেলফ পেয়েছে। ফ্রিডম ফ্রম সেলফ পায়নি।

জানালার ওদিকের অন্ধকার থেকে দুপুরে শৌনকের বলা কথাগুলো যেন তাকে ব্যঙ্গস্বরে প্রশ্ন করছে, 'আপনার সাপগুলো কি মরে গেছে কোনো কারণে? নাকি ওই পারফিউমটা ফুরিয়ে গেছে আপনার? আর স্টক নেই? অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে কেউ? যদি তা কেড়েও নেয়, তবু আপনার লোক দিয়ে টর্চার না করে প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে আপ্যায়ন করে কথা বলছেন কেন?'

আপনি যদি জানতেন, শৌনক, আমার উপলব্ধির কথা! স্বাধীনভাবে ভয় পাওয়াতেও আনন্দ, আর পরাধীন হয়ে আনন্দে থাকাও ভয়ংকর। কেননা আমার অস্তিত্ব, আমার জীবনযাপন সবই এখন স্টিফেন-শাসিত। ট্রেজার আমাকে খুঁজতে হবে নিজে উত্তেজনা পাওয়ার জন্য নয় আর, স্টিফেনের উদগ্র লোভ চরিতার্থ করার জন্যই। ভয় পেতে আমি এখন বাধ্য। তাতে উত্তেজনা নেই আর, আছে নিখাদ আতঙ্ক শুধু।

জানালার ধারে বসে বিরূঢ়ক নিজের সঙ্গে নিজে অনর্গল কথা বলে চলে।

পেখম মেয়েটির অনুচ্চারিত প্রশ্নটাও ফিরে আসছে মনে বারবার। মরতে তার ভয় কীসের? জীবনকে তো মূল্যবান সে ভাবেনি এতদিন। ভাবেনি বলেই তো যখন খুশি সে জীবন নিয়েছে অন্যের। কিন্তু একথা তার কখনও মনে হয়নি যে, নিজে স্বাধীনভাবে জীবন শেষ করে দেওয়ার মধ্যে যে পরিমাণ সুখ আছে, অন্যের হাতে জীবন সঁপে দেওয়ার মধ্যে তারই সমপরিমাণ বা ততোধিক বেদনা। চিরকাল নিজের মধ্যে নিজেকে কেন্দ্র করে বেঁচেছে বিরূঢ়ক, কখনও অন্যের দিক থেকে জীবনকে দেখার চেষ্টা করেনি। দুহাতের তালুতে পোকামাকড় ধরে মসকুটে টিপে মেরে ফেলে উল্লাস করেছে, কিন্তু তাতে পোকামাকড়ের কী বেদনা, ভাবেনি কখনও! কখনও না!

শৌনকের কাছ থেকে আজ সে জানতে পারল, শ্রীনিবাসও বেঁচে আছে তাহলে। মরেনি! শ্রীনি-কে মেরে ফেলে সে ভেবেছিল, শ্রীনি-র সঙ্গে মরে গেছে সে নিজেই। এখন বিরূঢ়ক শ্রীনি হয়ে যাবে। নতুন করে বাঁচবে। দেবলীনাকে নিয়ে কিংবা

দেবলীনাকে বাদ দিয়েই। কিন্তু তাও হল না। শ্রীনিবাস বেঁচে আছে। তার মানে, বিরূঢ়কও টিকে রইল। আলোর মৃত্যু হলে অন্ধকারও মরে যেত অনায়াসে। কারণ, অন্ধকার আলোর লজিকাল কোরিলেটিভ। আলো বেঁচে আছে বলে অন্ধকারও মরে যেতে পারেনি।

দেবলীনার আর শ্রীনি-র মধ্যে যে কাঁচা সন্দেহের মাটি দিয়ে সে একটা দেওয়াল তৈরি করার চেষ্টা করল, সেই দেওয়ালটাও টিকবে না, সে জানে। শ্রীনি দেবলীনার কাছে ফিরে যাবে এবং ফিরে যাওয়ার পর দুজনের দুর্বার প্রাণশক্তির চাপে ধ্বসে পড়বে ওই সন্দেহের দেওয়াল। কিছুদিন সংশয়ের যন্ত্রণা পাওয়ার পর ওরা ঠিকই কাছে আসবে, পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করবে, আচমকা মিলিত হবে এবং অতীতের সংশয়, পাপ ভুলে যাবে দিনানুদৈনিক অভ্যাসের ভেতর দিয়ে একদিন। দেবলীনাকে সে জানত। শ্রীনি-কে সে জেনেছে। ওরা ঠিক পারবে।

কিন্তু তার জীবনে কী হল? কিছুই না। শেষ হয়ে গেল।

'Life is a tale—told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.'

তাহলে নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করে দিতে তাকে বাধা দিচ্ছে কে? এখনই কি পারে না সে জীবনের প্রদীপ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিতে। আত্মহননের শতেক উপায় তার জানা আছে। তাহলে?

বাধা দিচ্ছে ওই সিসি-ক্যামেরার চোখগুলো। ওগুলো তাক করে আছে তারই দিকে। তার প্রত্যেকটা নড়াচড়া ফুটে উঠছে অন্য কোথাও অন্য কোনো ঘরের মনিটারে। যেখানে চোখ দিয়ে বসে আছে স্টিফেন বা তারই বিশ্বস্ত কোনো অনুচর। এদের কাছে তার জীবন মহার্ঘ এখন। ট্রেজার চেম্বারের সেই যে একমাত্র চাবিকাঠি! এখন স্বাধীনভাবে আত্মহত্যার অধিকারও আর নেই তার।

এমন প্রতি পদে শর্তাধীন বেঁচে থাকার অবশিষ্ট প্রহরগুলোকে সে কীভাবে একটু সহনীয় করে তুলতে পারে? জানালার ওদিকের বৃষ্টিভেজা গাছগুলো কি এই প্রশ্নের উত্তর জানে?

গাছেরা কথা বলে না, বৃষ্টির বিন্দুরা কথা বলে না কোনো।

ওই ছড়াটা, যেটার কথা বিরূঢ়ক শুনল আজ শৌনকের মুখে, ওটাকে ভাঙার মধ্যে অবশ্য একটা বুদ্ধির খেলা আছে। মেদিনীপুরে কুশল নাগের বাড়ির মেঝেতে হয়তো শুয়ে আছে কোনো রহস্য-উন্মোচনের ইঙ্গিত। শৌনক ও পেখমের সহায়তা ছাড়া সেই উন্মোচন প্রায় অসম্ভব। ওদের দুজনের সঙ্গে যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে স্টিফেন। কিন্তু শুধু স্টিফেন নির্দেশ দিয়েছে বলেই নয়, বিরূঢ়কের নিজেরও ইন্টারেস্টিং লেগেছে ওদের দুজনকে। ধারালো মগজ তার অসম্ভব প্রিয়। এবং এই

অন্তরীণকালে শৌনক ও পেখমের উপস্থিতি তাকে স্বস্তি দিচ্ছে কিছুটা। উত্তেজনাও।

উত্তেজনা আছে বটে এই ট্রেজার-হান্টের মধ্যে, বুদ্ধির কসরৎ আছে। যদিও তাতে স্বাধীনতা নেই, স্টিফেনই এখন প্রভু। তা হোক। তবু এভাবেই যদি জীবনের অবশিষ্ট প্রহরগুলো কাটিয়ে দেওয়া যায়।

বুদ্ধি খাটাতে আর যে ইচ্ছে করে না তার! বড়ো যান্ত্রিক।

কিন্তু যদি কিছুই না পাওয়া যায় ওই 'নাগলোক'-এ, তাহলে? স্টিফেনের হাতে প্রাণ যাবে। হয়তো লাশ হয়ে পড়ে থাকবে পোড়ো একটা বাড়ির অন্ধকারে। অন্তত সেভাবেও সে মুক্তি পাবে স্টিফেনের হাত থেকে, জীবনের দুর্বহ ভার থেকেও।

আহ্ মৃত্যু! বড়ো মধুর মনে হল তার শব্দটি।

শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি ধরে এল। আর একটু পরে ভোর হয়ে যাবে। পেয়ারা গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা অশ্রুবিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে টুপটাপ, টুপটাপ! এবার একটু ঘুমিয়ে নিলে হয় বোধহয়। যদি ঘুম আসে।

আলো নেভানোর অধিকার নেই এখানে। অথচ ঘর অন্ধকার না করে সে ঘুমোতে পারে না।

আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে শুয়ে পড়ল বিরূঢ়ক বিছানায়। মনে হল শরীরের ওপর অনেক অনেক জল তার। সেই অগাধ জলের মধ্যে সে চিত হয়ে শুয়ে আছে এক পরাভূত রাজপুত্রের মতো। জীবনের হস্তে পরাজিত রাজকুমার দুর্যোধন সে। যুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের তলায় মুখ লুকিয়ে রয়েছে লজ্জায়। বন্ধুহীন, স্বজনহীন, পরিজনহীন। অবশ্য কবেই বা সেসব ছিল? সে একক। সে চির-একাকী।

এই হ্রদের তলদেশ হতে উঠেই তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে শেষবারের মতো। পুরোনো বুড়ো হয়ে যাওয়া একটা শহর—মেদিনীপুর। নাগলোক। কাল তাদের নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে।

হ্রদের অনেক নীচে বুকে অনেক জলের ভার নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল অসমাপ্ত কৌরব।

৩০

যেন কত সন্তর্পণে ঝিঁঝিঁপোকারা ডাকছে। একটানা নয়, কিছুক্ষণ ডেকে ডেকে থেমে যাচ্ছে। আবার কয়েক মিনিট পর শুরু করছে প্যারেড। অন্যদিন হয়তো একটানাই ডেকে চলে, কিন্তু আজ ঝিঁঝিঁপোকারাও বুঝি মানুষের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। নাগেদের পোড়ো বাড়ির পেছনের কালকাসুন্দা ঝোপ থেকে উঠে আসছে সেই ক্ষণক্ষরিত, ক্ষণবিরত শব্দটা। পুরোনো দিনের পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে গোটা তিনেক, সেগুলো বসানো হয়েছে চবুতরার এখানে ওখানে। পাঁচ-সেলের বড়ো টর্চলাইটের আলোর বৃত্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধকার বারান্দায়, দেওয়ালে, ছাদে, চত্বরে। আর আলো-আঁধারির মধ্যে চারজন ছায়ামানুষ নিঃশব্দে পথ হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাড়িটা ভেঙে পড়েছে হেথাহোথা। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গিয়ে সরু সরু ব্রিটিশ আমলের ইটের পাঁজর বেরিয়ে এসেছে যত্রতত্র। এই চত্বর পেরিয়ে ভিতরবাড়িতে যাওয়ার একটা রাস্তা ছিল অতীতে; সেটা অটুটই আছে, কিন্তু সেই ভিতরমহল গোটাটাই লোপাট হয়ে গেছে এতদিনে। সেসব ভেঙে ফেলে পেছনের জঙ্গল এড়িয়ে স্কাইস্ক্র্যাপার উঠেছে। শুধু এই চত্বরটাকেই প্রোমোটারের হাতে পড়তে দেয়নি টিপি-র লোকজন। এমন সযত্ন রক্ষণ বাড়িটার সম্পর্কে সন্দেহ আরোই বাড়িয়ে দেয়।

বারান্দার ছাদ অনেক উঁচু, লোহার তৈরি বিশাল আকারের কড়িবরগাগুলো যদিও এখনও অটুট, তবু মাকড়সার জালে অবশ্য ভরে আছে সিলিং, মাকড়সার বংশ রাজত্ব করছে কত বছর ধরে, তার আর লেখাজোখা নেই। দেওয়ালে চুনের রং ফ্যাকাশে এখন, মধ্যে মধ্যে ড্যাম্প লেগে দেওয়ালের গায়ে অজানা সব মহাদেশের ছবি আঁকা হয়ে আছে। বারান্দা দিয়ে হাঁটলে ঝুরঝুর ঝুরঝুর করে মাথার ওপর চুন-বালি খসে পড়ছে। বারান্দায় সারি সারি বন্ধ ঘর, ঘরগুলোর দরজার কড়ায় পেল্লায় পেল্লায় সব লোহার তালা লাগানো।

এমনই পেল্লায় একটা তালা ছিল মূল ফটকে। ভীমের বুকের মতো ইয়াব্বড়ো লোহার দরজা, সেই দরজায় পালোয়ানের হাতের বালার মতো দরজার কড়া, সেই কড়াতে এক ইয়াব্বড়ো কটাকট কটাকট তালা। তালাটা দেখেই পেখম ভেবেছিল,

হয়ে গেল। এ তালা ভেঙে ঢোকা বুঝি রাবণেরও কর্ম নয়। কিন্তু রাবণ বুড়ো হয়েছে, রাবণোত্তর রাবণদের কাছে অসাধ্য কিছুই আর নয় এখন। স্টিফেনের লোকজন একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র দিয়ে কী জানি কী কায়দা করল, কড়াশুদ্ধ তালা কাগজের ফুলের মতো নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে এল দরজা থেকে। সেই ভীমবক্ষ লৌহদ্বারের পাল্লা ঠেলে বাড়িটার ভেতর ঢুকে এল ওরা চারজন—প্রথমে শৌনক আর বিরূঢ়ক, পেছন পেছন স্টিফেন আর পেখম। স্টিফেনের লোকজন বাড়িটার বাইরে অন্ধকারে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে।

স্টিফেন লোকটাকে একেবারেই নিতে পারছে না পেখম। বোম্বে-রোডে গাড়ি উঠে আসার পর ওদের বাপ-বেটির চোখের বাঁধন খোলা হয়েছে। স্টিফেনের আস্তানা থেকে বোম্বে-রোডে উঠে আসতে আনুমানিক যা সময় লেগেছে, তার থেকে মনে মনে হিসেব করে পেখম বুঝতে পারে, স্টিফেনের আস্তানা দমদম এয়ারপোর্টেরই কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ এরোপ্লেন অত নীচ দিয়ে উড়ে যাওয়া থেকে প্রথমে সে যা ভেবেছিল, সেটাই ঠিক। কিন্তু চোখ খোলার পর থেকেই স্টিফেনের এই অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে মহা বিরক্ত লাগছে পেখমের। লোকটার চোখদুটোই কেমন ঘিনঘিনে। বারবার সে পেখমের দিকে সরু চোখে জুলজুল করে তাকাচ্ছে, সেই তাকানোর ভাষাটা পেখমের বয়সি যে-কোনো মেয়ে সহজেই পড়ে নিতে পারে। এখন আবার নাগেদের পোড়ো বাড়ির ভেতর পেট্রোম্যাক্সের হলুদ আলোয় স্টিফেনের চোখে ঝলসে উঠছে এক অন্যরকমের চাহনি। সে চাহনি অপরিসীম লোভের। তার সঙ্গে ভয়ও মিশে আছে। লোভীরা স্বভাবতই ভীতু হয়। গাড়িতে সারাক্ষণ তার আর তার বাবার দুপাশ থেকে অস্ত্র উঁচিয়ে বসেছিল রক্ষীরা। একটু এদিক-সেদিক দেখলেই গুলি চালাবে। আর একটা কথা, পেখম বুঝতে পারছে, অন্তিম মহড়া সম্ভবত তাকেই নিতে হবে। আর সেই সুযোগ সে যদি পায়, তাহলে প্রথমেই সে স্টিফেনের ওই লোভথকথকে চোখদুটো নখ দিয়ে গেলে দেবে।

এই দুই পণ্ডিত মানুষের কথাবার্তা, হিসেব-নিকেশ, মাপজোখ কিছুই ঢুকছে না স্টিফেনের মোটা মাথায়। ফলত, একটা পাঁশুটে মার্কা বিরক্তির চিহ্ন বারবার জেগে উঠছে তার মুখের মাসলে। সে মাঝে মাঝেই পয়েন্ট থ্রি ফিফটি সেভেন ম্যাগনামের রুজার রেডহক রিভলভারটা এহাত থেকে ওহাতে নিচ্ছে। ভারী বাক্সটা মেঝের ওপর ঘষটে টেনে আনছে ইতস্তত। মাথার পেছন, ঘাড় চুলকোচ্ছে। চট্ চট্ করে মশা মারছে আর বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় গাল পাড়ছে। বহুদিন এদিকে থেকেছে লোকটা, কাজেই বাংলা সে বলতে পারে ইংরেজি মিশিয়ে, যদিও তার উচ্চারণে এখনও মার্কিন সানুনাসিক সুর।

বিরূঢ়ককেও সন্দেহের খাতা থেকে বাদ দেয়নি পেখম। ও কি সত্যিই বিপদে

পড়েছে, নাকি বিপদে পড়ার ভান করছে? আর যদি সত্যিই বিপদে পড়েও থাকে, তাহলেও তো আর সাত-খুন মাপ হয়ে গেল না। হ্যাঁ, বিরূঢ়ক এক বিরাট ট্র্যাজেডির শিকার, কিন্তু তার কাজের দায়িত্ব তাকেই তো নিতে হবে। ভালো হওয়ার সুযোগ কারও জন্যেই চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় বলে পেখম অন্তত বিশ্বাস করে না।

ছড়ানো চত্বরের চারিপাশে বারান্দায় মোটা মোটা থাম ওপরে উঠে গেছে। বিরূঢ়ক বলল, 'আপনি যে ধর্মীয় ছবিগুলোর কথা বলছিলেন, শৌনক, সেগুলোই আগে দেখা দরকার। তথাগতর পট থাকলে ওগুলোর মধ্যেই কোনো একটা হবে।'

শৌনক বলল, 'সেসব কি এখন আর আছে, নাকি কালের নিয়মে সব মায়ের ভোগে চলে গেছে? দেখি, আসুন!'

টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেওয়ালের গায়ে ছবি খুঁজতে লাগল ওরা। বেশি খুঁজতে হল না। চারিদিকের বারান্দার দেওয়ালে ঝোলানো চারটে অয়েল পেইন্টিং পাওয়া গেল। মাকড়সার জাল আর ঝুল সরিয়ে আলো ফেলে যা দেখা গেল, তাতে হতাশই হতে হল বেশ। এ কীসের সব পেইন্টিং? সাক্ষাৎ ঠাকুর-দেবতার একটিও তো নয়!

কম্পাসের কাঁটা দেখে দিকগুলো স্থির করেছিল ওরা আগেই। উত্তর দিকের দেওয়ালে এক খ্রিশ্চান ফাদারের ছবি। হাতে একটা বই। বইয়ের ওপর ক্রুশচিহ্ন দেখে অনুমান করা যায়, জোব্বাপরা পাদ্রীসাহেবের হাতের বইটি অবশ্যই হোলি বাইবেল। ছবিটা দেখে স্টিফেন বুকে ক্রুশ এঁকে বিড়বিড় করল, 'আভে মারিয়া, আভে মারিয়া!' মনে মনে হাসল পেখম। খুনে টেররিস্টের কী অহিংস ভক্তি! আহা, মরে যাই!

পশ্চিমের দেওয়ালে গলায় পৈতে, গায়ে নামাবলি জড়ানো, কপালের কাছটা সামান্য চাঁছা, টিকিওলা এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত। লম্বা টিকিটি আবার পেছন থেকে সামনে ডান কানের ওপর জড়ানো। এখানেও হাতে একটা বই। বইটার ওপর বাসুদেব আর অর্জুনের ছবি দেখে বোঝা যায়, গীতা।

দক্ষিণের দেওয়লে ঝোলানো পেইন্টিং-এর ধুলোঝুল ঝাড়তেই চমক। এক তিব্বতি লামার ছবি। কাঁধের ওপর আড়াআড়ি উঠে গেছে সঙ্ঘাটি। হাতে যথারীতি একটা বই। কিন্তু সেই বইয়ের মলাটে তিব্বতি অক্ষরে কী যে লেখা আছে, কে জানে! লামার মুখচোখ প্রশান্ত। লামা হাসছেন।

বিরূঢ়ক বলল, 'এই আপনার তথাগতর পট? তা তথাগত কোথায়? ইনি তো বুদ্ধ নন, বৌদ্ধ! তাহলে?'

শৌনক দ্বিধাকম্পিত স্বরে বলল, 'তাই তো! মিলছে না তো কিছুই!'

বিরূঢ়ক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বারান্দার কোণে একটা ভাঙা নড়বড়ে চেয়ার পেল। সেই চেয়ারটাকে দেওয়ালের গায়ে লাগিয়ে পেইন্টিং-টার সমান উচ্চতায় উঠল। বলল, 'দেখি, একটু টানাটানি করে। যদি কিছু হয়...'

কিন্তু টানাটানি করতে গিয়ে লামার গোটা পেইন্টিং-টাই খুলে বেরিয়ে এল দেওয়াল থেকে। বিরূঢ়কের হাত থেকে পেইন্টিং-টা ধরে নামিয়ে এনে নীচে দেওয়ালে ঠেসিয়ে রাখল পেখম। ছবির পেছনে একটা নিরেট দেওয়াল। সেই দেওয়ালের ওপর টর্চের তীব্র ফোকাস ফেলল শৌনক। স্টিফেন তার বাক্স থেকে একটা হ্যামার বের করে বিরূঢ়কের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্ট্রাইক দ্য ওয়াল। দেখুন তো, কেমন শব্দ ওঠে। ইজ ইট হলো?'

দেওয়ালে হাতুড়ি ঠুকতে লাগল বিরূঢ়ক। ঠুক্-ঠুক্, ঠুক্-ঠুক্। নাহ্, দেওয়াল একদম নিরেট। কোথাও কোনো ফাঁপাটাপা নেই। বিরক্ত হয়ে চেয়ার থেকে ধুপ্ করে লাফিয়ে নামল বিরূঢ়ক। স্টিফেন বলে উঠল, 'ওহ, শিট্!'

বিরূঢ়ক বলল, 'ধুর! কোথায় তথাগতর পট সরালেই দেখা যাবে একটা গোপন চেম্বার, সেই চেম্বার থেকে মাটির নীচে নেমে যাবে একটা লুকোনো সিঁড়ি... তা না! ডিসগাস্টিং! যা তা একেবারে। মুখে ধুলোবালি ঢুকে গেল মাঝের থেকে। তথাগতর পট খুলে যায়... তথাগতর পট খুলে যায়... কেন যে বানিয়েছিল উদ্ভুট্টে ছড়াটা!'

বলতে বলতেই হঠাৎ চুপ মেরে গেল বিরূঢ়ক। কী একটা ভেবে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা শৌনক, ছড়াটা কোথাও লিখিত আকারে দেখেছেন আপনি?'

'না তো! মুখে মুখে চলে এসেছে ছড়াটা। সুবিমলবাবু এই ছড়া শিখিয়েছিলেন শ্রীনিকে। শ্রীনি-র মুখেই তো আমরা শুনলাম।'

"হুম্! মুখে মুখে চলে আসার সমস্যা কী জানেন, শৌনক? ছড়ার শব্দগুলোর উচ্চারণ সামান্য পালটে যেতে পারে। বিশেষত প্রায় একই উচ্চারণের শব্দগুলোর ক্ষেত্রে। এই যে 'পট' কথাটা, এটা যদি ইংরেজি 'pot' হয়, তাহলে?"

'Pot? মানে, পাত্র? তাহলেই বা কী অর্থ হবে? তথাগতর পাত্র? কী পাত্র? ভিক্ষাপাত্র? নাকি তথাগত পাত্র কোনো ব্যক্তির নাম?'

'ওয়াইল্ড গুজ চেজ!' বলে বিরক্তিসহকারে থুতনির কাছটা একটু চুলকে নিল স্টিফেন।

স্টিফেনের সেই কথায় পাত্তা না দিয়ে পেখম বলল, "আচ্ছা, আসল কথাটা হয়তো ছিল 'পথ'। পরে মুখেমুখে ওটা 'পট' হয়ে দাঁড়িয়েছে! হতে পারে না?"

বিরূঢ়ক বলে উঠল, 'ব্রিলিয়ান্ট! তথাগতর পথ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এইট-ফোল্ড নোবল পাথ। একটা সংখ্যা পাচ্ছি। আট!'

এই বলেই সে কী যেন দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোর্ট-ইয়ার্ডটার দিকে চেয়ে। স্টিফেনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'মেজারিং টেপ, প্লিজ!'

বাক্স থেকে মেজারিং টেপ বের করে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বিরূঢ়কের হাতে দিল স্টিফেন। আয়তাকার চত্বরটার দৈর্ঘ্য মাপতে লাগল বিরূঢ়ক। মাপা শেষ হলে বলল, 'অ্যামেজিং! এগজাক্টলি এইট মিটার। এটাই আশা করছিলাম!'

শৌনক সোল্লাসে বলল, "তাহলে ওই লাইনটা—তথাগতর পট খুলে যায়, ফিবু নাচে শর্টে—এটার প্রথম অংশটা যদি এই চত্বরটার দৈর্ঘ্যের সূচক হয়, তবে কি পরের অংশটা প্রস্থের সূচক? ফিবু নাচে শর্টে—'ফিবু নাচে' তো বুঝলাম ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স... এখন 'শর্টে' কথাটা... শর্ট...শর্ট... আচ্ছা, এটা সংস্কৃত 'ষট্' শব্দের পরিবর্তিত রূপ নয় তো? আসল লাইনটা হয়তো ছিল—তথাগতর পথ খুলে যায় ফিবু নাচে ষটে—এরকম?"

'হতেই পারে,' বলল বিরূঢ়ক, "'ষট্' শব্দের অর্থ হচ্ছে ছয়। আচ্ছা প্রস্থটা, আসুন, মেপে ফেলা যাক।"

আবার ফিতে ফেলে কোর্ট-ইয়ার্ডের প্রস্থের দিকটা মাপা হল। কিন্তু না, মিলল না। প্রস্থ বেরোল পাঁচ মিটার।

শৌনক বলল, 'এটা কেমন হল?... ওহো, বুঝেছি, বুঝেছি।'

বিরূঢ়ক হেসে বলল, 'ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের সিক্সথ টার্ম, না?'

পেখম মনে মনে মেলাতে লাগল। ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮...। স্টিফেনের আস্তানায় গতকাল ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স নিয়ে অনেক কথা বলেছে বাবা। ঠিকই তো। ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের ষষ্ঠ পদটি ৫-ই বটে। তাহলে 'ফিবু নাচে ষট্-এ' মানে ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের সিক্সথ টার্মে যে সংখ্যাটি আছে, সেটা।

শৌনক উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তাহলে?'

বিরূঢ়ক উত্তর দিল, 'তাহলে এই কোর্ট-ইয়ার্ডটা হচ্ছে এমন একটা আয়তক্ষেত্র, যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৮ মিটার আর প্রস্থ হচ্ছে ৫ মিটার। তবে তো এটা একটা ফিবোনাচ্চি রেকট্যাংগল।'

শৌনক বলল, 'হ্যাঁ, একদমই। আ পারফেক্ট এগজাম্পল অফ ফিবোনাচ্চি রেকট্যাংগল!'

পেখম প্রশ্ন করল, 'ফিবোনাচ্চি রেকট্যাংগল কী, বাবা?'

শৌনক উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কালই তো বললাম। ভুলে মেরেছিস? ফিবোনাচ্চি রেকট্যাংগল হচ্ছে এমন একটা আয়তক্ষেত্র, যার দুটো সাইড ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের পরপর দুটো পদ। এক্ষেত্রে যেমন ৫ মিটার আর ৮ মিটার। ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সে পরপর এই দুটো টার্ম আসছে। ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮...'

পেখম বলল, 'তা নয় বুঝলাম। এই কোর্ট-ইয়ার্ডটা একটা ফিবোনাচ্চি রেকট্যাংগল। কিন্তু তাতে এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে?'

পেখমের কথা শুনে বিরূঢ়ক হাসতে লাগল। শৌনক বলল, 'বলিস কী রে? ফিবোনাচ্চি রেকট্যাংগল কি একটা যে সে ব্যাপার? পরের পর কতগুলো স্কোয়ার বা বর্গক্ষেত্র একটা বিশেষ কায়দায় পাশাপাশি জুড়ে এই ধরনের ফিবোনাচ্চি রেকট্যাংগল

বানানো হয়। প্রত্যেকটা বর্গক্ষেত্রের বাহু ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের এক্কেটা পদ হয়ে থাকে। ১মিটার বাই ১মিটার। আবার ১মিটার বাই ১মিটার। ২ মিটার বাই ২ মিটার। ৩মিটার বাই ৩ মিটার। ৫মিটার বাই ৫ মিটার। পরের পর এইভাবে জুড়ে এই ৮ মিটার বাই ৫ মিটার আয়তক্ষেত্রটা বানানো। এখন ব্যাক ক্যালকুলেশন করে এই আয়তক্ষেত্রটা থেকে ওই বর্গক্ষেত্রগুলো এক এক করে খুঁজে বের করা যায়। এবং এইভাবেই সেই আদি ১ মিটার বাই ১ মিটার স্কোয়ারটাও খুঁজে বের করা যাবে। আমার তো মনে হয়, সব থেকে ছোটো সেই ১ বাই ১ স্কোয়ারটাতেই লুকিয়ে আছে সমাধান সূত্র।' বাপের অনেকটা কথাই ট্যান্ হয়ে বেরিয়ে গেল পেখমের মাথার ওপর দিয়ে। তবু সে বলল, 'তা সেটা খুঁজে বের করবে কী করে, শুনি?'

'দ্যাখ,' শৌনক বলল, 'কীভাবে খুঁজে বের করব, সেটা তোকে এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোঝানোর থেকে হাতে-কলমে করেই দেখাই। তুই দ্যাখ, আমরা কী করছি আর বোঝার চেষ্টা কর। খুব সোজা! এমন কিছু হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয়।'

বাক্স থেকে চারকোল পেন্সিল বের করল বিরূঢ়ক। বলল, 'কিন্তু কোন দিকের সাইডটা দিয়ে শুরু করবেন কিছু ঠিক করেছেন, শৌনক? কোর্ট-ইয়ার্ডের পূর্ব আর পশ্চিম দুটো বাহুই তো ৫ মিটার—রেকট্যাংগলের প্রস্থের দিক। এখন পূর্ব দিকের বাহুটা নিয়ে শুরু করলে অন্তিমে যে ১ বাই ১ স্কোয়ারটা পাবেন সেটা, আর পশ্চিম দিকের বাহুটা নিয়ে শুরু করলে শেষে গিয়ে যে ১ বাই ১ স্কোয়ারটা পাবেন—সে দুটো কিন্তু আলাদা।'

শৌনক বলল, 'ঠিক বলেছেন। ট্রায়াল এন্ড এরর করব? আচ্ছা, পূর্বদিকের বারান্দাতে আমরা যাইওনি তো এখনও সেভাবে। চলুন তো একবার দেখি!'

পূর্বের বারান্দার দেওয়ালে ঝোলানো পেইন্টিং-টি এক দাড়িওলা মৌলবী সাহেবের। তাঁরও হাতে একটা মোটা বই। শৌনক বলল, 'হুম্, মৌলবী দেখছি কোরান পড়ছেন!'

বিরূঢ়ক ভুরু কুঁচকে বলল, 'কোরান কি? বইটার ওপর সোনালি অক্ষরে আরবি ভাষায় কী যেন লেখা! লেখাটার ওপর টর্চের আলো ফোকাস করুন, ফোকাস করুন!'

চেয়ারে উঠে লেখাটার ওপর থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগল বিরূঢ়ক। টর্চের আলোয় দেখা গেল, মৌলবী সাহেবের হাতের বইটির মলাটে লেখা— ال حديث

বিরূঢ়ক বলল, 'অ্যারাবিক আমি একটু একটু পড়তে পারি। লেখা আছে : আল্ হাদিথ।'

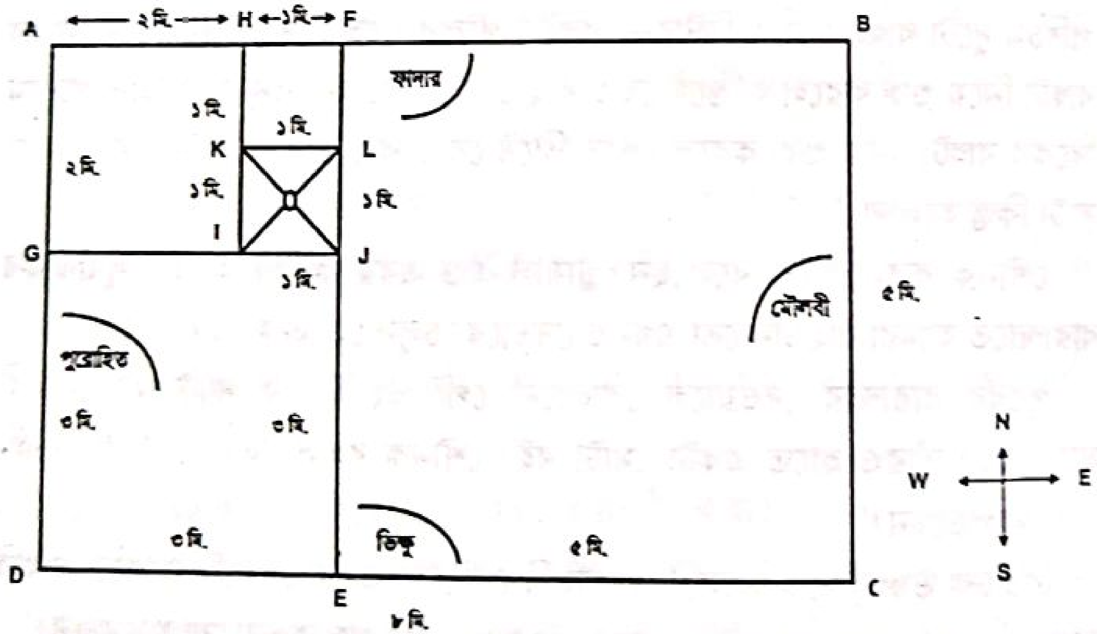
পেখম চোখ গোল গোল করে বলল, 'তাহলে কোরান পড়ছেন না মৌলবী সাহেব। হাদিথ পড়ছেন। যাকে আমরা বাংলায় বলি হাদিস্?'

শৌনক বলল, "হ্যাঁ। 'হদিস পাবেই, যদি তোমার বুদ্ধি থাকে ঘটে'। তার মানে এই হাদিস্-পড়া মৌলবী সাহেবের ছবিওলা পুবের বারান্দার দিক থেকেই মাপজোখ শুরু করতে হবে। চলুন।"

এতক্ষণ চুপচাপ হয়ে ছিল স্টিফেন। বোঁদা চোখ মেলে ওদের পেছন পেছন আসছিল। এখন বোধহয় তার আর ধৈর্য রইল না। বিরক্তি সহকারে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল, 'ওয়েল, কল মি হোয়েন ইউ ফিনিশ ইয়োর অ্যাব্রাক্যাডাব্রা ক্যালকুলেশন। আমি একটু বাইরে থেকে আসছি,' এই বলেই বিরস বদনে সে কেটে পড়ল।

স্টিফেনের কথায় অণুমাত্র পাত্তা না দিয়ে শৌনক আর বিরূঢ়ক পূর্বের বারান্দার দিকে একটা পেট্রোম্যাক্স নিয়ে এসে মোটা চারকোল-পেন্সিল আর মেজারিং টেপ নিয়ে কোর্ট-ইয়ার্ডে নেমে পড়ল। পেখম সাগ্রহে দেখছিল, ওরা কী করে।

শৌনক আর বিরূঢ়ক কোর্ট-ইয়ার্ডটাকে মেপে মেপে যেভাবে ভাগ করছিল কিংবা ঠিক যা করছিল, সেটা পাঠককে সহজে বোঝানোর চেষ্টা করা যাক। নীচের ম্যাপটা ভালো করে দেখুন।



ম্যাপের ABCD আয়তক্ষেত্রটি হচ্ছে, ধরা যাক, নাগেদের বাড়ির চত্বর বা কোর্ট-ইয়ার্ড। AB বাহু উত্তরে, AD বাহু পশ্চিমে, DC বাহু দক্ষিণে আর BC বাহু পূর্বদিকে রয়েছে। এই BC বাহুর দিকের বারান্দায় হাদিস-পাঠরত মৌলবী সাহেবের ছবি। BC বাহুর পরিমাপ ৫ মিটার। আর দক্ষিণদিকের DC বাহুর পরিমাপ ৮ মিটার। ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের ষষ্ঠ ও সপ্তম পদ।

০, ১, ১, ২, ৩, ৫*, ৮*...

প্রথমেই ওরা BC বাহুর সমান সমান করে DC বাহুর থেকে CE অংশ কেটে

নিল। এখন তাহলে ৮ মিটার মাপের DC বাহু দুটো অংশে ভাগ হয়ে গেল। CE আর DE। CE= BC= ৫মিটার। সুতরাং, DE= DC - CE= ৮মিটার - ৫ মিটার= ৩ মিটার।

এবার E বিন্দু দিয়ে BC বাহুর সমান্তরাল করে একটা সরলরেখা টানল বিরূঢ়ক। সরলরেখাটা উত্তর দিকের AB বাহুকে F বিন্দুতে ছেদ করল। ফলত, পাওয়া গেল EF বাহু।

তাহলে কোর্ট-ইয়ার্ডটা এখন দুই ভাগে ভাঙা হল। একটা আয়তক্ষেত্র, আর একটা বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্র BCEF-এর মাপ ৫ মিটার বাই ৫ মিটার। আর আয়তক্ষেত্র AFED-র মাপ দাঁড়াল ৫ মিটার বাই ৩ মিটার।

অর্থাৎ, ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের ঠিক আগের দুটো পদ। ৫ আর ৩।

০, ১, ১, ২, ৩*, ৫*, ৮...

এখন AD = BC = ৫মিটার। আগের মতো একইভাবে DE বাহুর সমান সমান করে AD বাহুর থেকে DG অংশ কেটে নিল শৌনক। G বিন্দু দিয়ে DE বাহুর সমান্তরাল করে একটা সরলরেখা টানল। সরলরেখাটা EF কে J বিন্দুতে ছেদ করল। তার ফলে পাওয়া গেল GJ রেখা।

এখন, DG = DE = ৩মিটার। তাহলে AG= AD - GD= ৫ মিটার - ৩ মিটার =২ মিটার।

এবারেও তাহলে পাওয়া গেল একটা আয়তক্ষেত্র আর একটা বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্র GJED-এর মাপ দাঁড়াল ৩ মিটার বাই ৩ মিটার। আর আয়তক্ষেত্র AGJF-র মাপ দাঁড়াল ৩ মিটার বাই ২ মিটার।

অর্থাৎ, ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের আবার ঠিক আগের দুটো পদ। ৩ আর ২।

০, ১, ১, ২*, ৩*, ৫, ৮...

এবার আবার আগের মতোই AG বাহুর সমান সমান করে AF বাহুর থেকে AH অংশ কেটে নিল ওরা। H বিন্দু দিয়ে AG বাহুর সমান্তরাল করে একটা সরলরেখা টানল। সরলরেখাটা GJ কে I বিন্দুতে ছেদ করল। তার ফলে পাওয়া গেল HI সরলরেখা।

এখন, AH = AG = ২ মিটার। তাহলে HF= AF - AH= ৩ মিটার -২ মিটার=১ মিটার।

এবারেও তাহলে বেরিয়ে এল একটা আয়তক্ষেত্র আর একটা বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্র AHIG-এর মাপ দাঁড়াল ২ মিটার বাই ২ মিটার। আর আয়তক্ষেত্র HFJI-র মাপ দাঁড়াল ২ মিটার বাই ১ মিটার।

অর্থাৎ, ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের আবার ঠিক আগের দুটো পদ। ২ আর ১।

০, ১, ১*, ২*, ৩, ৫, ৮...

এই একই পদ্ধতিতে আয়তক্ষেত্র HFJI-কে দুটি বর্গক্ষেত্র HFLK আর KLJI-তে ভেঙে নেওয়া গেল। দুটো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটারই মাপ ১ মিটার বাই ১ মিটার।

০, ১*, ১*, ২, ৩, ৫, ৮...

KLJI-বর্গক্ষেত্রটাই আলটিমেট স্কোয়ার। সেদিকে তাকিয়ে শৌনক বলল পেখমকে, 'যা, তাড়াতাড়ি গবেটটাকে ডেকে নিয়ে আয়। পাতালঘর খুলবে এবার!'

পেখম অমনি জোরে জোরে শিস দিতে দিতে ডাকতে ডাকতে দরজার দিকে গেল, 'স্টি-ফেন! মিস্টার স্টি-ফেন!'

বিরূঢ়ক সন্দেহাকুল চোখে শৌনকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এতটা শিওর হচ্ছেন কী করে? গাম্বাটটা আসার পর যদি আমাদের এই ফরমুলা কাজ না করে, যদি সুড়ঙ্গের মুখ না খোলে, তাহলে ও তো খেপে গিয়ে এখনই আমাদের তিনজনকে গুলি করে উড়িয়ে দিতে পারে। এতটা রিস্ক নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?'

ইস্পাতের মতো কঠিন গলায় উত্তর দিল শৌনক, 'ওইটেই আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য, বিরূঢ়ক! লক্ষ্যবস্তুর সামনে পৌঁছেও আপনার সংশয় যায় না। আর এমনকি সম্পূর্ণ ভুল পথে পরিচালিত হয়েও আমার প্রত্যয় মরে না। বাট আয়াম ড্যাম শিওর দ্যাট উই আর স্ট্যান্ডিং অন দ্য টানেল রাইট নাউ! দিস ইজ দ্য আনমিসটেকেবল ক্যালকুলেশন অফ লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি! ডান!'

এসব কথার মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌঁছালো স্টিফেন পেখমের সঙ্গে। এসেই বক্রোক্তি করল, 'জিওমেট্রির বুজরুকি শেষ হয়েছে? এবার কি টানেল খুলবে?'

গণিত সম্পর্কে এই ধরনের অশ্রদ্ধাসূচক কথা একমাত্র গবেটরাই বলে থাকে। তাই ওকথার কোনো উত্তর না দিয়ে শৌনক KLJI-বর্গক্ষেত্রটার কর্ণ দুটো যোগ করল। দুটো ডায়াগনাল KJ আর LI —ছেদ করল O-বিন্দুতে। শৌনক বলল, 'পেখম! যা তো মা, এই ডায়াগনাল দুটোর ইন্টারসেকটিং পয়েন্টের ওপর গিয়ে একপায়ে দাঁড়া তো!'

ব্যালেরিনার মতো দুলতে দুলতে লঘু পায়ে পেখম সেই দুই কর্ণের ছেদবিন্দুর ওপর গিয়ে দাঁড়াল। সে জানে, নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে এবার। তার বাবার হিসেব কখনও ভুল হয়নি, এবারেও হবে না।

কিন্তু কিছুই হল না। যেখানকার মাটি সেখানেই আছে। সব স্থির। কিছুই হচ্ছে না তো! এক্কাদোক্কা খেলার মতো করে জায়গাটার ওপর লাফালো কয়েকবার পেখম। নাহ্, কোনো নড়নচড়ন কিচ্ছু নেই। নিরাশ হয়ে স্কোয়ারটার ওপর থেকে সে সরে এল।

শৌনক আর বিরূঢ়ক পরস্পরের দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে। পুরো ভাবনাটাই তাহলে ভুল ছিল তাদের? ছড়াটার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা কিছু? এতক্ষণ পণ্ডশ্রম হল তাহলে? মনে মনে একেবারে ভেঙে পড়তে লাগল শৌনক।

রুজার রেডহক রিভলভারটা বের করে এনে শৌনকের কপালে ঠেকিয়ে সজোরে ধমক দিয়ে বলে উঠল স্টিফেন, 'এই আপনার গুপ্তধন খোঁজার নমুনা? এর জন্যেই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিলেন? এখনই সুড়ঙ্গের মুখটা খুঁজে বের করুন, নইলে... নাউ অর নেভার!'

শৌনকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পেখম ঘেমে উঠছিল। আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয়ে নীল হয়ে উঠছিল তার মুখ। বিরূঢ়ক হতোদ্যম হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। স্বপ্নটা মিলল না শেষ পর্যন্ত?

'কী হল? শুনতে পাচ্ছেন না? এতক্ষণ ধরে আজগুবি রেখা টানলেন মাটির ওপর... কাল সকালে এই পোড়ো বাড়ির কোর্ট-ইয়ার্ডে আপনাদের তিনজনের লাশ পড়ে থাকবে, গট ইট?...'

স্টিফেন আরও যেন কীসব বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ হতেই সে চুপ মেরে গেল। হ্যাঁ, শব্দটা মাটির নীচ থেকেই আসছে। ঠিকই তো!

তীক্ষ্ণ চোখে সবাই মাটির দিকে তাকাল। যেন পাতালের ভেতর অনেকগুলো লেয়ারে পাটাতন সরে যাচ্ছে, মাটি থরথর করে কাঁপছে। তার পরেই বর্গক্ষেত্রটার কর্ণের ছেদবিন্দু বরাবর একটা পাথরের স্ল্যাব ঘড় ঘড় শব্দ করে সরে যেতে লাগল। শুধু এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তেই মাটির বুক চিরে একটা অন্ধকার ফাটল যেন হাঁ-করে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

ভারী পাঁচ সেলের টর্চটার আলো বিরূঢ়ক সেই অন্ধকার গহ্বরের ভেতর ফেলে দেখল, সত্যিই কবেকার বানানো একটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে যেন কোন্ অতলে নেমে গেছে দেখা যাচ্ছে। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল স্টিফেন, 'আহ্! ফাইনালি দ্য ট্রেজার টানেল!'

তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'আপনারা তিনজন আগে নামুন। আমি পেছনে আসছি।'

অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর টর্চের আলো ফেলে সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নামতে লাগল ওরা চারজন... খড় আর পাতাপচার কটু গন্ধ... যেকোনো সময় অতর্কিতে পা পিছলে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা...

কিন্তু সেই পথে কয়েকটা ধাপ নেমেছে কি নামেনি, হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্যে চমকে উঠল ওরা। কোথা থেকে যেন একটা সুনীল আলোর গোলক তীব্র বেগে ছিটকে বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের গর্ভ থেকে। আলোর সেই বলটা ক্রমে আকারে বাড়ছে। দানবের বিরাট নীল চোখের মতো দ্যুতিমান সেই বলয় ছুটে আসতে লাগল ওদের

চারজনকে গ্রাস করে নেওয়ার জন্য।

শৌনক দেখল, আলোর বলটা তার রং পাল্টাচ্ছে। কখনও নীল, কখনও উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো সবুজ। আর তারই সঙ্গে শ্বাসরোধকারী বিষাক্ত বাতাসের প্রবাহ একটা।

সবার আগে ভয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল স্টিফেন। চিৎকার করে উঠল সে, 'মাই গড! দ্য ডেভিলস আই!!'

রুমালে নাক-মুখ চেপে পেখম, শৌনক আর বিরূঢ়কও পিছিয়ে এল খানিক। পেখম বুঝতে পারছিল না, ঠিক কী ব্যাপার ঘটল সুড়ঙ্গের ভেতর। কিছুটা পিছিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা তিনজন দেখতে পেল, নীলচে আলোটা দুলছে, ছুটে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। তিনজনই খক্ খক্ করে কাশতে লাগল খুব। পেখম ভাবছিল, এই তবে 'নাগলোকের পেটের ভিতর বিষাক্ত নীল হাওয়া'? কী ভয়ংকর!

কাশির দমক একটু থামতে পেখম দেখল, বিরূঢ়কের মুখে ফুটে উঠেছে আশ্চর্য রহস্যময় একটা হাসি। সেই নীল আলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে উচ্চারণ করছে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন :

'রাত্রি-পারাবারে
ফিরিতেছ বারম্বার একাকী বিচরি!
হেমন্তের হিম পথ ধরি,
পউষ-আকাশতলে দহি-দহি-দহি
—ছুটিতেছ বিহ্বল বিরহী
কত শত যুগজন্ম বহি!
কারে কবে বেসেছিলে ভালো
হে ফকির—আলেয়ার আলো!'

শৌনক হেসে বলল, 'ঠিক। ইমরটাল জীবনানন্দ! আলেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। পাতা, খড়, আরও অনেক কিছুর অরগানিক ডিকে-র ফলে ফসফিন, ডাইফসফেন আর মিথেন গ্যাসের উদ্ভব। সুড়ঙ্গে বাইরের বাতাস ঢোকামাত্রই ফসফিন আর ডাইফসফেন সেই বাতাসের সংস্পর্শে এসে অক্সিডাইজড হয়ে জ্বলে উঠেছে। আর তার ফলেই মিথেন গ্যাসে ধরে গেছে আগুন। মিথেন পোড়ে নীলচে শিখায়। দলা-পাকানো জ্বলন্ত গ্যাসের নীলাভ পিণ্ডটা উথালপাতাল হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। আর তাকেই গবচন্দ্র স্টিফেন ভাবছে, শয়তানের চোখ। ওহ্! তার মানে সুবিমলবাবু নিশ্চয়ই অন্তত একবার এপথে নেমেছিলেন বা অন্তত নামার চেষ্টা করেছিলেন।'

বিরূঢ়ক বলল, 'হ্যাঁ। অবশ্যই। তা না হলে নাগলোকের পেটের ভেতরে বিষাক্ত নীল হাওয়ার কথা তিনি বলে যেতে পারতেন না ছড়ায়। কিন্তু তিনিই সম্ভবত এ

পথে শেষ অবতরণকারী। বাকিরা শুধু ট্রেজার প্রোটেক্ট করেই মরেছে। এত বড়ো রহস্যটা জানতে পারেনি।'

শৌনক বলল, 'এখনও অবধি রহস্যের আমরা দেখেছি কতটুকু? এই তো রহস্যের শুরু। চলুন, আলেয়া নিভে গেছে। আবার আমরা নামার চেষ্টা করি।'

ইতোমধ্যে ওদের পেছনে আবার কখন এসে জুটেছে স্টিফেন। তার চোখে এক মুহূর্ত আগের ভয় সরে গিয়ে এখন আবার চকচক করে উঠেছে লোভের আগুন।

সেই সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে টর্চের আলোয় রহস্যময় সুড়ঙ্গের মধ্যে নামতে লাগল পুনর্বার চারজন নিয়তিতাড়িত মানুষ...

৩১

গত দিন তিনেক ভোঁদা কোনো ট্রিপ নেয়নি। মাথা গরম হয়ে আছে। আজকেও যেত না। নেহাত পাশের বাড়ির লোক না হলে। খুব ধরে বসল। 'মেয়ে-জামাই সন্ধের ট্রেনে কলকাতা যাবে, প্লিজ মেদিনীপুর স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয়।' কী আর করা? গাড়ি বের করতেই হল। এখন মাথা ঠান্ডা করে গাড়ি চালানোও মুশকিল ভোঁদার পক্ষে। বেশ ক-দিন হয়ে গেল, শৌনক আর পেখমকে পাওয়া যাচ্ছে না। জাস্ট হাওয়া, বেপাত্তা!

ওরা বাপ-বেটিতে গিয়েছিল চেন্নাই কী সমস্ত কাজকর্ম নিয়ে। যাওয়ার সময় ফ্লাইটে যায়, ফেরার টিকিট কেটেছিল করোমন্ডল এক্সপ্রেসে। সকালে ট্রেনে উঠে দুপুরবেলায় লিলিকে হোয়াটস্যাপে মেসেজ করেছে শৌনক। 'ট্রেন ঠিক সময়েই চলছে। উই আর ফাইন। কাল সকাল দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব খড়গপুরে। পেখম ঠিক আছে। চিন্তা কোরো না।' মেসেজটা করেছে দুপুর বারোটা পঁচিশে। কিন্তু তারপর থেকে সেদিন সারাদিন, সারারাত লিলি ওদের না পেয়েছে ফোনে, না পৌঁছোতে পেরেছে মেসেজ। ভেবেছে, হয়তো টাওয়ার নেই; দূরপাল্লার ট্রেনে লাইন পাওয়া প্রায়শই মুশকিল হয়—তাও ঠিক। মেদিনীপুরে টাওয়ারের অবস্থাও তো ঝুমুর নাচ দেখায় সারাদিন। তার পর একেবারে মাঝরাত পেরিয়ে শৌনকের নাম্বারে ডায়াল করে এনগেজড টোন পেয়েছিল লিলি। সমস্ত দিন যতগুলো মেসেজ করেছিল, সবগুলো আনসেন্ট দেখাচ্ছিল, মাঝরাতের পর যদিও সেন্ট হল, তবু সবুজ রঙের ডাবল টিক আর দেখা গেল না। তার মানে শৌনক মেসেজগুলো দেখেইনি। এমন তো হওয়ার কথা নয়, এক যদি শৌনক খুব ব্যস্ত না থাকে। কিন্তু ব্যস্ত সে হবে কী নিয়ে? তারপরের দিন সকাল থেকে বাপ-বেটি দুজনেরই ফোন সুইচড অফ বলছে। দুজনের ফোনেই একসঙ্গে চার্জ ফুরিয়ে গেল?

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, শৌনক আর পেখমের দেখা নেই। খড়গপুর থেকে কোথাও গেল? নাকি, খড়গপুরে নামেইনি? চিন্তায় মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় লিলির।

এতসব কিছুই জানত না ভোঁদা। তার পরের দিন সকালে বোসেদের বাড়িতে ডাক

পড়েছিল ভোঁদার। কাকিমা ফোন করেছিলেন। সে আরেক অদ্ভুত বিপর্যয়। প্রতিমার ছেলে দালি নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ছেলে বাড়িতেই ছিল। কী বই পড়ছিল। প্রতিমা মানে বুলি গেছিল শপিং করতে। ফিরে এসে দেখে বই বুকে চেপে দালি শুয়ে আছে খাটে। প্রথমে ভেবেছিল, ঘুমোচ্ছে। পরে দেখে ঠোঁটের কোণে গ্যাঁজলা। তাড়াতাড়ি দালির বাবাকে ফোন করে। তিনি ডাক্তার নিয়েই বাড়ি ফেরেন। ডাক্তার দেখে বলেছে, ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আমরি-তে নিয়ে যায়। সেখানকার ডাক্তারবাবুরা বলছেন, দালি সুস্থ আছে, কিন্তু কোনো কারণে শক্ পেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে। এখন দালি আইসিইউ-তে। পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি এখনও। কেমন একটা ঘোর-ঘোর ভাব। ডাক্তাররাও বেশ ঘাবড়ে গেছেন, কী হয়েছে বুঝতে পারছেন না। স্যালাইন, অক্সিজেন সব চলছে। মেয়ের কাছ থেকে ফোনে এইসব খবর পেয়ে কাকিমা ভোঁদাকে ফোন করেছিলেন। তিনি অবিলম্বে কলকাতা যেতে চান।

ভোঁদা যখন বোসেদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোল, তখন লিলিও চলে এসেছে ওখানে। সঙ্গে আরেকজন মহিলা। দেবলীনা না কী বলল তাঁর নাম। শৌনক আর পেখমের জন্য ওরাও উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছে। ভোঁদা চিন্তা করল, আগে তো কাকিমার ব্যাপারটা মেটাই, তারপর শৌনক-পেখম! ফোনে ধরল সে বুলিকে। কাকিমা কলকাতা যেতে চান— কথাটা বুলি শুনল। কিন্তু সব শুনে বুলি বলল, 'মায়ের এখনই কলকাতা আসার দরকার নেই। ডাক্তার বলছে, দু-একদিনের মধ্যেই দালি ঠিক হয়ে যাবে। আর দালির বাবা তো আছেই কলেজ ছুটি নিয়ে। বরং ক-দিন পর দালি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলে, তখন মা-কে পৌঁছে দিও, প্রতুলদা!' কাকিমা নিজেও বুলির সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু খুব একটা আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না।

এধারে শৌনক-পেখমের হলটা কী? সেদিন সন্ধে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও শৌনকরা ফিরল না দেখে আর কোনো উপায় না পেয়ে কোতোয়ালি থানায় ইনফর্ম করতে বাধ্য হল লিলি। থানায় ভোঁদাও গিয়েছিল লিলির সঙ্গে। সেই থেকে আজ অবধি পুলিশ ঘ্যান ঘ্যান করে একটা কথাই বলে যাচ্ছে, 'দুজনেই যখন মিসিং, তখন দেখুন বাপ-বেটি কোথাও বেড়াতে গেছে কিনা!' বিরক্তিকর! আরে বাবা, কোথাও বেড়াতে গেলে সেটা তো ফোনে বা অন্য কোনোভাবে জানাবে শৌনক। বাপ-বেটি দুজনেরই তো ফোন সুইচড অফ বলছে। রেল-পুলিশ বলছে, দুজনেই নাকি উড়িষ্যার কোনো স্টেশনে নেমে গেছে। ওদের লাগেজও মিসিং।

আজকেও লিলির সঙ্গে থানায় গিয়েছিল ভোঁদা। ফেরার পথে লিলিকে জিজ্ঞেস করল, 'শৌনকের খোঁজ করছিল কেউ ফোনে এই ক-দিন?'

লিলি বলল, 'ওর কলেজের কেউ-কেউ ফোন করেছে। পেখমেরও দু-একজন বন্ধু...'

'না, এখানকার কথা বলছি না। মেদিনীপুরের বাইরে থেকে শৌনকের পরিচিত কেউ ফোন করেছিল?'

লিলি একটু ভেবে বলল, 'শৌনকের পরিচিত কেউ না। আমার একজন বন্ধু বলতে পারো। শৌনকেরও চেনা। সাহিল—আমার স্কুল-জীবনের বন্ধু। কী কাজে কলকাতা গেছে সাহিল। সেখান থেকেই ফোন করেছিল।'

'কী বলছিল?'

'শৌনকের সঙ্গে কী কথা আছে বলল। শৌনক নেই শুনে ছেড়ে দিল।'

'তুমি কিছু বলোনি তো—শৌনক-পেখম ফেরেনি যে এসব?'

লিলি ম্লান মুখে বলল, 'নাহ্। বলিনি।'

'ভালো করেছ, লিলি, না বলে।'

মাথাটা একদম জ্যাম হয়ে আছে ভোঁদার। পাশের বাড়ির মেয়ে-জামাইকে সন্ধের ট্রেন ধরিয়ে সে ফিরছে। ভিড়টা অ্যাভয়েড করার জন্য জলের ট্যাঙ্কের পাশ দিয়ে না গিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে উলটোদিকে পুরোনো সেন্ট জন'স চার্চের পাশের রাস্তা ধরল সে। এদিকটা ফাঁকাফাঁকা। আলো কম; অনেক দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হলুদ আলোমাখা লাইটপোস্ট। এটা সেই পুরোনো আমলের চার্চ, যার চত্বরে আজও শুয়ে আছেন ব্রিটিশ যুগের তিন কুখ্যাত জেলাশাসক পেডি, ডগলাস আর বার্জ—যাঁরা খতম হয়েছিলেন বিপ্লবীদের হাতে। ওসব অবশ্য ভোঁদা জানে না, জানলেও মনে রাখে না। অন্তত এসব মনে রাখার মতো মনের অবস্থা তার নয় এখন। চার্চটা পেরিয়ে বাঁদিকে টার্ন নিতে যাবে, এমন সময় দুটো লোক হাত তুলে তাকে থামাল। বলল, গোলকুয়ার চক যেতে চায়। অন্ধকারে লোকগুলোকে ভালো দেখা গেল না। ভোঁদা একটু বিরক্তভাবেই গাড়ির দরজা খুলে লোক দুটোকে তুলে নিল। লোকদুটো পেছনে বসে কীসব বকবক করছে।

মেইন বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে কালেক্টরেট, তারপর এল আই সি-র মোড়, তারপর আরও এগিয়ে গান্ধিজির স্ট্যাচু থেকে ডানদিকে ঘুরে গাড়িটাকে বিদ্যাসাগর হলের কাছে নিয়ে এল ভোঁদা। আসলে সে একটু ঘুরপথে আসছে ভিড় এড়ানোর জন্যে। তার মাথার ঠিক নেই, হাতও স্টেডি নয় আজ। শৌনক আর পেখমের মিসিং হয়ে যাওয়ার ঘটনাটাতে তার প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছে। বিদ্যাসাগর হল বাঁ হাতের দিকে রেখে পুরোনো জেলখানার সামনে দিয়ে গাড়িটা নিয়ে এল সে। আরেকটু এগোলেই কলেজিয়েট স্কুলের মাঠ পড়বে। জায়গাটা একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। আলোগুলোও অনেকটা দূরে দূরে।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ পেছনে বসা লোকদুটোর কথাবার্তার কয়েকটা টুকরো

তার কানে ভেসে এল। গাড়ির আয়নার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে পেছনের সিটের দলাপাকানো অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকা মানুষদুটোর মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। ভোঁদা শুনল, একজন আরেকজনকে একটু চাপা গলায় বলছে, 'আজকে রাতে তো আর্জেন্ট মিটিং। সব্বাইকে ডাকা হয়েছে।'

অন্যজন জিজ্ঞেস করল, 'ক-টা নাগাদ? কোথায় হবে?'

প্রথমজন উত্তর দিল, 'রাত দেড়টা নাগাদ। মিটিং যেখানে হয় সেখানেই—সেই একই জায়গায়; মল্লিকবাড়িতে। দাদাদের আসতে একটু দেরি হতে পারে।'

লোকদুটো একদম চুপ মেরে গেল।

আশ্চর্য তো! রাত দেড়টায় মিটিং! কী মিটিং রে বাবা? মরুকগে। ভোঁদা বিরক্ত হয়ে স্টিয়ারিং ঘোরালো। কলেজিয়েট মাঠ ছাড়িয়ে ডানদিকে টার্ন নিয়ে কলেজিয়েট স্কুল পেরিয়ে একেবারে গোলকুয়ার চকে এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পেছনে ফিরে তাকাল। আর তখনই বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল ভোঁদা।

পেছনের সিটে কেউ নেই। লোকদুটো চলন্ত গাড়ি থেকে নামল কখন? ভোঁদা তো কোথাও গাড়ি থামায়নি। কী আজব ব্যাপার রে বাবা! লোকদুটো কি ভোজবাজির মতো উবে গেল নাকি?

গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক দেখল সে। মানুষের ভিড়ে কিছুই বুঝতে পারল না। ঘামতে ঘামতে গাড়ি নিয়ে কোনোমতে বাড়িতে এসে ঢুকল।

নাহ্, কিছু একটা তার হয়েছে। খামরুই ডাক্তারকে দিয়ে আর হবে না। মনের ডাক্তার দেখাতে হবে। ভুলভাল দেখছে, ভুলভাল শুনছে। ওই যে হ্যালুসিনেশন না কী বলে! পরপর ক'দিন ছাড়া ছাড়া এসব হচ্ছে। কারও সঙ্গে শেয়ার করারও উপায় নেই। শৌনক থাকলে না হয় সব খুলে বলত। কিন্তু কোথায় যে গেল শৌনক!

আচ্ছা, এতই কি সে ভুল দেখল, শুনল? পুরোনো চার্চের কাছে দুটো লোক হাত দেখিয়ে তার গাড়িতে উঠেছে। বলল, গোলকুয়ার চক যাবে... তারপর ভ্যানিশ হয়ে গেল? পুরোনো জেলখানার কাছেও গাড়িটা যখন, তখনও গাড়ির পেছনে লোকদুটো বসেছিল, কথা বলছিল। কী বলছিল যেন? মল্লিকবাড়িতে মিটিং, রাত দেড়টার সময়... তার মানে কী?

কুয়ো থেকে জল তুলে ঠান্ডা জলে বেশ করে স্নান করল ভোঁদা। রাতে কিছু খেতেই ইচ্ছে করল না। শুয়ে পড়ল ঘর অন্ধকার করে। শুধু মাথার ভেতর ওই কথাগুলো পাক খাচ্ছে—'মল্লিকবাড়িতে মিটিং, রাত দেড়টার সময়...'

কেন জানি তার মনে হল, এই কথাগুলোর সঙ্গে শৌনক-পেখমের মিসিং হওয়ার কোথাও একটা যোগ আছে। কেন মনে হল, সত্যিই সে জানে না। আজকাল এই এলোমেলো মনে-হওয়াগুলো প্রায়ই হচ্ছে! কী ভেবে সে সেলফোনে রাত দেড়টায়

অ্যালার্ম দিয়ে রাখল। আজকে এসপার কি ওসপার! ঘুম আসছে না, সামনে দেখার মতো কিছুই নেই, তবু চোখ জ্বেলে অনর্থক বিছানায় শুয়ে রইল ভোঁদা...

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে কতগুলো ভাবনা আসতে লাগল তার মনে। এই যে সে এইসব উলটোপালটা দৃশ্য দেখছে, শব্দ শুনছে, এগুলো তো তার মন-গড়া সব, নাকি? রেলব্রিজের ওপর দিয়ে পুরোনো আমলের চলন্ত গাড়ির ওপর বোমা ফেলে যুবকের দল রেলিং-এর আড়ালে লুকিয়ে যাচ্ছে, পুরোনো দিনের পুলিশের গাড়ি থেকে লালমুখো সাহেব অসহায় কোনো ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে চাবুক মারছে, কলেজিয়েট স্কুলের পুরোনো বিল্ডিং-এ লণ্ঠন জ্বলা সন্ধ্যায় এগজিবিশনের মধ্যে সাহেবকে গুলি করে পালিয়ে যাচ্ছে দুজন যুবক, সেখানে আবার কোত্থেকে এসে জুটছে দালি, গাড়ি থামিয়ে লোক উঠে 'রাত দেড়টায় মল্লিকবাড়িতে মিটিং'-এর গল্প বলে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে—এগুলো সব হ্যালুসিনেশন। এসব ঘটনা একদিকে আর প্রতিদিন যে ভাত খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোয়, সারাদিন এখানে-ওখানে যায়, হাটবাজার করে, বাড়ি ফিরে আসে—সেসব ঘটনা আরেকদিকে। দুরকম ঘটনা এক জাতের নয়। কারণ প্রতিদিনের ঘটনাগুলো ওরকম ভোজবাজির মতো হুশ্ করে এক লহমায় মিলিয়ে যায় না। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সেই এক ঘর, এক বাড়ি, এক গাড়ি, এক রাস্তা—সব একই থাকে। এই দুই ধরনের অভিজ্ঞতাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না তার। একটা মনের হিজিবিজিবিজি, আরেকটা স্পষ্ট, সত্যিকারের জ্যান্ত কটকটে বাস্তব জিনিস। এই দুটোকে গুলিয়ে ফেললেই সে পাগল হয়ে যাবে নির্ঘাত। যেমন রাতের স্বপ্ন আর দিনের বেলা গাড়িতে করে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে আসা—এ দুটো আলাদা—সেরকমই। কিন্তু...

কিন্তু... একটা খটকা। দু-একদিন আগেই বুলির সঙ্গে কথা বলল ফোনে। বুলির গলা এখন অনেক অন্যরকম হয়ে গেছে। ছোটোবেলার সেই রিনরিনে মিষ্টি সুরটা নেই আর বুলির গলায়। মাঝে মাঝে মেদিনীপুরে আসে বুলি, দেখাও হয়েছে বুলির সঙ্গে মাঝেমধ্যে। কিন্তু এ বুলি যেন সেই বুলি নয়। বুলি এখনও সুন্দর, অন্যরকম সুন্দর, এখন সে একটু ভারিক্কি হয়েছে। অথচ, যে-বুলিকে ভোঁদা ছোটোবেলায় দেখেছে, যাকে সাইকেলে করে নিয়ে গেছিল স্টেশনের দিকে, সেই কিশোরী বুলি... ছিপছিপে পাখির মতো সুরেলা, পালকের মতো লঘু, কস্তুরীর মতো সুরভিত, ঘাসফুলের মতো নির্ভার সেই বুলি কোথায় গেল? সেও তো সেদিন বাস্তবই ছিল, কিন্তু আজ? আজ সে স্মৃতিতে। আজ সেই বুলি শুধু স্বপ্নে। বাস্তবের কিশোরী বুলি স্বপ্ন হয়ে গেল কীভাবে? অতীতের সেই রূপেন, শৌনক, সে নিজে—ওরাও তো সবাই বাস্তবই ছিল। একদম কটকটে জলজ্যান্ত বাস্তব। অথচ এখন অতীতের সেই রূপেন, সেই শৌনক, সেই ভোঁদা কোথাও তো নেই আর। 'ছোটোবেলার সে' নিজেও তো নেই আর এখন।

বাস্তবের ছোটোবেলাটাই 'নেই' হয়ে গেছে। স্মৃতি হয়ে গেছে, স্বপ্ন হয়ে গেছে, হ্যালুসিনেশনের মতোই অবাস্তব হয়ে গেছে অতীত, যাকে শুধু মনে মনে পাওয়া যায়। তবে এই যে বুলির ছেলে দালি, শৌনকের মেয়ে পেখম, এরাও তো এখন কী সুন্দর, কী সত্যিকারের, কতো বাস্তব। কিন্তু আর কয়েক বছর পরেই এদেরও তো খুঁজে পাওয়া যাবে না আর বাস্তবের মধ্যে, ওদের এই চেহারা, এই নির্মল, নিষ্পাপ প্রকৃতি স্মৃতি হয়ে যাবে, স্বপ্ন হয়ে যাবে।

তাহলে মনের অসুখে দেখা এইসব ভুলভাল হিজিবিজি ছবি আর সুস্থ মনে, সুস্থ শরীরে দেখা ঠিকঠাক প্রতিদিনের বাস্তব—এ দুয়ের মধ্যে শার্প লাইন টানবে সে কী করে? একটা টু-ওয়ে ট্রাফিক, এদিকের লেন দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে পুবে, ওদিকের লেন দিয়ে গাড়ি ছুটে আসছে উলটোদিকে পশ্চিমে... এখন হঠাৎ যদি এদিকের লেন থেকে একটা গাড়ি হুশ্ করে ওদিকের লেনে ঢুকে পড়ে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে উলটোদিকে ছুটতে আরম্ভ করে... তার একটুক্ষণ পর আবার এদিকের লেন থেকে ওদিকের লেনে হুশ্ করে ঢুকে উলটোদিকে ছুটে গেল আরেকটা...তারপর আরেকটা... তারপর আরেকটা... চোখ-মেলে, ছুঁয়ে-ছেনে-চেটে দেখা প্রতিদিনের বাস্তব যেন সেই পুবমুখো লেন, আর স্মৃতি-স্বপ্ন-হ্যালুসিনেশনে দেখা এই অভিজ্ঞতাগুলো যেন পশ্চিমমুখো লেন... এদিকের ঘটনার গাড়ি ওদিকে ঢুকে পড়ছে ট্রাফিক সিগন্যাল না মেনে... এরকম ইল্লিগাল এন্ট্রি রুখবার জন্য ট্রাফিক পুলিশ থাকার কথা ছিল... ট্রাফিক পুলিশ কোথায় গেল, ট্রাফিক পুলিশ? সব মিশে যাচ্ছে যে! সব মিশে গেল...

ঠিক রাত দেড়টায় ঘুম ভাঙল অ্যালার্মের শব্দে। তড়াক করে উঠে বসল ভোঁদা। তারপর একটা কালো কাপড় গায়ে জড়াল সে। গাড়ির বড়ো রেঞ্চটা নিয়ে অন্ধকারে চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ল।

মল্লিকচকে যখন এসে পৌঁছোল, দেখল রাস্তাঘাট একদম শুনশান। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। রাস্তার পাশে কতগুলো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ধীরে ধীরে মল্লিকবাড়ির গেটের দিকে এগিয়ে গেল ভোঁদা। গেটে হাত দিয়ে দেখল, গেটটা খোলা।

গেট ঠেলে নিঃশব্দ নিথর মল্লিকবাড়ির ভেতরে সবেমাত্র ঢুকেছে, অন্ধকারের ভেতর স্ট্রিট লাইটের হালকা আভাস। পা টিপে টিপে এগোচ্ছে, এমন সময় সেই আলো-আঁধারির ভেতর থেকে দুটো লোক দুদিক থেকে বেরিয়ে এসে ভোঁদার কাঁধদুটো চেপে ধরল। সামনে থেকে আরও দুজন লোক এগিয়ে এসে ভোঁদার মুখে, পেটে উপর্যুপরি লাথি মারতে লাগল। ভোঁদা নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে, পারছে না। ওরা কী দিয়ে ভোঁদাকে মারছে, ভোঁদা বুঝতে পারছে না, সম্ভবত লোহার রড জাতীয় কিছু। চারটে লোক ভোঁদাকে ধাক্কা মেরে মাটির ওপর ঠেসে ধরেছে। বোধহয়, মেরেই ফেলবে!

অতর্কিতে হঠাৎ মার খেয়ে চোখে সরষে ফুল দেখছিল ভোঁদা। সে বুঝতে পারছিল, যারা তাকে মারছে, তারা হ্যালুসিনেশনে দেখা, ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যাওয়া লোকেদের মতো নয়। হয়তো এরাও একদিন স্মৃতির মতো অবাস্তব হয়ে যাবে, কিন্তু এ মুহূর্তে এরা চরম বাস্তব, এদের মারগুলোও রীতিমতো বাস্তব এবং সেই প্রচণ্ড মার খেয়ে সে এক বাস্তব নাকি অবাস্তব মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বাস্তব-অবাস্তবের এই জটিল গোলক-ধাঁধাকে ঘাড় ঝাঁকিয়ে হঠাৎ ঝেড়ে ফেলে দিল ভোঁদা। তার প্রচণ্ড রাগ হল। একদম বাস্তব রাগ। এরকম বস্তুনিষ্ঠ গাঢ় রাগ তার হয় মাঝে মাঝে। রেগে গেলে যেন ষাঁড়ের মতো জোর চলে আসে তখন তার শরীরে।

মেঝেতে ভোঁদাকে ঠেসে ধরে প্রচণ্ড মারছে লোকগুলো। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। মরিয়া হয়ে ভোঁদা পা দুটো সামনের লোকটার পায়ের ফাঁক দিয়ে বের করে এনে তার কোমরে উলটোমুখে সপাটে লাথি কসালো। সঙ্গে সঙ্গেই সামনের লোকটা ব্যালেন্স না রাখতে পেরে হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ল ভোঁদার মাথার ওপর দিয়ে। অন্য লোকগুলো একটু হকচকিয়ে গেছে দেখে এই সুযোগে ভোঁদা তার হাত আর কাঁধ দুটোতে একটা ভয়াবহ ঝাঁকুনি মারল। এই তিনটে লোকও একটু দূরে ছিটকে পড়েছে। হাতদুটো মুক্ত হতেই প্রচণ্ড জোরে গাড়ির রেঞ্জ মাথার ওপর ঘুরিয়ে ওদের একটার কপালে ভোঁদা আঘাত করল। লোকটা 'উফ্' বলে চেঁচিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ মাটির ওপর অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ল। আগেই মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল যে, সে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উঠে এগিয়ে আসছে দেখে ভোঁদা এবার তার চোয়ালে একটা ভীষণ আন্ডারকাট চালাতেই ঘুসি খেয়ে লোকটা ছিটকে পড়ল। অস্ত্রটা ছিটকে পড়ল আরও দূরে। এবার শূন্যে লাফিয়ে উঠে বাকি দুটো সশস্ত্র লোকের মধ্যে একটার পেটে লাথি কষাল ভোঁদা আর একই সঙ্গে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বিদ্যুতের বেগে অন্যজনের মাথার খুলির ওপর লোহার রেঞ্জ দিয়ে বেদম জোরে মারল। মাথায় আঘাত পেয়ে সেটাও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দুটো পড়ে আছে, আর বাকি দুটো নেংটি ইঁদুরের মতো জান নিয়ে পালাচ্ছে। 'থুঃ' করে মেঝেতে রক্তমাখা থুতু ফেলল ভোঁদা। এখন আবার সব চুপচাপ। বাইরে শুধু কুকুর ডাকছে খুব।

অসাড় অজ্ঞান লোকদুটোকে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে সেই ভীষণ অন্ধকারে মল্লিকবাড়ির দুর্গাদালানের দিকে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাওয়া ভোঁদা এগিয়ে যেতে লাগল আদিম কালপুরুষের মতো...

না, ভোঁদা নয়। এখন সে প্রতুল।

৩২

সিঁড়ির ধাপগুলো ক্রমশ পাতলা হতে হতে একটা আরেকটার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। নিম্নগামী এই সুড়ঙ্গপথ ঢালু হচ্ছে আরও। মধ্যে মধ্যে অন্ধকারের ভেতর দৈত্যাকার মাকড়সারা যুগ-যুগান্ত ধরে জাল বিছিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝেই সেই মাকড়সার জাল বিরক্তিকরভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে মুখে চোখে। একটু আগে সুড়ঙ্গের ভেতর জ্বলে ওঠা গ্যাসের ঘ্রাণ এখন সহনীয় হয়ে এসেছে। টর্চের আলোয় ছাতা-শ্যাওলার সাদাসবুজ দাগধরা সুড়ঙ্গের দেওয়াল, পেখম আর শৌনক হাঁটছে খুব সাবধানে পা টিপে টিপে। অন্যমনস্কতার মাশুল এখানে সাংঘাতিক; পা ফসকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লেই কোন মৃত্যুর অন্ধকার অতলে যে হারিয়ে যাবে ওরা, তার ঠিক নেই। ওদের পেছনে স্টিফেন আর বিরূঢ়ক নামছে নিঃশব্দ পদক্ষেপে।

সিঁড়িগুলো অনেক গভীরে নেমে শেষ হল। এই গভীরে কোনো শব্দ নেই। অথচ শব্দহীনতাটাই যেন এখানে গমগম করছে। দুই হাতের তালু দিয়ে কান ঢেকে রাখলে কর্ণসঙ্কুলির ভেতর যেমন একটা গন্ গন্ আওয়াজ হয়, এই ভূগর্ভের নীরবতাও তেমনই শব্দময়। মনে হয়, কারা যেন কথা বলছে। না, কথা বলছে নয়, কথা বলছিল—এইমাত্র বুঝি থেমে গেল। যেন গত শতাব্দীর অনেক উচ্চারিত শব্দ এখানে জমে নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

এইবার সংকীর্ণ পথ। কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়, আবার কোথাও ঘাড় নীচু করে হাঁটতে হয়। কোনো কোনো জায়গায় সুড়ঙ্গ এতটাই সরু যে হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে এগোনো সম্ভব। দেওয়ালে কীসব যেন লেখা। কোথাও দেবনাগরী হরফ, কোথাও জাপানি বর্ণমালা। কোথাও কোথাও বাংলা ও ইংরেজিতেও লেখা। এক জায়গায় শৌনক টর্চ ফেলে দেখল স্পষ্ট লেখা আছে—'তোমাকে কেউ ডাকেনি। তুমি নিজেই এসেছ।' আর-এক জায়গায় লেখা—'প্রেম চাও? প্রেম পেতে হলে দিতে হবে কাঁচা মাথা। ও আশিক, এ মাশুকের খিদে সাঙ্ঘাতিক! কলিজা খায়!'

কিছুটা এগিয়ে মনে হল, মেঝে থেকে গরম ভাপ উঠছে, জায়গাটা গরম হয়ে আছে। কোথা থেকে একটা সন্দেহজনক হিস্ হিস্ শব্দ পাওয়া গেল। টর্চ ঘুরিয়ে আলো ফেলতেই বুঝে উঠতে দেরি হল না। বিড়ে পাকিয়ে ফণা তুলে বসে আছে

এক রাজকেউটে। এক লহমা আর অপেক্ষা না করে স্টিফেন সেই ফণার ওপর গুলি চালাল। অব্যর্থ নিশানা। লুটিয়ে পড়ল কেউটে সাপটা। গুলির শব্দে কেঁপে উঠল সুড়ঙ্গের দেওয়াল। আরেকটু দেরি করলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু ছোবল দেওয়ার জন্য বসেছিল।

টর্চের আলোয় সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়ে থাকা কতগুলো জিনিসও চোখে পড়ছে। মামুলি জিনিস সব। একটা সুতির চাদর, ডাঁটিভাঙা চশমা একটা, ছেঁড়া দলা-পাকানো কতগুলো কাগজ, একটি ফতুয়া, হাতির দাঁতের বাঁকানো লাঠি, নকল দাড়ি-গোঁফ, পুরোনো আমলের দোয়াত-কলম, একজোড়া শুঁড়তোলা নাগরা জুতো, শোলার টুপি, ৎ-র মতো দেখতে বাদামি রঙের ব্রায়ার পাইপ। এগুলো আসলে কারা ব্যবহার করত, ভাবছিল শৌনক। বিরূঢ়ক হঠাৎ কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমার কী মনে হচ্ছে, জানেন?'

শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'এটা আসলে একটা ইম্প্রেশন-টানেল!'

'মানে?'

'বাইরের বস্তুসমূহের সঙ্গে ইন্টারাকশনের ফলে মনে যে ছাপ পড়ে, তাকেই ইম্প্রেশন বলে।'

'জানি। তো?'

'এরকম জনহীন জায়গায় মানুষের ব্যবহৃত জিনিস অনেকদিন পড়ে থাকলে, সেই জিনিসগুলোর সঙ্গে কসমিক মাইন্ডেরও ইন্টারাকশন হতে পারে।'

'কসমিক মাইন্ড? ওরকম কিছু আছে নাকি?'

'ধরুন, আছে। ইয়ুং-এর কালেকটিভ আনকনশাস মনে নেই?'

'বেশ। তা না হয় রইল। তো, অনেকদিন ধরে জিনিসগুলোর সঙ্গে কসমিক মাইন্ডের ইন্টারাকশন হলে হবেটা কী?'

'ইম্প্রেশন তৈরি হবে। পুরোনো সেই সব জিনিসের ছাপ। এই সুড়ঙ্গটা সেই সব ছাপে ভরতি। এর কোনোকিছুই বাস্তব নয়। এটা আসলে একটা স্বপ্ন। আমরা ঢুকে পড়েছি।'

'যাঃ! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ইট-পাথরের তৈরি সুড়ঙ্গ! স্বপ্ন হবে কী করে? আপনি বেশি বেশি কল্পনা করছেন। তবে...'

'তবে?'

'এই টানেলটা আমার কাছে বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝামাঝি কিছু একটা মনে হচ্ছে। ওই দেখুন, দেওয়ালটা রিয়াল, কিন্তু তারই কাছে পড়ে থাকা ডাঁটিভাঙা চশমাটা কেমন যেন ছায়া-ছায়া; যেন স্মৃতি দিয়ে গড়া আনরিয়াল একটা চশমা।'

কথাগুলো সবই শুনতে পাচ্ছিল পেখম। শেষ কথাটা শুনে চশমাটা সে কুড়িয়ে নিতে গেল। অমনি আশ্চর্য, চশমাটা যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে আর নেই। কয়েক হাত দূরে সরে গেছে। আবার কয়েক হাত দূর থেকেই কুড়োতে গেল। এবার সরে গেল আরও কয়েক হাত। 'কী রে, বাবা! ভূতুড়ে চশমা নাকি?' পেখম বলল।

'ভূতুড়ে নয়,' উত্তর দিল বিরূঢ়ক, 'স্মৃতি। ইম্প্রেশন!'

'আশ্চর্য!' বলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল শৌনক।

স্টিফেন ঈষৎ ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, 'এ আর কতদূর যেতে হবে? হাউ ফার?'

শৌনক বলল, 'জানি না। এখন হাউ-হাউ করবেন না!'

'বাট আয়াম অলরেডি শর্ট অফ ব্রিদিং! এসব জায়গায় অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে। আপনি জানেন না, আর কতটা যেতে হবে?'

'বললাম তো, নো আইডিয়া। আপনি অক্সিজেন মাস্কের ব্যবস্থা নিয়ে নামতে পারতেন!'

'ড্যাম ইট!' স্টিফেন অসহিষ্ণুভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

বিরূঢ়ক এবার চাপা গলায় রীতিমতো ধমক দিয়ে স্টিফেনকে বলল, 'চেঁচামেচি বন্ধ করুন, স্টিফেন। এই সুড়ঙ্গ খুবই পুরোনো। বেশি শব্দ হলে ওপর থেকে পাথর খসে পড়তে পারে। তখন পাথর চাপা পড়ে সবাই মরব এখানে।'

'নো, আই কানট বিয়ার ইট এনি মোর!' প্রচণ্ড জোরে মেঝের ওপর জুতোশুদ্ধ পা দিয়ে লাথি মারল স্টিফেন। আর তখনই মেঝের পাথর না কী আলগা হয়ে হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়তে লাগল। পেখম কিছু বুঝবার আগেই দেখল, ওরা চারজন আরও নীচে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে ... বহু চেষ্টা করেও আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না। সবশুদ্ধ চারজন দলা পাকিয়ে একটা আনত তলের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগল ওরা। কোথায় যে যাচ্ছে, বোঝার উপায় নেই। শেষে কী যে হল, ঢালু একটা মেঝের ওপর কীসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়ে থামল!

মেঝের ওপর উঠে বসল ওরা চারজন। দেখল, অন্ধকারে স্তম্ভের মতন একটা পেডেস্টল জাতীয় কিছু দাঁড়িয়ে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে জিনিসটার ওপর টর্চের আলো ফেলল শৌনক। পেডেস্টলের মাথায় একটা কাঁচের বড়ো বাক্স। বাক্সের মধ্যে ওটা কী?

একটা মানুষের মাথার খুলি। কাচের বাক্স সমেত পেডেস্টলটা ধীর লয়ে অ্যান্টি-ক্লক-ওয়াইজ ঘুরছে। বাক্সের ওপর দিকটা খোলা। অর্থাৎ, চাইলে খুলিটাতে হাত দেওয়া যায় বা তুলে নেওয়া যায়। পেখম দেখল, করোটির গায়ে কপালের কাছে একটা ছ্যাঁদা। কপালে গুলি করলে ঠিক যেমন হয়। কী কারণে যেন পেখমের হঠাৎ মনে হল, মানুষের মাথার এই খুলিটা যেন কোনো একটা ভয়াবহ ঘটনার ফলাফল।

এর সঙ্গে যেন ভীষণ কোনো অপমানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

শৌনকের চোখে কৌতূহল, স্টিফেনের চোখে আতঙ্ক আর বিরূঢ়কের চোখে সুস্পষ্ট চিন্তার ছাপ। ধীরে ধীরে বলল বিরূঢ়ক, 'কালিয়ামপুড়ি রাধাকৃষ্ণ রাও-এর একটা কাজ আছে আন্থ্রোপোমেট্রিতে। মানুষের মাথার খুলির নানারকম মাপজোখ থেকে মানুষটা কবেকার, নারী না পুরুষ, কীভাবে মারা গেছে, কতদিন আগে মারা গেছে এমন অনেক কিছু বের করা যায়। দুপাশের দুটো রগের মধ্যেকার ডিসটান্সটা যদি বের করতে পারি...'

...বলতে বলতেই কাঁচের বাক্স থেকে করোটিটা তুলে নিতে গেল বিরূঢ়ক। শৌনক হাঁ হাঁ করে ওকে বারণ করছিল। কিন্তু ততক্ষণে বিরূঢ়ক স্কাল-টা হাতে তুলে নিয়েছে। এবং সেটা হাতে নেওয়া মাত্রই যে-চতুষ্কোণ স্ল্যাবটার ওপর ওরা চারজন দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা বিপজ্জনকভাবে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। পেখমের মনে হল, পেটটা খালি খালি হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা লিফট নামতে শুরু করলে যেমন হয়, ঠিক তেমনই। একদম লিফটেরই মতন পাথরের স্ল্যাবটা ওদের নিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে অন্ধকারে। ওরা পরস্পর এ ওকে জড়িয়ে ধরে আছে আতঙ্কে। মাথা ঘুরছে। স্মৃতি, স্বপ্ন, সত্তা, জাগর সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত। কোথায় তলিয়ে যাবে ওরা? এখনই কি বিভিন্ন দিকে ছিটকে পড়বে অতর্কিতে...?

কিন্তু, না। সেসব কিছুই হল না। উলম্বভাবে অবতরণশীল সেই পাথরের স্ল্যাব 'ঘটাং' শব্দ করে এসে নামল যেন একতলা নীচের একটা ঘরের মেঝের ওপর। চমকে উঠল ওরা চারজন।

এত আলো, এত আলো আসছে কোথা থেকে? এদিক-ওদিক তাকাতেই মেঝের ওপর গোলাকার একটা ফাঁকের ভেতর দিয়ে সেই আলো আসছে দেখা গেল। কেমন যেন ঘোরলাগা আভা একটা। সে যেন কোনো কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, স্মৃতি নয়, যেন আচ্ছন্ন অস্তিত্বের একটা দ্যোতনা।

মেঝের ওপর গুঁড়ি মেরে ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখল, গোলাকার ফাঁকটা যেন একটা স্কাইলাইট, মেঝের নীচে প্রকাণ্ড একটা ঘর। স্কাইলাইটটা সেই মাটির তলার ঘরটার ছাদেই লাগানো রয়েছে। ওরা চারজন সেই স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে ওপর থেকে নীচের ঘরটার দিকে তাকাতেই রীতিমতো অবাক হয়ে গেল।

মাটির তলার সেই ঘরটায় উজ্জ্বল বৃত্তাকার একটা টেবিল, যার পরিধিতে বহু লোক গোল হয়ে বসে আছে। কী আশ্চর্য। মাটির এত নীচে মানুষ এল কী করে? টেবিলটাও ভারি অদ্ভুত! যেন একটা দৈত্যাকার দেওয়ালঘড়ি দিয়ে টেবিলের আপার সারফেসটা তৈরি। সেই দানো-ঘড়ির দুটো বিশাল বড়ো বড়ো কাঁটা ঘুরছে। অথচ, ঘড়ির কাঁটা সাধারণত যেদিকে ঘোরে সেদিকে নয়, উলটোদিকে।

অ্যান্টি-ক্লক-ওয়াইজ। সেই টেবিল বা ঘড়ির ভেতর থেকেই উঠে আসছে সাদা আলোর তীব্র ঝলক।

বেশিরভাগ লোকই গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে। কেউ বৃদ্ধ, কেউ মাঝবয়সি, কেউ বা একেবারে তরুণ। মুখগুলো সেই টেবিলের আলোয় উদ্ভাসিত।

এদের থেকে একটু দূরেই একটা আশ্চর্য সবুজ আলোর ঘেরাটোপ। ঘেরাটোপের ভেতর একটা খাট। সেই খাটে বিছানার ওপর বালিশে মাথা রেখে যে-বাচ্চা ছেলেটি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে শৌনক আর পেখম চমকে উঠল একসঙ্গে। দালি! দালি এখানে এল কী করে?

পরম নিশ্চিন্ত ঘুম বোধহয় নয়, সম্ভবত খুব জ্বর দালির। বিছানায় দালির পাশে বসে ওর কপালে জলপটি দিচ্ছে একটি মেয়ে সযত্নে। একটা বাটির জলে সাদা কাপড়ের ন্যাকড়া ডুবিয়ে ভাঁজ করে বারবার কপালে বসিয়ে দিচ্ছে মেয়েটি।

একটু কান পেতে শুনতেই টেবিলের চারপাশে বসা নীচের লোকগুলোর কথা শোনা গেল। কয়েকজন খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছেন।

একজন বয়স্ক মানুষ গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'তাহলে, দীনেশ! তোমার ট্রেজার প্রোটেকটারের এই পরিণাম?'

উত্তরে এক যুবক বললেন, 'দোষটা কি শুধু একা আমারই, যতীশদা? আপনাদের নয়? স্বপ্ন কি শুধু আমি একাই দেখেছিলাম? আপনারা দেখেননি? এই ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা কেউ? এতটা স্বার্থপরতা, এতটা লোভ, এতটা সংকীর্ণ দলীয়তা, এতখানি করাপশন?'

আরেকজন বৃদ্ধ বললেন, 'তাতে আর সন্দেহ কী? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিস্টেমেটিকালি ইতিহাসের পাতা থেকে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র সংগ্রাম মুছে দেওয়া হল, তখনই জানতাম, আদর্শবাদের শেষ চিহ্নটুকু ভাবী প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের মন থেকে মুছে যাবে। কিন্তু আমাদেরই হাতে গড়া ট্রেজার প্রোটেকটার—তার যে এই অবস্থা হবে...উত্তেজনা আর অর্থের লোভে... ছি,ছি! কী হেমবাবু, কিছু বলুন!'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে গমগমে উচ্চারণে টেবলের এক কোণে বসে থাকা একজন বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, সুপতিবাবু! স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু... প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রক ভারতের ইতিহাস রচনার অফিশিয়াল বোর্ড বসাল... তার ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হল রমেশচন্দ্র মজুমদারকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে গিয়ে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে পদে পদে বিরোধ বাঁধল সরকারের। সিপাহি বিদ্রোহকে রমেশচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলে মানতে

পারলেন না, উনিশশো পাঁচের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন, বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে যথাযথ মর্যাদা দিতে চাইলেন, গান্ধী ও নেহরুর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাকে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তুলে আনতে চাইলেন। তখন আজাদ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনাকে এসব কে লিখতে বলেছে? আপনাকে তো অফিশিয়াল হিস্ট্রি লিখতে বলা হয়েছে। ফলাফল—ডিরেক্টরের পদ থেকে রমেশচন্দ্রের পদত্যাগ। হা হা হা। তাতে কী এল গেল? রমেশচন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়াই সেই বোর্ড ভেঙে দিয়ে গভর্নমেন্টের পেটোয়া লোক তারাচাঁদকে দিয়ে লেখানো হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—'অফিশিয়াল হিস্ট্রি'। সেই অফিশিয়াল হিস্ট্রি এত বছর ধরে পড়ে পড়ে স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীরা জানতে পারল, দেশের স্বাধীনতা শুধু কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলনের ফল। কেবল গান্ধী ও নেহরুর অবদান। অত বড়ো লিডার সুভাষচন্দ্র বসু—এক প্যারাতে তাঁকে খতম করে দেওয়া হল। 'মিসগাইডেড লিডার'! আর তোমরা—তুমি দীনেশ, তোমার সহযোগী বাদল আর বিনয়, মাস্টারদা, প্রীতি, উজ্জ্বলা, বীণা, তার আগে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, বাঘা যতীন, টেগরা, কানাই, সত্যেন, আর তোমার পরে এই যে তোমরা সব—বিমল, যতি, প্রদ্যোৎ, প্রভাংশু, অনাথ, মৃগেন কত কতজন—তোমরা সবাই... সবাই জাস্ট 'টেররিস্ট'! অ্যাঁ? তাই তো? চমৎকার!"

বৃদ্ধের গলা আবেগে বুজে এল। দীনেশ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, ওই অফিশিয়াল হিস্ট্রি পড়েই তো মূল্যবোধ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে আজ ভারতবর্ষের। টাকা, পোলিটিকাল পাওয়ার, দুর্নীতি, স্বার্থবোধ—এছাড়া এখন আর বেশিরভাগ লোক কিছুই বোঝে না। কত রঙের ঝান্ডা! কিন্তু সব ঝান্ডার নীচেই সেই এক খেলা।'

প্রথম বৃদ্ধের গলা থেকে আক্ষেপোক্তি ঝরে পড়ল, 'হে ভগবান! এই আমার দেশ! এই আমার স্বাধীনতা!'

এদিকে ওপরে স্কাইলাইটের কাছে বসে আছে ওরা চারজন। শৌনক সব কথা অবাক হয়ে শুনছে। বিরূঢ়কের চোখে প্রবল উৎকণ্ঠা জেগে উঠেছে। স্টিফেন চোখ কুঁচকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী যেন দেখছে নীচের মানুষগুলোকে। পেখম যেন কিছুটা বুঝতে পারছে, আবার অনেকটাই বুঝতে পারছে না। চোখ তুলে একবার শৌনকের দিকে তাকাল পেখম। দেখল, শৌনকের পুরু চশমা আর গাল বেয়ে অশ্রুজল নেমে এসেছে। বাবা এত কাঁদছে কেন?

হেম নামের সেই বুড়ো মানুষটি ভারী গলায় ধীরে ধীরে বললেন, 'এই মাটির নীচে আজ এত বছর চাপা পড়ে আছি। সেলুলার জেলে দ্বীপান্তরিত হয়েছিল যারা, ফাঁসিকাঠে যারা বলিদান দিয়েছিল, জেলে অমানবিক অত্যাচারে কিংবা নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠে সকলের অজ্ঞাতে আমরা যারা মারা গিয়েছি নিতান্ত অবজ্ঞায়, মৃত্যু

এসেও আমাদের জ্বালা জুড়োতে পারেনি। সত্যিকারের স্বাধীনতা আসার আগে আমাদের মুক্তি নেই এই মাটির তলা থেকে। কিন্তু আর কবে? আর কতদিন, দীনেশ?... আচ্ছা, আমাদের কথা যথাযথ ও অনুপুঙ্খভাবে লেখার জন্য যে সম্বিৎকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারই বা কী হল?'

গভীর আনুগত্যের সঙ্গে দীনেশ উত্তর দিলেন, "সম্বিৎ তার কথা রেখেছিল, হেমদা! প্রত্যেকটি ঘটনার অনুপুঙ্খ ইতিহাসই সে লিখেছিল। কিন্তু তার বই 'আগুনপাখির ডানা' সে যখন প্রকাশ করতে গেল, পাণ্ডুলিপি পড়ে ভয় পেয়ে গেল তার প্রকাশক। সম্বিতের লেখার যেটুকু অংশ শাসকদলের বিপক্ষে যায় না, সেটুকুই প্রকাশ করল তার প্রকাশক। আর পাণ্ডুলিপির যেসব অংশ সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক, সেসব ছেঁটে বাদ দিয়ে দিল। পাণ্ডুলিপির সেই বাতিল অংশটুকু অতঃপর ফিরে এল আমাদের এই মাটির তলার ঘরে। এই দেখুন..."

এই বলে দীনেশ টেবিলের এক পাশ থেকে হলুদ হয়ে যাওয়া কতগুলো পাতা আলোর সামনে তুলে ধরলেন। কাগজগুলো শুধু হলুদ নয়, ভঙ্গুরও বটে। কাগজের হলুদ চূর্ণ ছড়িয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। দীনেশ বললেন, 'কিন্তু তাতেও কি রক্ষা হল? তাতেও বিপত্তি...'

টেবলের অপরদিক থেকে লম্বা চেহারার একটি ছেলে এবার উশখুস করে বলে উঠলেন, 'কী বিপত্তি, দীনেশদা? এত বিপত্তি মাটির তলার ঘরে জমিয়ে রেখে কী লাভ? এগুলো সল্‌ভ করার জন্য আপনি আমাদের আজকাল আর অ্যাকশনের অর্ডার দিচ্ছেন না কেন? একবার অর্ডার দিন না, আমি আর যতিই হিসেব মিটিয়ে আসি! যতিকেও লাগবে না, আমি একাই যথেষ্ট। কয়েক মিনিটের ব্যাপার!'

দীনেশ বিষণ্ণ হাসলেন। তারপর বললেন, 'যেকোনো সমস্যাই রিভলভারের নিশানায় সল্‌ভ করা যায় না, বিমল! অন্তত এ সময়ে তো আর নয়ই। আগে তো তুমি টারগেট ফিক্স করতে পারতে। জেমস পেডি। এডোয়ার্ড ভিলিয়ার্স। তাই না? এখন তো টারগেটই ফিক্স করা যাচ্ছে না। গোটা সিস্টেমটাই করাপট, গোটা সিস্টেমটাই টারগেট। অ্যান্ড ইটস অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট টারগেট! ওপর থেকে গুলি চালিয়ে একে নিকেশ করা যাবে না, বিমল। এর ভেতরে গিয়ে এর পচনশীল মূলটা কেটে ফেলতে হবে। সেটা সময়সাপেক্ষ।'

বিমল বললেন, 'একটা বাতিল হয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি কী সমস্যা তৈরি করতে পারে? দীনেশদা, একটু স্পেসিফিকালি বলুন। ভেবে দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে টেবলের চারপাশ থেকে অন্য তরুণেরাও সোচ্চারে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যাপারটা কী বলুন তো, দীনেশদা!'

দীনেশ বললেন, 'বীণাকে জিজ্ঞেস করো। ও বলবে।'

সবুজ আলোর ঘেরাটোপের ভেতর যেখানে দালির কপালে জলপটি দিচ্ছিল মেয়েটি, সেইদিকে সবাই এবার উৎসুক চোখে তাকাল।

টানটান করে চুল বাঁধা, কালো পাড় সাদা শাড়ি পরনে, উজ্জ্বল চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা, সপ্রতিভ সুশ্রী মেয়েটি বলে উঠলেন, "ব্যাপার ওই সম্বিতের লেখা নিয়েই। সম্বিতের লেখা খুবই ফায়ারি মেটেরিয়াল। এবং তার আকর্ষণ সাংঘাতিক। অলমোস্ট আ হিপনোটিক স্পেল! যেটুকু মাটির ওপর প্রকাশ পেয়েছিল, সেই 'আগুনপাখির ডানা' বইটি, সেও হয়ে গেল বহু দিন, আজ তা প্রায় হারিয়েই গেছে বলা যায়। মেদিনীপুর কলেজের লাইব্রেরিতে একটা কপি টিকে ছিল কোনোমতে। সেই বই এক অধ্যাপকের হাত থেকে পেয়েছিল এই ছেলেটি—উদ্দালক বা দালি এর নাম। অত্যন্ত সেনসিটিভ ছেলে। বইটা পড়তে পড়তে ছেলেটি বইয়ের মধ্যে একপ্রকার ঢুকে পড়ে। আমাদের সেসব আগুনঝরা দিন মনশ্চক্ষে দেখতে পেতে থাকে ছেলেটি। এদিকে মাটির নীচের এই ঘরে রাখা সম্বিতের বইয়ের অপ্রকাশিত অংশ সবেগে টানতে থাকে ছেলেটিকে আর বইটির প্রকাশিত অংশটিকে। আর তার ফলেই জ্ঞান হারিয়ে এখানে এসে পড়েছে ও!"

'তাহলে কী হবে এখন? একে ফেরত দেওয়া যাবে কীভাবে?' হেমবাবু চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'চিন্তা করবেন না, হেমদা! জ্বরটা আছে যদিও, ধীরে ধীরে কমে আসছে,' বলতে বলতে জলপটি বদলে দিলেন বীণা, 'ঠিক হয়ে যাবে শিগগিরই। আর ফিরিয়ে দেওয়া... ফিরিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। ওর সূক্ষ্ম শরীরটাই শুধু এখানে, স্থূল দেহ শুয়ে আছে কলকাতারই কোনো হাসপাতালের বেডে। জ্বর ছেড়ে গেলে হুঁশ ফিরলে ও হাসপাতালের বিছানাতেই জেগে উঠবে। সে তো যাই হোক, হল... কিন্তু...'

বিমল অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কী?'

'এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি এবার প্রকাশ না করলেই নয়। তাতে অনেক বাধা আসবে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। আসলে দীনেশদাই ঠিক বলছেন...'

সুপতিবাবু বললেন, 'কী বলো তো?'

চশমাটা চোখের ওপর ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে বীণা উত্তর দিলেন, 'টারগেটটা এখন অনেক অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে গেছে, অনেক ছড়িয়ে গেছে। আগে কী ছিল? ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন মিটিং-এ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেছিলাম। ব্যর্থ হই। কিন্তু ব্যর্থ হলেও ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে একজন ছাত্রীর দ্বারা গভর্নরকে হত্যার চেষ্টা—এটাই তখন এমন একটা ঘটনা যে, বিপ্লবের আগুন উছলে উঠে সারা দেশের গায়ে লেগে গিয়েছিল। কিন্তু এখন? এখন তো আর সেরকম নয়। এখন চাই রুট অ্যান্ড ব্রাঞ্চ রিফর্ম। সিস্টেমটা একেবারে পচে গেছে,

সুপতিদা। এটার একেবারে মূল ধরে নাড়া দিতে হবে। তার জন্য প্রথমেই ইন্টেলেকচুয়াল ও কালচারাল রিফর্ম দরকার। মানুষের চেতনার আমূল পরিবর্তন দরকার। আর তার জন্য সম্বিতের বইয়ের মতো অনেক বই, অনেক লিটারেচার প্রকাশ পাওয়া অবশ্যই জরুরি।'

ঘরের এক কোণ থেকে এবার কথা কয়ে উঠল আরেকটি ছেলে। বয়সে সে এদের তুলনায় ছোটো, কিন্তু খুবই সপ্রতিভ তার চোখমুখ। এতক্ষণ সে সব কথা চুপ করে শুনছিল, কিছু বলেনি। এবার সে মুখ খুলল, 'আই বেগ টু ডিফার উইথ ইউ, বীণাদিদি! ইন্টেলেকচুয়াল ও কালচারাল, এমনকি স্পিরিচুয়াল প্লেনেও রেভোল্যুশন আনা যে এখন অত্যন্ত জরুরি, আমি তা স্বীকার করছি। কিন্তু ফিজিকাল প্লেনে যে দুরারোগ্য ঘা দেখা দিয়েছে, সেগুলোর অস্ত্রোপচার ছাড়া অন্য কোনো গতি আছে বলে আমি মনে করি না। তাই আর্মড রেভোল্যুশনের প্রয়োজন তখনও ছিল, এখনও আছে; অন্তত তার প্রয়োজন একালেও একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।'

কথাটা শেষ হতেই ঘরের মধ্যে অনেকেই ছেলেটির কথায় সায় দিতে লাগল। 'প্রদ্যোৎ ঠিকই বলছে', 'আমরা সহমত প্রদ্যোতের সঙ্গে', 'একদম ঠিক বলেছিস, প্রদ্যোৎ'—এরকম অনেক কথাই শোনা যেতে লাগল।

সেই সম্মিলিত গুঞ্জনের মধ্যে দীনেশ উঠে দাঁড়ালেন। দুই হাত দুপাশে ছড়িয়ে সবাইকে শান্ত করার চেষ্টায় তিনি বলে উঠলেন, 'চুপ করো, চুপ করো। শান্ত হও। দাদাদের সঙ্গে কথা বলতে দাও। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ! এ বিষয়টা নিয়ে না হয় আমরা আবার একদিন বসব, সেদিন প্রীতি, কল্পনা, উজ্জ্বলা ওরাও থাকবে। মাস্টারদাও আসবেন বলেছেন। আপাতত এই মুহূর্তের সমস্যায় ফেরা যাক।... এখন এই লোকগুলো তো এসে গেছে, যতীশদা! এদের নিয়ে কী করব?'

হেমবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এরা কারা?'

দীনেশ উত্তর দিলেন, 'চারজন মানুষ। একজন অধ্যাপক আর তার মেয়ে—এরা জাস্ট জড়িয়ে পড়েছে। তৃতীয় ব্যক্তিটি ভয়ানক বুদ্ধিমান লোক; ট্রেজার প্রোটেক্টারের চিফ সুশীতলকে সরিয়ে সে নিজেই মাথা হয়ে বসেছে।'

যতীশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? এই তৃতীয় ব্যক্তিটি কী চায়? ট্রেজার?'

দীনেশ বললেন, 'না, ট্রেজার নয়। উত্তেজনা!'

'মানে?'

'সে এক বিচিত্র আধুনিক মনোবিকার। লোকটার জীবন থেকে সব উত্তেজনা হারিয়ে গেছে। সে ভয় পেতে চায়। ভয় পাওয়াতে চায়। ভয়ের উত্তেজনা সে উপভোগ করতে চায়। টিপি-র চিফ হয়ে বসাও তার ওই কারণেই। হি ওয়ান্টস টু এনজয় ফিয়ার!'

বিমল বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের মুখে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই জন্মের মতো শখ মিটে যাবে। শখের ভয়! শখের উত্তেজনা! হেঃ!'

হেমবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আর চতুর্থ ব্যক্তি?'

'এই লোকটাকেই ঠিক চিনতে পারছি না, হেমদা! কোথায় যেন দেখেছি ওকে, মনে করতে পারছি না। তৃতীয় ব্যক্তিটি এখন এই চতুর্থ ব্যক্তিটির কবজায় পড়েছে। চতুর্থ ব্যক্তিটির নির্দেশেই সে সুড়ঙ্গে নামতে বাধ্য হয়েছে একরকম। এই চার নম্বর লোকটা আমেরিকান নাগরিক। তবে জন্মসূত্রে সে ইউরোপিয়ান হলেও অবাক হব না। অধ্যাপক আর তার মেয়ে—ওদের উদ্দেশ্য ইতিবাচক। কিন্তু এই চার নম্বর যে ঠিক কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে, বুঝতে পারছি না আমি।'

'কী নাম বলছে কী লোকটা?' বিমল জিজ্ঞেস করলেন।

'নাম বলছে, স্টিফেন!'

'স্টিফেন?... আচ্ছা! নেভার হার্ড অফ হিম। ... তা অ্যাদ্দুর এসে গেছে যখন, তাহলে পেডেস্টলের ওপর রাখা আমাদের সেই অপমানিত হওয়ার চিহ্ন?' যতীশ গুহ উদ্‌বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'সে জিনিস এখন ওদের হাতেই, যতীশদা!' দীনেশের গলা বেদনাদীর্ণ হয়ে উঠল।

'বলো কী, দীনেশ?' শিউরে উঠলেন হেমচন্দ্র ঘোষ, 'বিপ্লবযজ্ঞের আদি ঋত্বিকের করোটি এখন ওদের হাতে? এ তো ভালো কথা নয়। যাও, যাও, তুমি এখনই ব্যবস্থা নাও!'

'সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি, হেমদা! কী করা যায় এদের নিয়ে? তাছাড়াও আমাদের লুকোনো ট্রেজারস এদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করব?'

সহসা খুব শান্ত হয়ে গেলেন হেমচন্দ্র। সোজা হয়ে বসে বললেন, 'একথাও কি আমাকে বলে দিতে হবে, দীনেশ? সে তুমি ভালই জানো। কাদের হাতে কী তুলে দিতে হবে... কীভাবে কাকে পরীক্ষা করতে হবে... সেই পরীক্ষায় কে টিকবে... কে হারিয়ে যাবে... কে মিলিয়ে যাবে... সব তুমি জানো... কল দেম টু ইয়োর ফায়ারি টেস্ট অ্যান্ড ফাইন্ড দোজ হু সারভাইভ...'

তারপরই নীচের ঘরটার দেওয়াল থরথর করে কেঁপে উঠল সমবেত মানুষগুলির সমস্বরিত উচ্চারণে: 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই...'

তখনই নীচের ঘরে কী যেন বিস্ফোরিত হল। প্রচণ্ড শব্দ ও নীল ধোঁয়ার ভেতর টেবিলের চারিদিক থেকে সেই বিপ্লবী সদস্যবৃন্দ, সেই সবুজ আলোর ঘেরাটোপ, রোগশয্যায় শায়িত দালি, সেবারত বীণা দাস—সবাই এক লহমায় ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে গেলেন। শুধু একা দাঁড়িয়ে রইলেন দীনেশ গুপ্ত। তাঁর সামনে একটা লোহার বাক্স, আরও কীসব জিনিস টেবিলের ওপর রাখা।

হঠাৎ দীনেশ ওপরে স্কাইলাইটের দিকে তাকালেন। এখন দীনেশ গুপ্ত সোজা তাকিয়ে আছেন পেখম, শৌনক, বিরূঢ়ক আর স্টিফেনের দিকে।

কী এক রহস্যময় হাসি খেলে গেল দীনেশের চোখে। তিনি ওদের চারজনের উদ্দেশে ভাবাবিষ্ট স্বরে সম্মোহনের ভাষায় আদেশ দিলেন, 'স্ট্রেঞ্জারস! নাউ, দিস ইজ ইয়োর টার্ন! কাম, কাম টু মি...'

৩৩

কী এক রহস্যময় হাসি খেলে গেল দীনেশের চোখে। তিনি ওদের চারজনকে ডাকলেন, 'স্ট্রেঞ্জারস! নাউ, দিস ইজ ইয়োর টার্ন! কাম, কাম টু মি...'

পেখম অবাক হয়ে দেখল, স্কাইলাইট থেকে নীচে ঘরের মধ্যে তখনই একটা সিঁড়ি তৈরি হয়ে নেমে গেল! সোনালি আলো দিয়ে তৈরি সিঁড়ির ধাপগুলো। স্টিফেন আর বিরূঢ়ক সেই আলোর সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল প্রথমে ধীরে ধীরে। ব্যাপারটা এত অসম্ভব, অথচ চোখের সামনেই ঘটছে! শৌনক একটু ইতস্তত করে তারপর পেখমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়!'

শৌনক নামার পরেই পেখমও সেই আলোর সিঁড়িতে পা রাখল। সিঁড়ি ভাঙতে হল না। সিঁড়িটাই নিজে থেকে ওকে নিয়ে তরতর করে নীচের দিকে চলেছে। এসকালেটর বা চলমান সিঁড়ির মতন!

ওরা চারজন নীচের ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়াল। সামনে দীনেশ গুপ্ত। বছর কুড়ির যুবক। একমাথা এলোথেলো চুল। ধুতির ওপর একটা শার্ট আর চাদর, একটা হাত সেই কালো চাদরে ঢাকা। চোখে গোল ফ্রেমের পুরোনো দিনের চশমা। উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু। মোটা ঠোঁটের কোণে একটা আশ্চর্য কৌতুকের হাসি।

বিরূঢ়কের হাতের সেই নরকরোটিটার দিকে তাকিয়ে দীনেশ বললেন, 'যেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, সেটা কী, জানো?'

বিরূঢ়ক উত্তর দিল, 'জানি। কিছুটা অনুমান করতে পেরেছি। এটা এমন কারও স্কাল, যিনি পুরুষ। যিনি মারা গেছিলেন পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে মাথায় গুলি লাগার ফলে। মৃত্যুকালে বয়স কুড়ির কাছাকাছি। এর বেশি এখনই কিছু বলতে পারছি না। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

দীনেশ বললেন, 'বাহ্! এতকিছু জানতে পারলে আর করোটিটা কার, তা জানতে পারলে না?'

বিরূঢ়ক উত্তর দিল, 'নাহ্, পারলাম না। এই করোটি পরীক্ষা করে সেটা জানা একরকম অসম্ভব। কার এটা?'

কথাটা শুনেই নিজের ভেতরে যেন অনেক গভীরে তলিয়ে গেলেন দীনেশ। পরে

ধীরে ধীরে বললেন, 'উনিশশো আট সাল তখন। আমার জন্মেরও আগের ঘটনা। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য মজঃফরপুরে পাঠানো হল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে। তাঁদের বোমার আঘাতে কিংসফোর্ড নন, মারা গেলেন মিসেস কেনেডি ও তাঁর মেয়ে গ্রেস। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন ওয়াইনি স্টেশনে। আর প্রফুল্ল উঠে বসলেন হাওড়াগামী ট্রেনে। মোকামাঘাট স্টেশনে নন্দলাল ব্যানার্জী নামের এক দারোগা প্রফুল্লকে সন্দেহ করল এবং পুরস্কারের লোভে তাঁকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে গেল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হল প্রফুল্লর এবং অন্তিম মুহূর্তে তিনি নিজের মাথা লক্ষ করে গুলি চালিয়ে আত্মাহুতি দিলেন নাকি পুলিশ-এনকাউন্টারে পুলিশের গুলি খেয়ে তাঁর মৃত্যু হল, সঠিক জানা গেল না।'

নিজের অজান্তেই বিরাঢ়ক বলে ওঠে, 'তারপর?'

'তারপরই তো নাটক। প্রফুল্ল চাকীকে শনাক্ত করার জন্য তাঁর মাথাটা ধড় থেকে কেটে স্পিরিটে চুবিয়ে পুলিশ কলকাতায় পাঠায়। সেই ছিন্ন শির পাঠানো হয় পূর্ববঙ্গে বগুড়ায় প্রফুল্লর মা-বাবার কাছে। এই কি আপনাদের ছেলে প্রফুল্ল? বলুন, বলুন!...' গভীর শ্বাস ফেলতে ফেলতে দীনেশ উত্তেজিত হয়ে বলে চলেন, 'শুনেছ কখনও তোমরা কোনো দেশের পুলিশ এই নারকীয় পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির আইডেন্টিফিকেশন করে থাকে?'

শৌনক বলে ফেলে, 'একটা ফোটোগ্রাফই তো যথেষ্ট ছিল। এভাবে আইডেন্টিফিকেশন করা হয় নাকি?'

'করা হয়, যখন মৃত ব্যক্তির প্রতি ন্যূনতম সম্মান দেখানোর প্রয়োজন বোধ করে না শাসকদল। করা হয়, যখন দেশের প্রতিটি মানুষই তাদের চোখে পশুর থেকেও হেয় হয়ে ওঠে।... কিন্তু সেখানেই নাটকের শেষ হল না। প্রফুল্ল চাকীর ধড়টা শেয়াল-কুকুরের খাদ্য হয়ে গেল। আর মাথাটা লর্ড সিনহা রোডে পুলিশের আই বি অফিসের বাগানে পুঁতে রাখা হল কিছুদিন। তারপর আবার পুলিশি খেয়ালে মাটি খুবলে মাথা তুলে নিয়ে এসে লালবাজারে ক্রিমিনাল রেকর্ড রুমে সাজিয়ে রাখা হল!'

পেখম আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'ওহ্! এই অপমানের বদলা নেননি আপনারা?'

'তা নেওয়া হয়েছিল বই-কি। বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল ব্যানার্জীকে খতম করেন শ্রীশচন্দ্র পাল ও রণেন গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু ক্রিমিনাল রেকর্ড-রুমের ওই অপমানের চিহ্নটি? তার কী হল? বহু বছর পর... আমারও আহুতি তখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে... শরৎচন্দ্র বসুর পীড়াপীড়িতে জাস্টিস নগেন্দ্রনারায়ণ সরকারের সহায়তায় পুলিশের সেই রেকর্ড-রুম থেকে গোপনে বের করে আনা হল প্রফুল্ল চাকীর ছিন্ন শির। ভোর রাত্রে বোরখাপরা মুসলমান রমণী সেজে ট্রেজার প্রোটেকটার চিফ সুবিমলবাবু

নগেন্দ্রনারায়ণ সরকারের বাড়ি থেকে কালো একটা বাক্সে করে প্রফুল্ল চাকীর করোটি নিয়ে এলেন এখানে... মাটির নীচের এই ঘরে... তোমার হাতে এখন সেটিই। এ আমাদের চরম অপমানের চিহ্ন। আমাদের অবমানিত ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ। সসম্মানে একে সমাহিত করার আগে আমাদের শান্তি নেই।'

কিছুক্ষণ দীনেশের মুখে আর কোনো কথা নেই। সকলেই চুপ করে আছে। তারপর হঠাৎ ঘোর ভেঙে যেন জেগে উঠলেন দীনেশ। তাঁর ঠোঁটে আবার সেই কৌতুকের হাসিটা ফুটে উঠল। সোজা স্টিফেনের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তো ট্রেজার চাও, তাই না?'

স্টিফেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'শিওর! তা না হলে এই ডেঞ্জারাস টানেলের মধ্যে ডেথ-রিস্ক নিয়ে নামব কী করতে?'

দীনেশ বললেন, 'রাইট!' তারপর ওদের চারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তামগ্ন স্বরে বললেন, 'কিন্তু জিনিস তো তিনটে। আর তোমরা চারজন লোক। ভাগ করব কীভাবে?'

স্টিফেন প্রশ্ন করল, 'কী কী জিনিস?'

টেবিলের ওপর থেকে হলুদ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কাগজের তাড়া তুলে নিয়ে দীনেশ বললেন, 'এটা একটা বইয়ের অপ্রকাশিত অংশ। লিখেছিলেন আমাদের এক বন্ধু সম্বিৎ। বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য, বহু অস্বস্তিকর ঘটনা, বিপ্লব আন্দোলনের বহু অনাবিষ্কৃত ইতিহাস।' তারপর সেই কাগজের স্তূপ থেকে টেনে বের করে আনলেন একটা আগ্নেয়াস্ত্র। বললেন, 'এটা বিপ্লবী দলকে উপহার দেওয়া আমার প্রিয় থ্রি এইটটি বোরের ওয়েবলি রিভলভার। এটা দিয়েই বিপ্লবীরা অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট পেডি, ডগলাস, বার্জকে খতম করেছিল।'

পুরোনো কাগজগুলোর দিকে তাচ্ছিল্য সহকারে তাকিয়ে ছিল স্টিফেন। তারপর রিভলভারটা দেখামাত্রই যেন একটা ভীষণ ক্রোধের ভাব জেগে উঠল তার মুখে। স্টিফেনের এই ভাবান্তর পেখম লক্ষ করছিল। কিন্তু লোকটার এমন ভাবসাবের কারণ কী, বুঝতে পারছিল না।

এবার লোহার বাক্সটা খুললেন দীনেশ। বাক্সটা কাত করে দেখালেন ওদের। পুরোনো দিনের অনেক বহুমূল্য গয়না—জড়োয়ার ঝুমকো, নেকলেস, সোনার তৈরি ঘড়ির চেন, টায়রা, কানপাশা, অনন্ত, বাউটি—সব আলো ঠিকরে ঝক্‌মক্ করে উঠল।

দীনেশ আবার বললেন, 'পেপারস... রিভলভার... গোল্ড! কিন্তু তোমরা তো চারজন। ভাগ হবে কীভাবে?'

স্টিফেন উত্তর দিল, 'সিম্পল! পেপারস আর রিভলভারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। অর্নামেন্টসগুলো আমার। আমি ওগুলো নিচ্ছি। দ্যাটস কুল।'

দীনেশ বললেন, 'মানে? ওগুলো তোমার? কীভাবে হয়?'

'বিকজ আয়াম দেয়ার ট্রু ইনহেরিটার। আমিই ওগুলোর যোগ্য হকদার,' স্টিফেন জবাব দিল।

এবার যেন দীনেশ গুপ্তকেও কিছুটা বিচলিত দেখাল। তিনি স্টিফেনের কথা কিছুই বুঝতে পারছেন না। সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ভুরু কুঁচকে তিনি চেয়ে রইলেন স্টিফেনের দিকে।

পেখম দেখল, স্টিফেনের সারা মুখটা যেন শয়তানের পিচ্ছিল হাসিতে ভরে গেছে। এ মুহূর্তে তাকে মোটেই আর নির্বোধ বলে মনে হচ্ছে না। চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল স্টিফেন, 'এই অর্নামেন্টসগুলো কাদের?'

'দিজ আর প্রপার্টিজ অফ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স,' দীনেশ বললেন।

ক্রূর লোভার্ত দৃষ্টি মেলে হিসহিস করে বলে উঠল স্টিফেন, 'বিভি-র বিপ্লবীরা নিশ্চয়ই এই গয়নাগুলো পরে বসে থাকত না। এগুলো কেউ তাদের ডোনেট করেছিল। কারা তারা?'

'সেই কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই,' বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন দীনেশ।

'কৈফিয়ত না দিলে কীভাবে বুঝিয়ে বলব কেন আমিই এগুলোর একমাত্র হকদার?' গলা চড়াল স্টিফেন।

'এগুলো আমাদের বোনেদের দেওয়া। তাদেরই অনুদান,' দীনেশ শান্ত স্বরে বললেন।

অশ্লীল ভঙ্গিতে হেসে উঠে স্টিফেন বলল, 'বোন? সিস্টারস? ইয়োর সিস্টারস লিভড ইন দ্য ব্রথেল? ওই বেশ্যাগুলো তোমাদের বোন ছিল?'

এবার সজোরে ধমক দিয়ে উঠল বিরূঢ়ক, 'স্টি-ফে-ন! মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ!'

দীনেশ কিন্তু শান্ত ভঙ্গিতে বিরূঢ়ককে থামালেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ। তারা আমার বোন। সতী স্ত্রীলোকেরা যতটা আমার বোন, ওই অভাগী মেয়েগুলোও ঠিক ততটাই আমার বোন। তারা তাদের স্বোপার্জিত গয়না, টাকা—সবই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিল নিঃশর্তে। আমাদের আন্দোলনের কাজে লাগবে বলে।'

শৌনক বলল, 'ইয়েস। হোয়াট রাইট ডু ইউ হ্যাভ, স্টিফেন, টু ইনসাল্ট দেম? এ তাঁদের পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত গয়না। আপনি কোনোমতেই তাঁদের অপমান করতে পারেন না।'

স্টিফেন সেই একইভাবে হেসে উঠে বলল, 'পাবলিক হোর! প্রসটিটিউটস! তাদের আবার সম্মান?'

অসভ্য লোকটার গালে এবার ঠাটিয়ে একটা চড় কষাবার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছিল পেখম। কিন্তু তার আগেই দীনেশ বললেন, 'মিস্টার স্টিফেন! ইউ প্রুভ ইয়োর ডার্টি কালচার। ওয়েল, আই হ্যাভ নো টাইম টু ওয়েস্ট উইথ ইউ...'

দীনেশকে কথা শেষ করতে না দিয়েই স্টিফেন বলে উঠল, 'কোথেকে পেত এই মেয়েগুলো এত গয়না? কারা দিত?... আমি বলছি, কারা দিত। এই ব্রথেলগুলোয় যাতায়াত করত ইউরোপিয়ান সিভিলিয়ানরা। সুজাগঞ্জ এলাকায় ছিল সেই ব্রথেল। এই বেশ্যাগুলো ছিল সেই সব সাহেবদের কঙ্কুবাইন্স! ছলাকলায় মন ভুলিয়ে একদিকে তারা যেমন এইসব প্রেজেন্ট আদায় করত, তেমনই আবার দুর্বল মুহূর্তে সাহেবগুলোর পেট থেকে সমস্ত ইনফরমেশন বের করে আনত এই বারবনিতারা। আর সেসব তথ্য তুলে দিত আপনাদের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের টেররিস্টদের হাতে। আই নো দ্যাট অল!'

উত্তেজিত কণ্ঠে দীনেশ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিকই তো! সেটা তো একটা বিরাট আত্মদানের ইতিহাস! দেশকে কতখানি ভালোবাসলে নিজেদের শরীর বেচে ব্রিটিশ সরকারের গোপন তথ্য সংগ্রহ করে এনে বিপ্লবী ভাইদের হাতে তুলে দিতে পারে মানুষ? সতী স্ত্রীলোকের থেকেও পবিত্র আমার এই বোনেরা, ইভন পিওরার দ্যান ফায়ার! এমনকি তাদের কষ্টের উপার্জন এই গয়নাগুলোও তারা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিল নিঃশর্তে।'

'কথাটা স্বীকার করলেন তাহলে?' ধূর্ত হেসে বলল স্টিফেন, 'দ্যাটস হোয়াই আয়াম টেলিং ইউ সো লং যে, এই গয়নাগুলোর এখন আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী— দ্য অনলি টু এয়ার!'

'কী বলছেন কী পাগলের মতো তখন থেকে?' বিরূঢ়ক ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'ঠিকই বলছি,' জ্বলন্ত চোখে উত্তর দিল স্টিফেন, 'আমিই এই জুয়েলারির একমাত্র হকদার, কারণ এগুলো যারা প্রসটিটিউটদের প্রেজেন্ট করেছিল, তাদেরই একজনের নীল রক্ত আমার শিরায় ধমনীতে বইছে। ইয়েস, ঠিকই শুনেছেন। মাই ম্যাটারনাল গ্র্যান্ড ফাদার ওয়াজ বার্নার্ড এডওয়ার্ড জন বার্জ—ববি!'

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় কেউ এর থেকে বেশি চমকে উঠত না। কারও মুখে কোনো কথা নেই; সকলেই বিস্ময়বিমূঢ়, শুধু দীনেশ গুপ্তের চোখে এবার বিস্ময়ের পরিবর্তে জ্বলে উঠেছে সংশুদ্ধ ক্রোধের বহ্নিজ্বালা।

ঘরভরা সেই নৈঃশব্দ্য ভেঙে স্টিফেন বলে চলে, 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেম্বাররা যখন আমার গ্র্যান্ড-পা বার্জকে গুলি করে মেরে ফেলে, তখন বার্জের একমাত্র সন্তান, আমার মা ডরোথি সবেমাত্র পাঁচ বছরের শিশু। সেই ফাইভ-ইয়ারস-বেবি ডরোথিকে নিয়ে আমার গ্র্যান্ড-মা বারবারা বার্জ ফিরে যান ইংল্যান্ডে—নর্থ ইয়র্কশায়ারের অ্যাম্পলফোর্থ গ্রামে। অ্যাম্পলফোর্থ ইজ মাই অ্যানসেস্ট্রাল হোম। আর সেখানেই আমার গ্র্যানি আমার মাকে বড়ো করে তোলেন। এদের এই বিভি-র চারজন মেম্বার শৈলেশ ঘোষ, অমূল্য ডাট, মণীন্দ্র চাউড্রি আর সনাটন বেরা এদের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, রাজসাক্ষী হয়। পুলিশকে তারা সব কিছু বলে দেয়। তাদের

সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই এক এক করে বিভি-র সকলে ধরা পড়ে। রামকৃষ্ণ, ব্রজকিশোর আর নির্মলজীবনের ফাঁসি হয়। শৈলেশ, অমূল্য আর মণীন্দ্র সেই সঙ্গে পুলিশকে এও বলেছিল, ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের দেওয়া অর্নামেন্টসগুলো তাদের কঙ্কুবাইনরা বিভি-কে ডোনেট করেছে। সেই বিপুল ধনসম্পদ মেদিনীপুরেই মাটির নীচে কোনো ঘরে লুকোনো আছে। কিন্তু কোথায় আছে, সেটা ওই রাজসাক্ষীরা বলতে পারেনি। আমি ছোটোবেলা থেকে আমার গ্র্যানি আর আমার মম্মির মুখে এই গল্পটা শুনে শুনে বড়ো হয়েছি। পরে আমি যখন স্টেটসে যাই পড়তে... আই হ্যাড আ ভেরি বিজি অ্যান্ড কালারফুল লাইফ... আমি ভেবেছিলাম, দিজ আর অল ফেক স্টোরিজ। কিন্তু এবার যখন জানলাম, সেসবের খোঁজ চলছে... তখন আমিই এসেছি এখানে... ব্রিটিশ অফিসারদের রত্নভাণ্ডারের একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী আমিই... বোঝাতে পারলাম, হোয়াই আয়াম দ্য অনলি লিভিং ট্রু ইনহেরিটার অফ দিজ প্রপার্টি? আমি এখন এগুলো নিয়ে চলে যাব, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না...নো ডার্টি নিগার ক্যান হোল্ড মি ব্যাক!'

শৌনক বলল, 'কিন্তু মিস্টার স্টিফেন! গয়নাগুলো তো সাহেবরা ওই মেয়েদের এমনি এমনি দেয়নি। দে অ্যাকচুয়ালি আর্নড দিজ... ওই মেয়েদের নিজস্ব উপার্জন এগুলো... তাহলে এগুলো আর সাহেবদের প্রপার্টি থাকছে কী করে?... তাছাড়া দেশ স্বাধীন হয়েছে, এ দেশের কোনোকিছুর ওপরেই এখন আর আপনারা দাবি করতে পারেন না... আপনার গ্র্যান্ড-পা বার্জ সাহেব একাই তো আর এগুলো... মানে অন্য সাহেবরাও তো... হাউ ক্যান ইউ বি সো শিওর...?'

স্টিফেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ডোন্ট প্লিড উইথ মি, বাবু! আই হ্যাভ সাফিসিয়েন্টলি এক্সপ্লেইনড মাই পজিশন। এনাফ ইজ এনাফ! নাউ...'

ত্বরিত গতিতে শৌনকের দিকে রুজার রেডহক রিভলভার বের করে তাক করল স্টিফেন। বলে উঠল 'আমি একটিও সাক্ষী রেখে যাব না এই ঘরে, আই শ্যাল কিল ইউ ওয়ান বাই ওয়ান লাইক স্ট্রিট ডগস!'

প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে পেখম শৌনককে আড়াল করে দাঁড়াল। স্টিফেন এতটা দূরে দাঁড়িয়ে পজিশন নিয়েছে যে, এখান থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়েও পড়তে পারবে না পেখম এ মুহূর্তে।

'ওহ্, দেন আয়াম সরি টু এলিমিনেট ইউ ফার্স্ট, প্রেটি লিটল ক্রিয়েচার!' রিভলভারটা এখন সোজা পেখমের দিকে তাক করে আছে।

'নো, ইউ কান্ট ডু দিস! স্টপ! স্টপ ইট!' বলে স্টিফেন আর পেখমের মাঝে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল বিরূঢ়ক। সে স্টিফেনকে নিরস্ত্র করতে চাইল।

প্রচণ্ড গুলির শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল ঘর। তারপর আবার পরপর দুবার

গুলির শব্দ। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল পেখম। মনে হল, রিভলভারের গুলি তার পেটে এসে লেগেছে। সে পেছনদিকে তার বাবার গায়ের ওপর উলটে পড়ল।

কেমন পালকের মতো হালকা হয়ে গেছে তার শরীর। সে যেন বাতাসের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে কোথাও... পায়ের পাতায় ঠান্ডা জলের স্পর্শ... এই তাহলে মৃত্যু?

কিন্তু মৃত্যুতে কি তাহলে কোনো ব্যথাবেদনা হয় না? এমন শান্ত সমর্পণ? তাও গুলি খেয়ে? কেমন যেন সন্দেহ হল পেখমের।

সে চোখ খুলল। আর তখনই যা দেখল, তাতে সে একেবারে অবাক হয়ে গেল। সে বেঁচে আছে... ঘরের মধ্যে থই থই করছে জল... আর ভিজে মেঝের ওপর একপাশে ভীষণ আহত হয়ে পড়ে আছে বিরূঢ়ক। স্টিফেনের গুলি বিরূঢ়কের বাঁ কাঁধে এসে লেগেছে। অনর্গল রক্ত বেরোচ্ছে তার কাঁধ থেকে। আর ঘরের অন্য কোণে সম্পূর্ণ রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে স্টিফেন।

পেখম ভাবল, বিরূঢ়কের সঙ্গে তো কোনো রিভলভার ছিল না। তাহলে স্টিফেনকে গুলি করে মারল কে?

এদিকে গুলি চালানোর ভীষণ আওয়াজে বিরূঢ়ক যেখানটায় পড়ে আছে, সেইদিককার মেঝের পাথর আলগা হয়ে পাতাল থেকে উঠে আসছে জল। সেই জল ক্রমশ বাড়ছে। পাতালের নীচে এই জলের মধ্যে এত স্রোত? কংসাবতী কি তবে এখানে অন্তঃস্রোতা? আন্ডারকারেন্ট ফ্লো আছে এইখানে?

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না পেখম। তার আগেই ঘরের মধ্যে দুর্নিবার নদীস্রোত পাক খেয়ে ঢুকে পড়ে বিরূঢ়কের আহত শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল পাতালগর্ভে। প্রফুল্ল চাকীর করোটিটাও গিয়ে পড়ল জলের মধ্যে। বিরূঢ়ক দেখল, সে এই ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল সে একবার। পেখম আর শৌনক ওকে স্রোত থেকে টেনে তুলবার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু হায়! তার আগেই জলস্রোত তাকে অনেক গভীরে টেনে নিয়ে গেছে।

এমন সংকটের মধ্যেও একবার হাসল বিরূঢ়ক। ভয়ের উত্তেজনায় নয়, তার সর্বাঙ্গে জীবনে এই প্রথম অবিমিশ্র আনন্দের শিহরন অনুভব করল সে। কাউকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে বিপন্ন করায় যে এত সুখ, এর আগে সে কখনও অনুভব করেনি!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই উচ্ছলিত স্রোতে অতল কূপের ভেতর চিহ্নহীনভাবে ডুবে গেল বিরূঢ়ক। সেই করোটিটাও আর নেই। বিরূঢ়কের সঙ্গেই ডুবে গেছে। ঘরের মধ্যে এখন আরও প্রবল বেগে উঠে আসছে বাঁধভাঙা জলস্রোত।

সেই জল পেরিয়ে এবার দীনেশ এগিয়ে গেলেন যেখানে স্টিফেনের শরীর কাঠ হয়ে পড়ে আছে, সেইখানে। হাতে তাঁর সেই পুরোনো থ্রি এইটটি বোরের ওয়েবলি রিভলভারটা ঝলসাচ্ছে। স্টিফেনের রক্তাপ্লুত শরীরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে হাসতে

হাসতে দীনেশ বললেন, 'বাহ্! আমার নিশানা—প্র্যাকটিসের অভাবে তাহলে এখনও একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। একটা মাথায় গিয়ে বিঁধেছে, আরেকটা বুকে। ... বার্জ সাহেবের নাতির মৃত্যু তাহলে আমার হাতেই ছিল।'

তারপরই পুরুষশার্দুলের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে জলদ্‌গম্ভীর গলায় শৌনককে বললেন দীনেশ, 'আর তোমরা? তোমাদের সঙ্গে তো এখনও ফয়সালা হল না। তোমরা কী চাও?'

শৌনক উত্তর দিল, 'কিছু না। ওই পুরোনো হলদে কাগজগুলো যদি পাই...'

'কী করবে?'

"প্রথমে 'আগুনপাখির ডানা' বইটির প্রকাশিত অংশের সঙ্গে এই অপ্রকাশিত অংশটি জুড়ে কোনো কিছু এডিট না করে পাবলিশ করব। তারপর আপনাদের কথা—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস লিখব।"

'আর গয়নাগুলো?'

'ওগুলো যাঁদের শ্রদ্ধার দান, তাঁদের আমি প্রণাম জানাই। কিন্তু আমাদের কাছে এইসব অমূল্য তথ্যে ভরা পুরোনো কাগজগুলোর মূল্যই সর্বাধিক। গয়না আমরা চাই না।'

'কিন্তু মাটির নীচে এই গয়নাগুলো ফেলে রাখাও তো বিপজ্জনক। আরও কত লোভী লোক হাত বাড়াবে এগুলোর দিকে। তাছাড়া আরেকটু পরেই এ ঘর জলমগ্ন হয়ে যাবে। শোনো! তোমার বন্ধু প্রতুল শুধু তোমাদের বাঁচানোর জন্য আজ স্টিফেনের লোকজনের হাতে প্রাণ বিপন্ন করে এই মল্লিকবাড়িতে ঢুকেছে। আমাদের বিপ্লবী দলের অশরীরী সদস্যরা আজ সন্ধ্যায় তাকে মল্লিকবাড়িতে ঢুকবার ইঙ্গিত দেয়। প্রতুল এখনই আসবে। আর আমাদের টিপি-র একজন সদস্য সাহিল আল ফরাজি নিজেকে বিপন্ন করেছে ট্রেজার প্রোটেক্ট করতে গিয়ে। এই গয়নাগুলো প্রতুল আর সাহিলের হাত দিয়ে তুমি সরকারি দপ্তরে জমা করে দিও। বোলো, বিপ্লবীদের গচ্ছিত ধনরত্ন তোমরা খুঁজে পেয়েছ এই মল্লিক-বাড়ির নীচে। এই অনুসন্ধানের স্বীকৃতি হিসেবে যে পুরস্কার মিলবে, তোমরা চারজনে তা ভাগ করে নিও।'

শৌনক বলল, 'পুরস্কার আমার বা আমার মেয়ে পেখমের চাই না। প্রতুল আর সাহিলই ওই স্বীকৃতি নেবে। ইতিহাসের গন্ধভরা এই কাগজগুলোই আমাদের কাছে সারা জীবনের সেরা পুরস্কার।'

দীনেশ গুপ্ত একটু হাসলেন। তারপর পেখমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু নতুন যুগের একজন তরুণীকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে তো কিছু পুরস্কার দিতেই হয়। বলো, কোন রিভলভারটা নেবে তুমি? স্টিফেনের ঝাঁ-চকচকে রুজার রেডহক রিভলভার, নাকি আমার পুরোনো বুড়ো হয়ে যাওয়া থ্রি এইটটি বোর ওয়েবলি?'

গরগর করে যেন একটা আনন্দের উষ্ণ স্রোত পেখমের পা থেকে মাথা অবধি ছেয়ে গেল। সে বলল, 'আপনার রিভলভারের সঙ্গে কি জগতের অন্য কোনো কিছুর তুলনা হয়? আমি আপনার রিভলভারটাই নেব।'

দীনেশ হাসতে হাসতে পেখমের হাতে তাঁর নিজের রিভলভারটা তুলে দিয়ে বললেন, 'নাও, শক্ত করে ধরো। দ্যাখো তো, কী সুন্দর মানিয়েছে রিভলভারটা তোমার চওড়া রিস্টের সঙ্গে!'

সত্যিই পেখমের হাতে ঝকমক করছিল মহার্ঘ আগ্নেয়াস্ত্রটি। দীনেশ বললেন, 'এটার উপযুক্ত ব্যবহার কোরো। এ দেশের নিরাপত্তা যারা বিঘ্নিত করে, বিশেষত এ দেশের মেয়েদের সম্মান নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তাদের মোকাবিলা করার জন্যই এটা তোমাকে আমি দিলাম। তোমার সাহসের পুরস্কার। এখনও গুলি ভরা আছে এর চেম্বারে। ওপরে তাকাও।'

পেখম ওপরে তাকাল। সেই স্কাইলাইটটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার জায়গায় একটা পাথরের তৈরি কচ্ছপের মূর্তি ছাদ থেকে ঝুলে আছে।

'দেখি, তোমার হাতের টারগেট কেমন? কচ্ছপটার শুঁড়ে হিট করতে হবে। এটা ট্রিগার... এখানে চাপ দিলেই...'

পেখম লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানল। দ-ন-ন-ন ভীষণ একটা শব্দ করে পাথরের তৈরি কচ্ছপটা মাটিতে খসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তেই শৌনক, পেখম অবাক হয়ে দেখল, ঘরের মধ্যে দীনেশ নেই। অন্তর্হিত হয়ে গেছেন। শুধু টেবিলের ওপর পড়ে আছে গহনাভরা লোহার বাক্সটা আর হলুদ কাগজের পুরোনো নথি। মাথার ওপর ছাদের অনেকটা ধ্বসে গেছে। এদিকে মেঝে ফুঁড়ে এবার আরও দুঃসহ বেগে জল ঢুকছে ঘরের মধ্যে...

বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল পেখম, সে একটা পুরোনো আমলের রিভলভার তার শিথিল হয়ে যাওয়া হাতের মুঠিতে ধরে আছে। কী যেন ভেবে রিভলভারটা সে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল আচ্ছন্নের মতো। মনে হল, চোখের পাতা তার কেমন যেন ভিজে আছে জলে। বাঁ হাতের চেটোতে চোখ মুছে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিয়ে সে তাকাল শৌনকের দিকে। দেখল, তার বাবাও কেমন তারই দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রয়েছে! কী একটা ঘোর... একটা আশ্চর্য মন্ময় চেতনার বিপন্নতা থেকে উঠে এসে যেন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তারা... এক মহানাটকের অন্তিম গর্ভাঙ্ক যেন আচমকাই থেমে গেছে এই ঘরের মধ্যে তার দর্শকদের অপ্রস্তুত দশায় ফেলে রেখে...

কিন্তু সেই ঘোর বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। একটু পরেই ছাদের সেই ব্যবধানের মধ্য দিয়ে প্রতুলের গলা পাওয়া গেল, 'কী করছিস কী এখানে তোরা? এঃ, অ্যাতো জল! কীভাবে উঠে আসবি? দড়ি ফেললে দড়ি ধরে উঠে আসতে পারবি?'

প্রথমে পেখম, পরে শৌনক সেই দড়ি ধরে অলংকারের বাক্স ও নথিপত্র সমেত উঠে এল মল্লিকবাড়ির দুর্গাদালানের ওপর। তাদের দুজনের চোখে যেন তখনও জড়িয়ে আছে অসমাপ্ত স্বপ্নের শিশির।

ভোরবেলার সেই আবছা কুয়াশামাখানো আলোয় পেখমকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল প্রতুল। অনেক অনেকদিন আগের একটা কথা মনে এল তার। অলিগঞ্জ ইস্কুলের কাছে 'টুকিটাকি' বলে একটা খেলনার দোকানে সে আর বুলি দেখেছিল একখানা ছবি। মাথায় একটা হালকা নীল রঙের স্কার্ফ জড়ানো একটি করুণ মুখের মেয়ের ছবি ছিল সেটা। ছবির মেয়েটির কানে একটা মুক্তোর দুল।

প্রতুল বলেছিল, 'কী সুন্দর মেয়েটা দেখেছিস, বুলি?'

বুলি বলেছিল, 'ওরকম মুক্তোর দুল পরলে আমাকেও অমন দেখাবে!'

তার কিছুদিন পরই বুলিকে অমনই একজোড়া মুক্তোর দুল উপহার দিয়েছিল প্রতুল। সেই দুলজোড়া পেখমের কানে চলে এল কীভাবে? নাকি, এ পেখম নয়, এ আসলে সেই বুলিই?

সাতাশ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া কিশোরী বুলির দিকে তাকিয়ে আজকের প্রতুল মুগ্ধ স্বরে বলে উঠল, 'তোকে এই দুলজোড়ায় দারুণ দেখাচ্ছে রে, পেখম! এতদিন কোথায় হারিয়ে গেছলি বল তো?'

অবসান

'দেখলি দেখলি দেখলি তো? কী বলেছিলাম আমি?' লিলি চিড়বিড়িয়ে বলে উঠল, 'পুলিশ একদম অপদার্থ, বলেছিলাম কিনা? তখন অধ্যাপকমশাই বললেন, পুলিশ অত্যন্ত শক্তিশালী।' শেষ কথাটা শৌনকের গলা নকল করে বলল লিলি। তারপর আবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে যোগ করল, 'এখন হল তো? নিজের চোখেই দেখলে! তুমি আর পেখম চেন্নাই না গেলে পুলিশ জন্মেও খুঁজে বের করতে পারত না শ্রীনিকে!'

লিলির কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে কুলকুল করে হাসছিল দেবলীনা। শৌনক বলল, 'শ্রীনি তো কিডন্যাপড হননি, নিজেই লুকিয়ে ছিলেন। তো পুলিশ কী করবে?'

'আর তোমরা? তুমি আর তোমার মেয়ে যে কিডন্যাপড হলে, সেটা খুঁজে বার করতে পারল না কেন পুলিশ?' লিলি ফুঁসে উঠল।

'আমাদের কিডন্যাপড হওয়ার পর ক-দিন গেছিল, লিলি? পুলিশ এত তাড়াতাড়ি কী করবে?'

'আরে কিডন্যাপড যে হয়েছিলে তোমরা, সেটাই কি ওরা ধরতে পেরেছিল? খালি খালি আমাকে বলে, বাপ-বেটিতে কোথাও বেড়াতে গেছে। মোবাইল অফ করে কেউ বেড়াতে যায়?'

'কিডন্যাপড হয়েছিলাম, সেটা পুলিশ বুঝতে পেরেছিল বই-কি।'

'কীভাবে?'

'তুমিই পুলিশকে আমাদের মোবাইলের আইএমইআই নম্বর দিয়েছিলে। তার থেকে মোবাইল ট্রেস করতে পেরেছিল পুলিশ। উড়িষ্যার কোনো জায়গায় পেয়েছিল মোবাইল দুটো। যারা ব্যবহার করছিল, ওদুটো তারা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলের দোকান থেকে কিনেছে। সেই থেকেই সন্দেহ করে, আমরা কিডন্যাপড। চিরুনি-তল্লাশি শুরু করে দিয়েছিল...'

'তো আমাকে সেকথা বলল না কেন? কিঁউ? আমার বর, আমার মেয়ে কিডন্যাপড; আমি মরছি টেনশনে... আমাকে জানানো উচিত ছিল।'

'না জানিয়ে ভালোই করেছে। জানিয়ে তোমার ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে লাভ ছিল কি?

তাছাড়া সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স ছাড়া মানুষ দুটো কিডন্যাপড হয়েছে, এরকম ডিক্লেয়ার করা পুলিশের নিয়মবিরুদ্ধ। সেটা জানো?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করা বেকার, শৌনক। তুমি হচ্ছ বুদ্ধিতে বেস্পতি। তর্কচুঞ্চু কোথাকার!' লিলি বলল।

'আর তুমি টেনশন করায় ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান।' উত্তর দিল শৌনক।

'একদম ফালতু কথা বলবে না, শৌনক। ভালো হবে না কিন্তু...' চোখ পাকিয়ে বলল লিলি।

লিলি-শৌনকের এই দ্বৈরথ দেখে মজা পাচ্ছিল দেবলীনা। সে বারবার হেসে লুটিয়ে পড়ছিল টেবিলের ওপর। তবু হাসতে হাসতেই ভাবছিল, তিনমাস পর আজ লিলির এই মজারু মুখ দেখে বোঝা যাবে না, শৌনক-পেখম মিসিং হওয়ার সময় এমনকি ওরা আচমকা ফিরে আসারও কিছু দিন পর অবধি কী ভীষণ উদ্‌বেগ অশান্তির ভেতর দিয়ে গিয়েছে লিলি!

হ্যাঁ, তিনটে মাস কেটে গেছে। সেই উদ্‌বেগ এতদিনে প্রায় হজম করে সহজ হয়ে এসেছে ওদের মন। শৌনকদের বাড়ির ছাদটার চারপাশের গাছগুলো—করবী, পেয়ারা, বকুল সবুজ হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। বিকেলবেলা ছাদে টেবিল পেতে আড্ডা দিচ্ছিল তিনজন। শৌনকরা বাড়ি ফেরার কিছুদিন পরেই শ্রীনিবাসনও ফিরেছিলেন কলকাতায়। দেবলীনা কলকাতায় চলে গেছিল তখনই। তারপরে আবার এতদিন পর এসেছে। এবার একা নয়। শ্রীনি, দেবলীনা দুজনেই। শ্রীনি-র মেদিনীপুর আসার স্বপ্ন পূরণ হল অবশেষে। গত দুদিন শৌনকের সঙ্গে শহরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন শ্রীনি।

এ মুহূর্তে শ্রীনিবাসন নীচের ঘরে বসে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। মিনিট কুড়ি পর তিনিও ছাদে এসে আড্ডায় যোগ দিলেন। তার একটু পরে লিলি বলল, 'এই তোরা গল্প কর! আমি নীচে গিয়ে রান্নার ব্যাপারটা একটু সামলেই আসছি। পূর্ণিমা ফোন করে জানিয়েছে, আজ আসবে না। গড়বেতা যাবে।'

দেবলীনা বলল, 'আমিও যাই তাহলে তোমার সঙ্গে।'

'না, না, বোস না। আমি আসছি তো এক্ষুনি।'

লিলি নীচে চলে যাওয়ার মিনিট দশেক পরে শৌনক বলল, 'আমাকে একবার বেরোতে হবে শ্রীনিবাসন, মেয়েকে নিয়ে আসতে যাব। আপনারা কথা বলুন। লিলি চলে আসবে এক্ষুনি ওপরে।'

শৌনক নীচে চলে গেল। ছোটো টেবিলটার দুপাশে এখন মুখোমুখি দেবলীনা আর শ্রীনিবাসন। করবীগাছটার সবুজ পাতার দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন শ্রীনি। শ্রীনিবাসের সেই তন্ময় ভাব দেখে খানিক ইতস্তত করে ধীরে ধীরে বলল দেবলীনা, 'কী দেখছ ওদিকে, রাজু?'

'দেখছি, পাতার আড়ালে কোনো মেয়ের মুখের অস্পষ্ট আদল ফুটে ওঠে কিনা।'

দেবলীনা বলল, 'কে সে? অন্য কেউ—না?'

করবী গাছের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবলীনার মুখের ওপর উজ্জ্বল চোখ মেলে শ্রীনিবাসন বললেন, 'যাকে চিরকাল ভেবে এসেছি, সেই-ই! অন্য কেউ নয়।'

'কিন্তু সে কি আর বাস্তবের এই আমি? তা নয় হয়তো। সে তো তোমার কল্পনা আর ভাবপ্রতিভা দিয়ে গড়া অন্য কেউ... আমার থেকে আলাদা...'

'একেবারে আলাদা তোমার থেকে সে, তা তুমি বলতে পারো না, লীনা। শিল্পীর চোখ যাকে ধরে, সে তোমার ভেতরের রূপ। আসল রূপ। সত্যিকারের তুমি। বাইরের কোনো ক্ষত কোনো আঘাত তাকে মলিন করতে পারে কি? পারে না!'

কথাটায় আমূল কেঁপে উঠল দেবলীনা। ছায়াচ্ছন্ন অপরাহ্ণের ভেতর বসে থেকে থেকে সে টের পেল কখন যেন তার দুচোখ ভরে উঠেছে জলে।

কাজললতার মতো মেয়েটির দুটি চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে শ্বাসের গভীরে ডুবে গিয়ে শ্রীনিবাস বললেন, 'কথা দাও, তুমি আর কোনোদিন কোনো ছবি আঁকতে আমাকে বাধা দেবে না?'

অশ্রুপরিপ্লুত স্বরে দেবলীনা বলল, 'দেব না। যদি...'

'যদি কী?'

উত্তর না দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দেবলীনা। তারপর নৈঃশব্দ্য ভেঙে গাঢ় উচ্চারণ করল, 'আমি বড়ো একা, রাজু! আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও চলে যেও না আর...'

নীচে নেমে শৌনক রান্নাঘরে গিয়ে লিলিকে বলল, 'প্রভু শ্রীনিবাস কি আবার কোনো রূপমঞ্জরী আঁকতে শুরু করবেন নাকি তাঁর লক্ষ্মী ঠাকরুনকে নিয়ে?'

লিলি বলল, 'যাঃ, তুমি ভারি ইয়ে! এখন যাও তো গিয়ে পেখমকে নিয়ে এসো! রান্না করছি, বকবক কোরো না।'

'ইশ্, আমি যে কেন আঁকা শিখলাম না! তাহলে আমিও... আমার মডেল অবশ্য একটু পৃথুলা, যাকগে!'

'আবার!' চোখ পাকিয়ে বলে উঠল লিলি।

শৌনক লিলির কাছে সরে এসে বলল, 'হ্যাঁ গো। এই দ্যাবা আর দেবীর ভুল-বোঝাবুঝি মিটেছে?'

'দেবলীনা তো তাই বলল। জানোই তো, একটু সময় লাগে চিড়-খাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগতে। তবে ওদের দেখে মনে হয়, বিশ্বাস একটু টাল খেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এখন আবার সব ঠিকঠাক। দেখছ না কেমন পাখিতে পাখিতে মুখ-ঠেকাঠেকি করে আছে?'

'হ্যাঁ, বন্ধুত্ব আর সহজ ভাব-বিনিময়ই সব ঠিক করে দেয়। এলাম, লিলি!' এই বলে শৌনক মেয়েকে আনতে বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সাহিল এসেছিল এবাড়িতে কয়েকদিন আগে। সঙ্গে একটি মেয়ে—জুলেখা। কিডন্যাপাররা সাহিলকে কামালগাজিতে নামিয়ে দিয়ে যায়। সাহিল তখন খুবই অসুস্থ। পায়ের হাড় ভেঙেছিল। কলকাতায় একটি বেসরকারি হসপিটালে তার চিকিৎসা চলে মাসখানেক। হসপিটাল থেকেই সে লিলির সঙ্গে যোগাযোগ করে। জানতে চায়, শৌনক বাড়িতে আছে কিনা। নেই শুনে খুব চিন্তায় পড়ে গেছিল সাহিল। শৌনক বাড়ি ফিরে প্রথমেই সাহিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সাহিল তখনও হসপিটালাইজড।

জুলেখা ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে শৌনকদের ফ্যামিলি অ্যালবাম দেখছিল। লিলি বসেছিল ওর পাশে। একটু পরে উঠে এসে দেখল, সাহিল আর শৌনক গম্ভীর মুখে স্টাডিতে বসে কীসব কথা বলছে। লিলি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা কে রে, সাহিল?'

সাহিল একটু মুচকি হাসল। বলল, 'সিপাইবাজারে বাড়ি। আমার সঙ্গে অল্পদিনের আলাপ!'

লিলি মজার মুখ করে বলল, 'হুম্, কেস জন্ডিস মনে হচ্ছে? কী রে? মেয়েটি কিন্তু বেশ!'

'নিয়ামৎ আল্লাহ্!' বলে সাহিল হাসতে লাগল। হাসির মধ্যেই অনেক না-বলা কথা! শৌনকও ওদের হাসিতে যোগ দিয়েছিল।

তিন মাস আগের সেই রাত্রিতে মাটির নীচের ঘরে কী ঘটেছিল, সেসব কথা কাউকেই কিছু বলেনি শৌনক আর পেখম। ওরা দুজন কিডন্যাপড হয়েছিল, মল্লিকবাড়ির নীচে ওদের আটকে রেখেছিল, অবশেষে কোনোমতে মুক্তি পায় ওরা বন্ধুদের সাহায্যে, আর ওদের বাঁচাতে গিয়েই মল্লিকবাড়ির তলা থেকে একটা পুরোনো বাক্স প্রতুল আর সাহিল উদ্ধার করে, বাক্সটা সরকারের ঘরে জমা করেছে সাহিল আর প্রতুল—এটুকুই বাইরের পৃথিবীকে জানিয়েছে শৌনক। আর কিচ্ছু না। কিছুদিন পর সবকটা লিডিং নিউজমিডিয়া কভার করে সাহিল আর প্রতুলের এই আশ্চর্য কৃতিত্বের কথা। 'মল্লিকবাড়ির নীচ থেকে ধনসম্পদভরা বাক্স উদ্ধার করলেন মেদিনীপুর শহরের দুই বাসিন্দা প্রতুল ও সাহিল—' ইত্যাদি।

সরকারি পুরস্কার হিসেবে যে মোটা অঙ্কের টাকা এসেছিল হাতে, প্রতুল চেয়েছিল,

তা তিন ভাগে ভাগ হোক সাহিল, শৌনক আর তার নিজের মধ্যে। টাকা যে সে নেবে না, সেকথা তো আগেই বলেছিল শৌনক। সাহিল বলল, 'আমি তো শিকারেই ছিলাম না, আমি কী করে টাকা নিতে পারি?' মুশকিলে পড়ে গেল প্রতুল। এত টাকা নিয়ে সে কী করবে?

'এ পড়ে পাওয়া টাকা; চাই না বাবা, এসব আমি। আমি যা পারি নিজেই উপার্জন করব,' তার এই এক কথা শুনতে শুনতে শৌনক তো জেরবার। শেষে শৌনকের পরামর্শে সেই টাকার একটা বড়ো অংশ দিয়ে মেদিনীপুর কলেজে একটা এনডাওমেন্ট ক্রিয়েট করেছে প্রতুল; স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার অবদান ও বিপ্লব-আন্দোলন নিয়ে গবেষণার কাজে সেই টাকা প্রয়োজনমতো খরচ করা হবে।

ইতিহাসের গন্ধমাখা সেই হলুদ বিবর্ণ কাগজগুলো শুধু শৌনকের। ম্যাজেন্টা রঙের কালিতে লেখা পুরোনো দিনের পাকানো পাকানো হস্তাক্ষর। প্রথম প্রথম পড়তে অসুবিধে হচ্ছিল। তারপর ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে ফেলে দিন কতক পড়তে পড়তে অভ্যেস হয়ে গেছে তার। এখন জলের মতো ঝরঝর করে পড়ে যেতে পারে। নানা বিতর্কিত প্রসঙ্গ তুলেছেন সম্বিৎ, বারবার প্রশ্নচিহ্নে কণ্টকিত করেছেন প্রতিষ্ঠিত নেতাদের সিদ্ধান্তগুলিকে, ঐতিহাসিক অনেক চরিত্রের বহুপূজিত ভাবমূর্তির খড়ের পা দেখিয়ে দিয়েছেন নির্মেদ তথ্য তুলে ধরে ধরে। এক কথায় এ লেখা বিস্ফোরক। প্রকাশিত হলে অনেকেরই বিপদ হত তখন। কিন্তু এখন তা প্রকাশিত হওয়াই উচিত, নিরপেক্ষ ইতিহাস রক্ষার খাতিরেই। প্রেসকপি তৈরি করছে শৌনক। 'আগুনপাখির ডানা'-র প্রকাশিত অংশের সঙ্গে এই অপ্রকাশিত অংশগুলি যোগ করে পুনঃপ্রকাশ করবে। বইয়ের সামনে একটি দীর্ঘ ভূমিকাও লিখতে হবে তাকে। তার জন্য আরও পড়াশোনা দরকার। এ কাজে সে ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের সাহায্য পাবে—এমন প্রতিশ্রুতিও পেয়েছে।

তিন মাস আগে বাড়ি ফিরেই বুলিকে ফোন করেছিল শৌনক দালির খবর নেওয়ার জন্য। বুলি বলল, হঠাৎই জ্ঞান ফিরে এসেছে দালির। কী হয়েছিল, ডাক্তাররাও ঠিক বুঝতে পারছেন না। তার দিন দু-এক পরে শৌনক ফোন করে জেনেছিল, আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা অবজারভেশনে রেখে দালিকে ছেড়ে দিয়েছে আমরি থেকে। সে এখন একদম সুস্থ। স্কুলে যাওয়া শুরু করবে। আর দেরি না করে কাকিমা আর পেখমকে নিয়ে শৌনক গেছিল কলকাতা। অন্যদের যতটুকু বলা হয়েছে, দালিকেও ততটুকুই বলা হল। দালি বারবার কীভাবে ওরা কিডন্যাপড হল, কোথায় ছিল, কীভাবে ছিল, কেমন করে বেরিয়ে এল—সব ডিটেলস সোৎসাহে জানতে চাইছিল। শৌনক বলল, 'তুমি আরেকটু সুস্থ হয়ে যাও, দালিবাবু। পুজোর ছুটিতে তুমি মেদিনীপুর গেলে সব গল্প তোমাকে বলব।'

সে তো সুস্থ হয়ে গেছে! আর কত সুস্থ হবে সে? সব কথা তাকে বলছে না কেন সবুজমামা, পেখমদিদি? দালি বারবার আক্ষেপ করতে লাগল, শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে অভিযানে যেতে পারল না ওদের সঙ্গে। দালি জানে না, ওর শরীর খারাপ হওয়ার আগেই পেখম-শৌনক চেন্নাই চলে গিয়েছিল।

দালি বলল, 'এর পরের বার আমার যাই হোক, আমাকে ঠিক নিয়ে যাবে তো তোমরা, পেখমদিদি?'

পেখম সংক্ষেপে মাথা নেড়ে জানাল, নিয়ে যাবে।

'ঠিক নিয়ে যাবে কিন্তু, তা না হলে সারা জীবন আমি তোমাকে ইমলি বলে ডাকব। পেখমও না। দিদিও না। স্রেফ ইমলি! মনে থাকে যেন!'

কয়েক সপ্তাহ আগে কলেজে লিজার পিরিয়ডে কমনরুমে বসে খাতা দেখছিল শৌনক। হঠাৎ একটা অ্যানোনিমাস নাম্বার থেকে নতুন কেনা মোবাইলে সে একটা মেসেজ ঢুকতে দেখল। মেসেজটা খুব অদ্ভুত আর মজার। তিরিশজন রোমান সৈনিক বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রাণদণ্ড হয়েছে। বৃত্তের কোনো একটা পয়েন্ট-এ প্রথম একজনের শিরশ্ছেদ করা হল। তারপর সেখান থেকে তিনটে পজিশন বাদ দিয়ে চার নম্বর পজিশনের সৈনিকের মাথা কেটে ফেলা হল। এইভাবে ওই তিনটে পজিশন স্কিপ করে করে পরের জনের মুণ্ডচ্ছেদ চলছে। ক্লক-ওয়াইজ ঘুরছে ব্যাপারটা। একবার বৃত্তাকারে ঘুরে এলে জীবিত সৈনিকদের সংখ্যা কমে আসছে, সার্কল ছোটো হচ্ছে। আবার চলছে এগজেকিউশন। এইভাবে চলতে চলতে শেষ যে-সৈনিকটি বেঁচে থাকবে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন এই মরণখেলা শুরু হওয়ার আগেই, মানে একেবারে শুরুতে যখন তিরিশ জন সৈনিকই বেঁচে ছিল, তখনই কি বলে দেওয়া সম্ভব ছিল, কত নম্বর সৈনিক মুক্তি পাবে শেষে?

সমস্যাটা শৌনকের অচেনা নয়। একে জোসেফাস প্রবলেম বলে। কিন্তু কে পাঠাল মেসেজটা? পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়? কিন্তু পার্থদার নম্বর মনে হচ্ছে না তো এটা!

নতুন ফোনে সেভ করে রাখা হয়নি পার্থদার নম্বর। ডায়েরি ঘেঁটে পার্থদার নম্বরটা বের করে দেখল শৌনক। মিলছে না। পার্থদার পুরোনো নম্বরেই ডায়াল করল সে। পার্থদা ফোন ধরে বললেন, 'বল, কী খবর?'

শৌনক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি নতুন সিম নিয়েছ, পার্থদা?'

'না তো! কেন?'

'না, কিছু না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম!...' ধানাই-পানাই আনকথা ভানকথা বলে শৌনক কোনোমতে কথা শেষ করল।

মেসেজটা যে পাঠিয়েছে, সে পার্থদা নয়। শৌনকের অন্য কোনো বন্ধু, ম্যাথসের

কোনো অধ্যাপক বা কোনো ছাত্র পাঠাতেই পারে মেসেজটা। কিন্তু শৌনকের কেন জানি মনে হল, এ জিনিস পাঠাতে পারে বোধহয় একজনই। এই প্রবলেমের ধরন, এর মেজাজ সব কিছুই একজনের কথাই মনে করায়। কিন্তু সে তো...

অ্যানোনিমাস নম্বরটাতেই এবার ডায়াল করল শৌনক। উলটোদিক থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, 'আপনার ডায়াল করা নম্বরটির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই'।

বারবার তিনবার নম্বরটা ডায়াল করল শৌনক। একই কথা বারবার বলে যাচ্ছে। নাম্বার ইনভ্যালিড।

এখনও সে মাঝে মাঝে ওই নম্বরে ডায়াল করে। কিন্তু সেই একই ব্যাপার। '...নম্বরটির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই!'

পেখমের বইয়ের শেলফে একটা লুকোনো চেম্বার আছে। কখনও কখনও কোনো দুপুরে মা যখন বাড়িতে থাকে না, বাবাও কলেজে, কোনো কারণে পেখম একা বাড়িতেই রয়েছে, শেলফের সেই গোপন চেম্বার খুলে রিভলভারটা বের করে আনে পেখম। দ্যাখে, ঝকঝক করছে রিভলভারটা। থ্রি এইটটি বোরের ওয়েবলি রিভলভার। প্রথম দিনই খুলে দেখেছিল, ছটা চেম্বারের তিনটে খালি আর বাকি তিনটেতে বুলেট ভরা ছিল। বুলেট তিনটে খুলে রেখেছে পেখম। মনে মনে ভাবে সে, সত্যিই কোত্থেকে এল রিভলভারটা তার কাছে?

রিভলভারের ব্যারেলে এখনও কেমন যেন বারুদের আঘ্রাণ! নেশা ধরে যায়।

সেই রাতে মাটির নীচের সেই ঘরে কী ঘটতে দেখেছিল, সেকথা শৌনকের নির্দেশে সেও কাউকে বলেনি। কিডন্যাপড হওয়া, মল্লিকবাড়িতে আটকে থাকা, গহনার বাক্স খুঁজে পাওয়া, শেষে মুক্তিলাভ—এটাই আপাতত তাদের অভিযানের 'অফিশিয়াল ভার্সন'! অ্যাকচুয়াল ভার্সনটা কেউ জানতে পারবে না।

কিন্তু সত্যিই কী হয়েছিল সেদিন রাত্রে? বিপ্লবীদের সেই মিটিং, হেমচন্দ্র ঘোষ, বীণা দাস, দীনেশ গুপ্ত, যতীশ গুহ, বিমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যোৎ, সেই সব কথোপকথন... সব সে সেই রাতে ঘটতে দেখেছিল যে! কিন্তু এসব সত্যিই কি সে-রাতে ঘটেছিল? আচ্ছা, মল্লিকবাড়ির সেই মাটির নীচের ঘরে বন্দী হয়ে এসব স্বপ্নে দ্যাখেনি তো, পেখম? কিন্তু স্বপ্ন তো লোকে একা একা দ্যাখে। একই স্বপ্ন বাবাও দেখল তাহলে কীভাবে তারই সঙ্গে?

কোনো কোনো রাত্রে পাওয়ার-কাট হয়ে গেলে পেখম ছাদে চলে যায়। একা একা অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে সেই রাত্রিটির কথা অস্থির হয়ে ভাবে। বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে চায়। মেলাতে পারে না। হাঁটতে হাঁটতে ছাদের মাঝখানে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। অন্ধকারে নিজের ডান হাতের পাতাটা মুঠো করে অনুভব করার চেষ্টা করে। অসম্ভব

জেনেও অন্ধকারের মধ্যেই চোখ জ্বেলে সে কেন যে নিজের হাতটাকেই দেখতে চায়! একটা প্রশ্ন উঠে আসে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে। ভুরু কুঁচকে যায় তার। আচ্ছা, স্টিফেনকে তাহলে সত্যি সত্যিই কে গুলি করে মেরেছিল সেদিন রাত্রে? সে নিজেই নয়তো?

আর এ শহর থেকে অনেক দূরে, কোনো পাহাড়ি জায়গায়, মাটির নীচে সে অন্য একটা ঘর... সেখানে খাঁচার ভেতরে খাদ্যাভাবে শীর্ণ হয়ে আসা সেই সব মহানাগ– ভাইপার্স, ব্ল্যাক মাম্বা, গ্রিন মাম্বা, কালকেউটে, শঙ্খচূড়, দুধরাজেরা প্রোষিতভর্তৃকার মতো ক্ষীণ হয়ে আসে বিরহবেদনায়... রোজ যে আসত তাদের কাছে, ভালোবাসত, চেম্বারের ওপরের ঢাকনা খুলে খাবার দিত, সে মানুষটি কোথায় গেল? কতদিন হয়ে গেল, সে আর আসে না কেন?

সাপেরা এসব ভাবে। আমরাও ভাবি। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উঠে আসে আমাদের মনে।

স্টিফেনকে কে মেরেছিল, এ প্রশ্নের উত্তরে কখনও মনে হয়, স্বপ্নের কোনো চরিত্রই গুলি করে মেরেছিল বাস্তবের স্টিফেনকে। কখনও আবার মনে হয়, তাই কি কখনও হয়? বরং স্বপ্নাচ্ছন্ন কোনো বাস্তব মানুষই হত্যা করেছিল হয়তো বাস্তবের স্টিফেনকে সেই রাতে।

এমন বহুবিধ প্রশ্ন।

কখনও প্রশ্নগুলোর একরকম উত্তর পাই। কখনও অন্যরকম উত্তর। উত্তরগুলো লিখি। সন্তুষ্ট হতে পারি না। মুছে দিই। আবার লিখি। আবার মুছে ফেলি।

কিন্তু শেষে সব প্রশ্নকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা প্রশ্ন অতন্দ্র হিমালয়ের মতো জেগে ওঠে। সেদিন ভোররাতে মল্লিকবাড়ির ভূগর্ভস্থ কক্ষের মেঝে ঠেলে উঠে এসেছিল কংসাবতীর চোরা স্রোত। বিরূঢ়ক সেই স্রোতের মধ্যে তলিয়ে যায়। কিন্তু আহত বিরূঢ়ককে কি পুরোপুরি গিলে নিতে পেরেছিল কংসাবতী সেদিন? শেষ পর্যন্ত কোথায় গেল আমাদের সময়ের বিষাদজাতক বিরূঢ়ক?

এ প্রশ্নের হয়তো কোনো উত্তর নেই।

অথবা...

এ প্রশ্নের উত্তর শৌনকের ফোনে অজানা নম্বর থেকে আসা সেই মেসেজের মধ্যে, সেই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রোমান সৈনিকদের অবধারিত বাঁচামরার জটিল ধাঁধার ভেতরেই হয়তো লুকোনো রয়েছে।

পরিশিষ্ট : ক

সোনালি কল্পনা আর পাথুরে প্রমাণ

এ কথা ভাবা কি খুব ভুল হবে যে, আমার পাঠক উপন্যাস পড়া শেষ করে এই পরিশিষ্টটি পড়তে শুরু করেছেন? বোধহয় না। কেননা পরিশিষ্ট বইয়ের শেষেই থাকে আর বাংলাভাষায় বই বাঁদিক থেকে ডানদিকেই পড়েন মানুষ। তবে হ্যাঁ, আমার মতো কোনো কোনো বেয়াড়া পাঠক আছেন, যাঁরা একটা বইয়ের ব্লার্ব, ভূমিকা, পরিশিষ্ট, পরিভাষাকোশ, তথ্যপঞ্জি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয় আগে পড়ে নিয়ে তার পরে মূল টেক্সট পড়তে আরম্ভ করেন। সেইসব বেয়াড়া পাঠক, পাঠিকাদের উদ্দেশে আমার বিনীত নিবেদন, যদি উপন্যাস পড়ার আগে আপনি এই পরিশিষ্ট পড়তে শুরু করে থাকেন, তাহলে দয়া করে এই অবধি পড়েই থামুন এবং আগে উপন্যাসটা পড়ে নিন। তারপর না হয় পরিশিষ্টে আসুন। পরিশিষ্ট তো আছেই, পালিয়ে তো যাচ্ছে না!

এই অনুরোধ করার কারণ, পরিশিষ্ট আগে পড়ে পরে উপন্যাসটি পড়লে কিন্তু তার রসাস্বাদে বাধা জন্মানোর প্রভূত সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। আপনি সাজঘরের খবর আগে নিয়ে পরে নাটক দেখতে বসলে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হবে। কোনোকিছু পড়তে বসে পঠনকালে লেখককে সাময়িকভাবে খানিক বিশ্বাস করে নিতে হয়। যাকে বলে willing suspension of disbelief. তারপর পড়া শেষ হলে লেখাটির ওপর স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ করা যায়, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তর্ক-বিতর্কের অবসর তখন মেলে। সেই পাঠ-পরবর্তী চর্চার ক্ষেত্রে এই পরিশিষ্টটির একটি বিশেষ ভূমিকা থেকে যাচ্ছে।

এই উপন্যাসকে আপনি রহস্যোপন্যাস হিসেবে পড়তেই পারেন, এর শরীরে যেহেতু ট্রেজার-হান্টের গন্ধ লেগে রয়েছে। এর মূল কাহিনি, মূল কাহিনির চরিত্রসমূহ—এই সবই ২০১৫ সালের। ওই বছরের গ্রীষ্মকালে ঘটনাগুলো শুরু হয়েছে। সমতলে তখন গরম পড়ে গেছে; যদিও পাহাড়ে ঠান্ডা বাতাস বইছে, যা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাহিনি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে উঠেছে। এসব কাললক্ষণ ও ঋতুলক্ষণ আমি উপন্যাসের মধ্যে ইঙ্গিত করেছি। উপন্যাসের বয়স্ক চরিত্রগুলোর বয়েসও কাহিনিতে ইশারায় বলা হয়েছে। তবু

আমার মনে তারা যে যে-বয়েসের মানুষ, সেটা এবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম। আমি এখানে প্রধান বয়স্ক চরিত্রগুলোর কথাই লিখছি।

কাহিনির সময়কাল : ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

উদ্দালক (দালি)-র দিদা প্রিয়বালা বসুর জন্ম ১৯৪৫-এ, কাহিনির সমকালে বয়েস ৭০।

সুবিমল শাসমলের জন্ম ১৯০৩-এ। মারা গেছেন অনেকদিন আগে।

সুশীতলবাবু / শ্রীনিবাসন জন্মেছেন ১৯৪৮-এ। কাহিনির সমকালে বয়েস ৬৭।

দেবলীনার জন্ম ১৯৭০-এ। কাহিনির সমকালে বয়েস ৪৫। লিলি, শৌনক, বিরূঢ়ক, সাহিল, প্রতুল—এদের বয়েস ওরই কাছাকাছি।

ডাক্তার নগেন্দ্র খামরুইয়ের জন্ম ১৯৩৬-এ। কাহিনির সমকালে বয়েস ৭৯।

একটা পুরোনো ড্রয়িং খাতা, কতগুলো হলুদ হয়ে যাওয়া চিঠি, লাইব্রেরির কোণে পড়ে থাকা একটা বিবর্ণ পৃষ্ঠার বই—এই সব সূত্রে উপন্যাসের চরিত্রগুলো জড়িয়ে পড়েছে ফেলে আসা একটা যুগের সঙ্গে। সেই যুগপর্বটি আজ কিছুটা স্মৃত, অনেকটাই বিস্মৃত। খুব দূর কালের যুগ নয় সেটি। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ নাগাদ সেই সময়।

তার মানে এই উপন্যাসে ইতিহাসের একটা অংশগ্রহণ আছে, যদিও এটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস নয়। ইতিহাস এখানে কাহিনির একটি উপাদান মাত্র। ইতিহাসের সঙ্গে এই উপন্যাসে ব্যবহৃত তথ্যের কোনো বিরোধ নেই। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো পাঠকের জন্য একথা পরিষ্কার করে এখনও বলা দরকার যে, কোনো উপন্যাসে ইতিহাসকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলেও উপন্যাসটিকে সাক্ষাৎ ইতিহাসের বই ভাবা সুসঙ্গত নয়। তাতে উপন্যাস ও ইতিহাস—উভয়েরই অমর্যাদা করা হয়।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৩—এই সময়কালে সংঘটিত বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা অনুপুঙ্খ তথ্য 'জানতে' চান, তাঁরা কোন্ কোন্ ইতিহাসের বইতে তাঁদের জ্ঞানের পিপাসা পরিতৃপ্ত করতে পারবেন, সেগুলোর নামধাম আমি এই উপন্যাসের আখ্যানভাগের মধ্যেই দিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লিখতে তো আমি বসিনি। সে অধিকারও নেই আমার। আমি লিখতে বসেছি একটা উপন্যাস, আর পাঁচটা উপাদানের মধ্যে ইতিহাসও যার একটা উপাদান। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই ইতিহাসকে অভ্রান্ত, ধ্রুব বলে মনে করে থাকি, তা সত্ত্বেও ইতিহাসেও আছে অনেক গোলযোগ, অনেক কথা চেপে যাওয়া, অনেক কথা বাড়িয়ে বলা এবং সর্বোপরি যে-রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস লিখিত হয়, তার বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারা। ভলতেয়ার বলেছিলেন– history is the lie commonly agreed upon. তবু এর পরেও অতীতকে জানার জন্য ইতিহাসই একমাত্র নথি, যত নড়বড়েই হোক তার ভিত, যত পরস্পরবিরোধিতাই লেগে থাকুক তার শরীরে।

লিখিত ইতিহাসের বইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির মধ্যে নানা অসমাহিত প্রশ্ন জেগে ওঠে। অনেক ফাঁক, অনেক সংশয়ের তৃণাঙ্কুর, অনেক সম্ভাবনার ইশারা। একজন লেখক যখন ইতিহাসের উপাদান তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেন, তখন ওই ফাঁক, ওই সংশয়, ওই সম্ভাবনাগুলোকে তিনি ভরিয়ে তোলেন কল্পনার রঙে। আর তার ফলেই মৃত ইতিহাসের শুকনো পঞ্জরাস্থিতে প্রাণের সঞ্চার হয়; যে-দিনগুলো মরে গেছে, সেই দিনগুলো জলজ্যান্ত হয়ে পাঠকের মনশ্চক্ষে ধরা দিতে থাকে ছবির পর ছবিতে।

একথা ঠিক। কিন্তু মুশকিল হল, সেই ছবির মিছিলগুলোতে ইতিহাস যেমন থাকে, কল্পনাও তেমন থাকে বিস্তর। ফলত, ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনিকে আপনি ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতে পারেন না কোনোমতেই। আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনি একটি উপন্যাস পড়েছেন, ইতিহাস পড়েননি।

কিন্তু সেই মনে রাখাটা বহু ক্ষেত্রেই মানুষ করেন না। পঠিত কোনো ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যানকে তিনি নানা আলোচনায় টেনে আনেন ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে। তারপর যখন একদিন জানতে পারেন, যাকে তিনি প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছেন, তার মধ্যে অনেকটাই ইতিহাসের বইয়ের সঙ্গে মিললেও বেশ কিছুটা লেখকের সৃজনশীল কল্পনা, তখন গোটা ব্যাপারটার ওপরেই তাঁর আস্থা চলে যায়।

এমনটা হচ্ছে বা হয় রসবোধের অভাবের ফলে। কেন আমরা তথ্যের জন্যে ইতিহাসের কাছে যাব, আর কেন আনন্দ পাওয়ার জন্য, রসের খোঁজে, ভাবের সন্ধানে ইতিহাসাশ্রয়ী সাহিত্যের কাছেই যাব, সেই ব্যাপারগুলো পরিষ্কার না হওয়ার ফলেই এই বিপত্তি। যার ফলে যতই আমরা গাই না কেন, 'তুমি পুরাণকে বলো ইতিহাস আর ইতিহাসকে বলো পুরানো', কার্যক্ষেত্রে দল-মত- শ্রেণিনির্বিশেষে আমরা বেশিরভাগ লোকই ওই ইতিহাস আর পুরাণকে নির্বিচারে গুলিয়ে বসে থাকি।

যেহেতু এই অস্বাভাবিক রকমের গুলিয়ে ফেলাটা আমাদের দেশে এখনও বেশ স্বাভাবিক অভ্যাস হয়েই আমাদের মনে গেড়ে বসে আছে, তাই লেখকের দায়িত্বটুকু আমি ভুলে যেতে পারি না। লেখক হিসেবে আমি মনে করি, উপন্যাসের শেষে আমার বলে দেওয়া দরকার, কতটা আমি ইতিহাস থেকে নিয়েছি আর কতটা তাতে কল্পনা যোগ করেছি কাহিনি-কথনের স্বার্থে।

তা সেদিক দিয়ে দেখলে এ উপন্যাসে ইতিহাসের সঙ্গে যেটুকু সৃজনশীল কল্পনা যুক্ত হয়েছে, তার পরিমাণ বেশি নয়। এখন সেগুলো এক এক করে নীচে জানিয়ে দিচ্ছি।

১. বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স বা বিভি-র বিপ্লবী সদস্যদের বেছে নেওয়া হয়েছিল নামী স্কুল ও কলেজের ভালো ছাত্রদের মধ্য থেকে। এঁরা প্রায়শই বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ অর্থাৎ সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ। বিভি-র সদস্যদের মধ্যে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ সংখ্যায় কমই ছিলেন। বিভি-র কার্যকলাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি যেসব কারণে, এটিকে

তার অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন মধুমন্তী সেনগুপ্ত। বিভি ছিল একটি গুপ্ত সমিতি। বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালানোর জন্য টাকার দরকার। রাজনৈতিক ডাকাতি আলোচ্য সময়কালে বিরল বা পরিত্যক্ত হয়ে গেছিল মতাদর্শগত কারণে। তাহলে টাকা আসত বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতি সহমর্মী মানুষদের অনুদান থেকে। সেগুলো গচ্ছিত রাখা, প্রয়োজনে সঠিকভাবে খরচ করা এবং গুপ্তচরবৃত্তি তথা নজরদারির জন্য বিভি-র নেতারা কাদের নিয়োগ করেছিলেন? বিপ্লবী নেতারা দলের নির্দেশে প্রায়শই এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হতেন। এমতাবস্থায় অর্থসম্পদ ও অন্যান্য স্থায়ী চরিত্রের কাজের জন্য গোপনে স্থানীয় মানুষদের সাহায্য নেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্থায়ী, স্থানীয় মানুষ কারা, বিভি-র ইতিহাসে তা অনুচ্চারিত থেকে গেছে। এখানেই আমি কল্পনা করেছি ট্রেজার প্রোটেকটারের মতো একটি গোপন শাখা-সংগঠনের, যার সদস্যরা উপরিলিখিত নিরুত্তেজ, গদ্যময় কার্যগুলি সমাধা করতেন। কল্পনা করেছি, বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত স্বয়ং এই ট্রেজার প্রোটেকটর বা টিপি-র মতো শাখা-সংগঠন গোপনে স্থাপন করে যান।

২. কাকাতুয়া-বাড়ি সম্পূর্ণ বাস্তব। মেদিনীপুর শহরের কর্ণেলগোলা থেকে মীরবাজারের দিকে যাওয়ার দীর্ঘ রাস্তাটি ধরে এগিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার স্ট্যাচু অতিক্রম করে নাক-বরাবর এগিয়ে গেলে মসজিদের আগে রাস্তার বামদিকে বাড়িটি চোখে পড়ে। বাড়িটির নেমপ্লেটে রোমান হরফে 'কাকাতুয়া-বাড়ি' কথাটি লেখা আছে। বাড়ির সামনে উঁচু রোয়াক। সেই রোয়াকের সামনে কাকাতুয়ার দাঁড় ঝোলানোর দীর্ঘ শেকলটি এখনও ঝুলছে। ওখানে যে দাঁড় ছিল, আর দাঁড়ে যে কাকাতুয়া বসে থাকত, তা যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের অনেকেই এখনও জীবিত এবং সাক্ষ্যপ্রদানে সক্ষম। এই কাকাতুয়া-বাড়িতে বিভি-র বিপ্লবীরা আসতেন, মিটিং করতেন, বিপদ বুঝলে বাড়ির পেছনের লুকোনো সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে যেতেন, এসব জনশ্রুতি এখনও মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সেটা জনশ্রুতি বলেই ইতিহাসের বইতে তা স্থান পায়নি। এখন এই বাড়ির আদি বাসিন্দা হিসেবে সুবিমল শাসমল বা বর্তমান বাসিন্দা হিসেবে যে সত্যসাধন প্রতিহারের কথা আমি লিখেছি, সেগুলো কিন্তু আমার কল্পনা। ওই দুজন কাল্পনিক চরিত্র। তাঁদের সঙ্গে কাকাতুয়া-বাড়ির বর্তমান বাসিন্দাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার বই পড়ে কাকাতুয়া-বাড়ির বর্তমান বাসিন্দাদের দয়া করে বিরক্ত করবেন না।

৩. কাকাতুয়া-বাড়িতে লুকোনো দেরাজ থেকে পাওয়া একতাড়া পুরোনো চিঠি এবং সেই চিঠিগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ চিঠির কথা উপন্যাসে লিখেছি। যে চিঠিটি বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত দলের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক যতীশ গুহকে সংকেতের ভাষায় লিখেছেন। এই চিঠিটি আমার কল্পনা। এটি আমি কল্পনা করেছি কাহিনি-বয়নের স্বার্থে। ওরকম কোনো চিঠি বাস্তবে পাওয়া যায়নি। আর কাকাতুয়া-বাড়িতে কোনো লুকোনো দেরাজ নেই। তা খুঁজে সময় নষ্ট করবেন না।

৪. গোটা উপন্যাস জুড়ে একটি রিভলভারের জার্নি আছে। এই জার্নিটাই উপন্যাসের আখ্যানভাগকে ধরে রেখেছে। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে, বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত তাঁদের ইতিহাসখ্যাত রাইটার্স-বিল্ডিং অভিযানের আগে তাঁর প্রিয় এই ৩৮০ বোরের ওয়েব্‌লি রিভলভারটা যতীশ গুহকে পাঠিয়ে দেন; এই রিভলভারটি মেদিনীপুরের তিন কুখ্যাত জেলাশাসক পেডি, ডগলাস, বার্জকে হত্যায় এবং ভিলিয়ার্স হত্যা-চেষ্টায় ব্যবহৃত হয় এবং প্রতিবার অ্যাকশন শেষে ঘুরপথে বিপ্লবীদের লুকোনো ডেরায় ফিরে আসে। এখানে বলবার কথা এই যে, ১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল ডগলাস-নিধন যজ্ঞে বিপ্লবী প্রভাংশু পালের হাতে সত্যি সত্যিই একটি ৩৮০ বোরের রিভলভার ছিল। অ্যাকশন শেষে প্রভাংশু এই রিভলভার সহই ফেরারি হন এবং বিপ্লবী প্রদ্যোত ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে ধরা পড়েন। এটুকু ইতিহাসের সত্য। এইখান থেকেই আমি রিভলভারটির একটি সঞ্চারপথ বা লোকাস কল্পনা করি, সেটি যেন দীনেশের প্রিয় ওয়েবলি রিভলভার, যা বহু হাত ঘুরে বিপ্লব আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশনগুলির সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে এবং এইভাবেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সাক্ষী হয়ে থাকে। এই উপন্যাসে এই ৩৮০ বোরের ওয়েবলি রিভলভারটিই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যা একই সঙ্গে লিপ্ত ও নির্লিপ্ত। লিপ্ত, কেননা অস্ত্র হিসেবে তাকে অ্যাকশনে ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্লিপ্ত, কারণ তা নিষ্প্রাণ, জড় বস্তু। এই উপন্যাসের দার্শনিক প্রতিভূ এই রিভলভার এবং কাকাতুয়া-বাড়ির পাখির শূন্য দাঁড়।

৫. উপন্যাসে ব্যবহৃত অলিন্দ-যুদ্ধ, পেডি হত্যা, ডগলাস হত্যা, বার্জ হত্যা এবং ভিলিয়ার্সকে হত্যার চেষ্টা—এইসব অ্যাকশনগুলোতে ইতিহাসের বিবরণকেই অবিকৃত রাখা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় বিপ্লবীদের সাক্ষ্য এবং কিছু কিছু জায়গায় পুলিশ রিপোর্টেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমি কেবল পরিবেশের যথাসম্ভব বর্ণনা ও প্রাসঙ্গিক সংলাপ-যোজনার মধ্য দিয়ে সেই ঐতিহাসিক বিবৃতিকেই জীবন্ত করে তোলার প্রয়াস করেছি।

৬. পরাধীন ভারতে ও স্বাধীন ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামীদের বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাসকে নানা মহল থেকে চেপে দেওয়া হয়। এই চেপে দেওয়ার প্রবণতা সেই সুদূর ১৯২০ বা তার আগে থেকেই চলে আসছিল। বিপ্লবী নেতারা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে এতাদৃশ অপচেষ্টার প্রতিবিধান এই এত উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁদের অ্যাকশন প্রোগ্রামের বাইরে রাখবেন, তা তো হতে পারে না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বয়ং অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতি ও অন্যান্য গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা লিখেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এসব মাথায় রেখেই আমি কল্পনা করেছি, বিপ্লবীদলের নেতৃবৃন্দের দিক থেকে

তাঁদের জনৈক সদস্যের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিপ্লব আন্দোলনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করার। মন্ত্রগুপ্তির পূর্বনির্ধারিত সময়সীমা শেষ হলে তাঁকে লেখাটি প্রকাশ করার নির্দেশও দিয়েছিলেন দলের নেতারা। আমি ধরে নিয়েছি, বিভি-র সেই ভারপ্রাপ্ত সদস্যের ছদ্মনাম সম্বিৎ এবং তাঁর লেখা বইটির নাম 'আগুনপাখির ডানা', যা অংশত প্রকাশিত হয়েও অধুনালুপ্তপ্রায় এবং অপ্রকাশিত বাকি অংশ রয়ে গেছে কোনো গোপন স্থানে। এই সম্বিৎ চরিত্রটি, তাঁর লেখা বইটি ও বইয়ের বয়ান আমার কল্পনাপ্রসূত, যদিও সেই কল্পনার জোরালো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, পেডি-হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্তকে নিশ্চিত ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু ও ব্রিটিশ শাসকের তরফের অ্যাডভোকেট জেনারেল এন এন সরকারের হাত ছিল। যদিও শাসকের পক্ষের কৌঁসুলি, তবু আইনজীবী এন এন সরকার বিপ্লবীদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এর থেকে বেশি কিছু তথ্য আমি এখনও পর্যন্ত পাইনি। আমি এই এন এন সরকারের ছায়ায় নগেন্দ্রনারায়ণ সরকারের চরিত্রটি কল্পনা করেছি। পুলিশ কাস্টডি থেকে রিভলভার ও প্রফুল্ল চাকীর করোটি বের করে এনে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনাটিও কাহিনি নির্মাণের স্বার্থে আমার কল্পনা।

৮. পুলিশ ইন্সপেকটারের পুত্র প্রমথ মুখোপাধ্যায় ওরফে সত্য একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর ও প্রভাংশু পালের কংসাবতীর ঘাটে ডগলাস সাহেবকে হত্যা করার বিফল আয়োজনও সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। শুধু বার্জ হত্যার দিন পুলিশ গ্রাউন্ডের মাঠে সত্য-র উপস্থিতি ও কার্যকলাপ কাল্পনিক।

৯. মিসেস বার্জের চরিত্র সম্পূর্ণ বাস্তব। তাঁর নাম সত্যিই বারবারা বার্জ। বার্জ হত্যার সময় তাঁর একমাত্র কন্যার বয়েস ছিল চার বা পাঁচ—এও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু স্টিফেন চরিত্রটি আমার কল্পনা। মিস্টার ও মিসেস বার্জ সম্পর্কে তথ্যাদি মিস্টার বার্জ বাল্যকালে যে বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন, সেই বিদ্যালয়ের পত্রিকা অ্যাম্পলফোর্থ জার্নালে প্রকাশিত শোকসংবাদ বা অবিচুয়ারি থেকে পাওয়া গিয়েছে।

১০. মেদিনীপুর স্টেশনের কাছে সেন্ট জনস চার্চের গ্রেভ-ইয়ার্ডে আজও চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন জেমস পেডি, রবার্ট ডগলাস ও বার্নার্ড বার্জ; কবর তিনটের চেহারাও আমার বর্ণনারই অনুরূপ। কিন্তু সেই তিনটে কবরের পাশে কবরের মতো দেখতে কোনো অতলস্পর্শী চৌবাচ্চা নেই। আর যদি সেরকম কোনো গহ্বর অজ্ঞাত কোনো কারণে খুঁড়ে থাকেন চার্চ-কর্তৃপক্ষ, তাহলেও আমার বই পড়ে তাতে উঁকিঝুঁকি দিতে যাবেন না, ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে আমি দায়ী থাকব না।

১১. ভারতের ইতিহাস রচনার অফিশিয়াল বোর্ডে ডিরেক্টর হিসেবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের নিয়োগ, পরবর্তী সংঘাত ও রমেশচন্দ্রের পদত্যাগ প্রসঙ্গে যা লিখেছি, তা সর্বৈব ঐতিহাসিক ঘটনা। শুধু সেই লজ্জাকর অবমাননা ও বঞ্চনার ইতিহাস যথেষ্ট চর্চিত নয়। এখানে একবিন্দুও আমি কল্পনার আশ্রয় নিইনি।

১২. প্রফুল্ল চাকীর আত্মাহুতি, তারপর তাঁর মৃতদেহ থেকে মাথাটা কেটে নিয়ে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কলকাতায় পাঠানো, লর্ড সিনহা রোড (এলিসিয়াম রো)-এ সেই ছিন্ন শির পুলিশের আইবি অফিসের বাগানে পুঁতে রাখা—এসব ইতিহাসেরই তথ্য, পরে আবার সেটিকে সেখান থেকে তুলে লালবাজারে ক্রিমিনাল রেকর্ড রুমে এনে রাখা হয়েছিল—এটি জনশ্রুতি। ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে ১৯৯৪-৯৫ সালে ওই করোটি ক্রিমিনাল রেকর্ড রুম থেকে বের করে এনে ডিএনএ টেস্ট করার দাবি তোলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন, ওখানে ওই করোটি রাখা আছে, ডিএনএ টেস্টে তা প্রফুল্ল চাকীর করোটি প্রমাণ হলে সসম্মানে তা সমাহিত করা হোক। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ ওখানে ওরকম কোনো করোটি পাওয়া যাচ্ছে না, জানিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে অমলেন্দু দে বলেন, প্রফুল্ল চাকীর করোটি পুলিশের রেকর্ড রুম থেকে সরানো হয়েছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া এ ব্যাপারটাকে সে সময় কভার করেছিল। এ পর্যন্ত আমি কিছুই কল্পনা করিনি। কল্পনা করেছি এর পর থেকে। এই সব প্রাপ্ত তথ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই আমি প্রফুল্ল চাকীর করোটি মল্লিকবাড়ির নীচের ভূগর্ভস্থ কক্ষে কীভাবে এসে পৌঁছোল, কল্পনায় তা দেখে নিতে চেয়েছি।

১৩. মেদিনীপুরে দত্তগলিতে আমার উপন্যাসের বর্ণনা মতোই ইঁট বের করা ব্রিটিশ আমলের অনেক ভাঙা ভাঙা বাড়ি আছে। কিন্তু আমার বই পড়ে কেউ তার কোনো একটায় ঢুকতে যাবেন না, বিনীত অনুরোধ। ওখানে কোনো সুড়ঙ্গ নেই। বিশেষত, ওসব বাড়ির মেঝে খোঁড়াখুঁড়ি করে বিপদ ডেকে আনবেন না, দোহাই! জায়গাটা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, সাপখোপে ভরা, তদুপরি দেওয়ালগুলোও ভঙ্গুর, কখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, তার ঠিক নেই।

১৪. একইভাবে মল্লিকবাড়ির নীচেও নেই কোনো পাতালঘর। সেখানে গুপ্তধন নেই—আমার এই আখ্যানের সত্যতা থাকলেও নেই, না-থাকলেও নেই।

যদিও 'থাকা' বা 'না-থাকা' দুই-ই খুব গভীর দার্শনিক চর্চার বিষয়!

পরিশিষ্ট : খ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই উপন্যাসটি রচনা করতে গিয়ে আমি বহু মানুষের কাছে ঋণী হয়ে রয়েছি। তাঁদের উদ্দেশে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বসে প্রথমেই যাঁর কথা আমার মনে উঠে আসছে, তিনি একজন ইতিহাসপ্রখ্যাত ব্যক্তি। বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত, যিনি ১৯৩১-এর ৭ এপ্রিল মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক প্রদর্শনীতে অত্যাচারী জেলাশাসক জেমস পেডির ভবলীলা সাঙ্গ করেন এবং ওই বছরেরই ২৯ অক্টোবর গিলেন্ডার হাউসে ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিস্টার ই ভিলিয়ার্সকে হত্যার চেষ্টায় ধৃত হন। ঘটনাচক্রে ফাঁসি না হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কারাগৃহ হতে মুক্তি পান এবং মেদিনীপুরে ফিরে স্বগৃহে বসবাস করতে শুরু করেন।

অনেক পরে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের মেয়ে অপর্ণা দাশগুপ্ত মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের বালিকা বিভাগে শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। আমার মাসি তৃপ্তি চক্রবর্তীও তখন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। আমার মাসির সূত্রে আমি বছর তেরো-চোদ্দো বয়সে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের আগ্নেয় সান্নিধ্যে এসেছিলাম। একাধিকবার আমি তাঁদের বাড়ি গেছি ঠিকই, কিন্তু প্রথম দিন মধ্যাহ্নবেলা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তা আমার স্মৃতিপটে আজও অমলিন হয়ে আছে। তারই কিছুটা অংশ আমি আমার 'পুনর্যাপী ফিনিক্স' গল্পের বইয়ের 'ক্রান্তিকারী'-শীর্ষক গল্পে নিবেদন করেছি। ছত্রিশ বছর আগেকার সেই পুণ্যস্মৃতির দিকে তাকিয়ে আজ আমার মনে হয়, হয়তো সেদিন সন্ধ্যাতেই আমার আজকের এই উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। বলবার কথা আমার এখনও ফুরিয়ে যায়নি এবং যদি সুযোগ পাই, যদি ভগবান দিন দেন, তবে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত পটভূমিকায় ওই একই বিষয়ে 'গাইব, মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত।'

এই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ উপলক্ষ্যে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমার আভূমি প্রণিপাত নিবেদন করছি।

উপন্যাসটির একটা খসড়ামতো আমি বছর চারেক আগে লিখেছিলাম। তাতে

মাত্র তেরোটা অধ্যায় ছিল। সে প্রায় কিছুই ছিল না। লেখার পর সেকথা বুঝতে পেরে ও নিয়ে আমি চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই লেখাটি ঘটনাক্রমে আমার দিদি মৌসুমী দত্ত (মিঠুদিদি) ও আমার ভাগিনেয়ী মানালি দত্ত দেশাই পড়েছিলেন। বছরে এক-দুবার বাড়ি গেলে তাঁদের সঙ্গে দেখা হত। আর দেখা হলেই তাঁরা আমাকে 'ওই লেখাটার কী হল, কী হল' বলে তাড়া দিতে থাকেন। এই প্রশ্ন উঠলেই আমি কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতাম। কারণ, আমি জানতাম, ওই লেখাটি আমার কাছে তৃপ্তিদায়ক হয়নি এবং ওটির কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। লেখাটা যে ল্যাপটপে সেভ করা ছিল—আমি তাও ভুলে গেছিলাম। নেহাত চোখে পড়েনি তাই, চোখে পড়লে নিশ্চয়ই ডিলিট করে অপার্থিব শান্তি অনুভব করতাম। পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেত আরও একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ রচনা।

কিন্তু তা হল না। আমার সঙ্গে শুভঙ্কর ভট্টাচার্যের দেখা হল। এখন থেকে বছরখানেক আগে। শুভঙ্কর গুণী মানুষ। একাধারে তাঁর অনেক গুণ। পেশায় শিক্ষক এই মানুষটি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক। সাহিত্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আবার চলচ্চিত্র-অভিনেতা। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মৌমিতা ঋক প্রকাশনী নামে একটি প্রকাশনালয় পরিচালনা করেন। তাঁদের ফেসবুক পেজে ধারাবাহিক রচনা দেওয়ার জন্য তাঁরা অনুরোধ করেন। আমার কাছে নতুন লেখা ছিল না। নতুন লেখা তৈরি করার ইচ্ছা বা অবসরও কিছুই ছিল না। ভাবলাম, পুরোনো কোনো লেখা যদি তাঁদের দেওয়া যায়। তেমন আছে কি কিছু?

তখন ল্যাপটপ ঘাঁটতে গিয়ে ওই তেরো অধ্যায়ে লেখা খসড়াটি আমি দেখতে পেলাম। আমি চুপিচুপি ওটিই সাহসভরে শুভঙ্করকে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

খুব তাড়াতাড়ি শুভঙ্করের তা পড়া হয়ে গেল। তিনি খুবই খুশি লেখাটি পড়ে, এটিকে তিনি ধারাবাহিক উপন্যাস হিসেবে ঋক প্রকাশনীর ফেসবুক পেজে প্রকাশ করতে রাজি।

বললাম, কিছু প্রশ্ন থাকে তো, বলুন! তিনি গোটা সাতেক প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, ভাবি। ভাবতে গিয়ে আমার ইচ্ছে হল, উপন্যাসটিকে একেবারে প্রথম থেকে নতুন করে লিখি। সেকথা শুভঙ্করকে বলতে তিনি আরও খুশি হয়ে গেলেন। কথা রইল, আমি একটি করে অধ্যায় লিখব আর তিনি সেই অধ্যায়টি পড়বেন। তারপর প্রতি শনিবার তা বেরোবে। হাজার তিনেক শব্দ আমি একেকদিনে লিখে ফেলতে পারি। তিনি পনেরো মিনিটে তা পড়ে নিয়ে ওই অধ্যায় সম্পর্কে নানারকম আলোচনা করতেন। তাঁর কিছু কথা আমি মানতাম। কিছু মানতাম না। যেগুলো মানতাম, সেগুলো আরেকবার একটু দেখে দিয়ে শুভঙ্করকে পাঠাতাম। এই করে শুক্রবার রাতের মধ্যে অধ্যায়টি তৈরি হয়ে যেত ও শনিবার সকালে তা বেরোত। তবে অনেক ক্ষেত্রে সময়াভাবে আমি শনিবার ভোররাতে লিখেও পাঠিয়েছি এবং শনিবার সকাল দশটা নাগাদ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর অধ্যায়টি নিয়ে আমরা দুজন সেলফোনের দুই প্রান্তে আবার বসেছি।

এত কথা বলার কারণ, এই উপন্যাসে শুভঙ্করের সুচিন্তিত মতামতগুলিকে আমি যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছি এবং এ লেখায় শুভঙ্করের বিশেষ অবদান রয়েছে। সেই জন্যে আমি শুভঙ্করের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

উপন্যাসটির প্রতিটি অধ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে যাঁরা তাঁদের মূল্যবান মন্তব্যের দ্বারা পরবর্তী অধ্যায়গুলি রচনার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আমি অনুজাপ্রতিম স্নেহভাজন ঐশী রায়ের নাম করতে চাইব। ভারতের বিশেষত বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে তার প্রেরণাময় প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি মনে করি, এই বিষয়ে ভবিষ্যতে ঐশীর অনেক কিছু করার আছে। গবেষণা বা সাহিত্যকর্ম—যে-কোনো শাখায় তার স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়ার সুগভীর সম্ভাবনা আছে, আমি দেখেছি। এই উপন্যাসের যেসব অধ্যায়ে বিপ্লব-আন্দোলনের কথা আছে, সেগুলো আমি প্রাথমিকভাবে ঐশী পড়বে, একথা ভেবেই লিখেছি। তাতে আমাকে প্রতি পদে সতর্ক থাকতে হয়েছে, যেন কোনো তথ্যপ্রমাদ না ঘটে। আমাকে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বই, পত্রিকা, গবেষণাসন্দর্ভ, স্মৃতিকথা দিয়ে ঐশী সহায়তা করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যভ্রান্তি সংশোধন করেছে। যে কয়েক জায়গায় সে আমার সঙ্গে একমত হতে পারেনি, সেসব বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করেছে। সেসব তর্কে কখনও ছিল তারুণ্যের আবেগ, কখনও ছিল নিকষ যুক্তি ও তথ্যের প্রাখর্য। এসব উত্তপ্ত বাগ্‌বিনিময় আমি উপভোগ করেছি এবং বহু জায়গায় তার কথার প্রতিবাদ করে তাকে আরও খেপিয়ে দিয়েছি। তাতে আমারই লাভ হয়েছে। ক্রোধের মুহূর্তে সে আরও তথ্য, আরও শানিত যুক্তি খুঁজে বের করেছে এবং এই অবসরে আমি আমার লেখা সংশোধন করার সুযোগ পেয়েছি। এই লেখার জন্য আমি ঐশীর কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি, যে-আগুন ঐশীর মধ্যে জ্বলছে, তা যথাযোগ্য কর্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে অচিরেই দেদীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ঐশীর পাশাপাশি আমি এখানে আমার আরেকটি বোনের কথা বলব। সে শীর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপন্যাসে আমাকে শীর্বা প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার প্রয়োজনীয় ভাবনাগুলি সরবরাহ করে নতুন করে কল্পনা করতে বাধ্য করেছে। শীর্বা আবার মার্শাল আর্টেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। উপন্যাসে বহু জায়গায় বিস্তর মারপিট আছে! তার অনেকটাই আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের মারপিটসংক্রান্ত পূর্ব-অভিজ্ঞতাপ্রসূত হলেও, কয়েকটি জায়গায় আমি আটকে গেছিলাম। সেই জায়গাগুলোয় শীর্বা আমাকে জট খুলতে খুবই সাহায্য করেছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়লে মানুষ কীভাবে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, সেই বিষয়ে শীর্বা অনেক অভিনব পরিকল্পনা পেশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

একইভাবে অনুজপ্রতিম প্রীতম বাগচি ও আবীরলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বলতে চাই। আমার প্রায় সব কাজের পেছনেই এই দুই তরুণের সস্নেহ অনুমোদন, নির্দেশ, তর্জন-গর্জন বিদ্যমান। এই উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। এদের ধন্যবাদ

জানালে এরা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হবে চিন্তা করে সেই অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম।

লেখার প্রতিটি পর্ব পড়ে নানারকম সংশোধনীয় ভ্রান্তি যিনি নির্দেশ করেছিলেন, তিনি আমার এক দিদি মীনাক্ষী প্রামাণিক। তিনি নাট্যকর্মী; অভিনেত্রী। আমার রচিত নাট্যমুহূর্ত ও সংলাপগুলিতে তিনি যেমন একদিকে তাঁর মুগ্ধতা জানাতেন, তেমনই অসাবধানতাবশত যেসব ভ্রান্তি আমার নজর এড়িয়ে গেছে, সেগুলোও তিনি নির্দেশ করতেন। প্রায়শই অত্যন্ত নিরীহমুখে মীনাক্ষীদি সর্বাধিক বিষাক্ত প্রশ্নগুলো করতেন। যেমন, একটু আগেই বলা হল শীতকাল, এখন আবার এত গরম পড়ল কীভাবে? গ্রীষ্মের ছুটি কতদিন? কার বয়স কত? একটা বাইক কত বেগে ছুটলে এইটুকু সময়ে এতটা দূরত্ব যেতে পারে? উপন্যাসটি লিখিত হয়ে যাওয়ার পরে এই সমস্ত প্রশ্নের আলোকে আমি তা আদ্যোপান্ত সংশোধনের সুযোগ পেয়েছি।

এই একই ধরনের পরামর্শ পেয়েছি আমার দিদি মৌসুমী দত্ত ও আমার দুই ভাই সাগর ও সৈকতের কাছ থেকে। এ লেখায় তাঁদের বিশেষ ভূমিকা আছে। তাঁদেরও ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

এ উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যিনি পাঠোত্তর প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ দানে উৎসাহিত করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তিনি মনস্বী প্রাবন্ধিক অধ্যাপিকা গোপা দত্তভৌমিক। গোপাদিকে আমি আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের গণিত বিভাগের অধ্যাপক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ও তাঁর 'পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রের গণিত' বইটির কাছে আমি আমার সুগভীর ঋণ স্বীকার করি। মজার ব্যাপার, অধ্যাপক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় আমার এই উপন্যাসে একটি চরিত্র হিসেবেও এসেছেন। তাতে তাঁর সস্নেহ অনুমোদন আছে, অনুভব করেছি। আমাকে উপন্যাসটির প্রতিটি পর্বে উৎসাহিত করার জন্য একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই ওই একই কলেজের একই বিভাগের অধ্যাপক পুলক সামন্তকেও, যিনি ছাত্রজীবনে আমার সহপাঠী ছিলেন।

আগেই বলেছি, লেখাটি ধারাবাহিকভাবে ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি একেকটি পর্ব লিখেছি এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আগে থেকে পুরোটা লিখে একেক অধ্যায় প্রকাশ করিনি। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে একেকটি অধ্যায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব পাঠক-পাঠিকারা বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে আমাকে পরবর্তী অধ্যায়ে সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রেরণা জুগিয়েছেন, তাঁদের কাছেও আমি সবিশেষ ঋণী। এঁদের মধ্যে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে চাইছি অমৃতা চৌধুরী, শুক্তি রায়, সায়ন্তন ঠাকুর, সৌম্য ভট্টাচার্য, অভিজিৎ চৌধুরী, বিশ্বক মুখোপাধ্যায়, ব্রততী চৌধুরী, দেবব্রত ভট্টাচার্য, সঞ্চালিকা আচার্য, সৌম্যব্রত দে, মিতা দত্ত, অম্বেষা সামন্ত, ঋতি চট্টোপাধ্যায়, সমাদৃত রায়, শ্রীদর্শিনী চন্দ্র, শোভনকুমার সিংহ, মৌসুমী চক্রবর্তী, শেলি দাস, অভিষেক মাইতি, নবনীতা চক্রবর্তী, শুভঙ্কর দত্ত, কণিকা কর্মকার, হাসিবুর রহমান, পরমপ্রিয়া বসু ঠাকুর, পার্থ মুখার্জী, ইরাবতী রায়,

সবিতা মজুমদার রাহা, কুশল নন্দী, শ্রেমা ভট্টাচার্য, মণিকুন্তলা রায়, গার্গী মুখার্জি, গার্গী চট্টোপাধ্যায়, অদিতি ঘোষ দস্তিদার এবং এমুহূর্তে হয়তো নাম মনে পড়ছে না এমন বহু পাঠক-পাঠিকার কথা। এঁরা অনেকেই আমার প্রিয় লেখক, প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফল ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁদের মেধাবী সান্নিধ্য এই লেখাটিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আমি এঁদের সকলের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

অবশেষে যখন উপন্যাসটিকে আদ্যোপান্ত সংশোধন করতে বসি, ধানসিড়ি প্রকাশনের কর্ণধার শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত উপন্যাসটি পড়ে কয়েকটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেগুলো আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। আরও কিছু সংশোধন করি এবং উপন্যাসটির মাঝখানে আরও একটি অধ্যায় যোগ করা জরুরি বলে মনে হয়। আমার সমস্ত কাজের পেছনেই শুভ ও সেঁজুতির প্রীতিপূর্ণ সমর্থন থাকে। তাঁদের আমি আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই।

সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। মহামারী-আক্রান্ত এই দুঃস্থ সময়ে সতর্ক থাকুন, নিরাশ হওয়ার সমস্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও ইতিবাচক চর্চা ও আশাবান থাকার প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে এই কঠিন সময়কে আমরা যাতে সকলে মিলে অতিক্রম করে যেতে পারি, ভগবানের কাছে সেই ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাই।

সন্মাত্রানন্দ
১৫ আগস্ট, ২০২১